

ভয়াল রসের সম্রাট

এইচ পি লাভক্র্যাফট

শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা

সটীক সংস্করণ

ডেগন • ফ্রম বিয়ন্ড • হিপনোস • হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস
দ্য হাউন্ড • দ্য র‍্যাটস ইন দ্য ওয়ালস • দ্য শানড হাউস
ইন দ্য ভল্ট • পিকম্যান'স মডেল • দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ
দ্য থিং অন দ্য ডোরস্টেপ • দ্য শ্যাডো আউট অব টাইম



ভয়াল রসের সম্রাট

এইচ পি লাভক্র্যাফট

শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা

সটীক সংস্করণ

ডেগন • ফ্রম বিয়ন্ড • হিপনোস • হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস
দ্য হাউন্ড • দ্য র‍্যাটস ইন দ্য ওয়ালস • দ্য শানড হাউস
ইন দ্য ভল্ট • পিকম্যান'স মডেল • দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ
দ্য থিং অন দ্য ডোরস্টেপ • দ্য শ্যাডো আউট অব টাইম

এইচ পি লাভক্র্যাফট

শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা

ভয়াল রসের সম্রাট

এইচ পি লাভক্র্যাফট

শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা

সটীক সংস্করণ

সম্পাদনা ও টীকা

দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ



কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

Voyal Roser Samrat H P Lovecraft
Best twelve Stories, with annotation and illustrations
Edited by Dip Ghosh & Santu Bag

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২০

ইবুক প্রকাশ: আগস্ট ২০২০

প্রচ্ছদ: সুদীপ দেব

বর্ণশুদ্ধি: সংকল্প সেনগুপ্ত

পৃষ্ঠাবিন্যাস: কল্পবিশ্ব

ইবুক সংস্করণ: বাংলা ডিজিটাল প্রেস

মুদ্রক: শরৎ ইমপ্রেশনস প্রা. লি.
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

পরিবেশক: অরণ্যমন প্রকাশনী
৩/সি যদুনাথ দে লেন, কলকাতা ১২
আলাপন: ৭২৭৮৯৯২৫৪০

প্রকাশক: কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
৩৭২/৩ দমদম রোড, সুরের মাঠ, কলকাতা ৭০০০৭৪
ইমেল: kalpabiswa.publications@gmail.com
ওয়েবসাইট: kalpabiswabooks.com
আলাপন: ৯০৫১৩৭০১১৬

মূল্য: ৪৫০ টাকা

"*The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.*"

—H P Lovecraft

অজ্ঞাতকে—

সমস্ত ভয়ের আদিম উৎস যে

প্রকাশকের কথা

মৃত্যুর এত বছর পরেও এইচ পি লাভক্র্যাফটের জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। বরং বলা যায়, দিনে দিনে তা যেন বাড়ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, গোটা বিশ্বে এমন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বাঙালি পাঠকের কাছে সেভাবে গৃহীত হননি ক্ষণজন্মা শক্তিশালী এই সাহিত্যিক। সেই কবে অদ্রীশ বর্ধন 'দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড' অনুবাদ করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে সেভাবে কেউই অনুবাদ করার কথা ভাবেননি লাভক্র্যাফটের রচনা। একেবারে হালফিলে বাংলা ভাষায় লাভক্র্যাফটচর্চা খানিক গতি পেয়েছে। তবুও লাভক্র্যাফট সম্যক পরিচিতি পেয়ে গিয়েছেন, এমনটা নয়। তাই এই বইয়ের পরিকল্পনার সময় থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, লাভক্র্যাফটের সঙ্গে সকলের যথার্থ পরিচয় করানো। কেবল তাঁর কয়েকটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ করায় সায় ছিল না আমাদের। বরং প্রতিটি লেখার টীকা রচনা, লেখার শুরুতে সেটি সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলা কিংবা লেখকের জীবনপঞ্জি—নানাভাবে এই বইটিকে নির্মাণের কথা ভেবেছি আমরা। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সব অলঙ্করণ অতীতের বুক থেকে নিয়ে আসা তো আছেই। উদ্দেশ্য, লাভক্র্যাফট সম্পর্কে যাঁর কিছুমাত্র ধারণা নেই, তিনিও এই বইটি থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন মহান এই সাহিত্যিকের লেখার আড়ালে থাকা রহস্য ও গূঢ় ইঙ্গিতকে। প্রবেশাধিকার পাবেন লাভক্র্যাফট সৃষ্ট এক অনন্য মায়াভুবনে। এখন পাঠক তৃপ্ত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়।



বিশেষ কৃতজ্ঞতা

বিশ্বদীপ দে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ দেব,
দেবজ্যোতি গুহ, সুপ্রিয় দাস

কেন লাভক্র্যাফট পড়ব

বিশ্বদীপ দে

১৯৩৭ সালের ১৫ মার্চ। অন্ত্রের ক্যানসার ও কিডনির অসুখে ভুগে মারা যাচ্ছেন হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্র্যাফট। সে দিন হাসপাতালের বিছানায় অসহায় ও নিঃসঙ্গ (যেমনটা সব মানুষকেই হতে হয় মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে) লাভক্র্যাফট কি ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর আশি বছর পরেও তাঁকে নিয়ে চর্চা হবে সারা বিশ্ব জুড়ে? তিনি হয়ে উঠবেন পপ-সংস্কৃতির এক অনিবার্য মুখ?

এত বছর পেরিয়ে গিয়েছে। পৃথিবী বদলে গিয়েছে আমূল। তবু আজও তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলে মনের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে এক ভিন্নতর দুনিয়ার আহ্বান। মানুষ তার অবস্থান বদলে ঝলমলে নক্ষত্রের রাতের নীচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র বেয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে এক মহাজাগতিক সুর। আর কসমসের অসীম বিস্তারের সঙ্গে যোগসূত্র বুনতে থাকে। জীবন, বেঁচে থাকা ক্রমে প্রসারিত হয়ে স্থান-কালের সীমারেখা পেরিয়ে এক দূরবর্তী চেতনায় লীন হয়ে যেতে থাকে।

বেঁচে থাকার সময় সাহিত্যজগতের মূলধারা তাঁকে পাত্তা দেয়নি একেবারেই। কেবল শখের সাংবাদিকতা ও পাল্প ফিকশনের জগতে খানিক নামডাক হয়েছিল মাত্র। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর কল্পবিজ্ঞান ও হরর সাহিত্যের দুনিয়ায় তো বটেই, ধীরে ধীরে পপুলার সংস্কৃতিরও অঙ্গ হয়ে পড়েন লাভক্র্যাফট। সিনেমা, টিভি, কমিক্স, গেমস হয়ে ক্রমশ বেড়েই চলেছে ব্র্যান্ড লাভক্র্যাফটের চাহিদা। কিন্তু এসবের আড়ালে রয়েছেন লাভক্র্যাফটের রচনার আসল পাঠকেরা। যাঁরা আজও সময়ে-অসময়ে দ্বারস্থ হন তাঁর। নতুন কোনও লেখকের বই না খুলে বইয়ের তাক থেকে নামিয়ে পড়তে বসেন কবেকার এক মানুষের রেখে-যাওয়া রচনাসম্ভার। কিন্তু কোন জাদুতে? কেনই বা আজও নতুন এক পাঠক হাতে তুলে নেবেন লাভক্র্যাফটের বই? কেন পড়ছি, কেন পড়ব আমরা তাঁর লেখা?

একটা উত্তর দেওয়া যাক। বাংলা ভাষায় প্রথম লাভক্র্যাফট অনুবাদ করেছিলেন অদ্রীশ বর্ধন। 'কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড'। কিংবদন্তি সাহিত্যিকের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। সেই বইয়ের শুরুতে লেখক সম্পর্কে ছোট্ট একটি রচনাও লেখেন অনুবাদক।

আর সেই লেখার একেবারে শেষে এসে তিনি জানান, ‘‘লাভক্র্যাফট পাঠকের মন ছুঁয়ে যায় জমিয়ে আনন্দ দিতে পারেন বলেই। সব পপুলার ফিকশন কিন্তু এই কষ্টিপাথরে যাচাই হয়, তা-ই নয় কি?’’

এ বই কিশোরবেলায় পড়া। সেই সময় ওঁর অন্য রচনা পড়ার প্রশ্নই নেই। পরে বড় হয়ে দেখি, গুগ্‌লে পুরো রচনাসমগ্রই রয়েছে। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখেছি, হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়তে হচ্ছে। দু-লাইন পড়ার পর থমকে গিয়ে আবার আগের চার লাইন পড়া। বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, টানা চলতে থাকা বাক্য—এককথায় পাঠককে যেন টেনে এনে এক ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দেওয়া। তখন অদ্রীশের ওই লাইনগুলোর কথা মনে পড়েছিল। আর মনে হয়েছিল, কই, আমি তো আনন্দ পেতে পারছি না!

ক্রমে সময় যায়। বেছে বেছে তাঁর ছোট লেখা পড়ি, যাতে বেশিক্ষণ শব্দের জাগ্‌লারির মধ্যে না থাকতে হয়। তারপর আস্তে আস্তে রসাস্বাদন শুরু। আর মুগ্ধ হওয়াও। এই কয়েক বছরের পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তাঁর লেখাপাঠে যে আনন্দলাভের কথা লিখেছিলেন অদ্রীশ বর্ধন তা আসলে সময়সাপেক্ষ। লাভক্র্যাফট পড়বারও একটা অনুশীলন আছে। ধীরে ধীরে সেটা আয়ত্ত করতে হবে পাঠককে। আর একবার তাঁর অদ্ভুত রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলে তখন ব্যাপারটা বদলে যেতে থাকে। মনে হয়, এই যে বিশেষণের ছড়াছড়ি, বহু লেখার মধ্যে একটা কুয়াশা জড়ানো—এসবই তাঁর লেখার মধ্যে ছড়িয়ে-রাখা আসল মণিমুক্তো।

তবে লাভক্র্যাফটের লেখা সম্পর্কে একটা বড় অভিযোগ, তাঁর লেখার স্টাইল বড় একঘেয়ে। ফ্র্যাঙ্ক এইচ উডওয়ার্ড পরিচালিত ‘লাভক্র্যাফট: ফিয়ার অব দি আননোন’ তথ্যচিত্রটির কথা মনে পড়ল। সেখানে বহু বিখ্যাত মানুষের লাভক্র্যাফট সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। তারই মধ্যে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক নিল গেইম্যান এক জায়গায় বলেছেন, কেউ যদি প্রথমবার লাভক্র্যাফট পড়তে বসেন, তাঁকে শিখে নিতে হবে পড়ার কৌশল। কেননা সেই অর্থে লাভক্র্যাফটের ভাষা কোনওভাবেই আধুনিক নয়। যে-কোনও লাভক্র্যাফট-অনুগত পাঠকই গেইম্যান সাহেবের এই কথার সঙ্গে একমত হবেন।

আরও একটা ব্যাপার। লাভক্র্যাফটের অধিকাংশ রচনাই উত্তমপুরুষে। যেন উন্মত্ততার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে করতে কেউ লিখছেন তাঁর কাহিনি। মানুষ যখন সেইরকম অবস্থায় পড়ে, তার মধ্যে একটা ঘোর কাজ করে। আর ঘোরের

মধ্যে চেনা দুনিয়ার সামান্যতম শব্দ, চিরচেনা দৃশ্যও হয়ে উঠতে থাকে 'লার্জার দ্যান লাইফ'। সব কিছুতেই সে খুঁজে পায় গোপনীয়তার অনুপম সংকেত। এই অবস্থায় সত্যিই সে কিছু লিখলে বা বললে সেটাও চেনা গদ্যের স্টিরিয়োটাইপকে ছেড়ে অন্যতর হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক।

অন্য মহৎ লেখকদের মতোই লাভক্র্যাফটের লেখাতেও ছিল সেই অমোঘ দর্শন, যা শেষ পর্যন্ত কালকে জয় করে চিরকালীন হয়ে উঠতে পারে। তাঁর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আবেগ, তার নাম ভয়। এবং তার পাশাপাশি যে জিনিসটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়তে থাকে তা হল বিষাদ। তাঁর সমস্ত ভয়ের মধ্যেই এই বিষাদও অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়েছে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখায় লিখেছিলেন, "আমি ও আমার গল্প একই।" লাভক্র্যাফট তেমন কিছু কোথাও লিখেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যেও তাঁর জীবন ছায়া ফেলে গিয়েছে। কিশোর বয়সে পৌঁছে বারবার আঘাত পেতে পেতে এমন অবস্থা হয়েছিল, আত্মহননের চিন্তা ঘুরতে শুরু করেছিল মাথার মধ্যে। তিন বছর বয়সে বাবা অপ্রকৃতস্থ হয়ে গেলেন। মারাও গেলেন কয়েক বছর পরে। এখন পরিষ্কার যে, তাঁর সিফিলিস হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সেই অসুখের কোনও চিকিৎসা ছিল না। তিনি পাগল হয়ে গেলেন। জীবনের শেষ পাঁচ বছর কাটল পাগলাগারদে। সেই ঘটনার কুড়ি বছর পরে লাভক্র্যাফটের মা-কেও সেখানে ভরতি হতে হয়েছিল। কিন্তু লাভক্র্যাফটকে সব থেকে বড় আঘাত দিয়েছিল শিল্পপতি দাদুর মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুর পরে ৪৫৪ অ্যাঞ্জেল স্ট্রিটের বিশাল বাড়ি ছেড়ে উঠে আসতে হল ৫৯৮ অ্যাঞ্জেল স্ট্রিটের একটা ছোট বাড়িতে। সেটার সঙ্গে আগের বাড়িটার তুলনাই হয় না। আগের বাড়ির বিরাট লাইব্রেরিতে নানা বিষয়ের বই পড়ে পড়ে সময় কাটত তাঁর। নতুন বাড়িটা ওই এলাকাতেই। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়েছিল সুদূর! জীবনটাও বদলে গেল আমূল। দারিদ্র্য এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের কোণে। সাইকেল চালিয়ে বহু দূর চলে যেতেন কিশোর লাভক্র্যাফট। ব্যারিংটন নদীর স্থির ও গভীর জলের দিকে তাকিয়ে সেই বিষণ্ণ কিশোরের মনে হয়েছিল, জীবনটাকে এবার শেষ করে দিলেই হয়!

১৯০৪ সাল থেকে একেবারে একলা হয়ে যান তিনি। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কও একেবারে তিক্ত হয়ে উঠেছে। অনটন তখন চেপে বসেছে সংসারের ভরকেন্দ্রে। নিজের ছেলের মুখ

মায়ের কাছে ‘অশুভ’ বলে মনে হত। সেই সময় লাভক্র্যাফট হয়ে পড়েছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ। বছরকয়েক চলার পর শখের সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন তিনি। ধীরে ধীরে আবার খানিক স্বাভাবিক জীবনে ফেরেন। কিন্তু কৈশোর ও তারুণ্যের ওই বছরগুলোর কালো ছায়া তাঁর বাকি জীবনে গাঢ় ছাপ ফেলে গেছে। ‘আউটসাইডার’ কাহিনিতে যেন সেই জীবনই উঠে আসে। এই গল্পের কথক এমন একজন, যে বছরের পর বছর পৃথিবীর আলো দেখেনি। এক অন্ধকার দুর্গের মধ্যে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ দীর্ঘ সময়। তারপর একদিন সে বেরিয়ে পড়ল রোদ্দুর-হাওয়াময় জীবনের আঙিনায়। কিন্তু সেই পৃথিবীতে কেউ তাকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাঁদের সকলের কাছে সে এক এলিয়েন। মানুষের পৃথিবীতে এক বিকট দানব।

হয়তো এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁকে কসমসের কথা ভাবিয়েছে। মানবজীবনকে আতশকাচের তলায় না রেখে তিনি তাঁর দূরবিন তাক করেন আরও দূরে। সময়-স্থান ব্যতিরেকে মহাশূন্যের অসীম বিস্তারের দিকে।

অথচ জীবনের সামান্য সময়ই তিনি কাটিয়েছেন প্রভিডেন্সের বাইরে। তাঁর কবরেও লেখা ‘আই অ্যাম প্রভিডেন্স’। এ এক আশ্চর্য প্যারাডক্স। নিজের স্থানিক অবস্থান আঁকড়ে-থাকা এক মানুষ নিজের চেতনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর কোণে। আসলে ‘সাধারণ মানুষ’-এর সঙ্গে সংযোগবিহীন লাভক্র্যাফট বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর লেখার বিষয় তাঁরা হতে পারেন না। ‘ডিফেন্স রিমেইনস ওপেন’ প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘‘আমি ‘সাধারণ মানুষ’-এর কথা লিখতে পারি না, কেননা আমি তাদের ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহীও নই। আগ্রহ ছাড়া কোনও শিল্প হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আমার কল্পনাকে আকর্ষণ করে না। করে মানুষের সঙ্গে কসমসের সম্পর্ক—অজানার সঙ্গে। যেটা একাই আমার মধ্যে সৃজনশীল কল্পনার স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোলে। মানবকেন্দ্রিক গদ্য আমার পক্ষে অসম্ভব। কেননা আমি সেই আদিম মায়োপিয়া অর্জন করতে পারিনি, যা পৃথিবীটাকেই বিরাট করে দেখায়, কিন্তু তার পশ্চাৎপটকে অবহেলা করে।’’

১৯২৬ সালে তিনি লেখেন ‘দ্য কল অব কথুলু’, যা পরবর্তী সময়ে জন্ম দেবে ‘কথুলু মিথোজ’-এর। কথুলু এক অতিজাগতিক মহা-অস্তিত্ব। মানবসভ্যতার চেয়ে তার বয়স ঢের ঢের বেশি। আক্ষরিক অর্থেই রাজা মান্ধাতাও তার কাছে সে দিনের ছোকরা। যার নামটা

পর্যন্ত আমাদের জিব উচ্চারণ করতে পারে না। সে এক অনন্ত নিদ্রায় নিমজ্জিত। কিন্তু একবার যে জেগে উঠলে নিতান্ত অবহেলায় গুঁড়িয়ে দিতে পারে গোটা মানবসভ্যতাকে। এই যে মানুষের পৃথিবীর নাগালের বাইরের এক মহাচেতনার কল্পনা তাঁকে অনুপ্রাণিত, বলা যায় তাড়িতও হয়তো করেছে, সেই কল্পনা আসলে কসমসের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। লাভক্র্যাফটের সেই কল্পনার জোর এত বেশি যে, তার মধ্যে ডুবে গিয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। কেবল পাঠক নন। লেখকরাও। তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন 'কথুলু মিথোজ'কে। আর কালক্রমে লাভক্র্যাফট হয়ে উঠছেন এক রহস্যময় চরিত্র, যিনি পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে-থাকা এক প্রাচীন রহস্যের সন্ধান জেনে গিয়েছেন।

'নেক্রোনমিকন' নামক এক আশ্চর্য গ্রন্থের খোঁজ পেয়েছেন তিনি। লাভক্র্যাফট নিজে জানিয়ে গিয়েছেন, এই নাম তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'দ্য হাউন্ড' গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ মেলে এই বইয়ের। মহাজগতের সব রহস্য লুকিয়ে আরবি ভাষায় লিখিত এই বইয়ের মধ্যে। যে বই পুরোটা আজ পর্যন্ত কেউই চাক্ষুষ করেনি। এই বইয়ের এক কাল্পনিক ইতিহাস লিখে ফেলেছিলেন লাভক্র্যাফট। ক্রমে বহু মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে দেন, এই বই সত্যিই আছে!

আর এভাবেই নিজের সৃষ্টির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছেন লাভক্র্যাফট। বহু মানুষের চোখে হয়ে উঠেছেন অতিপ্রাকৃত চর্চাকারী!

২০১২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করা জাপানি মাঙ্গা ও অ্যানিমে 'বাঙ্গো স্ট্রে ডগস'-এ একটি চরিত্রের নাম হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্র্যাফট। সেই চরিত্রের 'সুপার পাওয়ার' হল, সে নিজেকে অক্টোপাস-সদৃশ এক মনস্টারে পরিণত করতে পারে। 'কথুলু মিথোজ'-এর ছায়ায় এইভাবে স্রষ্টা নিজেই হয়ে উঠেছেন এক অতিজাগতিক প্রাণী!

এ এক ট্র্যাজেডিই বটে। খ্যাতি থেকে অতি-খ্যাতির আবহে আজও তিনি অতি-জীবিত। আর সেই বেঁচে থাকার আড়ালে রয়ে গিয়েছে তাঁর অমোঘ দর্শন। তাঁর রচনার 'বিটউইন দ্য লাইনস'-এ থেকে-যাওয়া অকথিত সেই দর্শনকে বুঝতে তাই তাঁর লেখার গভীরে নামতে হবে।

আসলে কসমসের বিপুল অস্তিত্বের মাঝে মানুষের অবস্থান কতটা সামান্য, মানুষের আবেগ ও তথাকথিত মানবিক মূল্যবোধ কতটা অর্থহীন— এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন লাভক্র্যাফট। তাঁর লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। আর এই জায়গা

থেকেই তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মেটাফরের। সেই মেটাফরই কথুলুর রূপ ধরে বইয়ের পাতায় জেগে ওঠে মহানিদ্রা ভেঙে। কেবল কথুলুই তো নয়, আরও আছে। ঘাটানোথোয়া, ইগ, নিয়ারলাটহোটেপ... মানুষের চেতনার স্থান-কালের কাছে তারা সকলেই 'আউটসাইডার'।

সারাজীবন 'ফিয়ার অব দি আননোন'কে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে মানবসভ্যতার সবচেয়ে পুরোনো ও সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ হল ভয়। আর সবচেয়ে পুরোনো ও সবচেয়ে শক্তিশালী ভয় হল অজানার ভয়। সেই অজানাকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। মানুষের মনের অন্ধকারে ছায়া ফেলে যায় কোন মহাজগতের ধারণা? অজানা, অসীম সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ 'হিপনোস' গল্পের দুই স্বপ্নদর্শী খুঁজতে বেরিয়েছিল। বিনিময়ে পেয়েছিল ঘন আতঙ্কের ঠাসবুনোট অনুভূতি।

লাভক্র্যাফটের লেখায় প্লট ও ঘটনার ঘনঘটার আতিশয্যের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে এই অনন্তের খোঁজ। মনে পড়ছে, বহু বছর আগে অদ্রীশ বর্ধন এক আলাপচারিতায় লাভক্র্যাফটের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি তাঁর লেখায় অনন্তকে ধাওয়া করেছিলেন।

সেই অনন্তের খোঁজ পেতেই আমাদের তাঁর লেখার কাছে ফিরে যেতে হবে। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে বাঙালি পাঠকের কাছে সেভাবে পঠিত নন তিনি। কেন কে জানে! সে হয়তো এক অন্য লেখার বিষয়। এখানে এইটুকুই বলা যেতে পারে, লাভক্র্যাফটের 'মেন্টর' এডগার অ্যালান পো-র কিছু রচনা বাঙালি পাঠকের অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু লাভক্র্যাফট নন। যদিও গত কয়েক বছরে ছবিটা বদলেছে। লাভক্র্যাফট অনূদিত হচ্ছেন। দুই বাংলার পাঠকের তাঁকে ঘিরে আগ্রহ বাড়ছে।

আশি বছর পেরিয়ে মৃত্যুর শতবর্ষের দিকে ধাপে ধাপে এগোচ্ছেন এইচ পি লাভক্র্যাফট। একশো বছর পরেও তাঁকে আমাদের প্রয়োজন পড়বে। পড়বেই। অনন্তের যাত্রাপথে একশো বছর যে একটা বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

ঋণ: ১) লাভক্র্যাফটের একটি সংকলনে এস টি জোশীর লেখা ভূমিকা।

২) তথ্যচিত্র 'লাভক্র্যাফট: ফিয়ার অব দি আননোন'।

স্বপ্নের ভেতর জেগে ওঠে অচেনা শহর। নির্জন পথঘাট বেয়ে চাঁদের ঠান্ডা আলো সেই শহরের চিবুক ছুঁয়ে দেয়। আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের ভিড়। চেতনার গভীরে টুপটাপ ঝরে পড়ছে রাত্রির অকরুণ হিম। এই সময় কান পাতলে তুমি শুনতে পাবে, এক অপার্থিব সুর ভেসে চলেছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে। সমুদ্রের তলদেশে নিদ্রিত মহাপ্রাণের শরীরও কেঁপে উঠছে সেই সুরের অলৌকিক ঘোরে।

এসো, ভেসে যাই কোনও সুদূর দুনিয়ায়। মানুষের জাগতিক বেঁচে থাকার তুচ্ছতাকে সরিয়ে রেখে শরিক হই এক অনন্ত অভিযানের। অবর্ণনীয় সেই যাত্রাপথে তারার ধুলোয় মিশে আমরা বিস্মৃত হব গন্তব্য। বিস্মৃত হব, কোন অনাদি অতীত থেকে শুরু করেছিলাম এই যাত্রা। এই পথের কি শেষ আছে? নাকি এই ভেসে চলাই আমাদের নিয়তি?

এক অচেনা পৃথিবীর দরজা এই খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে। এসো...



ডেগন

ডেগন শুধু লাভক্র্যাফটের প্রথম দিকের রচনাই নয়, এই গল্পেই প্রথম কথুলু মিথোসের বীজ বপন করা হয়। ডেগনের কথা এর পরেও বহু গল্পে লাভক্র্যাফট এনেছেন। স্বীকারক্তি, সুইসাইড নোট, প্যারানয়া, প্রাচীন অপার্থিব দেবতা, অজানার আতঙ্ক— লাভক্র্যাফটের নিজস্ব ঘরানার ছাপ এই গল্পের পাতায় পাতায়।

ডেগন
(Dagon)



চূড়ান্ত মানসিক চাপের মধ্যে এই কথাগুলো লিখছি। কারণ আজ রাতের পর এ জীবন আমি আর রাখব না। টিকে থাকার জন্যে যে ওষুধ আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিত, ফুরিয়ে এসেছে তার ভাঁড়ার। নিঃশেষ হয়ে গেছে আমার শেষ কপর্দকটুকুও এই যন্ত্রণা সহ্য করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই নিচের নোংরা রাস্তায় চিলেকোঠার জানলা থেকে ঝাঁপ দেব একটু বাদেই।

ভাববেন না যে আমি দুর্বল হৃদয় কিংবা পাগল। সে আমার যতই মরফিনের নেশা থাকুক না কেন। এই যে তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা লাইন লিখছি, এগুলো পড়ে হয়তো সমস্তটা বুঝবেন না। কিন্তু কিছুটা অন্তত আন্দাজ করতে পারবেন ঠিক কী কারণে স্মৃতিলোপ বা মৃত্যু, এ দুটোর একটা পথ বেছে নেওয়া আমার জন্যে কেন এত জরুরি ছিল।

মাল সরকারের দায়িত্ব নিয়ে জাহাজে চড়ে যাত্রা করছিলাম। বিস্তীর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরের এক অকূল নির্জন অঞ্চলে জার্মান হানাদারের খপ্পরে পড়ল আমাদের জাহাজ। মহাযুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে[1]। জার্মান নৌসেনারা তখনও তাদের যুদ্ধের শেষবেলার হতাশা এবং মানসিক অধঃপতনে একেবারে ডুবে যায়নি[2]। জাহাজখানা তারা যুদ্ধের পারিতোষিক

হিসেবে দখল করল বটে, কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে ন্যায্য, ভদ্র আচরণ প্রাপ্য, তাদের আচরণ হল সেরকমই। তাদের ঢিলেঢালা নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে একলা একটা নৌকোয় চড়ে পালালাম ধরা পড়ার পাঁচদিন বাদেই। সঙ্গে নিলাম বেশ কিছুদিন চলার মতো জল আর খাবার।

মুক্তি পেয়ে নৌকো নিয়ে যখন ভাসলাম, তখন ঠিক কোথায় রয়েছি তার বিন্দু-বিসর্গ জানতাম না। নাবিকদের মতো দিক নির্ণয় করার ক্ষমতাও আমার ছিল না কোনওদিন। আকাশের তারা আর সূর্যের গতিবিধি থেকে আন্দাজ করতে পারছিলাম যে রয়েছি বিষুবরেখার দক্ষিণে কোথাও। তবে ঠিক কোন দ্রাঘিমাংশে তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। চোখে পড়েনি কোনও দ্বীপ বা উপকূলের রেখাও।



চিত্র ১.১ : একলা একটা নৌকোয় চড়ে পালালাম

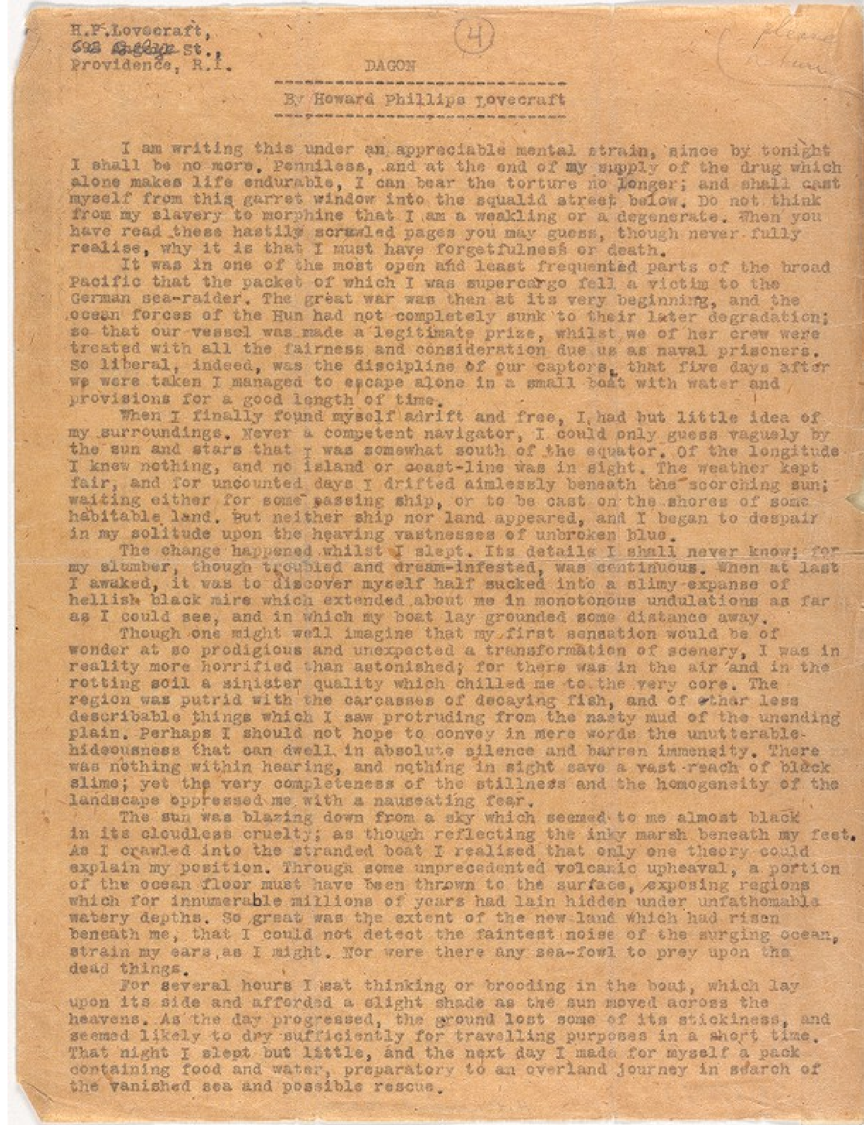
আশা করেছিলাম হয়তো কোনও জাহজের নজরে পড়ব, অথবা পৌঁছে যাব টিকে থাকার মতন কোনও সমুদ্রতটে। সমুদ্রের পরিষ্কার আবহাওয়ায় জ্বলন্ত সূর্যের নিচে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসতে ভাসতে কেটে গেল না-গোনা অনেকগুলো দিন। এ ক-দিনে না কোনও জাহাজ চোখে পড়ল, না ডাঙার চিহ্ন দেখতে পেলাম। সেই বিরামহীন নীল উত্তাল বিশালতার মাঝে একাকীত্ব গ্রাস করল আমায়, ক্রমশ মুষড়ে পড়তে লাগলাম আমি।

অবস্থা যখন পালটালো তখন আমি ঘুমিয়ে। স্বপ্নতাড়িত এক ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে সে সময় একনাগাড়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি আমি। তাই ঠিক কী হয়েছিল জানার এখন আর কোনও উপায় নেই। ঘুম ভেঙে দেখলাম আঠালো পাঁকে শরীরের অর্ধেক ডুবে রয়েছে আমার। আর চারপাশে ভয়ানক উর্মিমালার মতো চেহারা নিয়ে দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কৃষ্ণকালো, পঙ্কিল, এক নারকীয় প্রান্তর। একটু দূরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে আমার নৌকোটা।

ভাবছেন হয়তো এইরকম অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত দৃশ্যপট পরিবর্তনে আমি একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। না হইনি। বরং সেখানকার পচা জমি আর হাওয়ায় মিশে ছিল এমন এক অশুভ ইঙ্গিত যে বিস্ময় নয়, আতঙ্ক গ্রাস করেছিল আমায়। হিম হয়ে এসেছিল অন্তরাত্মা। অন্তহীন সেই পূতিগন্ধময় প্রান্তরের চারপাশে ছড়িয়ে পচাগলা মাছ। জঘন্য পাঁক থেকে ইতস্ততঃ উঁচিয়ে রয়েছে অবর্ণনীয় অন্যান্য জীবদেহ। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল আঠালো কালো পাঁক ছাড়া আর দেখার কিছু নেই, কান পাতলে শোনা যায় না কোনও শব্দও। মাথার ওপরে সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে যে নির্মেঘ নিষ্ঠুর আকাশ থেকে, তার রংও নিচের জলাভূমির মতনই কালো। সে ঊষর ব্যাপ্তি আর নিথর নীরবতার বীভৎসতাকে বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই। অখণ্ড নিস্তব্ধতায় মোড়া বৈচিত্রহীন সেই দৃশ্যপটের আতঙ্কে নাড়ি উলটে আসছিল আমার।

শরীরটাকে টেনে নৌকোয় নিয়ে যেতে যেতে কী ঘটেছে কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম। কোনও এক অভূতপূর্ব ভূস্তরীয় উপদ্রবে জলের অতল গভীরতায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ডুবে থাকা সমুদ্রের তলদেশের একাংশ ছিটকে উঠে এসেছে ওপরে[3]। বুঝলাম এই নবীন ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি অতিবিশাল। কারণ বহু চেষ্টা করেও সমুদ্রের ক্ষীণতম আওয়াজটুকু আমার কানে এল না। চোখে পড়ল না মাছের দেহাবশিষ্টের লোভে উড়ে আসা কোনও

সামুদ্রিক পাখিও। সূর্যের তাপ বাঁচিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে বসে রইলাম কাত হওয়া নৌকোর এক চিলতে ছাওয়ায়।



H.P.Lovecraft,
[illegible] St.,
Providence, R.I.

(4)

DAGON

By Howard Phillips Lovecraft

I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer; and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages you may guess, though never fully realise, why it is that I must have forgetfulness or death.

It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea-raider. The great war was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation; so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that five days after we were taken I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time.

When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude I knew nothing, and no island or coast-line was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun; waiting either for some passing ship, or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastnesses of unbroken blue.

The change happened whilst I slept. Its details I shall never know; for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awaked, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away.

Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished; for there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight save a vast reach of black slime; yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear.

The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty; as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat I realised that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions which for innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me, that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, strain my ears as I might. Nor were there any sea-fowl to prey upon the dead things.

For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness, and seemed likely to dry sufficiently for travelling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue.

চিত্র ১.২ : ডেগন: টাইপ করা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

কয়েক ঘণ্টা বাদে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল, জমির আঠালো চটচটে ভাবটা শুকিয়ে আসছে। হয়তো অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁটাচলার মতন উপযুক্ত হয়ে উঠবে। সে রাতে ভালো করে ঘুমোলাম না। সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারলে হয়তো উদ্ধারের

একটা সম্ভাবনা থাকে। তাই পরের দিন ঝোলায় জল আর খাবার বেঁধে নিয়ে নিখোঁজ সমুদ্রের সন্ধানে বেরনোর জন্যে তৈরি হয়ে রইলাম।

তিনদিনের দিন সকালে দেখলাম মাটি শুকিয়ে বেশ শক্ত হয়ে গেছে, অনায়াসে হাঁটা যায়। মাছের দুর্গন্ধে যদিও পাগল হওয়ার জোগাড়, তাকে বিশেষ আমল দিলাম না, আমার মাথায় তখন অন্য দুশ্চিন্তা। বুক বেঁধে পা চালালাম অজানার উদ্দেশে।

উঁচুনিচু ঊষর প্রান্তের পশ্চিম দিকে একটা উঁচু টিলা চোখে পড়েছিল, সারাদিন হাঁটলাম সেইটে লক্ষ করে। তবে পৌঁছতে পারলাম না। রাতটুকু জিরিয়ে নিয়ে ফের হাঁটা শুরু করলাম পরের দিন। তবে সেদিনও মনে হল না পাহাড়টার ধারে কাছে পৌঁছতে পেরেছি।

অবশেষে চতুর্থ দিন সন্ধেবেলা এসে পৌঁছলাম পাহাড়ের গোড়ায়। দেখলাম যা ভেবেছিলাম পাহাড়টার উচ্চতা তার চাইতে অনেক বেশি। সামনের একটা উপত্যকার জন্যে সেটাকে প্রান্তরের বুকে বেশি স্পষ্ট দেখায়। ক্লান্তিতে পাহাড়ে চড়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই সেদিনের মতো নিদ্রা গেলাম তার ছায়াতেই।

সে রাতে কেন ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখলাম জানি না। তবে ঘেমে নেয়ে যখন ঘুম ছুটে গেল, তখন পুব প্রান্তরের অনেক ওপরে উঠে এসেছে কৃষ্ণপক্ষের বিশাল ক্ষয়াটে চাঁদ। বুঝলাম আর ঘুম হবে না, যা সব স্বপ্ন দেখেছি, তারা ধাক্কা আর দ্বিতীয়বার সহ্য করতে পারব না।

চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বুঝলাম আমার দিনেরবেলায় যাত্রা করাটা বোকামি হয়েছে। রোদের তাপ না থাকলে আমার এত শক্তিক্ষয় হত না। সত্যি বলতে কি সূর্যাস্তের সময় যে পাহাড়ে চড়াটাকে ভয় পাচ্ছিলাম, মনে হল সেটা এবার অনায়াসে করে ফেলতে পারি। ঝোলাটা তুলে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম শিখর লক্ষ করে।

আগেই বলেছি প্রান্তরের বৈচিত্রহীনতা আমার ওপর কেমন একটা আতঙ্কের ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে সে আতঙ্ক বেড়ে গেল বহুগুণ। দেখলাম পাহাড়ের নিচে এক অতলস্পর্শী খাদ। চাঁদের আলো তখনও স্পর্শ করেনি তার গভীরতার জমাট বাঁধা অন্ধকার। মনে হলে যেন দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর অন্তিম কিনারায়, যার পরে রাজত্ব শুরু হয়েছে অনন্ত রাত্রির অরাজকতার। মনে ভেসে উঠল প্যারাডাইস লস্ট[4] আর নিরাকার অন্ধকারের রাজ্যে শয়তানের ভয়ানক উত্থানের অদ্ভুত সব আতঙ্ক জড়ানো স্মৃতি।

চাঁদ আকাশের আরও কিছুটা ওপরে উঠে আসতে দেখলাম সামনের উপত্যকার উতরাই যতটা খাড়া ভেবেছিলাম ততটা নয়। উঁচিয়ে থাকা পাথর আর কার্ণিশ ধরে অনায়াসে নিচে নামা যায়। শ'খানেক ফুটের পর ঢালের খাড়াইও অনেক কম।

মাথায় কি ভূত চাপল জানি না, হাঁচড়পাঁচড় করে পাথর বেয়ে নেমে এসে দাঁড়ালাম নিচের ঢালের ওপর। তার নিচের পাতালজোড়া অন্ধকারে তখনও আলো এসে পড়েনি।

দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই নজর গেল উলটোদিকের ঢালের একটা অদ্ভুত জিনিসের দিকে। আমার থেকে প্রায় একশো গজের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিশাল কোনও বস্তু। চাঁদের আলোয় সাদা ঝকঝক করছে তার চেহারা। নিজের মনকে প্রথমে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যে সেটা বৃহৎ আকারের একটা পাথর বই আর কিছু নয়। তার গড়ন আর অবস্থান দেখে তাও কেমন যেন মনে হতে লাগল যে সেটা হয়তো প্রকৃতির হাতে সম্পূর্ণ গড়া নয়।

কিন্তু জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখার পরে মনের ভেতর যে সব ভাবের উদ্রেক হল তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। বস্তুটি আয়তনে অতিবিশাল। দাঁড়িয়ে সেটা এমন এক পাতাল কন্দরে যা অতল সাগরজলে নিমজ্জিত ছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। অথচ বুঝতে অসুবিধে হয় না সেটা একটা শিলাস্তম্ভ। আর তার সুগঠিত আকার এককালে যারা গড়ে তুলেছে, কিংবা হয়তো আরাধনা করেছে, তারা অতি অবশ্যই কোনও জীবন্ত, বুদ্ধিমান প্রাণী।

ভয়ের সঙ্গে যোগ হল কেমন একটা অবিশ্বাসের ঘোর। বৈজ্ঞানিক কিংবা প্রত্নতত্ত্বাত্তিকদের মতো উত্তেজিতও হয়ে পড়লাম কিছুটা। আরও একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপরে। তার অদ্ভুত উজ্জ্বল আলো পড়েছে খাদের খাড়া দেওয়ালের ওপর। সে আলোয় দেখলাম সামনে ছড়িয়ে রয়েছে প্রশস্ত জলস্তর, তার দু-প্রান্ত এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। আমার পায়ের কাছে ছলছল করছে তার মৃদু তরঙ্গ, আর খাদের উলটোদিকে সেই জলের ঢেউ ধুইয়ে দিচ্ছে বিশাল শিলাস্তম্ভের পাদদেশ।

শিলাস্তম্ভের গায়ে এবার নজরে পড়ল শিলালেখ আর অপটু শৈলিতে খোদাই ভাস্কর্য। শিলালেখের অদ্ভুত দর্শন সেই হাইরোগ্লিফিক লিপি আমি আগে কখনও দেখিনি কিংবা বইতেও পড়িনি। তার বেশির ভাগ অক্ষরই যেন মাছ, তিমি, কাঁকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি জলজ প্রাণীর প্রতীকি রূপ। আরও দু-একটা অক্ষরে চেহারা নিয়েছে এমন কিছু

প্রাণীর যারা আজকের যুগে অজানা, কিন্তু যাদের পচন লাগা শরীরগুলো আমি আগেই দেখেছি প্রান্তরের পাঁকে পড়ে থাকতে।

প্রকাণ্ড ভাস্কর্যগুলোও জলের এপার থেকেও অনায়াসে দেখা যাচ্ছিল। হতভম্ব হয়ে গেলাম তাদের ওপর চোখ পড়তেও। পাথর কুঁদে বাস-রিলিফে গড়া সেসব প্রস্তর শিল্পের বিষয়বস্তু দেখলে প্রখ্যাত ভাস্কর ডোরে[5] পর্যন্ত ঈর্ষায় জ্বলতেন। মূর্তিগুলো বোধহয় মানুষের, অথবা বলা ভালো মানুষের আদলের কোনও প্রাণীর। কোনও এক সামুদ্রিক গুহার জলে তারা খেলে বেড়ায় মাছের মতন, অথবা উপাসনা করে কোনও জলমগ্ন শিলাস্তম্ভের। তাদের চেহারার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব না, কারণ সে সব কথা মনে পড়লেই মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। অবয়বের গঠন তাদের অনেকটা মানুষের মতো হলেও হাত পায়ের আঙুল তাদের হাঁসের মতন জোড়া, ড্যাবডেবে, চকচকে দুই চোখের নিচে বসানো একজোড়া চওড়া থলথলে ঠোঁট। তাদের চেহারার বাকি সব বিশেষত্বের কথা মনেও আনতে চাই না। পো কিংবা বুলওয়ার[6] তাঁদের দুঃস্বপ্নেও সেইরকম বীভৎসতা কল্পনা করতে পারতেন না।

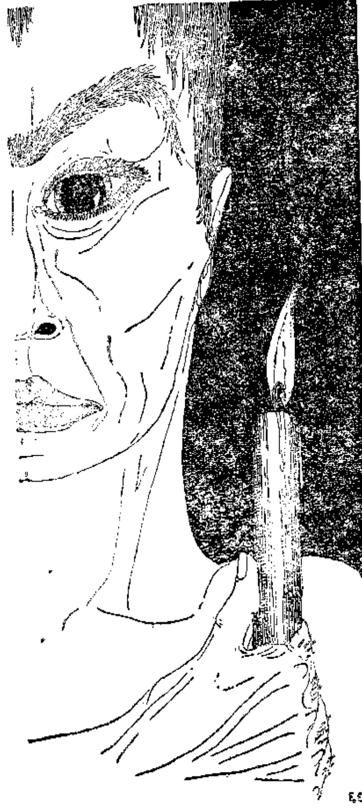
তবে একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগল। মনে হলে পাথর কুঁদে গড়ার সময় পেছনের দৃশ্যপটের অনুপাত অনুযায়ী প্রাণীগুলোর আয়তন যথাযথ রাখা হয়নি। একটা ভাস্কর্যে লক্ষ করলাম একটা প্রাণী তিমি শিকার করছে, কিন্তু আয়তনে তিমিটা তার চাইতে সামান্যই বড়। ওই আয়তন আর কিম্ভূত চেহারা থেকেই কয়েক লহমায় সিদ্ধান্ত করলাম প্রাণীগুলো খুব সম্ভব কোনও কল্পিত দেবতার রূপ। তাদের উপাসনা করত যে সব প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রচারী কিংবা মৎসজীবি উপজাতিরা, পিল্টডাউন[7] মানব কিম্বা নিয়েনডারথালের[8] প্রথম পুরুষ জন্ম নেওয়ার বহু আগেই হয়তো লুপ্ত হয়ে গেছে তাদের শেষ বংশধরেরা।

কোনও দুঃসাহসিক নৃতত্ত্ববিদেরও কল্পনাতীত এক অতীতের এই অপ্রত্যাশিত দর্শন পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চিন্তামগ্ন হয়ে। সামনের শব্দহীন জলে তখন অদ্ভুত সব ছায়া ফেলছে চাঁদের আলো।

তখনই দেখলাম তাকে। কালো জলে অতি সামান্য আলোড়ন তুলে উঠে এল জীবটা। বিশালাকায়, বীভৎস চেহারা তার, যেন সাক্ষাৎ পসেইডন পুত্র পলিফেমাস[9]। কোনও এক দুঃস্বপ্নের দানবের মতন ছিটকে গিয়ে আঁশে ঢাকা দুই হাতে শিলাস্তম্ভটাকে জড়িয়ে ধরল সেটা। ভয়ানক মাথাটা ঝুঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল মাপা আওয়াজে।

ঠিক তখনই বোধহয় আমার মাথাটা বিগড়ে যায়।

আমার উন্মত্তের মতন খাদের চড়াই বেয়ে ওঠার কথা, কিম্বা প্রলাপ বকতে বকতে নৌকো অবধি পৌঁছনোর কথা বিশেষ মনে নেই। কেবল মনে আছে গান গাইছিলাম গলা ছেড়ে, আর তা না পারলে হাসছিলাম আপন মনে। আর মনে আছে নৌকোয় পৌঁছনোর কিছুক্ষণ বাদেই এক প্রলয় তুফানের কথা। সে তুফানের বাজের আওয়াজ আর প্রকৃতির প্রমত্ততার অন্যান্য শব্দের কথাও ভুলিনি এখনও।



চিত্র ১.৩ : দরজায় কার যেন আওয়াজ পাচ্ছি!

ঘোর যখন কাটল তখন আমি সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে। মাঝ সমুদ্র থেকে যে জাহাজ আমাকে উদ্ধার করে তার ক্যাপ্টেনই আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রলাপের ঘোরে আমি নাকি অনেক কিছুই বলেছিলাম, কিন্তু সেসব কথায় কান দেয়নি কেউই।

প্রশান্ত মহাসাগরে কোন ভূ-প্রলয়ের কথা আমার উদ্ধারকারীরা শোনেনি। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না জেনে আমিও আর বেশি ঘাঁটাইনি। একবার এক স্বনামধন্য এথনোলজিস্টকে খুঁজে বের করে তাঁকে প্রাচীন ফিলিস্টিনদের মৎস দেবতা ডেগনকে[10] নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করেছিলাম। দেখলাম তিনি আমার কথায় কেবল আমোদই পাচ্ছেন। আমিও তাঁর চিন্তাভাবনা একবারেই গতানুগতিক দেখে আর কথা বাড়াইনি।

কিন্তু রাতের বেলায়, বিশেষত কৃষ্ণপক্ষের আকাশে যখন সামান্য ক্ষয়লাগা চাঁদ ওঠে, তাকে আমি দেখতে পাই। মরফিন ব্যবহার করে দেখেছিলাম স্বস্তি মিলেছে সামান্যই। উলটে দাস হয়ে পড়েছি এই কালান্তক নেশার। তাই শেষ করে দিতে চলেছি সব। যদিও জানি যা লিখেছি তা পড়ে মানুষ হয়তো ব্যঙ্গ করবে, নাক ওলটাবে।

প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করি, জার্মান যুদ্ধ জাহাজ থেকে পালিয়ে অনাবৃত নৌকোয় যখন রোদ লেগে জ্বরের ঘোরে পড়েছিলাম, সে সময় সমস্তটা কল্পনা করিনি তো? প্রশ্ন করি বটে নিজেকে, কিন্তু উত্তরে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে প্রায় জীবন্ত এক ভয়ানক ছবি। গভীর সমুদ্রের কথা কল্পনা করলেই মনে হয় সেই জীবগুলো বোধহয় তার তলদেশের কাদায় লেপটে বেড়াচ্ছে। হয়তো উপাসনা করছে তাদের প্রাচীন প্রস্তর মূর্তির। কিম্বা জলমগ্ন গ্রানাইটের শিলাস্তম্ভে ফুটিয়ে তুলছে নিজেদের বীভৎস অবয়ব। দুঃস্বপ্ন দেখি কোনও একদিন তারা উঠে আসবে সমুদ্র তরঙ্গের ওপরে, দূষিত নখরপিঞ্জরে বিঁধে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানবজাতিকে টেনে নিয়ে যাবে পাতালে। সেইদিন, যেদিন জগৎজোড়া প্রলয়ের মাঝে ভূপৃষ্ঠ যাবে ডুবে, উঠে আসবে সমুদ্রের কালো কুৎসিত তলদেশ।

শেষের সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে। দরজায় কার যেন আওয়াজ পাচ্ছি! যেন কোনও পিচ্ছিল শরীর ধীর ভারী পদক্ষেপে ধাক্কা দিচ্ছে তাতে। ওঃ ভগবান ওই হাতটা! জানলা! জানলাটা কোথায়!



প্রথম প্রকাশ: ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে গল্পটি ‘দ্য ভ্যাগর‍্যান্ট’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে লেখাটি বিখ্যাত পাল্প ম্যাগাজিন ‘উইয়ার্ড টেলস’-এও ছাপা হয়।

ভাষান্তর: সুমিত বর্ধন



ফ্রম বিয়ন্ড

প্রভিডেন্সে ঘটা লাভক্র্যাফটের এই প্রথম গল্পটিতে তিনি সায়েন্টিফিক হরর গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। সেই সময়ের ফিজিক্স সম্পর্কে লাভক্র্যাফটের যেটুকু জ্ঞান ছিল তাই নিয়ে তিনি মহাবিশ্বের রহস্যকে নিজের গল্পের মধ্যে ধরেছেন। লাভক্র্যাফটের কসমিক হররেরও এটাই প্রথম দিককার উদাহরণ যেখানে তিনি বুঝিয়েছেন এই মহাবিশ্বের অগণিত আশ্চর্য প্রাণীদের কাছে মানবজাতির অস্তিত্ব একেবারেই তুচ্ছ।

পরপার
(From Beyond)



এ ক-দিনেই কেমন বীভৎসভাবে পালটে গেছে ক্রফোর্ডের চেহারা। চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

ক্রফোর্ড টিলিংহাস্ট। আমার এককালের প্রাণের বন্ধু। এর আগে তাকে দেখেছি প্রায় দু-আড়াই মাস আগে। সেবার যখন মোলাকাত হয়, তার অতিপ্রাকৃত গবেষণার আসল উদ্দেশ্যের কথা সে দিন খুলে বলেছিল ক্রফোর্ড। কিন্তু আমি ভয়ে আঁতকে উঠে দু-একটা আপত্তি জানাতেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল সে। একরকম ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আমাকে বিদায় করেছিল তার ল্যাবরেটরি আর বাড়ি থেকে।

এরপর টুকরোটাকরা খবর এসেছে কানে। সে নাকি তার সেই হতচ্ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রখানা নিয়ে আস্তানা গেড়েছে চিলেকোঠার ঘরে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ, চাকরবাকরদেরও ঘেঁষতে দেয় না কাছে।

কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, মাত্র দশ সপ্তাহের মধ্যে ক্রফোর্ডের চেহারাখানা বদলে এমন কুৎসিত কদাকার রূপ নেবে। তার আগের তাগড়াই শরীরটা শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। ঝুলে-পড়া শিথিল চামড়ায় লেগেছে ধূসর হলদেটে রঙের ছোঁয়া। কালি-পড়া কোটরে বসে-যাওয়া দুই চোখ জ্বলছে কেমন এক বুকে কাঁপুনি-ধরানো দীপ্তিতে। বলিরেখা-পড়া কপালে ডালপালা মেলেছে অজস্র শিরা-উপশিরা। হাত দুখানা

বিরামহীনভাবে কেঁপে চলেছে থরথর করে। এককালের পরিষ্কার করে কামানো মুখ ঢেকে গেছে একরাশ সাদা দাড়িতে। সাদা হয়ে গেছে মাথার ঝাঁকড়া চুলের গোড়াগুলোও। পোশাক-আশাক পর্যন্ত আলুথালু, অবিন্যস্ত। সে হতশ্রী চেহারাটার ওপর চোখ পড়লে শিউরে না উঠে উপায় নেই।

মাসকয়েকের বিচ্ছেদের পর ক্রফোর্ডের অসংলগ্ন ভাষায় লেখা চিঠিখানা পেয়ে সে রাতে যখন তার বেনেভোলেন্ট স্ট্রিটের[11] বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন এই কদাকার মূর্তিতেই দর্শন পেলাম তার।

ক্রফোর্ডের হাতে মোমবাতি, সারা শরীর কাঁপছে ঠকঠক করে। আমায় বাড়িরে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বারংবার পেছন ফিরে তাকায় সে। যেন সেই জনমানবহীন সেকেলে বাড়িটায় ওঁত পেতে থাকা অজানা কোনও কিছুর আতঙ্ক চেপে বসেছে তার মনে।

দর্শন আর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করাটা ক্রফোর্ডের আদৌ উচিত হয়নি। ওসব বিষয়ের চর্চা ঠান্ডা মাথার নির্মোহ গবেষকদেরই মানায়। ক্রফোর্ডের মতন কাজ-পাগল, আবেগি মানুষ এসবের মধ্যে মাথা গলালে তার পরিণতি হয় ঠিক দু-রকমের। অসফল হলে নেমে আসে চূড়ান্ত হতাশা, আর সফল হলে সঙ্গী হয় এক অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় আতঙ্ক। এত দিন ক্রফোর্ড ছিল তার গবেষণায় অসফল। নিঃসঙ্গতা আর নৈরাশ্য ছিল তার সহচর। কিন্তু আজ তাকে দেখে আতঙ্কে গুলিয়ে উঠল শরীর। বুঝলাম, সাফল্যের কবলে পড়েছে সে।

দশ সপ্তাহ আগেকার কথা মনে পড়ে গেল, যে দিন পইপই করে সাবধান করেছিলাম ক্রফোর্ডকে। কিন্তু সে দিন উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল সে। অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জ্ঞান দিয়েছিল আমায় পণ্ডিতি ঢঙে।

“এই পৃথিবী আর ব্রহ্মাণ্ডের আমরা কতটুকুই বা জানি? যেমন সীমিত আমাদের পর্যবেক্ষণক্ষমতা, তেমনি ক্ষুদ্র আমাদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা। জগৎটাকে বোঝার জন্যে আমাদের শরীরটা গড়ে উঠেছে যেমনভাবে, বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়বস্তুগুলো আমারা বুঝি ততটুকুই। তাদের মূল রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই নেই এতটুকুও। বৃথাই আমরা ভাবি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব গূঢ় রহস্য আমাদের পাঁচটা দুর্বল ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে ফেলেছি।[12] কিন্তু কল্পনা কর এমন এক শ্রেণির জীবের, যাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আরও গভীর, আরও বিস্তৃত। কিংবা যাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির পরিসরই আলাদা। তারা

আমাদের এই চেনা জগৎটাকেও একবারে আলাদা নজরে দেখবে তো বটেই, আমাদের খুব কাছে ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে জড়-চেতনশক্তির যে আর-একটা দুনিয়া আছে, তাকেও তারা সমানভাবে দেখতে পারবে, বুঝতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টির এই গুপ্ত অংশ লুকিয়ে আছে আমাদের হাতের নাগালেই। আর আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি সেই গুপ্ত জগতের আবরণ উন্মোচন করার পদ্ধতি। না, ঠাট্টা করছি না। ওই যন্ত্রটা দেখছ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর থেকে ছড়িয়ে যাবে তরঙ্গ। মানুষের শরীরে যেসব সুপ্ত, অপরিণত ইন্দ্রিয় আছে, জাগিয়ে তুলবে সেগুলোকে। শুধু মানুষ কেন? যে-কোনও জীবিত প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরের সব নানান দৃশ্যপট খুলে যাবে আমাদের সামনে। অন্ধকার, যা দেখে কেঁদে ওঠে কুকুরে, মাঝরাতে যা দেখে কান খাড়া করে ফেলে বেড়ালে, দেখতে পাব সেইসব। দেখতে পাব এমন আরও অনেক কিছু, যা আজ পর্যন্ত নজরে পড়েনি কোনও জীবিত প্রাণীর। টপকে যাব স্থান-কাল-মাত্রা, শরীর না নড়িয়েই ডুব দেব সৃষ্টিরহস্যের অতলে।”

না, ক্রফোর্ড টিলিংহাস্টের এইসব কথাবার্তায় মোটেও মজা পাইনি আমি। কারণ তাকে চিনতে বাকি ছিল না। তাই উলটে কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলাম তাকে। কিন্তু আবিষ্কারের নেশায় সে তখন পাগল। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল আমায় গলাধাক্কা দিয়ে।

না, আজও তার সেই উন্মাদনা কাটেনি। কেবল আমার ওপর রাগের চাইতেও প্রবল হয়ে উঠেছে আমাকে তার কাজের ফিরিস্তি শোনানোর বাসনা। তাই অপাঠ্য হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিতে একরকম হুকুমের ভাষায় ডেকে পাঠিয়েছে আমাকে।

ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে ক্রফোর্ডের প্রেতমূর্তি। বৃত্তের আকারে আলো ফ্যালে তার হাতের মোমবাতি। তার পেছনে বাড়ির অন্দরে পা রেখে এক অজানা ভয় স্পর্শ করে আমাকেও। মনে হতে থাকে, অন্ধকারের আনাচকানাচে কোনও আতঙ্ক বুঝি-বা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পিছু নিয়েছে আমার। আলোর বৃত্তাকার সীমানার বাইরে যেন রূপ ধরে আস্তানা গেড়েছে দশ সপ্তাহ আগে শোনা শব্দ আর কল্পনাগুলো। ক্রফোর্ডের নিস্পৃহ, শীতল কণ্ঠস্বরে মেশে তার সঙ্গে। কেমন গুলিয়ে উঠতে থাকে আমার সমস্ত শরীর।

কাজের লোকগুলো থাকলেও তবু খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু ক্রফোর্ডের কাছে শুনলাম, তারা নাকি বিদায় নিয়েছে দিন তিনেক আগেই। গতবার ক্রফোর্ড খেপে উঠে আমাকে গলাধাক্কা দেওয়ার পর থেকে বুড়ো গ্রেগরিই যা হোক আমাকে কিছু খবরাখবর

দিত। কিন্তু সে-ও যে আমার মতন একজন বিপদ-আপদের বন্ধুকে কিছু না জানিয়েই মনিবকে ফেলে পালিয়েছে, সেটা শুনে বড় আশ্চর্য লাগল।

হঠাৎ তলব করার কারণটা সঠিক বুঝতে পারছিলাম না বটে। কিন্তু আন্দাজ করতে পারছিলাম, অচিরেই ক্রফোর্ড আমাকে শোনাতে চলেছে কোনও চমক-লাগানো রহস্য কিংবা আবিষ্কারের কথা। অতএব খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুচে গেল ভয় আর আতঙ্ক। উলটে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল কৌতূহল আর অধীর আগ্রহ। কল্পনার জগতেরও বাইরের বিষয় নিয়ে বেহিসেবি অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে দিনকয়েক আগে সরব হয়েছিলাম আমিই। কিন্তু আজ যখন ক্রফোর্ড অনেক মূল্য চুকিয়ে সাফল্যের পথে, তখন তার ওই অদম্য উদ্দীপনা যেন স্পর্শ করল আমাকেও।

ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে ক্রফোর্ডের অমানুষিক চেহারা। দুলতে থাকে তার হাতের মোমের আলো। তার পেছনে পেছনে আমি হাঁটি জনবিহীন বাড়ির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

খেয়াল করলাম, বাড়িতে বিদ্যুৎসংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। ক্রফোর্ডকে জিজ্ঞেস করতে উত্তর পেলাম, বিশেষ কারণ আছে।

"সাহসে কুলোয়নি... বাড়াবাড়ি হয়ে যেত।"

ক্রফোর্ড বিড়বিড় করে বকে চলে আপন মনে। বুঝলাম, এ এক নতুন রোগে ধরেছে তাকে।

পা রাখি ক্রফোর্ডের চিলেকোঠার ল্যাবরেটরিতে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে সেই হতচ্ছাড়া যন্ত্রটা। গতবারে মৃদু গর্জন তুলে চলতে দেখেছিলাম এটাকেই। কিন্তু এখন দেখলাম, যন্ত্রের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কেমন একটা মরমর, অশুভ, বেগুনি রঙের আলোর প্রভা। একটা রাসায়নিক ব্যাটারির সঙ্গে যন্ত্রটা তার দিয়ে জোড়া রয়েছে বটে, তবে মনে হল না, সেখান থেকে কোনও বিদ্যুৎ আসছে। ক্রফোর্ডকে প্রশ্ন করে জানলাম, ওই বিরামহীন আলোর উৎস নাকি বিদ্যুৎজাতীয় কিছুই নয়।

যন্ত্রের একপাশে আমায় বসায় ক্রফোর্ড। যন্ত্রের মাথার ওপরে একথোকা কাচের বাল্‌ব। চালু করে দেয় তার ঠিক নীচের একটা সুইচ। আগের দিনের মতনই মৃদু গর্জন করে চালু হয়ে যায় যন্ত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যন্ত্রের গর্জন পালটে যায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। সে আর্তনাদও খানিক বাদে পরিণত হয় একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনে। যন্ত্রের চারপাশের আলোকচ্ছটাও যেন তার সঙ্গে

তাল রেখে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেই ফের নিবুনিবু হয়ে আসে। একই সঙ্গে আলোর বর্ণও যায় পালটে। অস্বাভাবিক, বিকট, সেই জগাখিচুড়ি রঙের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।



চিত্র ২.১ : সে পরিবেশ যেন কল্পনাকে টেনে নিয়ে গেল গূঢ় প্রতীক চিহ্নে মোড়া কোনও এক অশরীরী জগতে।

আমার কপালের প্রশ্নের রেখাগুলো বোধহয় ক্রফোর্ডের নজর এড়ায়নি। ভেসে আসে তার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর। “বুঝতে পারছ না কীসের আলো? আলট্রা-ভায়োলেট!”

বিস্ময়ে চমকে উঠি আমি। খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে ক্রফোর্ড।

“কী ভাবছ? আলট্রা-ভায়োলেট চোখে দেখা যায় না? তা অবশ্য সত্যি! কিন্তু কেবল আলট্রা-ভায়োলেট কেন, চোখে দেখা যায় না, তেমন অনেক কিছু এবার দেখতে পাবে।”

“শোনো হে! বহু বছরের বিবর্তনে আলগা ইলেকট্রন থেকে জৈবিক মানুষ হয়ে উঠেছি আমরা। উত্তরাধিকারে পেয়েছি হাজারটা ইন্দ্রিয়। তরঙ্গের প্রভাবে জেগে উঠছে সেসব সুপ্ত ইন্দ্রিয়। যেসব সত্য জেনেছি আমি, এইবার তুমিও জানবে সেইসব। বুঝতে পারছ, কেমন লাগবে? বলছি, দাঁড়াও।”

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দেয় ক্রফোর্ড। আমার উলটোদিকে বসে আমার চোখের দিকে তাকায় বীভৎস দৃষ্টিতে।

“বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলোর একটা নিবিড় সংযোগ আছে। অতএব প্রথমে নানান সংকেত পাবে সেগুলোই। শুরু হবে কান দিয়ে। তারপর পালা আসবে অন্য ইন্দ্রিয়গুলোরও। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের[13] কথা শুনেছ? ওটা হল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। নিজে পরখ করে দেখেছি। কাজ করে অনেকটা দৃষ্টিশক্তির মতনই। মস্তিষ্কে ছবি পাঠায়। ওভাবেই প্রমাণ পাবে তুমি। পরপারের প্রমাণ।”

চুপ করে যায় ক্রফোর্ড। চারপাশে তাকাই সেই সুযোগে। বিশাল ঘরখানার দক্ষিণের দেওয়ালটা ঢালু। সেটায় পড়েছে এমন একটা ম্লান আলো, যেটা নিত্যদিনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার কথা নয়। ঘরের কোণগুলো ঢাকা পড়েছে ছায়ায়। ঘর জুড়ে কেমন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অপ্রাকৃত পরিবেশ। সে পরিবেশ যেন কল্পনাকে টেনে নিয়ে গেল গূঢ় প্রতীক চিহ্নে মোড়া কোনও এক অশরীরী জগতে। কেমন যেন মনে হতে লাগল, আমি বসে রয়েছি অদ্ভুত এক বিশাল মন্দিরে। তার কালো প্রস্তরস্তম্ভগুলো পাষাণফলকের সিক্ত মেঝে থেকে মেঘ অবধি উঠে হারিয়ে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে।

এই স্পষ্ট ছবিখানাও কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ফুটে উঠল আর-এক ভয়ংকর মানসচিত্র। চারপাশে যেন কেবল আদি-অন্তহীন এক নিঃসঙ্গ শূন্যতা। শব্দহীন, দৃশ্যবস্তুহীন সে শূন্যতায় যেন অস্তিত্ব নেই কোনও কিছুরই। শিউরে উঠলাম ছোট শিশুর মতনই। আতঙ্কে পেছনের পকেট থেকে টেনে বের করলাম বহুকালের সঙ্গী পিস্তলখানা[14]।

সেই নিঃসীম শূন্যতার কোনও এক সুদূর প্রান্ত থেকে ধীরগতিতে ভেসে এল অদ্ভুত ধ্বনি। অতি অস্পষ্ট তার আওয়াজ, অতি মৃদু তার কম্পন, অথচ তাকে সুরেলা বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। সে ধ্বনিতে মেশানো মাত্রাছাড়া বন্যতা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিল কেমন একটা হালকা যন্ত্রণা। আনমনে ভাঙা কাচ ঘষলে যেমন অনুভূতি হয়, বোধ করলাম সেইরকম একটা কিছু। সেই সঙ্গে শব্দের উৎস থেকে ভেসে এল হিমশীতল দমকা বাতাস, বয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে।

বসে রইলাম নিশ্বাস বন্ধ করে। বুঝতে পারলাম, শব্দ আর বাতাস, প্রকোপ বাড়ছে দুটোরই। মনে হতে লাগল, আমি যেন বাঁধা রয়েছি রেললাইনের সঙ্গে, আর দূর থেকে ছুটে আসছে কোনও দানবিক ইঞ্জিন।

ডাকতে গেলাম ক্রফোর্ডকে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সমস্ত অদ্ভুত অনুভূতি। ঘরের ম্রিয়মাণ আলোয় নজরে পড়ল কেবল ক্রফোর্ড আর তার যন্ত্রখানা। ক্রফোর্ডের দৃষ্টি আমার হাতের পিস্তলের ওপর, মুখে তার রক্ত-জল-করা হাসি।

তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, আমি যা দেখেছি আর শুনেছি, সে দেখেছে-শুনেছে তার চাইতে ঢের বেশি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে যেতেই আমাকে থামিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

"যতটা সম্ভব চুপ করে থেকে বোঝার চেষ্টা করো। আর নড়াচড়াও কোরো না। ভেবো না, ওই যন্ত্রের কিরণে কেবল আমরাই দেখতে পাই। ওর প্রভায় আমাদেরকেও দেখা যায়। চাকরবাকরগুলো বিদেয় হয়েছে তো বলেছি। কিন্তু কী করে তা বলিনি, না? ওই মাথামোটা হাউসকিপার মিসেস আপডাইককে আমি পইপই করে মানা করেছিলাম আলো জ্বালাতে। শোনেনি। একতলার আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তার আকর্ষণ করে নিয়েছিল অনুরূপ কম্পনকে। ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। অন্য এক জগতের শব্দ আর দৃশ্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এখান থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম মরণ চিৎকার। পরে দেখেছিলাম, সারা বাড়িময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে কেবল জামাকাপড়ের স্তূপ। কেউ নিস্তার পায়নি। মিসেস আপডাইকের জামাকাপড়গুলো সামনের হলঘরের সুইচের কাছে পড়ে ছিল। সেটা দেখেই বুঝতে পারি, আলোটা জ্বালাতে গিয়েছিল সে-ই। নড়াচড়া না করলে খানিকটা নিরাপদে থাকবে। মনে রেখো, যে ভয়ংকর জগৎ আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করছি, সেখানে আমরা দুর্বল, অসহায়। বলছি না, নড়াচড়া কোরো না!"

চিত্র ২.২ : লাভক্র্যাফটের হাতে লেখা "ফ্রম বিয়ন্ড" গল্পের পাণ্ডুলিপি

সত্যিটা জানতে পেরে আর ক্রফোর্ডের হুকুমের জোড়া ধাক্কায় আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল। আতঙ্কের ধাক্কায় খুলে গেল মনের বোঝার ক্ষমতা। ক্রফোর্ড যাকে পরপার আখ্যা দিয়েছিল, ফের মনের মধ্যে ফুটে উঠল সেখানকার অনুভূতিগুলো। মনে হল, শব্দ আর গতির এক আবর্তের মধ্যে আটকে পড়েছি আমি, আমার দৃষ্টি ঢেকে রেখেছে নানান টুকরো টুকরো ছবির বিশৃঙ্খলা। ঝাপসা হয়ে এসেছে ঘরের কিনারাগুলো। দূরের শূন্যতা থেকে সামনে ডানদিকের ছাদ ফুঁড়ে ফেনার মতো উপচে নেমে আসছে মেঘের আকৃতির একটা স্তম্ভ। ফের নজরে ভেসে উঠল আগে-দেখা সেই মন্দিরের

আকার। কিন্তু এবার সে মন্দিরের থাম স্পর্শ করেছে অন্তরিক্ষের এক আলোর সাগরকে। আলোর সমুদ্র থেকে একটি আলোকরশ্মি এবার ছিটকে এল একটু আগে দেখা স্তম্ভের দিকে। শব্দ, দৃশ্য আর নানান অজানা অনুভূতির খণ্ডচিত্রের এক বিচিত্র বর্ণময় বিশৃঙ্খলা যেন ছড়িয়ে গেল চারপাশে। মনে হতে লাগল যেন হারিয়ে যাচ্ছে আমার কঠিন দেহাবয়ব, তরল হয়ে গলে যাচ্ছে আমার শরীর। এর মধ্যেই মনের মধ্যে ফুটে উঠল একঝলক ছবি। অদ্ভুতদর্শন একচিলতে রাতের আকাশ। সে আকাশ ঢাকা ঘুরপাক খেতে থাকা গোলকে, সূর্যের মতনই তারা উজ্জ্বল। ক্রমশ পেছনদিকে সরতে শুরু করে গোলকের ঝাঁক। দূরে গিয়ে রূপ নেয় নক্ষত্রপুঞ্জের। আকার তার ক্রফোর্ডের মুখমণ্ডলের বিকৃত প্রতিচ্ছবির মতন।

খানিক বাদে বুঝলাম, চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে বিশালদেহী সজীব কিছু, ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার শরীর। না, কেবল ছুঁয়ে নয়, হেঁটে যাচ্ছে আমার শরীরের মধ্যে দিয়েই। দেখলাম, ক্রফোর্ড তাদের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। মনে পড়ে গেল তার পিনিয়াল গ্ল্যান্ড নিয়ে বলা কথাগুলো। হয়তো তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ঠাহর করতে পারছে অনেক বেশি। তার অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিতে যে কী ধরা পড়ছে, সেই প্রশ্নের ঝড় উঠল মনে।

হঠাৎ যেন আমার মধ্যে জেগে উঠল আর-এক পৃথক দৃষ্টিশক্তি। বাড়তি ক্ষমতা তার। আলোছায়ার উথালপাথালের মাঝে এবার দেখতে পেলাম আর-এক দৃশ্য। তার বেশির ভাগটাই ঝাপসা হলেও কিছু অংশ ফুটে রয়েছে পরিষ্কারভাবে। সিনেমার ছবি ভুলক্রমে যবনিকার রঙিন কাপড়ের ওপর পড়লে যেমন দেখতে হয়, চেনা জগতের ওপর সে দৃশ্য চাপানো তেমনভাবেই। চিলেকোঠার ল্যাবরেটরি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, ক্রফোর্ডের কদাকার চেহারা, দৃশ্যের এই কয়েকটা জিনিস অপরিচিত নয় মোটেও। কিন্তু তাদের বাদ দিয়ে বাকি স্থানটুকুতে তিলধারণের জায়গা নেই। সেখানে জানা-অজানা, জড়-চেতন নানান অবর্ণনীয় আকৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এলোমেলোভাবে। প্রতিটি পরিচিত জিনিসের সঙ্গে মিলেছে অজস্র অপরিচিত, অদ্ভুতদর্শন বস্তু। কেবল মিলেছে বললে ভুল হবে, পরিচিতের গঠনে যেন মিশেছে অচেনা বস্তু, অজানা বস্তু যেন গড়ে উঠেছে রোজের চেনা জিনিস দিয়ে[15]।

চেতন বস্তুর মধ্যে যে প্রাণীগুলো সর্বপ্রথম চোখে পড়ে, তাদের কুৎসিত মিশকালো অবয়ব যেন জেলি দিয়ে গড়া। যন্ত্রের কম্পনের সঙ্গে তাল রেখে থিরথির করে কাঁপে

তাদের শরীরগুলো। অতুল সংখ্যায় তারা ভেসে বেড়ায় যেন কোনও অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে। পরস্পরের শরীরের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে অতিক্রম করে যায় তাদের থলথলে চেহারাগুলো। মাঝেমধ্যে প্রাণীগুলো অতর্কিত আক্রমণে গ্রাস করে পরস্পরকে। আক্রান্ত জীবটি বেমালুম মিলিয়ে যায় কোনওরকম চিহ্ন না রেখেই।

শিউরে উঠলাম আমি, হতাভাগা চাকরবাকরগুলো কী করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। প্রথমবার নজরে আসা আমাদের চারপাশের গোপন জগৎটার বাকি খুঁটিনাটিগুলোও ঠাহর করতে চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল জীবগুলোর চিন্তাই।

এতক্ষণ আমার ওপর নজর রাখছিল ক্রফোর্ড। এবার ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর।

"দেখছ? ওদের দেখতে পাচ্ছ? তোমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে তোমার চারপাশ দিয়ে, তোমার মধ্যে দিয়ে কারা ছিটকে ছিটকে ভেসে বেড়ায়, এবার বুঝতে পারছ? আকাশ, বাতাস— এসব আদতে কোনও প্রাণীতে গড়া, এবার বুঝতে পারছ? এবার বলো, সীমানার প্রাচীর আমি ভেঙে নামিয়েছি কি না? কোনও জীবিত মানুষ এযাবৎ যা দেখেনি, সেইসব জগৎ তোমায় দেখিয়েছি কি না? বলো! বলো!"

সেই তুমুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে চিৎকার করতে থাকে ক্রফোর্ড, ক্রোধে বিকৃত মুখখানা নিয়ে আসে আমার মুখের কাছে। পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর আক্রোশে চোখ দুটো তার জ্বলতে থাকে আগুনের মতন। বিরক্তিকর গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে যন্ত্র।

"কী ভাবলে? ওই এলোমেলো ভাসতে-থাকা জীবগুলো নিকেশ করেছে চাকরবাকরদের? ওহে বুদ্ধু, ওগুলো নিরীহ। কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাকরবাকরগুলো উধাও হয়ে গেছে, তা-ই না? কী করে বলো তো? তুমি আমায় বাধা দিয়েছিলে। যখন আমার দরকার ছিল প্রচণ্ড উৎসাহের, তখন নিরুৎসাহ করেছিলে তুমি আমায়। সৃষ্টিরহস্যের সত্য তুমি জানতে চাওনি, এত বড় কাপুরুষ তুমি। কিন্তু এইবারে পেয়েছি তোমায়। কীসে তুলে নিয়ে গেছে চাকরগুলোকে? কেন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছিল তারা? জানো না, না? কোনও সমস্যা নেই, এখনই জানতে পারবে। তাকাও আমার দিকে। শোনো ভালো করে, কী বলছি। তোমার কী মনে হয়ে বস্তু, আকার— এসবের আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে? ওহে, সৃষ্টির যে গভীরে আমি গিয়েছি, তোমার পুঁচকে মগজখানা তার কল্পনাও করতে পারবে না। অনন্তের গণ্ডির বাইরেটা অবধি দেখতে

পেয়েছি আমি। নক্ষত্রলোক থেকে টেনে এনেছি দানবদের। এক-এক পদক্ষেপে জগৎ থেকে জগৎ টপকে যারা মৃত্যু আর মত্ততা বিলোয়, নিজের কাজে লাগিয়েছি সেইসব ছায়াশরীরকে। করায়ত্ত করেছি শূন্যতাকে। যারা মানুষকে গ্রাস করে, যাদের স্পর্শে মানুষ বিলীন হয়ে যায়, তারা সব আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের কী করে এড়াতে হয়, আমার জানা আছে। কিন্তু তুমি পড়বে তাদের খপ্পরে, বুঝেছ? যেমন চাকরগুলো পড়েছিল। দারুণ, না? বলেছিলাম না, নড়াচড়া করাটা বিপজ্জনক। তোমায় এতক্ষণ নড়াচড়া না করতে দিয়েই বাঁচিয়ে রেখেছি। বাঁচিয়ে রেখেছি, যাতে দেখতে পাও আরও অনেক কিছু, শুনতে পাও আমার কথা। নড়লে অনেক আগেই ওদের খপ্পরে পড়ে যেতে তুমি। তবে চিন্তা কোরো না। ওরা তোমাকে কোনওরকম যন্ত্রণা দেবে না। চাকরগুলো কষ্ট পেয়ে চিৎকার করেনি, চিৎকার করেছিল ওদের দেখে। আমার পোষ্যরা যে দুনিয়া থেকে আসে, সেখানকার সৌন্দর্যের মাপকাঠি অনেকটা আলাদা। আমাদের চোখে ওদের চেহারাটা তাই বড় একটা সুন্দর ঠ্যাকে না। আমি প্রায় একবার দেখে ফেলেছিলাম ওদের, কোনওমতে সামলে নিয়েছি। কিন্তু আমি চাই, তুমি ওদের দিকে তাকাও। চিন্তা কোরো না, বিলীন হয়ে যাওয়াটা মোটেই যন্ত্রণাদায়ক নয়। আরে, তাকাও-না! জানতে ইচ্ছে করছে না ওদের কেমন দেখতে? সাধে কি বলি, তুমি বৈজ্ঞানিক নও! কাঁপছ? আমার আবিষ্কার-করা অনন্য জীবদের দেখার আগ্রহে কাঁপছ? নড়ছ না কেন তাহলে? ক্লান্ত লাগছে? চিন্তা কোরো না। ওরা এসে পড়ল বলে। দ্যাখো, দ্যাখো! আরে, দ্যাখোই-না! ঠিক তোমার বাঁদিকের কাঁধের পেছনে।”

এর বাকি অংশটুকু সংক্ষিপ্ত। খবরের কাগজের কল্যাণে সেটুকুও আপনাদের জানা। গুলির আওয়াজ পেয়ে পুলিশ আসে। দেখে ক্রফোর্ড মৃত, আর আমি পড়ে আছি অচৈতন্য হয়ে। পুলিশ প্রথমে আমায় গ্রেফতার করে, কারণ আমার হাতে পিস্তল ধরা ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের পর যখন দেখা গেল যে, ক্রফোর্ড মারা পড়েছে মৃগীরোগে, আর গুলি লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে কেবল যন্ত্রটা, তখন ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পুলিশ আমায় ছেড়ে দেয়। যা দেখেছি, তার সবটুকু খোলাখুলি প্রকাশ করিনি। মনে হয়েছিল, করোনার হয়তো আমার সেসব কথায় সন্দেহ করবেন। কিন্তু যেটুকু বলেছিলাম, সেটুকু শুনে ডাক্তারটি রায় দিয়েছিলেন যে, খুনে পাগল ক্রফোর্ড নিঃসন্দেহে আমায় কোনওভাবে সম্মোহন করেছিল।

ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করতে পারলে আমার ভালোই হত। চারপাশের আকাশ-বাতাসের কথা ভাবলেই মনে যে চিন্তাগুলো উঠে এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় প্রতিটি স্নায়ুতে, তার থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যেত। আমি যে একা আছি, আমার সে বোধ চলে গেছে। চলে গেছে সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। ক্লান্ত হয়ে পড়লে মনে হয়, ভয়ংকর কিছু তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমায়। কিন্তু তা-ও ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করতে পারি না একটিমাত্র কারণে— যে চাকরবাকরগুলোকে ক্রফোর্ড টিলিংহাস্ট খুন করেছে বলে অভিযোগ করা হয়, তাদের দেহগুলো আজ পর্যন্ত পুলিশ খুঁজে পায়নি।



প্রথম প্রকাশ: *১৯৩৪ সালের জুন মাসে গল্পটি 'দ্য ফ্যান্টাসি ফ্যান' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।*

ভাষান্তর: *সুমিত বর্ধন*



হিপনোস

লাভক্র্যাফটের সিংহভাগ লেখার মতোই এই গল্পেও রয়েছে অচেনা বিশ্বের অজানা ভয়ের কথা। ‘ন্যাশনাল অ্যামেচার’ পত্রিকাতে প্রকাশিত এই গল্প তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু স্যামুয়েল লাভম্যানকে। লাভক্র্যাফটের দেখা দুটি স্বপ্নে লাভম্যান ছিলেন। যা থেকে তিনি দুটি গল্প (‘দ্য স্টেটমেন্ট অব র‍্যানডলফ কার্টার’ এবং ‘নায়ারলাথোটেপ’) লেখেন। পরে ‘হিপনোস’-এর মতো স্বপ্নতাড়িত গল্প লিখে তাই সেটি এই বন্ধুকেই উৎসর্গ করেন লেখক।

হিপনোস[16]
(Hypnos)



এস এল[17]-এর প্রতি

“ঘুম সম্পর্কে বলা যায়, তাকে ঘিরেই আমাদের প্রতিরাতের দুঃসাহসিক অভিযান। আমরা বলতেই পারি, মানুষ রোজ বিছানায় যায়, এটা তার স্পর্ধা! আসলে পুরোটাই তার ধারণাতীত, বিপদ সম্পর্কে অবহেলারই ফল এটা।”

— বোদলেয়র[18]

করুণাময় ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? যদি থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, তিনি ওই কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে রক্ষা করুন। যখন কোনও মনের জোর বা মানুষের তৈরি কোনও ড্রাগ আপনাকে ঘুমের অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না, সেই সময়টা তাঁর করুণা আমার চাইই। মৃত্যু, আহা, তাকে এখন পরম মমতাময় বলে মনে হয়। আসলে যারা একবার রাত্রির গোপন কুঠুরিতে ঝাঁপ দিয়ে সেই অজানা সত্যির সন্ধান পেয়েছে, তারা জীবনে আর কখনও শান্তি পাবে না। আজকাল খালি মনে হয়, যেখানে প্রবেশের অনুমতি কারও নেই, কেন সেখানে বোকার মতো ঢুকতে গেলাম? ওই চিরন্তন রহস্যের সন্ধান কোনও মানুষের পক্ষে কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। মনে পড়ে আমার বন্ধুর কথা। জানি না সে কে ছিল, কোনও নির্বোধ নাকি ঈশ্বরের দূত— যে-ই হোক, সে-ই ছিল আমাদের সফরের নেতা। আমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে সে মুখোমুখি হয়েছিল সেই ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নের, যা হয়তো আমারও হতে পারত।

মনে পড়ে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই প্রথম দিনটার কথা। একটা স্টেশনে তাকে আমি প্রথম দেখি। অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। তার অচেতন শরীরটাকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছিল কৌতূহলী জনতা। আচ্ছন্ন শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল খিঁচুনিতে। সেই সময়ই আমি তাকে প্রথম দেখি। চল্লিশের আশপাশে বয়স। মুখময় অজস্র রেখার কাটাকুটি। অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। তবুও ডিম্বাকার মুখটা বড় সুন্দর। ঢেউখেলানো চুল আর দাড়ির মধ্যে রুপোলি রেখা। ভুরুটা ধবধবে সাদা, যেন শ্বেতপাথরে তৈরি। সব মিলিয়ে লম্বাচওড়া শরীরটা দেখলে মনে হয়, বুঝি কোনও শাপভ্রষ্ট দেবতা।

আমার ভেতরের যে শিল্পী, সেই ভাস্কর তার সমস্ত পাগলামি নিংড়ে বলে উঠল, আরে! এ যে পৃথিবীর কোনও আদিম দেবতার পাথুরে শরীর! কোনও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যাকে উদ্ধার করে কেউ তার শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে দমচাপা এই নশ্বর জীবনের স্পন্দন সে অনুভব করতে পারে।

সে যখন তার উজ্জ্বল, ধ্যানমগ্ন, গভীর চোখ মেলে চেয়ে দেখল, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এই মানুষটি হতে চলেছে আমার বন্ধু। আমার মতো নির্বান্ধব এক মানুষের একমাত্র বন্ধু। তার দৃষ্টিতে ছিল আমাদের চেতনাময় বাস্তব জীবনের বহু দূরে অবস্থিত কোনও এক অচেনা ভয়াল দুনিয়ার সংকেত। যে জগৎকে আমি এতকাল কেবল কল্পনাই করতে চেয়েছি। বলা বাহুল্য, তাতেও ব্যর্থ হয়েছি।

আশপাশের ভিড় সরিয়ে তাকে আমি বললাম, চাইলে সে আমার বাড়ি যেতে পারে। দুর্বোধ্য রহস্যে ঘেরা অজানা জগতের সন্ধান পেতে তার মতো শিক্ষক আমার প্রয়োজন। সে কী বুঝল জানি না। তবে মাথা নেড়ে নীরবে আমার আহ্বানে সম্মতি দিল।

সেই সময়ে কোনও কথা না বললেও পরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, তার কণ্ঠস্বর আসলে এক সুর। চেতনার গভীর থেকে উঠে আসা এক আশ্চর্য সুর। আমি তার একটা প্রস্তরমূর্তি তৈরি করতে শুরু করে দিলাম। ছেনি-বাটালি দিয়ে কাজ করতে করতে আমরা কথা বলতাম। দিন হোক বা রাত— আমাদের কথা চলত অনর্গল।

তার সঙ্গে কথা বলা অবশ্য কঠিনই ছিল, কেননা পার্থিব এই দুনিয়ার কোনও কিছুর সঙ্গেই তার কোনও সংস্রব ছিল না। তবু আমরা কথা বলতাম। আমাদের কথোপকথনের বিষয় ছিল এক অজানা, অসীম ব্রহ্মাণ্ড। চিরচেনা বস্তুজগৎ, সময় ও স্পেসের হিসেব সেখানে চলে না। সেই জগতের অবস্থান আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব ও চেতনার অনেক

গভীরে। কেবল ঘুমের ভেতরে স্বপ্নের অবয়বে সেই অচেনা ও ভয়ংকর জগতের আঁচ মেলা সম্ভব। সেই স্বপ্ন অবশ্যই আমাদের রোজকার দেখা স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের ভেতরের সেই স্বপ্ন সাধারণ হরিপদ কেরানির জীবনে কখনও আসে না। কেবল কল্পনায় বুঁদ মানুষেরা সারাজীবনে হয়তো এক কি দু-বার সেই স্বপ্ন দেখতে পায়।

মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে ব্রহ্মাণ্ডকে চিনেছে তা আসলে জন্ম নিয়েছে সেই অসীম জগতের ইশারায়। যেন এক আকস্মিকের খেলা। অনুসন্ধিৎসু মানুষরা কখনও হয়তো তার সামান্য আঁচ পায়। অবশ্য তারপরই সেটাকে অগ্রাহ্যও করে। জ্ঞানী মানুষেরা অবশ্য স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সেইসব প্রয়াসের আড়ালে সজোরে অট্টহাসি হেসে উঠেছেন ঈশ্বর।

এক আয়ত চোখের মানুষ[19] একবার বলেছিলেন, সময় আর স্পেস আপেক্ষিক। শুনে সবাই ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল। সেই আয়ত চোখের মানুষটি অবশ্য কেবল আঁচটুকুই পেয়েছিলেন। আমি সবসময়ই চেয়েছি সেই সীমিত আন্দাজকে অতিক্রম করতে। বলাই বাহুল্য, পারিনি। আমার বন্ধু জানাল, সে-ও চেষ্টা করেছে। এবং খানিকটা সাফল্যও নাকি পেয়েছে! এবার আমরা দু-জনেই চেষ্টা করা শুরু করলাম। হোরি কেন্টের পুরোনো ম্যানর হাউসের[20] স্টুডিয়োর চেম্বারে উদ্ভট সব ড্রাগ সেবন করতে শুরু করলাম আমরা। যে ড্রাগসেবনে মগজে ভেসে আসে ভয়ানক ও নিষিদ্ধ স্বপ্নের সারি।

সেই দিনগুলোয় যে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল, তাকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ওই কয়েক ঘণ্টার সফরে যা যা দেখেছি আর অনুভব করেছি, সেই ভয়ংকর ও অপার্থিব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার মতো চিহ্ন ও সংকেত পৃথিবীর কোনও ভাষার ভাণ্ডারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক। আমাদের সেই আশ্চর্য সফর জুড়ে ছিল অজানা এক উত্তেজনার দাপাদাপি। ঠিক কী কী দেখে আমরা ওরকম উত্তেজিত হয়েছিলাম, তা বলা সম্ভব নয়। কারণ তাকে নিজের স্নায়ু দিয়ে অনুভব করার সাধ্য কোনও সাধারণ মানুষের নেই। বস্তুজগৎ ও সময়ের অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় সব উপাদান মিলেমিশে ছিল সেই উত্তেজনার ভেতরে। উপাদানগুলি যেন একসঙ্গে গাঁথা। তাদের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই।

আমরা যেন ভেসে যাচ্ছিলাম। কিংবা বলা যায়, উড়ে চলেছিলাম। আমাদের মনের একটা অংশের সঙ্গে চিরচেনা বাস্তব দুনিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মনের সেই

টুকরো যেন প্রতিমুহূর্তে ধাওয়া করে চলছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রবল ভয়াল কোনও নারকীয় জগৎকে। যেতে যেতে মাঝেমধ্যে আশ্চর্য থকথকে পদার্থের তৈরি সব প্রাচীরকে ভেদ করে এগোতে হচ্ছিল। যেন জমাট-বাঁধা বাষ্প দিয়ে তৈরি। কিংবা বলা ভালো, মেঘের শরীরের উপাদান দিয়ে সেই প্রাচীরগুলি তৈরি।

শরীরহীন, অন্ধকার সেই যাত্রাপথে আমরা কখনও একসঙ্গে ছিলাম। কখনও-বা একদম একলা। যখন একসঙ্গে এগোচ্ছিলাম, টের পাচ্ছিলাম, আমার বন্ধু আমার থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আমি কেবল তার উপস্থিতির আন্দাজ পাচ্ছিলাম। এক অপার্থিব সোনালি ছমছমে আলোয় তার ধবধবে ভুরু, জ্বলজ্বলে চোখ, অন্ধকার চুল-দাড়ির আভাস ঝলমল করে উঠে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল তার উপস্থিতি।

আমাদের কাছে সময়ের কোনও হিসেব ছিল না। সময় যেন আমাদের কাছে হয়ে উঠল এক অলীক মায়া। পুরো ব্যাপারটাই যে অস্বাভাবিক, সেটা দিব্যি বুঝতে পারছিলাম। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপারটা হল, আমাদের বয়স গেল থমকে!

আমরা কথা বলতাম ফিশফিশ করে। গোপনীয় আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা সব কথা। কোনও দেবতা বা শয়তানেরও কল্পনার অতীত, এমন সব পরিকল্পনা আমাদের আলোচনায় ভেসে বেড়াত। তবে জোরে স্পষ্ট গলায় সেসব বলতে পারতাম না। কথা বলতে গেলেই যেন কেঁপে উঠতাম। আমার বন্ধু একবার একটা কাগজে লিখে বসল তার ইচ্ছের কথা, যা মুখে বলার সাহস তার ছিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজটা আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম। তারপর ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলাম জানলার বাইরে। শিউরে উঠে তাকিয়ে রইলাম তারা-ঝলমলে রাত্রির আকাশের দিকে। ওর লেখাটা ভালো করে দেখিনি। তবে যেটুকু দেখেছিলাম, তাতে আন্দাজ করতে পারি... কেবল আন্দাজ... আমার বন্ধু পাতায় ফুটিয়ে তুলছিল একটা নকশা। যে নকশা আমাদের চোখে দেখা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক। সেই নকশাই নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি। এবং জীবজগতের সমস্ত প্রাণের অন্তিম গন্তব্যও তারই নির্দেশ অনুযায়ী স্থির হয়।

আমি সত্যি বলছি, বন্ধুর ওইসব চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, ও যা বলতে বা লিখতে চায়, তা নিশ্চয়ই আজগুবি। কেননা সেই অজানা জগতের অজানা লড়াইয়ের সাক্ষী হওয়ার মতো শক্তি আমার ছিল না।

এরপর এল সেই রাত। অজানা জগতের গভীর হাওয়ার ঢেউ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল অনন্ত শূন্যের ভেতরে। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের চেতনা থেকে ক্রমে দূরে, আরও দূরে আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল পাগলপারা আশ্চর্য সব অনুভূতি। অনন্তকে বুঝি অনুভব করতে পারছিলাম আমরা। অবিশ্বাস্য আনন্দে কাঁপছিলাম। সেইসব অনুভূতির খানিকটা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে। যেটুকু মনে আছে, তাকেও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ক্রমে সেই থকথকে প্রাচীরগুলির সংখ্যা বাড়ছিল। তারা আমাদের শরীরে যেন কামড় বসাচ্ছিল। যেতে যেতে একসময় আমি বুঝতে পারলাম, আমরা আজ এমন এক জগতে চলে এসেছি, যেখানে এর আগে কখনও আসিনি। এক পবিত্র ইথারের সমুদ্রের মধ্যে যেন আমরা ঝাঁপ দিয়েছি। আমার বন্ধু অন্য দিনের মতোই আমার থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তার মুখ আজ উজ্জ্বল ও অতি তরুণ। মনে হল, তার সেই ভেসে চলার মধ্যে কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আচমকাই তার সেই মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সে যেন মিলিয়ে গেল! আর তখনই চলতে চলতে আমি ধাক্কা খেলাম এমন এক প্রাচীরে, যাকে ভেদ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। ঘন, আঠালো, দুর্ভেদ্য সেই প্রাচীরকে আমাদের চেনা জগতের কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

বুঝতে পারলাম, আমি এই প্রাচীরের সামনে আটকে গেলেও আমার বন্ধু সেই প্রাচীরকে অনায়াসেই পেরিয়ে গিয়েছে। প্রাচীরটা পেরিয়ে যাওয়ার জন্য আবার চেষ্টা করতেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলাম, আমি শুয়ে আছি টাওয়ার স্টুডিয়োর ভেতরে। ঘরের অন্যদিকে শুয়ে আছে আমার এতক্ষণের স্বপ্ন-সহযাত্রী। তখনও সে অচেতন। তার স্বপ্নালু মুখটা ম্লান। অথচ কী সুন্দর! জানলা দিয়ে আসা চাঁদের সোনালি আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে তার প্রত্ন-শরীর।

ক্ষণিকের নীরবতার পরে আচমকাই নড়ে উঠল তার শরীরটা। আর তারপরেই সে চিৎকার করে উঠল। ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, কতটা তীক্ষ্ণ ছিল সেই চিৎকার! ঠিক যেমন বোঝাতে পারব না, কোন সুদূর নরকের ছায়া সেই সময় তার আতঙ্কিত চোখের তারায় ফুটে উঠেছিল! মাত্র এক মুহূর্তের ওই চিৎকার ও অমানুষিক দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে আমি জ্ঞান হারালাম। আমার বন্ধু চেতনা ফিরে পেয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে না-জাগানো পর্যন্ত অজ্ঞানই রইলাম।

স্বপ্নের ভেতরে আমাদের আশ্চর্য অভিযানের সেই শেষ। আমার বন্ধু পেরিয়ে গিয়েছিল সেই প্রাচীর, যা আমি টপকাতে পারিনি। সেখানে গিয়ে সে কী দেখেছে, তা বলার সাহস ওর ছিল না। কেবল ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতবাক আমার বন্ধু আমাকে সতর্ক করে বলেছিল, চির-অচেনা অন্ধকারের রাজত্বে অভিযানের কথা আমাদের আর কক্ষনো ভাবা উচিত নয়।

সে আমাকে পরামর্শ দিল, এবার থেকে যতটা সম্ভব কম করে ঘুমোতে হবে আমাদের। তার জন্য ড্রাগের আশ্রয় নিতে হলে তা-ই সই। কিন্তু ঘুমের রাস্তায় যাতায়াত কমাতেই হবে। সে যে ভুল বলেনি তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লেই এক অবর্ণনীয় দুঃস্বপ্ন গ্রাস করে নিচ্ছিল আমাকে। প্রতিটা ছোট ও অনিবার্য ঘুমের ভেতরেই আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত! কিন্তু আমার বন্ধুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত হয়ে উঠল। সে চোখের সামনে বুড়িয়ে যাচ্ছিল! রাতারাতি তার মুখে বলিরেখা গজিয়ে উঠল, চুল হয়ে উঠল সাদা।

আমাদের জীবনটা বদলে গেল। আমার সেই বন্ধু, যার আসল নাম বা পরিচয় সে কখনও মুখ ফুটে বলেনি, সে ক্রমে বিচ্ছিরি রকমের খিটখিটে হয়ে উঠল। আসলে সে একা থাকতে ভয় পাচ্ছিল। বিশেষত, রাত হলে সে একা থাকতেই চাইত না। বেশ কয়েকজন মানুষের সান্নিধ্যও তাকে প্রশান্তি দিতে পারছিল না। অচেনা মানুষদের সঙ্গেও আমরা মেলামেশা করছিলাম। অকালে বুড়োটে মেরে-যাওয়া আমাদের চেহারা অন্যদের মনে বিশ্রী কৌতূহলের জন্ম দিত। আমার সেটা একেবারেই ভালো লাগত না। কিন্তু আমার বন্ধুর তাতে অসুবিধা ছিল না। অন্তত একা থাকার চেয়ে লোকের ভিড়ে থাকাটাই তার কাছে শ্রেয় ছিল, যতই তারা আমাদের কৌতূহলের চোখে দেখুক-না কেন।

ঘরের বাইরে কক্ষনো একা একা বেরোতে চাইত না সে। বিশেষ করে রাতে, তারা-ঝলমলে আকাশের নীচে একলা যেতে তার তীব্র আপত্তি ছিল। ঠেলেঠুলে বের করলে দেখতাম, ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখে এমন ভয়ের জলছাপ লেগে থাকত, যেন আকাশের শরীরে কোনও ভয়ংকর জেগে রয়েছে। সে আকাশের একই দিকে তাকাত, এমন নয়। বিভিন্ন সময় আকাশের বিভিন্ন কোণে আটকে থাকত তার ভয়ার্ত দৃষ্টি। বসন্তকালে সে তাকাত উত্তর-পূর্ব আকাশের দিকে। গ্রীষ্মে দেখত ঠিক মাথার ওপরে থাকা আকাশের দিকে। শরৎকালে তার দৃষ্টি ঘুরে যেত উত্তর-পশ্চিমে। শীতকালে সেটা

চলে যেত পুব আকাশে, তবে ভোরের দিকে। শীতের মাঝামাঝি সময়ে তার চোখে ভয়ের মাত্রা কমে আসত।

বছর দুয়েক কাটার পরে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আকাশের দিকে তাকানোর সময়ে আসলে সে নির্দিষ্ট কোনও নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন যেমন সরছে, আকাশে তার দৃষ্টিও সেইভাবেই বদলে বদলে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি অনুযায়ী আকাশের দিকে দেখতে দেখতে আমার ধারণা হল, করোনা বোরিয়ালিসের[21] দিকেই তাকায় আমার বন্ধু।

আমরা এখন লন্ডনের একটা স্টুডিয়োতে থাকি। দু-জনের কেউই সেই দিনগুলোর কথা ভুলেও উচ্চারণ করি না। অজানা জগতের ভয়াল রহস্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার সময়টা এখন কেমন অলীক বলে মনে হয়। যত দিন যাচ্ছে, আমরা আরও বুড়ো আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। নিয়মিত ড্রাগসেবন আর স্নায়বিক দৌর্বল্যেরই ফল এই অকালবার্ধক্য। লম্বা ঘুমের থেকে অবশ্য ছুটি মিলেছে। কিন্তু দু-এক ঘণ্টার ঘুমও আমাদের কাছে আতঙ্কের কালো ছায়া নিয়ে আসে।

জানুয়ারি মাস। বৃষ্টি আর কুয়াশাচ্ছন্ন চারপাশ। পকেট একেবারে ফাঁকা। ড্রাগ কেনার পয়সা জোগাড় করা মুশকিল। যেসব মূর্তি বানিয়েছিলাম, সবই বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন করে মূর্তি বানাব, মালমশলা কেনার সাধ্যও নেই। সত্যি বলতে কী, উৎসাহও নেই। ভয়ংকর খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা।

এরপরই এল সেই রাত। স্পষ্ট মনে আছে সেই রাতটার কথা। লক্ষ করলাম, আমার বন্ধু ঘুমোচ্ছে। একেবারে অঘোরে। জাগাতে গিয়েও পারলাম না। জনশূন্য, অন্ধকারময় স্টুডিয়ো। বাইরে বৃষ্টিপতনের ছন্দময় ধ্বনি। বড় ঘড়ির টিক টিক শব্দটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে এই নিস্তব্ধতার ভেতরে। এমনকী, ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা আমাদের শৌখিন ঘড়ির মৃদু টিক টিকও শোনা যাচ্ছে। বাড়ির অন্যত্র কেউ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলল। দূরে বৃষ্টি ও কুয়াশা-মাখা শহরের শব্দ। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে আমার ঘুমন্ত বন্ধুর গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। সেই নিশ্বাসের ভেতরে মিশে রয়েছে যেন কোনও অশুভ দুনিয়ার ছায়া। ছন্দময় শ্বাসক্রিয়ার গভীরে অমানুষিক আতঙ্ক ও যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে। বুঝতে পারছিলাম, ঘুমের গভীরে স্বপ্নের পথে সে পৌঁছে গিয়েছে সেই নিষিদ্ধ, অকল্পনীয়, অসহনীয় ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে।

জেগে থাকাটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। বিপর্যস্ত মনের মধ্যে নানারকম ছবি ভেসে উঠতে লাগল। শুনতে পেলাম, কোথায় যেন কোনও ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হচ্ছে। এ ঘড়ি আমাদের ঘড়ি নয়। কেননা, ওরকম শব্দ-করা কোনও ঘড়ি আমাদের নেই। আমার বিষণ্ণ কল্পনায় স্পষ্ট অনুভব করলাম, ওই ঘণ্টার শব্দ আসলে কোনও দীর্ঘ সফর শুরুর সংকেত। ঘড়ি— সময়— স্পেস— অসীম— বহু দূরে তলিয়ে যেতে যেতে কল্পনার স্রোত আবার আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। আমি অনুভব করলাম, এই ছাদ, কুয়াশা, বৃষ্টি, আবহাওয়ামণ্ডলের অন্তরালে আকাশের উত্তর-পূর্বে জেগে উঠেছে করোনা বোরিয়ালিস! হ্যাঁ, সেই করোনা বোরিয়ালিস। আমার বন্ধুর চেতনায় যে প্রবল ভয়ংকর অজানা জগতের দূত। তার অর্ধবৃত্তাকার শরীর জুড়ে ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল তারারা।

ঠিক সেই সময় আমি একটা নতুন শব্দ শুনতে পেলাম। একনাগাড়ে চলতে থাকা একটা সুর। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনেক দূরের কোনও জগৎ থেকে ভেসে-আসা একঘেয়ে গুঞ্জন নাকি গজরানি— আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে ভেসে আসছে কার আহ্বান!



চিত্র ৩.১ : বন্ধ দরজার আড়ালে থাকা ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছেছে ভয়ংকর এক লাল ও সোনালি-মেশানো আলোকরশ্মি

এরপর আমি এমন চিৎকার করে উঠেছিলাম যে, পুলিশ ও বাড়িওয়ালা এসে ঘরের দরজা ভাঙতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই দূরের একঘেয়ে গুঞ্জনের এত ক্ষমতা ছিল না যে, আমাকে একেবারে দখল করে ফেলে আমার বুকের মধ্যে চিরকালীন ভয়ের জলছাপ হয়ে উঠবে। আমার চিৎকারের কারণ ছিল অন্য— কানে ভেসে আসা কোনও গুঞ্জন নয়, চোখে দেখা এক দৃশ্য। আমি দেখেছিলাম আকাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে অন্ধকার, বন্ধ দরজার আড়ালে থাকা ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছেছে ভয়ংকর এক লাল ও সোনালি-মেশানো আলোকরশ্মি। এমন এক রশ্মি, যা ঘরের অন্ধকারকে ভেদ করছে না। সে কেবল বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘরের কোণের নিদ্রিত মানুষটির মুখমণ্ডল থেকে। আমার বন্ধুর মুখটা এখন অবিকল পুরোনো সময়ের মতো দেখাচ্ছে, যখন আমরা সময় আর স্পেসের শিকল

ভেঙে কোন সুদূরে ভেসে গিয়েছিলাম এক গোপন, নিষিদ্ধ দুঃস্বপ্নের গুহায়। তখনও স্বপ্নের গভীরে তার তারুণ্যে ভরা মুখে আমি এমনই আলো ফুটে থাকতে দেখেছিলাম।

আমি দেখলাম, আমার বন্ধুর কালো, ঘন, আয়ত চোখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। তার পাতলা, ছায়াচ্ছন্ন ঠোঁট ধীরে ধীরে ফাঁক হচ্ছে। মনে হল, সে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইছে। কিন্তু আতঙ্ক এমনভাবে তাকে গ্রাস করেছে, তার গলায় কোনও স্বর ফুটে উঠছে না। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে তার দেহ, কেবল জেগে আছে মাথাটুকু। কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আতঙ্কিত মুখে জেগে রয়েছে তীব্র, মগজ অবশ করে দেওয়া ভয়ের জলছাপ।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। কেবল সেই অমানুষিক গজরানি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বন্ধুর আতঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম অভিশপ্ত সেই সোনালি-লাল আলোর উৎসের দিকে। আর দেখলাম... ওহ্! এক লহমার জন্য আমি যা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম, তার অভিঘাতেই আমার কণ্ঠস্বর চিরে বেরিয়ে এসেছিল তীব্র আর্তনাদ। সেই চিৎকার এমনই তীব্র ছিল, ছুটে এসেছিল পুলিশ ও বাড়িওয়ালা।

আমি কখনও কাউকেই বলতে পারিনি আমি কী দেখেছিলাম। চেষ্টা করেও পারিনি। সেই স্বপ্নতাড়িত মানুষটিও পারেনি। আমি নিশ্চিত, আমি যা দেখেছিলাম, ও তার থেকেও অনেক, অনেক বেশি কিছু দেখেছিল। ও আর কখনওই কথা বলবে না। কিন্তু আমি চিরকাল পাহারা দিয়ে যাব ওকে, অনন্ত জ্ঞান ও দর্শনের পিপাসু, চির-অতৃপ্ত ঘুমের দেবতা হিপনোসকে[22]।

ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাত্রে, তা আমার কাছে অজানাই রয়ে গেছে। মনের ভেতরে জেগে-ওঠা ভয়ানক সব দৃশ্যের অভিঘাতে আমি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলাম। বাকিরাও কেউ কিছুই বলতে পারেনি। ওদের আচরণে স্পষ্ট, ওরা পুরো ব্যাপারটাই আমার পাগলামি বলে ধরে নিয়েছে। ওরা আমাকে বলেছে, আমার কোনও দিনই কোনও বন্ধু ছিল না। শিল্প-দর্শনে বুঁদ হয়ে থাকার পাগলামিতেই নাকি আমার জীবনের এমন করুণ পরিণতি!

সেই রাতে বাড়িওয়ালা, পুলিশ— সবাই আমাকে অনেকক্ষণ ধরে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধ দিল, যাতে আমি শান্ত হতে পারি। আমার বন্ধুকে নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। ওরা স্টুডিয়োর এক কোণ থেকে উদ্ধার করেছিল একটা মূর্তি, যার জন্য প্রচুর প্রশংসা জুটেছিল আমার কপালে। পরবর্তী সময়ে খ্যাতিও

পেয়েছি প্রভূত। একসময় যে খ্যাতির আশাকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হয়ে থেকেছি এক ধূসর দাড়িময়, বলিরেখায় ঢাকা মুখের সামনে। ভালোবাসা ও প্রার্থনায় মগ্ন থেকেছি তার সামনে।

আমি আমার বানানো সব মূর্তি বিক্রি করে দিয়েছি— এ কথা ওরা বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না। অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে ওরা দেখাচ্ছিল ঘরের কোণের মূর্তিটার দিকে। কী করে ওদের বোঝাই, ওটা আমার বন্ধুর দেহাবশেষ। এক অজানা জগৎ থেকে ভেসে-আসা আলোয় যে বন্ধু চিরকালের মতো অনড়, শীতল, নীরব হয়ে গিয়েছে। সেই বন্ধু, যার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি মেতে উঠেছিলাম এক আশ্চর্য পাগলামিতে। যার ঈশ্বরপ্রতিম দেবদুর্লভ শ্বেতপাথরের মুখশ্রীতে লেগে আছে চিরতারুণ্যের জলছাপ। ঠোঁটে লেগে মৃদু বাঁকা হাসি। সুবিন্যস্ত দাড়ি, ঢেউখেলানো চুল।

ওদের দাবি, ওই মুখ আসলে আমারই আদলে তৈরি। আমারই মতো বছর পঁচিশেকের এক তরুণকে আমি তিলে তিলে নির্মাণ করেছি পাথর কুঁদে কুঁদে। কিন্তু ওরা খেয়াল করেনি ওই মুখের চারপাশে যে শ্বেতপাথরের পশ্চাৎপট, তাতে খোদাই-করা একটা নাম। অ্যাটিকা হরফে[23] লেখা যে নামটি প্রাচীন গ্রিসের উপাস্য ঘুমের দেবতার— হিপনোস।



প্রথম প্রকাশ: *গল্পটি ১৯২৩ সালের মে মাসে, 'দ্য ন্যাশনাল অ্যামেচার' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।*

ভাষান্তর: *বিশ্বদীপ দে*



হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস

স্বপ্ন দেখে সেটা নিয়ে গল্প লেখা ছিল লাভক্র্যাফটের প্রিয় এক অভ্যাস। এই ছোট্ট লেখাটিও তাঁর দেখা এক স্বপ্নেরই টুকরো। তাঁর অধিকাংশ গল্পের তুলনায় খুবই ছোট এই গল্পটি।

একটি অলৌকিক জ্যোৎস্না[24]

(What the Moon Brings)



চাঁদকে আমি ঘৃণা করি। ভয়ও পাই। যখন দেখি, চিরচেনা ও প্রিয় জিনিসও জ্যোৎস্নায় কেমন অপরিচিত ও কুৎসিত হয়ে ওঠে।

নির্জন গ্রীষ্মের সেই ছমছমে রাতে পুরোনো এক বাগানের ভেতরে পায়চারি করছি। নিস্তব্ধ বাগানটার চারপাশ ধুয়ে যাচ্ছে চাঁদের অমল আলোয়। বাগানময় ছড়িয়ে-থাকা রাশি রাশি পাতা আর ফুলের মাতাল গন্ধে ভরা এমন গ্রীষ্মের রাত। আহা! এমন রাতেই তো মনের ভেতরে আশ্চর্য রঙের সব স্বপ্ন জেগে উঠতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতেই আচমকা চমকে উঠে লক্ষ করলাম বাগানের মধ্যে একটা ঝরনা! ঝরনার জলের মধ্যে হলদে আলো পড়ে চকচক করছে। শান্ত সেই ঝরনার স্রোত আপন মনে বয়ে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে এমন এক সমুদ্রের দিকে, যার অস্তিত্ব আমাদের চেনা দুনিয়ায় কোনও দিনই ছিল না! আমি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। শব্দহীন, উজ্জ্বল, ঝলমলে ঢেউগুলিকে অশুভ বলে মনে হচ্ছিল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পূর্ণ চাঁদের মায়ার ভেতরে কোথা থেকে এল এই অভিশপ্ত স্রোত! কীভাবে এল?

পদ্মের কুঁড়িগুলো খসে পড়ছিল একে একে। নিয়তিতাড়িতের মতো তারা সেই জলের ভেতরে ঘূর্ণি তুলে চকিতে হারিয়ে যাচ্ছিল এক আশ্চর্য নকশার সেতুর তলায়। তারা ভেসে

বেড়াচ্ছিল আপন খেয়ালে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কতকগুলি শান্ত, মৃত মুখের সারি ভেসে চলেছে জলের মধ্যে দিয়ে!

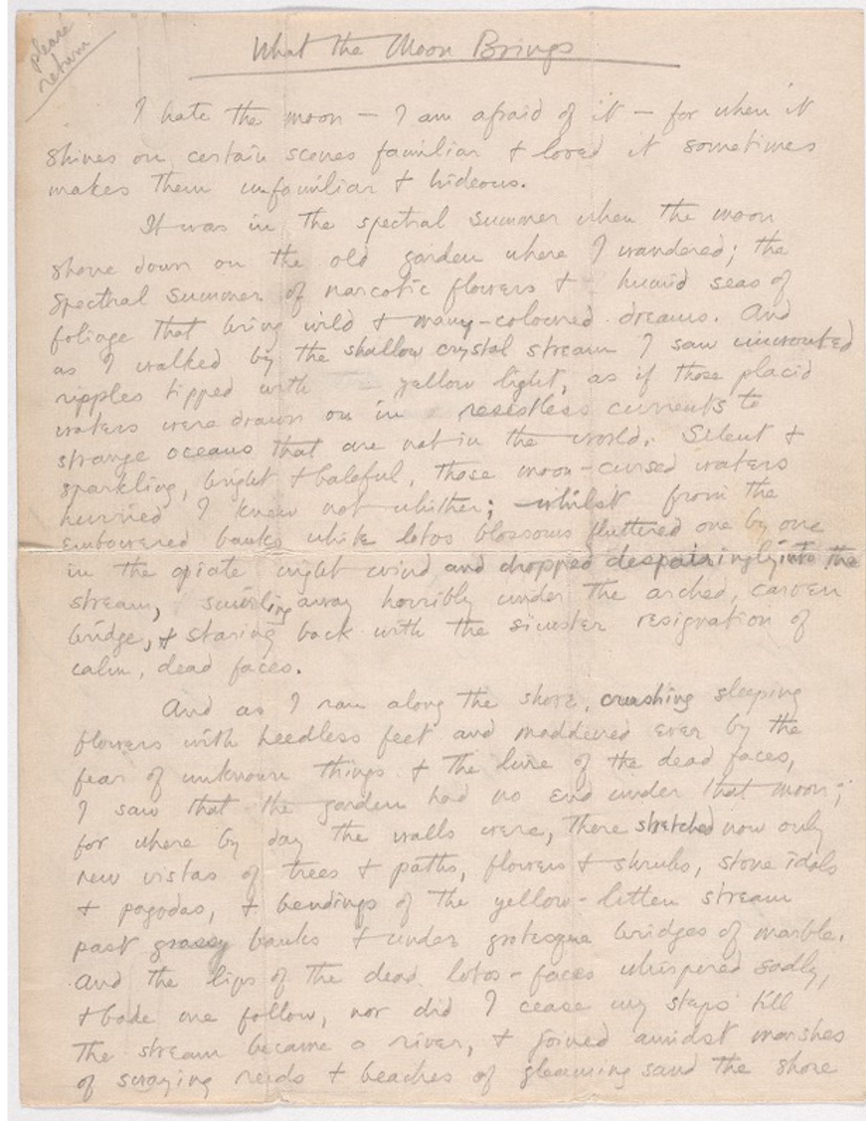
আমি দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করলাম সেই তীর ধরে। আমার পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছিল বাগানের মাটিতে পড়ে-থাকা ঘুমন্ত ফুলগুলি। কী এক অজানা ভয়ে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এগোচ্ছি। হয়তো জলের মধ্যে ভেসে বেড়ানো মৃত মুখের সেই কল্পনা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে অবাক হয়ে দেখলাম, বাগানের শেষে যে পাঁচিল ছিল, তা অদৃশ্য! কী এক আশ্চর্য জাদুতে বাগানটা এক অনিঃশেষ পথের ভেতরে হারিয়ে গিয়েছে! চাঁদের আলোয় যত দূর দেখা যায়, কেবল অচেনা আগন্তুক সব গাছ। সেই গাছেদের সঙ্গে নিয়ে চলেছে পথ। পথ জুড়ে কেবল ফুল, গাছ আর ঝোপ। পাথরের মূর্তি আর প্যাগোডা! আর সেই নদী, ঘাসে ভরা পাড়ের কিনার বেয়ে শ্বেতপাথরের বিচিত্র আঁকাবাঁকা সামঞ্জস্যহীন সেতু পেরিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে।

ঠিক সেই সময় বাতাসের ভেতরে কার যেন বিষণ্ণ ফিশফিশ শুনতে পেলাম! কে যেন আমাকে এগিয়ে যেতে বলছে। অনেকটা দূরে শ্বেতপাথরের সেতুটার দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমায়। সেই ফিশফিশকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ক্রমে আবিষ্কার করলাম, সেই ঝরনার জলস্রোত থেকে সৃষ্টি হয়েছে একটা নদী। আর তারপর সেই নদীটা চলতে চলতে গিয়ে মিশেছে এক বিস্তীর্ণ জলাভূমির পথ ধরে এক বিরাট অচেনা সমুদ্রে! সেই অচেনা সমুদ্রের তীর বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে ঝকমকে বালি। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের শরীর। অন্ধকার রাতেও চাঁদের আলোয় তার ঢেউগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছিল সেখান থেকে।

চাঁদের আলোয় আচমকা এ রহস্যের শরিক হয়ে পড়েছি আমি, এই নির্জন রাতে! যদি সত্যিই ওই মৃত মুখেদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, তাহলে তাদের থেকে জেনে নিতাম জ্যোৎস্নাময় রাতের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা রহস্যকে।

ধীরে ধীরে চাঁদ পশ্চিমদিকে হেলে গেল। ক্রমে ভাটার টান ফুটে উঠল সমুদ্রে। দেখলাম, শান্ত ঢেউগুলি বিষণ্ণ তীর থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ঢেউ সরে গিয়ে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সবুজ শ্যাওলাময় সাদা মন্দিরের চূড়া। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, এই জলময় স্থান কেবল মৃতদের জন্যই। কোনও জীবিত মানুষের কখনও এখানে আসা উচিত নয়। টের পেলাম, থরথর করে কাঁপছি আমি। মনে মনে বললাম,

এই শেষ। আর নয়। আর কখনও কোনও ফিশফিশ শব্দের পাল্লায় পড়ে এমন জায়গায় আসার মতো ভুল করব না। নাহ্!



please return

What the Moon Brings

I hate the moon — I am afraid of it — for when it shines on certain scenes familiar & loved it sometimes makes them unfamiliar & hideous.

It was in the spectral summer when the moon shone down on the old garden where I wandered; the spectral summer of narcotic flowers & humid seas of foliage that bring wild & many-coloured dreams. And as I walked by the shallow crystal stream I saw unwonted ripples tipped with yellow light, as if those placid waters were drawn on in resistless currents to strange oceans that are not in the world. Silent & sparkling, bright & baleful, those moon-cursed waters hurried I knew not whither; whilst from the embowered banks white lotos blossoms fluttered one by one in the opiate night wind and dropped despairingly into the stream, swirling away horribly under the arched, carven bridge, & staring back with the sinister resignation of calm, dead faces.

And as I ran along the shore, crushing sleeping flowers with heedless feet and maddened ever by the fear of unknown things & the lure of the dead faces, I saw that the garden had no end under that moon; for where by day the walls were, there stretched now only new vistas of trees & paths, flowers & shrubs, stone idols & pagodas, & bendings of the yellow-litten stream past grassy banks & under grotesque bridges of marble. And the lips of the dead lotos-faces whispered sadly, & bade me follow, nor did I cease my steps till the stream became a river, & joined amidst marshes of swaying reeds & beaches of gleaming sand the shore

চিত্র ৪.১ : লাভক্র্যাফটের হাতে লেখা “হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস” গল্পের পাণ্ডুলিপি

এই সময় দেখতে পেলাম, অন্ধকার আকাশ থেকে একটা শকুন নেমে আসছে। সম্ভবত সামনের জলমগ্ন প্রবালপ্রাচীরটায় বসে বিশ্রাম নিতে চায় সেটা। আমি ঠিক করলাম, ওর কাছে জানতে চাইব মৃতদের এই জগৎ সম্পর্কে! শকুনটা ক্রমশ নেমে আসছিল। ভেবেছিলাম, আমার কাছেই ও নামবে, কিন্তু ক্রমে বুঝলাম, ভুল ভেবেছি। কাছে নয়,

দূরে। অনেক দূর দিয়ে সেই রাক্ষুসে প্রবালপ্রাচীরের আড়ালে কোথায় যেন তলিয়ে গেল শকুনটা। আমি তার কোনও হদিশ পেলাম না।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে রয়েছি সামনের দিকে। ডুবন্ত চাঁদের আলোয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে জলের তলায় লুকিয়ে-থাকা এক মৃত শহরের আশ্চর্য সব গম্বুজ, খিলান ও ছাদ! আর তার সঙ্গে সেই গন্ধটার তীব্রতাও বেড়ে চলেছে। বলা ভালো, দুর্গন্ধ। যেন পৃথিবীর সমস্ত মৃতের গন্ধ এসে মিশেছে সেই গন্ধের মধ্যে। টের পেলাম, রাতের গহিনে বিস্মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত এক শহরের মধ্যে সমুদ্রের মাংসখেকো কীটেরা এসে ভিড় করেছে কবরের পচা মাংসের লোভে।

এই ভয়াল, থমথমে শহরের ওপরে আলো ফেলতে ফেলতে চাঁদ ক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছিল। অবশ্য জ্যোৎস্নার কী-ই বা প্রয়োজন ওই কীটদের? তারা ব্যস্ত রইল নিজেদের কাজে। কুরে কুরে খেতে লাগল মৃত শরীরের মাংস। আমি সেই কীটময় স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকাতে তাকাতে আমার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল দূরে। ঠিক সেখানে, যেখানে একটু আগে শকুনটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি। আর সেদিকে তাকাতেই যেন শিউরে উঠলাম। আমার শরীরের মধ্যে কী এক অলৌকিক সংকেত ঝিলিক দিয়ে উঠল। যদিও আমার চোখ তখনও নতুন কিছুই দেখেনি। তবু...

ক্রমে বুঝতে পারলাম, ভুল কিছু ভাবিনি। অকারণে বুকের মধ্যে অনুভব করিনি আতঙ্কের চোরাস্রোত। ভাটার টানে জলস্তর নামতে নামতে দূরের প্রবালপ্রাচীরটা ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছিল। এতক্ষণ যার চুড়োটুকুই আমার চোখের সামনে ছিল। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল সবটা। বুঝলাম, ওটা আসলে শয়তানের ভয়ংকর মুকুট! হ্যাঁ, শয়তান। তার প্রকাণ্ড কপালটা এবার জলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের ম্লান-হয়ে-আসা আলোয় একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝতে পারছিলাম, আরও নীচে, মাইলের পর মাইল গভীরে ওই দানবের খুরের মতো পা ছুঁয়ে আছে সমুদ্রের তলদেশ।

আমি চিৎকার করে উঠলাম। চারপাশের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিল আমার সেই ভয়ার্ত আর্তনাদ। আমি বুঝতে পারছিলাম, জলের স্তর আর-একটু নেমে গেলেই সেই অতিকায় শয়তানের চোখ দুটো জেগে উঠবে। বিশ্বাসঘাতক চাঁদ তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলবে আমাকে!

আমার আর উপায় ছিল না। সেই অমানুষিক দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে নিঃসংকোচে আমি লাফ দিয়ে পড়লাম সেই দুর্গন্ধময় শ্যাওলা-মাখা জলের গভীরে, যেখানে স্থূলকায় সমুদ্রকীটরা পৃথিবীর মৃতদের শরীর ঘিরে বনভোজনে মত্ত।



প্রথম প্রকাশ: *গল্পটি* **১৯২৩** *সালের মে মাসে, 'দ্য ন্যাশনাল অ্যামেচার' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।*

ভাষান্তর: *বিশ্বদীপ দে*



দ্য হাউন্ড

উইয়ার্ড টেলস পত্রিকায় প্রকাশিত লাভক্র্যাফটের প্রথম গল্পে আবদুল আলহাজ্রেডের নেক্রোনমিকনের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও লাভক্র্যাফট গল্পটি সুইসাইড নোটের আকারে লিখেছেন। গল্পটি পো, অ্যামব্রোস বিয়ার্স ও কার্ল হায়েসম্যানের লেখা থেকে প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।

সারমেয় সংকেত
(The Hound)



বিরামহীন সাঁইসাঁই শব্দে অস্থির হয়ে উঠেছে কান, যেন কোনও দুঃস্বপ্নের দেশে ডানা ঝাপটাচ্ছে কিছু। দূরে কোথাও একটানা ডেকে চলেছে কোনও অতিকায় হাউন্ড, মৃদু আওয়াজ আসছে তারও। পাগল হয়ে যাচ্ছি কিংবা স্বপ্ন দেখছি ভেবে নিজের মনকে হয়তো ভোলাতে পারতাম। কিন্তু একের পর এক যা ঘটে গেছে, তাতে আর ওইসব আত্মপ্রবঞ্চনা করে লাভ নেই। কীসের কবলে পড়ে সেন্ট জনের শরীরটা একটা ছেঁড়াখোঁড়া লাশ হয়ে গেল, তার রহস্য জানি কেবল আমি। আমারও ওই একই পরিণতি হওয়ার আগে গুলি করে নিজের মাথা উড়িয়ে দিতে চলেছি আমি। কারণ এই মুহূর্তে কোনও এক অশুভ এলড্রিচ[25] জগতের অন্ধকার অন্তহীন সুড়ঙ্গপথ বেয়ে সবেগে ধেয়ে আসছে আমার মৃত্যুদূত। তারই আতঙ্কে বেছে নিয়েছি আত্মহননের পথ।

এক মূর্খ বিকারের জেরে নেমে এসেছে এই ঘোর বিপর্যয়। রোজের সাদামাটা জীবনটায় আর তৃপ্তি হচ্ছিল না আমাদের। ফিকে হয়ে আসছিল প্রেম আর অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণও। অবসাদের থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছিলাম আমি আর সেন্ট জন। তাই যেখানে যা নান্দনিক ঘরানা কিংবা শিল্পশৈলী আছে, মিলে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছিলাম তাদের রহস্য উদ্ধারে। পেরিয়েছিলাম প্রতীকীবাদীদের প্রহেলিকা[26] আর প্রাক্-রাফেলীয়দের[27] উচ্ছ্বাসের শিল্পরুচির পথ। হাজির হয়েছিলাম ব্যভিচার-বাদীদের[28]

নিরানন্দ চারুকলায়। সে শিল্পের বাইরের অংশটুকুতে মন ভরেনি আমাদের। পরিতৃপ্তির সন্ধানে ডুব দিয়েছিলাম তার নারকীয় গভীরতায়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেখানেও মন টেকেনি আমাদের। অচিরেই ঘুচে গিয়েছিল বোদলেয়র[29] আর হাইসমান্সের[30] সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণও।

অবশেষে আরও উত্তেজনা খোঁজার তাগিদে শুরু হল আর-এক প্রয়াস। সশরীরে অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা ভোগের প্রচেষ্টা। আর এই অদম্য বাসনার তাড়নায় আমরা হাত লাগালাম এক জঘন্য অপকর্মে। তার কথা বলতে এই আতঙ্কের মধ্যেও আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসছে।

সেই বীভৎস নিন্দনীয় কাজের নাম কবর লুণ্ঠন[31]।

আমাদের ভয়ানক সব অভিযানের বিবরণ দেব না। লুট করে আনা মালপত্রের ফিরিস্তিও দেব না। তবে এটুকু জানিয়ে রাখি যে, সেসব সংগ্রহের ঠাঁই হয়েছিল আমাদের বাড়ির মিউজিয়ামে।

আমাদের সুবিশাল পাথরের বাড়িটাতে বাসিন্দা বলতে ছিলাম কেবল আমি আর সেন্ট জন। সঙ্গ দেবার জন্যে দাসদাসী পর্যন্ত ছিল না। এই বাড়িরই বহু নীচে, ভূগর্ভের অন্দরে এক গোপন কামরায় গড়ে তুলেছিলাম আমাদের মিউজিয়াম।

আমাদের আসক্তিক্লান্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে ফের চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিলাম আমরা। মেতেছিলাম তাই উন্মাদ শিল্পীদের নারকীয় রুচিতে। সেই ভয়ানক সংগ্রহশালায় গড়ে তুলেছিলাম আতঙ্ক আর বিনাশের এক অকল্পনীয় দুনিয়া। ঘরের দেওয়াল জুড়ে বসানো ছিল কালো ব্যাসাল্ট আর অনিক্স পাথরে কোঁদা বিশাল বিশাল দানবমূর্তি। দু-পাশে পাখা মেলে তারা তাদের মুখের অট্টহাসির ফাঁক দিয়ে উগরে দিত উদ্ভট সবুজ আর কমলা রঙের আলো। গোপন পাইপ দিয়ে বয়ে-আনা হাওয়ায় ফুলেফেঁপে উঠত বিশাল বিশাল কালো পর্দা। তাদের গায়ে লাল রঙে আঁকা হাতে হাত ধরা অস্থিমূর্তিরা যেন মেতে উঠত এক মরণ নৃত্যে। পাইপ দিয়ে কেবল হাওয়া নয়, বয়ে আসত আমাদের মেজাজ শরিফ করার জন্যে নানান গন্ধ। কখনও অন্তিম সৎকারের লিলি ফুলের হালকা সুবাস। কখনও-বা প্রাচ্যের অধিপতিদের সমাধিগৃহের ধূপের মাদক সুগন্ধ। আবার কখনও মাটি-তোলা কবরের অন্তরাত্মা-কাঁপানো উৎকট দুর্গন্ধ।

এই ভয়ংকর কামরার দেওয়ালের গায়ে পরপর রাখা ছিল প্রাচীন মমির সারি। তাদের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত সংরক্ষিত মৃতদেহ। ট্যাক্সিডার্মিস্টের হাতের কারিকুরিতে প্রাণবন্ত দেখাত সেসব ন্যাকড়া-ঠাসা লাশ। তাদের মাঝে ইতস্তত রাখা ছিল পৃথিবীর নানা প্রাচীন গোরস্থান থেকে লুটে-আনা সমাধিশীর্ষের ফলক। ঘরের নানান কোণে সাজানো থাকত নরমুণ্ড। তাদের এক-একটাতে পচনের ছাপ এক-একরকম। কোথাও অভিজাতবংশীয়দের কেশহীন গলিত মস্তক। আবার কোথাও সদ্য কবর-দেওয়া শিশুদের ঝকঝকে সোনালি চুলে সাজানো তাজা মুণ্ড। ভয়ানক বিষয়বস্তুর ওপর ছবি আর স্থাপত্যেরও কমতি ছিল না। তাদের বেশ কিছুই সৃষ্টি আমার আর সেন্ট জনের। ছিল মানুষের চামড়ায় বাঁধাই একটা তালা-মারা কাগজপত্রের ব্যাগ। তার অন্দরে রাখা ছিল এমন সব অকল্পনীয় ছবি, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেসবই কুকীর্তি নাকি স্বয়ং শিল্পী গয়ার[32], যদিও ভয়ে তিনি কখনও সে কথা স্বীকার করেননি। অভাব ছিল না বিকট সব তারের আর ফুঁ-দেওয়া বাদ্যযন্ত্রেরও। আমার আর সেন্ট জনের হাতে পড়ে সেইসব কাঠ আর পেতলের বাজনা বেজে উঠত বীভৎস আওয়াজে— কখনও স্বরবিচ্যুতির অসহনীতায়, আবার কখনও দানবিক চিৎকারের ভয়ানক অট্টরোলে। এ ছাড়া ছিল নকশিকাটা কালো আবলুশ কাঠের বহু আলমারি। সেসব ঠাসা কবর থেকে লুট করে আনা নানান অবর্ণনীয় সামগ্রীতে। প্রত্যেকটা আমাদের উন্মাদনা আর বিকৃতির ফসল। নিজের প্রাণ নিতে যাওয়ার আগেই এগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছি, সুতরাং আর বিশদে কিছু বলতে চাই না।

মুখে নাম আনা যায় না, এমন সব জিনিসপত্রের সন্ধানে আমরা কবরে হানা দিতাম শিকারির মতনই। কিন্তু তা বলে ছোটলোক গোর লুটেরাদের মতন হামলে পড়িনি। আমাদের কাছে এই শখ ছিল সূক্ষ্ম শিল্পের নামান্তরমাত্র। তাই যেন শিল্পসাধনা হয়ে উঠত প্রতিটি অভিযান। নিজেদের মেজাজ, প্রাকৃতিক শোভা, পরিবেশ, আবহাওয়া, ঋতু, চাঁদের আলো ইত্যাদি নানান কিছু মনোমতো হলে, তবেই নামতাম কাজে। কবরের গহ্বর ভয়ানক হাসিতে তার অভ্যন্তরের রহস্য মেলে ধরলে যে চরম আনন্দের অনুভূতি হয়, তার অন্তরায় অনেক। সময়জ্ঞানের অভাব, আচমকা ঝলসে-ওঠা বিদ্যুৎ, কিংবা আনাড়ি হাতে মাটি উলটে ফেলা, এ ধরনের সামান্য উলটো-পালটা হলেই ছিল সব পরিশ্রম পণ্ড হবার সম্ভাবনা। খুঁটিনাটির ওপর তাই তীক্ষ্ণ নজর থাকত আমাদের।

নিত্যনতুন দৃশ্যপটে আরও চড়া দাগের অভিজ্ঞতা ভোগ করার বাসনা চেপে বসেছিল আমাদের ওপর। যেন এক চির-অতৃপ্ত বিকার। আর এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা ছিল সেন্ট জনের। সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই অভিশপ্ত গোরস্থানে। সেখানেই আমাদের ওপর নেমে এসেছিল ভয়ংকর এক অমোঘ নিয়তি।

একটা অসুস্থ প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে পা রেখেছিলাম আমরা হল্যান্ডের সেই সাংঘাতিক কবরখানায়। কয়েকটা ভয়ানক গুজব আর কিংবদন্তি যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। কানে এসেছিল, গোরস্থানের এক কবরে পাঁচশো বছর ধরে শুয়ে আছেন এমন একজন, যিনি জীবদ্দশায় নিজেই ছিলেন গোর লুটেরা। কোনও এক চোখধাঁধানো সমাধিগৃহ থেকে নাকি চুরি করে এনেছিলেন এমন কিছু, যার ক্ষমতা মারাত্মক।

সে দিনের সেই মুহূর্তের কথা আজও মনে আছে। মাথার ওপর হেমন্তের চাঁদ। তার ম্লান আলোয় ভয়-ধরানো ছায়া ফেলেছে কবরগুলো। সমাধির জরাজীর্ণ বেদি আর অযত্নে বেড়ে-ওঠা ঘাসের ওপর একরাশ বিরক্তি নিয়ে ঝুঁকে রয়েছে কদাকার গাছগুলো। আকাশে চাঁদের প্রেক্ষাপটে পাক খাচ্ছে অগুনতি বিশালদেহী বাদুড়ের ঝাঁক। আইভি লতায় ঢাকা প্রাচীন গির্জাটা ভূতুড়ে আঙুল উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। দূরে ঝোপঝাড়ের আনাচকানাচে আলেয়ার নাচ নেচে চলেছে জোনাকির দল। দূরের সাগর আর জলাভূমির ওপর দিয়ে আসা বাতাসে মিশেছে গাছগাছড়া, ছত্রাক আর নানান অজানা জিনিসের গন্ধ। আর এসবের সঙ্গে ভয়ের আর-এক মাত্রা যোগ করেছে অজানা উৎস থেকে ভেসে-আসা কুকুরের ডাক। যেন দূরে কোথাও একনাগাড়ে ডেকে চলেছে কোনও অতিকায় হাউন্ড[33]। সে আওয়াজ শিহরন ধরিয়ে দেয় শরীরে, মনে করিয়ে দেয় চাষাভুসোর মুখে শোনা গল্পটা। যার কবরের তল্লাশে এখানে আসা, তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল এখানেই। ছেঁড়া, থ্যাঁতলানো সেই শরীর যেন খুবলে ফেলেছিল কোনও অবর্ণনীয় পশুর দাঁত-নখ।

পাণ্ডুর চাঁদের নজরদারিতে গোর লুটেরার কবরে ঝপাঝপ কোদাল পড়ে আমাদের। অদ্ভুতদর্শন গাছ, বুক-কাঁপানো ছায়া, প্রাচীন গির্জা, বিশাল বিশাল বাদুড়, জোনাকির নাচ, সব যেন প্রেক্ষাপটে ভাসে ছবির মতন। গুমরে-কাঁদা রাতের বাতাস রোমাঞ্চ ধরায় শরীরে। নানা উৎকট দুর্গন্ধে উলটে আসে নাড়ি। আর দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের অদ্ভুত ডাক। এত মৃদু সে আওয়াজ, যে নিজের কানকেই বিশ্বাস করা যায় না।

আচমকাই শ্যাওলার ভিজে স্তর পেরিয়ে কোদাল লাগে একটা শক্ত কিছুতে। একটা গোল লম্বাটে বাক্স। তার পচনে জীর্ণ আকারের গায়ে জমে রয়েছে আকরিকের কঠিন প্রলেপ। বাক্সটা তৈরি মোটা মজবুত জিনিসে বটে, কিন্তু এতই পুরোনো যে, সেটাকে চাড় মেরে খুলতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না।

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম বাক্সের অন্দরে। কী অদ্ভুত। পাঁচশো বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়ে গেছে বাক্সের বাসিন্দার দেহাবশেষের অনেকটাই। অতীতের হত্যাকারীর চোয়ালের পেষণে কঙ্কালটার দু-একটা অংশ গুঁড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বেশির ভাগটাই অটুট। লম্বাটে দাঁত-বসানো খুলিটা ধবধবে সাদা, পরিষ্কার। অক্ষিকোটর দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই চোখ এককালে আমাদের মতনই বিকারের নারকীয় আগুন জ্বলত ধকধক করে।

কফিনের একপাশে পড়ে একটা অদ্ভুত কবচ। হয়তো এককালে পরানো ছিল কফিনে শোয়া কঙ্কালের গলাতেই। অচেনা কায়দায় খোদাই-করা তার সবুজ জেড[34] পাথরের গঠন। সূক্ষ্ম কারুকাজে প্রভাব প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পের। যেন গুঁড়ি মেরে থাকা একটা পাখা-বসানো হাউন্ড। কিংবা একটা স্ফিংক্স[35], মুখ গড়া যার খানিকটা কুকুরের আদলে। সে মুখে একই সঙ্গে বিদ্বেষ, মৃত্যু আর পশুত্ব এমন ছাপ ফেলেছে যে, দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। তার নীচের দিকটা ঘিরে খোদাই-করা কয়েকটা অক্ষর— দুর্বোধ্য সেই অজানা লিপির মর্ম। আর একদম তলায় সিলমোহরের কায়দায় খোদাই অদ্ভুতদর্শন একটা খুলির ভয়ংকর আকৃতি।

কবচটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নিবার হয়ে উঠল সেটাকে পাওয়ার আকর্ষণ। যেন ওই মান্ধাতার আমলের কবর থেকে নজরানা হিসেবে ওটাই প্রাপ্য আমাদের। কারণ খুঁটিয়ে দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম কবচটা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। কেবলমাত্র নির্মল সাহিত্য-শিল্পে দখল থাকলে হয়তো কবচের চেহারাটা অস্বাভাবিক ঠেকত। কিন্তু উন্মাদ আরব আবদুল আলহাজ্রেডের নিষিদ্ধ নেক্রোনমিকন[36] বইখানা দেখা ছিল আমাদের। সে বইতে ইঙ্গিতে উল্লেখ ছিল এটারই কথা। মধ্য এশিয়ার এক দুর্গম প্রদেশের নাম লেং[37]। সেখানকার শবভোজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতীক এই বীভৎস কবচ। বুড়ো আরব প্রেতবিশারদ তাঁর বইতে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন এ কবচের রূপের

রেখাগুলোরও। মানুষের লাশ যারা দাঁতে ছিঁড়ে খায়, কোনও অজ্ঞাত অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে তাদের আত্মার শক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ও রেখা।

হাতিয়ে নিলাম জেড পাথরের সবুজ কবচটা। কবচ মালিকের সাদা পরিষ্কার খুলি আর গুহার মতন অক্ষিকোটরের দিকে শেষবারের মতন দৃষ্টি দিয়ে কবরটা বুজিয়ে দিলাম আগের মতন।

হেমন্তের পাণ্ডুর চাঁদের ম্লান আলোয় ঠিক করে বোঝা গেল না, কিন্তু যখন তড়িঘড়ি জায়গাটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, মনে হল, আমাদের হাতে আলগা-হয়ে-যাওয়া কবরের মাটির ওপর নেমে এসেছে বাদুড়ের ঝাঁক। যেন সন্ধান করছে কোনও অশুভ, অভিশপ্ত পুষ্টির।

পরের দিন যখন জাহাজে চড়ে দেশের উদ্দেশে রওনা দিলাম, মনে হল যেন দূর থেকে ভেসে আসছে কোনও অতিকায় হাউন্ডের মৃদু ডাক। কিন্তু সে সময়ে হেমন্তের দুঃখী বাতাস কেঁদে চলেছে নিস্তেজ আওয়াজে। তাই এবারেও ঠিক করে কিছু বোঝা গেল না।

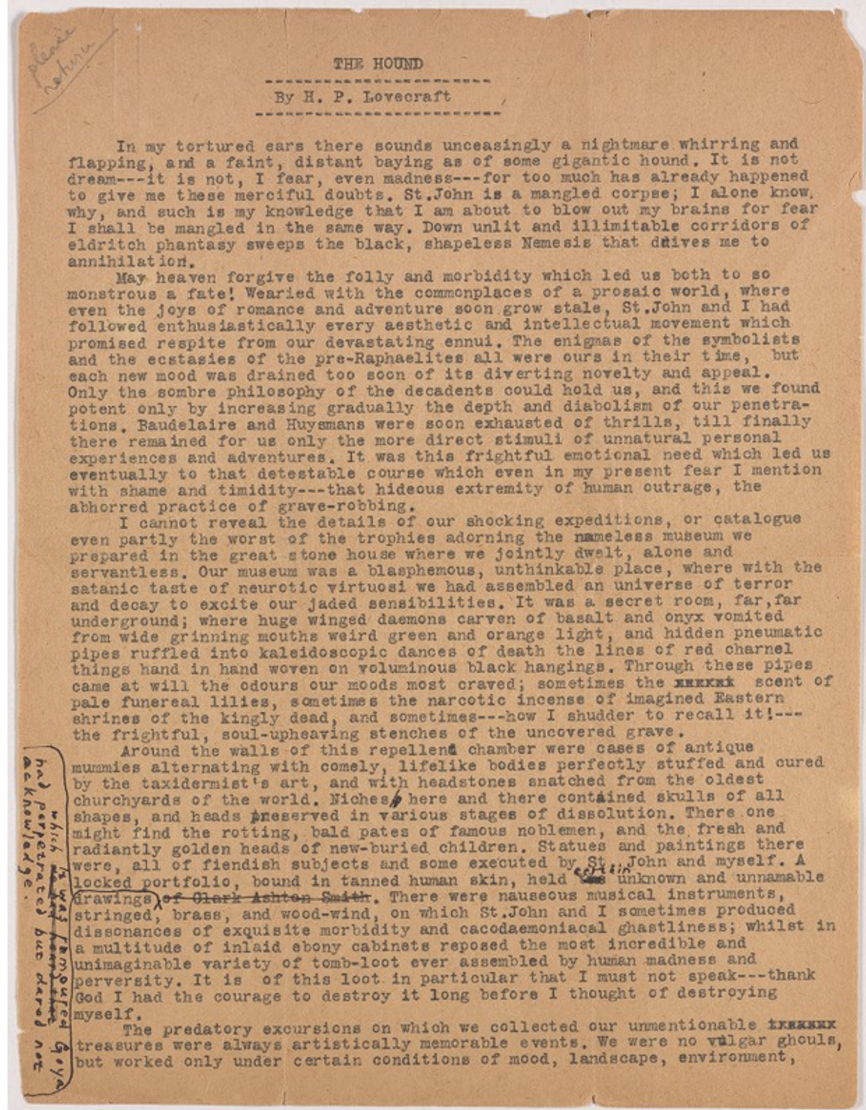
ইংল্যান্ডে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হল যত অদ্ভুত ঘটনা। জনশূন্য পাণ্ডববর্জিত বিশাল মাঠের মাঝখানে একটা প্রাচীন জমিদারবাড়ির কয়েকখানা ঘরে ছিল আমাদের নিঃসঙ্গ বাস। বন্ধুবান্ধব দূরস্থান, চাকরবাকর পর্যন্ত ছিল না। অতিথির আগমনে কদাচিৎ বেজে উঠত আমাদের দরজার কড়া। কিন্তু এবার মনে হতে লাগল, রাতবিরেতে বাড়ির দরজা আর দুটো তলারই জানলা হাতড়াচ্ছে কেউ। কখনও-বা মনে, হল লাইব্রেরির জানলায় চাঁদের আলো ঢেকে দিয়েছে কোনও বিশাল ছায়ামূর্তি। আবার কখনও মনে হল, কাছেই কোথাও সাঁইসাঁই শব্দে পাখা ঝাপটাচ্ছে কিছু। কিন্তু প্রত্যেকবারই খোঁজাখুঁজির পর নজরে পড়ল না কিছুই। অতএব দায় চাপালাম কল্পনার ওপর। হল্যান্ডের গোরস্থানে শোনা কুকুরের ডাক যেমন মনে হত, শুনতে পাচ্ছি তখনও, মনে হল, এসবও হয়তো সেইরকমই কোনও অলীক কল্পনা।

জেড পাথরের কবচটার ঠাঁই হল আমাদের মিউজিয়ামের এক কোণে। মাঝেমধ্যে তার সামনে নানা বিচিত্র গন্ধের মোমবাতি জ্বালি আমরা। চলে আলহাজ্রেডের নেক্রোনমিকন থেকে কবচের বিষয়ে পড়াশোনাও। ক্রমে বুঝতে পারি গোর লুটেরাদের প্রতীক আর তাদের আত্মাদের মধ্যের সম্পর্কের রহস্য। যা পড়ি, তাতে আরও দুশ্চিন্তা জমে উঠতে থাকে মনে।

তারপর একদিন হানা দিল আতঙ্ক।

সে দিন ২৪ সেপ্টেম্বর। রাতের বেলায় খটখট করে উঠল আমার ঘরের দরজা। ভাবলাম হয়তো সেন্ট জন। কিন্তু তাকে যখন ভেতরে আসতে বললাম, তখন কে যেন হেসে উঠল খনখনে আওয়াজে। করিডরে বেরিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘুম থেকে টেনে তুললাম সেন্ট জনকে। কিন্তু সে বলল, সে কিচ্ছু জানে না। দুশ্চিন্তা গ্রাস করল দু-জনকেই। এই রাতেই প্রথম মনে হতে লাগল, ধু ধু মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে ভেসে-আসা কুকুরের অস্পষ্ট ডাক হয়তো এক ভয়ানক সত্য।

এর দিন চারেক পরের কথা। আমরা দু-জনেই তখন আমাদের গোপন মিউজিয়ামে। লাইব্রেরির যে লুকোনও দরজা থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে মিউজিয়াম অবধি, হঠাৎ মনে হল, সেই দরজা খুব ধীরে ধীরে সন্তর্পণে আঁচড়াচ্ছে কোনও কিছু। দু-দুটো ভয় চেপে ধরল আমাদের। এমনিতেই আমরা সর্বদাই আতঙ্কে থাকতাম, পাছে কেউ আমাদের এই বীভৎস সংগ্রহের কথা টের পেয়ে যায়। তার সঙ্গে এবার যোগ হল এই অজানা রহস্য।



please return

THE HOUND

By H. P. Lovecraft

In my tortured ears there sounds unceasingly a nightmare whirring and flapping, and a faint, distant baying as of some gigantic hound. It is not dream---it is not, I fear, even madness---for too much has already happened to give me these merciful doubts. St.John is a mangled corpse; I alone know why, and such is my knowledge that I am about to blow out my brains for fear I shall be mangled in the same way. Down unlit and illimitable corridors of eldritch phantasy sweeps the black, shapeless Nemesis that drives me to annihilation.

May heaven forgive the folly and morbidity which led us both to so monstrous a fate! Wearied with the commonplaces of a prosaic world, where even the joys of romance and adventure soon grow stale, St.John and I had followed enthusiastically every aesthetic and intellectual movement which promised respite from our devastating ennui. The enigmas of the symbolists and the ecstasies of the pre-Raphaelites all were ours in their time, but each new mood was drained too soon of its diverting novelty and appeal. Only the sombre philosophy of the decadents could hold us, and this we found potent only by increasing gradually the depth and diabolism of our penetrations. Baudelaire and Huysmans were soon exhausted of thrills, till finally there remained for us only the more direct stimuli of unnatural personal experiences and adventures. It was this frightful emotional need which led us eventually to that detestable course which even in my present fear I mention with shame and timidity---that hideous extremity of human outrage, the abhorred practice of grave-robbing.

I cannot reveal the details of our shocking expeditions, or catalogue even partly the worst of the trophies adorning the nameless museum we prepared in the great stone house where we jointly dwelt, alone and servantless. Our museum was a blasphemous, unthinkable place, where with the satanic taste of neurotic virtuosi we had assembled an universe of terror and decay to excite our jaded sensibilities. It was a secret room, far, far underground; where huge winged daemons carven of basalt and onyx vomited from wide grinning mouths weird green and orange light, and hidden pneumatic pipes ruffled into kaleidoscopic dances of death the lines of red charnel things hand in hand woven on voluminous black hangings. Through these pipes came at will the odours our moods most craved; sometimes the xxxxxx scent of pale funereal lilies, sometimes the narcotic incense of imagined Eastern shrines of the kingly dead, and sometimes---how I shudder to recall it!---the frightful, soul-upheaving stenches of the uncovered grave.

Around the walls of this repellent chamber were cases of antique mummies alternating with comely, lifelike bodies perfectly stuffed and cured by the taxidermist's art, and with headstones snatched from the oldest churchyards of the world. Niches here and there contained skulls of all shapes, and heads preserved in various stages of dissolution. There one might find the rotting, bald pates of famous noblemen, and the fresh and radiantly golden heads of new-buried children. Statues and paintings there were, all of fiendish subjects and some executed by St. John and myself. A locked portfolio, bound in tanned human skin, held certain unknown and unnamable drawings ~~of Clark Ashton Smith~~. There were nauseous musical instruments, stringed, brass, and wood-wind, on which St.John and I sometimes produced dissonances of exquisite morbidity and cacodaemoniacal ghastliness; whilst in a multitude of inlaid ebony cabinets reposed the most incredible and unimaginable variety of tomb-loot ever assembled by human madness and perversity. It is of this loot in particular that I must not speak---thank God I had the courage to destroy it long before I thought of destroying myself.

The predatory excursions on which we collected our unmentionable xxxxxxx treasures were always artistically memorable events. We were no vulgar ghouls, but worked only under certain conditions of mood, landscape, environment,

চিত্র ৫.১ : “দ্য হাউন্ড” গল্পের টাইপ করা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ করে খুলে দিলাম দরজা।

আমাদের ওপর এসে পড়ল একঝলক হাওয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে একটা খসখস শব্দ, খুকখুক হাসি, আর কারও ক্রমাগত বকবক করে যাওয়ার আওয়াজ। আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নাকি স্বপ্ন দেখছি, নাকি সজ্ঞানেই আছি, সেসব কিচ্ছু বোঝার চেষ্টা করিনি। কেবল আঁতকে উঠে উপলব্ধি করেছিলাম আর-একটা ব্যাপার। না-দেখা অশরীরী বকবক করে চলেছে হল্যান্ডের ভাষায়।

এর পরের দিনগুলো কাটতে লাগল একই সঙ্গে বিস্ময়ে আর আতঙ্কে। কখনও মনে হত, এককালের অপ্রাকৃতিক সব উত্তেজনার মাশুল চুকিয়ে হয়তো আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি। আবার কখনও কখনও নিজেদেরকে ধীরে ধীরে আসতে থাকা কোনও সর্বনাশা নিয়তির শিকার ভেবেও নাটুকে আনন্দে পেতাম। অদ্ভুত সব ব্যাপারস্যাপারও এবার থেকে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। মনে হতে লাগল, আমাদের নির্জন বাড়িটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে কোনও অশুভ সত্তার উপস্থিতিতে। তবে তার গতিপ্রকৃতি যে কী, তা বোঝা ছিল আমাদের সাধ্যের বাইরে। প্রতিরাতেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে আসতে লাগল দানবিক কুকুরের আওয়াজ। জোর থেকে আরও জোরে, ক্রমশই বাড়তে থাকল সে আওয়াজ। ২৯ অক্টোবরে নজরে পড়ল, লাইব্রেরির জানলার নীচের নরম মাটিতে পড়েছে কীসের যেন পায়ের ছাপ। অসাধ্য সে ছাপের বর্ণনা দেওয়া। এর সঙ্গে কে জানে কেন আমাদের পুরোনো বাড়িটাতে পালে পালে হাজির হতে শুরু করল বিশাল চেহারার সব বাদুড়। দিনে দিনে বাড়তে লাগল তাদের সংখ্যা।

চূড়ান্ত আঘাত নেমে এল ১৮ নভেম্বর। আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশনটা বেশ দূরে। সেখান থেকে অন্ধকারে হেঁটে আসার সময়ে কোনও ভয়ংকর মাংসাশী পশুর কবলে পড়ল সেন্ট জন। সে আক্রমণে ফালাফালা হয়ে গেল সেন্ট জনের শরীর, তার মরণ চিৎকার ভেসে এল আমাদের বাড়ি অবধি। দৌড়ে গেলাম সেই ভয়ংকর ঘটনাস্থলের কাছে। লক্ষ করলাম, সদ্য-ওঠা চাঁদের প্রেক্ষাপটে মেঘের মতন ভাসছে অস্পষ্ট কালো কিছু একটা। তার সঙ্গে কানে এল পাখা ঝাপটানোর সাঁইসাঁই শব্দ। সেন্ট জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে তখন পৌঁছে গেছে মৃত্যুর দোরগোড়ায়, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না। "ওই কবচটা— ওই অশুভ জিনিসটা— " [38]এটুকু বলেই বেরিয়ে গেল তার প্রাণ, পড়ে রইল কেবল একটা ছেঁড়াখোঁড়া লাশ।

পরের দিন মাঝরাতে সেন্ট জনকে কবর দিলাম আমাদের অযত্নলালিত বাগানে। জীবদ্দশায় যেসব ভূতুড়ে গুহ্যবিদ্যা তার পছন্দ ছিল, পাঠ করলাম তারই কয়েকটা। শেষ ভৌতিক মন্ত্রটা আওড়াচ্ছি, অতিকায় হাউন্ডের অস্পষ্ট ডাক ভেসে এল জনশূন্য ফাঁকা মাঠের কোনও সুদূর কোণ থেকে। আকাশে ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাকাতে সাহস হল না। কেবল চোখে পড়ল, বিশাল প্রান্তরের স্বল্প আলোয় ঢিপি থেকে ঢিপিতে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা চওড়াটে ছায়ামূর্তি।

চোখ বন্ধ করে আছড়ে পড়লাম মাটিতে মুখ গুঁজে। কতক্ষণ বাদে জানি না, উঠে কোনওমতে টলতে টলতে উঠে পৌঁছোলাম বাড়ির ভেতরে। যত্ন করে রাখা সবুজ জেড পাথরের কবচের সামনে প্রণিপাত করতে শুরু করলাম অনবরত।



চিত্র ৫.২ : অন্ধকারে হেঁটে আসার সময়ে কোনও ভয়ংকর মাংসাশী পশুর কবলে পড়ল সেন্ট জন

তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে পুরোনো বাড়িতে একা থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না। তাই কবচটা সঙ্গে নিয়ে পরের দিনই পাড়ি দিলাম লন্ডনের উদ্দেশে। যাওয়ার আগে নষ্ট করে দিয়ে গেলাম আমাদের মিউজিয়ামের অশুভ সংগ্রহ— কিছুটা মাটিতে পুঁতে, কিছুটা পুড়িয়ে দিয়ে।

কিন্তু দিন তিনেক যেতে-না-যেতেই মনে হল, ফের শুনতে পাচ্ছি হাউন্ডের ডাক। হপ্তাখানেক বাদে অন্ধকার নামলেই মনে হতে লাগল, আমার দিকে কেউ তাকিয়ে রয়েছে অদ্ভুত চোখে। একদিন সন্ধেবেলা হাওয়া খাচ্ছি ভিক্টোরিয়া বাঁধে[39], খেয়াল করলাম, নদীর জলে রাস্তার আলোগুলোর যে প্রতিফলন পড়েছে, তাদেরই একটা হঠাৎ ঢেকে দিল একটা কালো আকার। একই সঙ্গে রাতের বাতাসের চাইতে জোরালো একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। বুঝতে পারলাম, সেন্ট জনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, আমার কপালেও তা জুটতে বেশি দেরি নেই। কবচটাকে সাবধানে মুড়ে নিয়ে তাই পরের দিন চড়ে বসলাম হল্যান্ডগামী জাহাজে।

হাউন্ডটা এল কোথা থেকে? আমাকেই বা সেটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে কেন? আমার কাছে এসব প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর ছিল না। কবচটা তার কবরে শুয়ে-থাকা নির্বাক মালিককে ফিরিয়ে দিলে কী হবে, তা-ও আমার জানা ছিল না। হাউন্ডের ডাক শুনেছিলাম প্রথমবার সেই প্রাচীন গোরস্থানে। শুরু সেখানে। তারপর সেন্ট জন তার শেষনিশ্বাসের সঙ্গে বলেছে কবচের কথা। আর এই দুইয়ের মাঝে ঘটেছে একের পর এক ঘটনা। সুতরাং ওই কবচ চুরির সঙ্গে আমার ওপর নেমে-আসা এই অভিশাপের যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা বুঝতে মোটেও অসুবিধে হচ্ছিল না। তাই মনে হয়েছিল, যুক্তি বিচার করে প্রতিটি পন্থা একবার পরখ করে দেখা দরকার।

কিন্তু তার আগেই ঘটল আর-এক অঘটন। রটারডামের এক সরাইখানায় আবিষ্কার করলাম, চুরি হয়ে গেছে আমার কবচ। চোরেরা গায়েব করে দিয়েছে আমার উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র সম্বল। মুষড়ে পড়লাম আমি, ডুবে গেলাম অবসাদের অতলে। সে রাতে মনে হল, হাউন্ডের ডাক যেন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

পরের দিন সকালে অপেক্ষা করছিল আর-এক খবর। এক অজানা দুর্বিপাক নেমে এসেছে শহরের এক নিকৃষ্ট পল্লিতে। আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছে সেখানকার লোকজন। অতীতের সমস্ত ভয়ংকর অপরাধকে নৃশংসতায় ছাপিয়ে গেছে সে ঘটনা। একটা জঘন্য বস্তিবাড়িতে হানা দিয়েছে রক্তলাল মৃত্যু[40]। চোরছ্যাঁচড়ের সেই কদর্য আস্তানায় কোনও চিহ্ন না রেখেই এক অজানা আততায়ী ছিঁড়ে ফালাফালা করে রেখে গেছে একটা পুরো পরিবারকে। আর সারারাত আশপাশের মাতালের হুল্লোড় সত্ত্বেও নাকি হালকা শোনা গেছে কোনও অতিকায় হাউন্ডের তেজি, চাপা ডাক।

ফের এসে দাঁড়াই সেই বিপজ্জনক গোরস্থানে। শীতকালের পাণ্ডুর চাঁদের আলো ভয়ানক সব ছায়া ফ্যালে। ফুটিফাটা সমাধি আর তুষার-পড়া বিবর্ণ ঘাসের ওপর বিরক্তি নিয়ে ঝুঁকে থাকে নিষ্পত্র, ন্যাড়া গাছগুলো। প্রতিকূল আকাশের দিকে আঙুল তুলে ব্যঙ্গ করে আইভি-মোড়া গির্জা। হিমেল সাগর আর বরফ-জমা জলাভূমির ওপর দিয়ে ছুটে-আসা নিশীথ বাতাস হাহাকার করে চলে উন্মাদের মতন।

নিজের হাতেই কলুষিত করা সেই প্রাচীন কবরের কাছে এগোই পায়ে পায়ে। ভয় পেয়ে উড়ে পালায় কবরের ওপর উড়তে-থাকা বাদুড়ের বিশাল ঝাঁক। আগেই কমে এসেছিল হাউন্ডের ডাক, কবরের কাছে পৌঁছোতে এবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সে আওয়াজ।

কেন এলাম এই কবরের কাছে? এর নীচে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে যে সাদা দেহাবশেষ, তার কাছে প্রার্থনা করতে? ক্ষমা চাইতে? নাকি পাগলের মতন কাকুতিমিনতি করতে? কারণ যা-ই হোক, তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করলাম কবরের হিম-জমাট মাটিকে। শুধু নিজেই যে হঠাৎ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলাম তা-ই নয়, মনে হল, আমার ওপর ভর করেছে বাইরের কোনও প্রবল ইচ্ছাশক্তি।

কবর খুঁড়ে ফেলতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মাঝে থেমেছিলাম একবারই। একটা শীর্ণ চেহারার শকুন হঠাৎ হিমেল আকাশ থেকে তিরবেগে নেমে এসে কবরের মাটি ঠোকরাতে আরম্ভ করেছিল পাগলের মতন। কোদালের এক ঘায়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলাম তার।

অবশেষে নাগাল পেলাম সেই জরাজীর্ণ লম্বাটে বাক্সটার। ওপর থেকে সরিয়ে ফেললাম তার সোরা-পড়া ঢাকনাটা। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এটাই আমার শেষ কাজ।

দেখলাম, সেই শতাব্দীপ্রাচীন কফিনে গাদাগাদি করে ঘুমিয়ে রয়েছে পেশিবহুল বিশাল বিশাল বাদুড়। আর সেইসব দুঃস্বপ্নের অনুচরদের আলিঙ্গনের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে আমাদের চুরির শিকার সেই অস্থিসর্বস্ব দেহ। কিন্তু কোথায় আমাদের প্রথম দর্শনে দেখা সেই শান্ত, পরিচ্ছন্ন রূপ? এখন তার সর্বাঙ্গ ঢেকে রয়েছে শুকনো জমাট রক্ত, চুল আর মাংসের ফালিতে। ফসফরাসের মতন জ্বলন্ত দুই অক্ষিকোটর বাঁকা চাহনিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকেই। সে দৃষ্টিতে চৈতন্যের লক্ষণ স্পষ্ট। তার রক্ত-মাখা তীক্ষ্ণ শ্বদন্তগুলো মেলা বিকৃত ভঙ্গিতে, হয়তো-বা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ব্যঙ্গ করেই।

সেই বাঁকা হাসিতে মেলা মুখের ফাঁক দিয়ে এবার বেরিয়ে এল একটা পরিহাস-মাখা চাপা আওয়াজ। ঠিক যেন কোনও অতিকায় হাউন্ডের ডাক। চমকে দেখলাম তার নোংরা রক্ত-মাখা নখে লটকে রয়েছে হারিয়ে-যাওয়া সবুজ জেড পাথরের কবচখানা। আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল আতঙ্কের চিৎকার, ছুটে পালালাম বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে। খানিক বাদে খেয়াল করলাম, আমার চিৎকার পালটে গেছে উন্মাদের অট্টহাসিতে।

নক্ষত্র বায়ুতে সওয়ার হয় উন্মত্ততা... দাঁত-নখ তার শান-দেওয়া শত শত লাশে... ফোঁটায় ফোঁটায় মৃত্যু ছেটায় ভূগর্ভে পোঁতা শয়তান মন্দিরের নিকষকালো ধ্বংসাবশেষ থেকে উড়ে-আসা প্রমত্ত বাদুড়ের পালের পিঠে চড়ে।

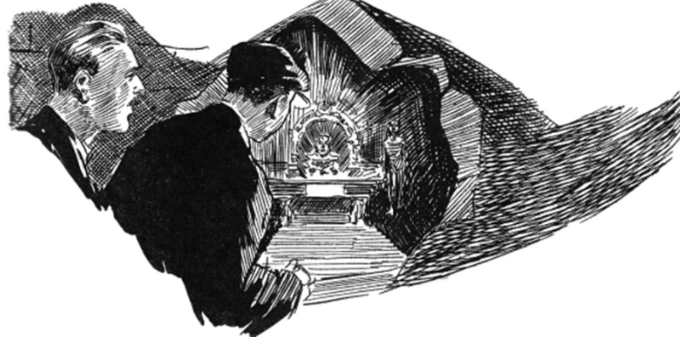
ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়ছে সেই অস্থিসর্বস্ব ভয়ংকরের কুকুরের মতন ডাক। শিরা-উপশিরা-মেলা অভিশপ্ত ডানা দুটোর সাঁইসাঁই পতপত শব্দ ক্রমাগত চক্কর মেরে এগিয়ে আসছে কাছে। যার নাম নেই, যার নাম নিতে নেই, তার কাছ থেকে বাঁচার একমাত্র পন্থা আত্মবিলুপ্তি। আমার রিভলভার আমাকে সেই আত্মবিলুপ্তি এনে দেবে।



প্রথম প্রকাশ: *গল্পটি ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'উইয়ার্ড টেলস' নামক পাল্প ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।*

ভাষান্তর: *সুমিত বর্ধন*





দ্য র‍্যাটস ইন দ্য ওয়ালস

লাভক্র্যাফটের অন্যতম বিতর্কিত গল্প যেখানে কথক নিজের বংশ পরিচয় খুঁজতে গিয়ে প্রধান চরিত্রটি এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হয়। গল্পটিতে লাভক্র্যাফট নিউ ইংল্যান্ডের নানা রকম অতিকথার সঙ্গে বংশগতি ও সেই কারণজনিত বিকৃতির সম্পর্কে নিজের ধারণার কথা বলেছেন। মনে করা হয় গল্পের কথক ও তার বংশের জাতিবিদ্বেষ আসলে লাভক্র্যাফটের নিজের মনের কথাই বলে। গল্পটির বর্ণনা অত্যন্ত ভয়ংকর বলে লাভক্র্যাফটের নিজেরই দ্বিধা ছিল পাঠকেরা এটি পড়তে পারবে কি না।

মূষিক আতঙ্ক[41]

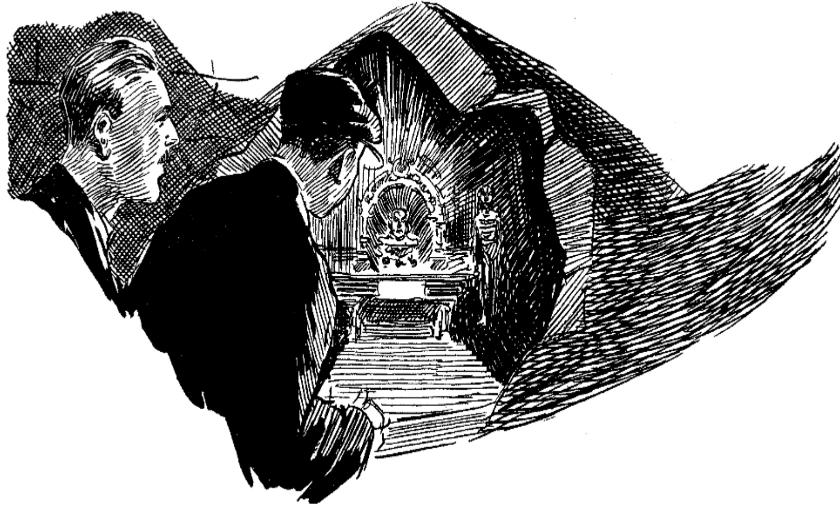
(The Rats in the Walls)



শেষ মিস্ত্রিটা কাজ খতম করে যে দিন বিদায় নিল, ১৯২৩ সালের সেই ১৬ জুলাই আমি এক্সাম প্রায়োরিতে[42] পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করলাম। পুরো অট্টালিকাই প্রায় নতুন করে সংস্কার করতে হয়েছিল। একটু শামুকের খোলার মতো ধ্বংসস্তূপ ছাড়া বাড়িটার বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। কাজটা কিন্তু বেশ ঝক্কির গেল ক-দিন। তবুও হাজার হোক, পূর্বপুরুষের ভিটে বলে কথা— তাই অর্থের ব্যাপারে কোনওরকম কার্পণ্য করিনি আমি। প্রথম জেমসের[43] আমল থেকেই এই বাড়িতে কেউ বাস করে না। দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত থাকার পেছনে নাকি এক রহস্যময় ঘটনা দায়ী, যার কোনওরকম যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। শোনা যায়, এই বাড়ির ভূতপূর্ব মালিকের সঙ্গে এক রহস্যময় পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলস্বরূপ শুধু এই বাড়ির মালিকই নন, তাঁর পাঁচ ছেলেমেয়ে এবং সঙ্গে চাকরবাকরগুলো অবধি সেই ভয়ানক ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। একটু ভুল বললাম, একমাত্র তাঁর তৃতীয় সন্তানটিই সেই বীভৎস ঘটনার নাগপাশ কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ভাগ্যচক্রে তিনিই আমার পূর্বপুরুষ।

এই নারকীয় হত্যালীলার দায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এই তৃতীয় সন্তানের ওপর বর্তায়। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে, তাঁর পক্ষে সাক্ষী দেবার মতোও কেউই বেঁচে ছিলেন না। পিতৃহত্যার

দায় মাথায় নিয়ে তিনি তাঁর নিজের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন, এবং আইনানুসারে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তৎকালীন রাজাবাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, এই ঘটনার বহু দিন পরেও ইনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার না কোনও উৎসাহ দেখিয়েছেন, না তাঁর হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। উলটে সদা সর্বদাই চেষ্টা করে গেছেন কোনও এক ভয়ংকর স্মৃতিকে এবং এই 'অভিশপ্ত' বসতবাড়িকে তাঁর মন এবং দৃষ্টিসীমানার বাইরে রাখতে। মনে হয়, আইনের চোখরাঙানির চেয়েও অজানা কোনও এক প্রচণ্ড আতঙ্কের প্রভাব তাঁর ওপর প্রবল ছিল।



চিত্র ৬.১ : ১৯২৩ সালে আমি এক্সাম প্রায়োরিতে পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করলাম

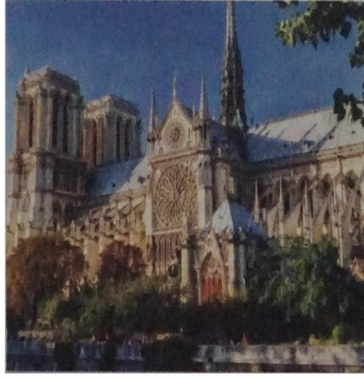
এই ভদ্রলোকের পোশাকি নাম, ওয়াল্টার ডে লা পোর। ইনিই এককালে এক্সাম[44] অঞ্চলের এগারোতম ব্যারন এবং আমার প্রপিতামহ। শুনেছি, ওই ঘটনার পর গোপনে ইনি ভার্জিনিয়াতে পালিয়ে আসেন এবং অতীত দুঃস্বপ্নকে পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করেন। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মই পরের শতাব্দীতে ডেলাপোর[45] বংশ নামে পরিচিতি লাভ করে।

এক্সাম প্রায়োরি কিন্তু এই পুরোটা সময় খালিই পড়ে ছিল— যদিও পরবর্তীকালে এটিকে নরিস[46] পরিবারের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। অট্টালিকাটির গঠনের মধ্যে বহু পুরাতন এক মিশ্র স্থাপত্যরীতি লক্ষ করা যায়। সে জন্য, কেউ বসবাস না করলেও অনেকদিন ধরে এটা রিসার্চের এবং তদুপরি অ্যাকাডেমিক আগ্রহের একটা

বিষয়বস্তু ছিল। কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই বাড়ির গথিক[47] ঘরানার বড় বড় উঁচু মিনার, বাড়ির নীচের দিকে স্যাক্সন বা রোমানিয়ান[48] টাইপের গঠন, তার ওপর ড্রুইডিক[49] এবং সিমরিক স্থাপত্যের মিশ্রণে তৈরি এর ভিত যেন একে মহাকালের স্রোতে অটুট দণ্ডায়মান এক সুপ্রাচীন ও স্থবির প্রস্তরখণ্ডের রূপ দিয়েছিল। প্রায়োরির নীচের অংশটি একভাবে সোজা উঠে গিয়ে মিশে গেছে কঠিন চুনাপাথরের তৈরি এক উঁচু বাঁধের সঙ্গে— যার মাথায় উঠলে অদূরের অ্যানচেস্টার[50] গ্রামটির তিন মাইল পশ্চিমে বিস্তৃত ভগ্ন উপত্যকাটি পুরোপুরি দেখা যায়। স্থপতি এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুব আগ্রহের সঙ্গে শতাব্দীপ্রাচীন এই ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু এখানকার মানুষজন কেন জানি না জায়গাটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখেন না। একশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা যখন এখানে বাস করতেন, তখনও লোকজন এটিকে এড়িয়েই চলত। আর এখন তো শ্যাওলা আর অবহেলার অন্ধকার জায়গাটার ওপর একটা বিষাদ-ছায়ার মতো নেমে এসে আশপাশের লোকজনদের কাছে একে আরও ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। তাই পারতপক্ষে কেউ এদিক বিশেষ মাড়ায় না। অ্যানচেস্টারে এসেছি একদিনও হয়নি, এরই মধ্যে জেনে গিয়েছিলাম যে, আমি এক 'অভিশপ্ত' ইমারতের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছি। এসবের মাঝে, সপ্তাহের শুরুতেই মিস্ত্রি লাগিয়ে পুরোদমে এক্সাম প্রায়োরি সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম আর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এই অট্টালিকার সঙ্গে জুড়ে-থাকা শতাব্দীপ্রাচীন প্রবাদের ভিত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে।



চিত্র ৬.২ : গথিক টাওয়ার



চিত্র ৬.৩ : রোমানিয়ান স্থাপত্য

আমার পরিবারের অতীত ইতিহাস বেশ অদ্ভুত। যে রহস্য নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ সুদূর অ্যানচেস্টার থেকে ভার্জিনিয়ার কলোনিতে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করেন, সে ব্যাপারে ডেলাপোর বংশ কিন্তু নিশ্ছিদ্র মন্ত্রগুপ্তি বজায় রেখে চলেছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও এই রহস্যের বিশেষ কিছুমাত্র উদ্ধার করে উঠতে পারিনি। আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের মতো আমরা কিন্তু নিজেদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করা বা বহু বছর আগে তাদের নায়কোচিত কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে ছাতি দশ হাত করে ফেলার মতো

কিছুই করিনি, বরং নিজেদের পরিবারের ইতিহাসের বিষয়ে বিশেষ কিছু না-জানার জন্য চুপ করে থাকতে হয়েছে অধিকাংশ সময়েই। বংশানুক্রমে কিছু সংস্কার, আদবকায়দা বা আচার-বিচার ইত্যাদি আদিপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের ওপর হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু সেখানেও ভাঁড়ে মা ভবানী! কেবল আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধার সময়ে, আমার পূর্বপুরুষ সেই রহস্যময় ভদ্রলোক, একটি মুখবন্ধ খামে কিছু লিখে তাঁর বড় ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে যান এবং নির্দেশ দেন, খামের মুখ যেন তাঁর মৃত্যুর পরেই খোলা হয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের বংশের গৌরবের সূচনাই ঘটেছে, আমার পূর্বপুরুষের এই দেশান্তরকরণের পর থেকেই। তবে এটা ঠিক যে, পরবর্তীকালে এক সম্মানজনক বংশের মর্যাদা আমরা লাভ করেছিলাম, তবুও সবাইকে এড়িয়ে চলার মতো অসামাজিকতা এবং তদুপরি চাপা স্বভাবটা যেন আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে ভীষণভাবে ঢুকে গিয়েছিল— যতই তাতে ভার্জিনীয় মিশ্রণ থাকুক-না কেন।

যা-ই হোক, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ভাগ্যদেবতা আরও একবার আমাদের ওপর বিমুখ হলেন। কারফ্যাক্স পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বসংকট দেখা দিল। আমাদের বাড়িটা ছিল জেমস[51] নদীর ধারেই। উন্মত্ত জনতা যখন সেই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, তখন সেখানে আমার দাদু উপস্থিত ছিলেন। সেই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের তিনি বলি হন, আর সেই সঙ্গে তাঁর বাবার দেওয়া বিশেষ খামটি, যা ছিল আমাদের পরিবারের রহস্যময় অতীতের এক চরম গোপনীয় দলিল— সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আজ, এত দিন পরেও সেই দিনটির কথা আমার স্মৃতিতে দগদগ করছে। তখন আমার সাত বছর বয়স। পুলিশের চিৎকার, মহিলাদের বিলাপ, নিগ্রোদের[52] বুকফাটা আর্তি— সব মিলিয়ে সে রাতটা আমার মন থেকে কোনও দিনই মুছে যাবার নয়। আমার বাবা তখন মিলিটারিতে, রিচমন্ডের হয়ে লড়ছিলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি আর মা শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিলাম। যুদ্ধ শেষ হবার পর আমরা সপরিবারে উত্তরের দিকে যাত্রা করি। এভাবেই ধীরে ধীরে আমি বড় হলাম, মধ্যবয়সে পৌঁছোলাম, এবং শেষ পর্যন্ত এক কর্তব্যপরায়ণ ইয়াঙ্কিতে পরিণত হলাম। যদিও আমার বাবা, আমি— কেউই জানতে পারিনি যে, সেই খামের মধ্যে কী লেখা ছিল।

ম্যাসাচুসেটসে ফিরে আমি নিজের ব্যাবসার ব্যস্ততায় ডুবে গেলাম, আর রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে প্রতিদিন মোলাকাতের ফলে, সুদূর অতীতে কোনও একসময়ে আমার পরিবারের

এক প্রাচীন রহস্যের প্রতি আগ্রহ আমার মন থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেল। যদি সেই সময় কোনওভাবেও আন্দাজ করতে পারতাম!! তাহলে এক্সাম প্রায়োরিকে এরকম ইঁদুর-বাদুড়ের আস্তানাই থাকতে দিতাম— জীবনে কোনও দিনই এই অভিশপ্ত এলাকায় পা রাখতাম না।

১৯০৪ সালে আমার বাবা মারা গেলেন। না, আমার জন্য না, আমার মা-হারা ছেলে অ্যালফ্রেডের জন্য, আমাদের পরিবারের এই প্রাচীন রহস্যের ওপর তিনি কোনও সূত্রই রেখে গেলেন না। আমার ছেলেই কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের প্রায় বিস্মৃত পরিবারের আদি ইতিহাস ঘেঁটে বের করেছিল। আমি ওকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু গল্প বলেছিলাম বটে ওর ছোটবেলায়, তবে সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল আমার কল্পনা। ১৯১৭ সালে আমার ছেলে এভিয়েশন অফিসার হয়ে লন্ডনে যায়। আর সেখান থেকে আমাদের পরিবারের ব্যাপারে খুব আশ্চর্যজনক কিছু খবর আমাকে লিখে পাঠিয়েছিল। পড়ে জানতে পারলাম, ডেলাপোরদের জীবন একসময় যেমন বর্ণময়, ঠিক ততখানিই অভিশপ্ত ছিল। আরও জানলাম, আমার ছেলের এক বন্ধু, ক্যাপটেন নরিস, আমাদের পুরোনো ভিটের নিকটবর্তী গ্রাম অ্যানচেস্টারের বাসিন্দা। তার থেকেই এসব খবরের সন্ধান পেয়েছে অ্যালফ্রেড। তা ছাড়া সে নরিসের গ্রামের বাড়িতে গিয়েও থেকেছে। সেখানে আমাদের আদি পরিবারের ব্যাপারে গ্রাম্য লোকমুখে যা কুসংস্কার এবং কিংবদন্তি যুগযুগান্তর ধরে ছড়িয়েছে, সেটা বড় বড় লেখকের গল্প-উপন্যাসকেও হার মানাবে। যদিও নরিস নিজেও এসব গালগল্পের খুব কমই বিশ্বাস করে, তবুও এই গল্পগুলি আমার ছেলে অ্যালফ্রেডের কাছে বেশ চিত্তাকর্ষক লেগিয়েছিল, সন্দেহ নেই। বলতে দ্বিধা নেই, এই জনশ্রুতিগুলিই কিন্তু সুদূর অতলান্তিক পারের পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। অ্যালফ্রেড লিখেছিল যে, নরিসের কাকাই এখন ওই সম্পত্তির মালিক। আমার ছেলের পরিচয় জেনে তিনি খুব কম দামে ওই জমি-বাড়ি আমাকে বিক্রি করে দিতে রাজি হলেন। অদম্য কৌতূহলে, আমিও নরিস ছেলেটির সাহায্যে আমাদের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হলাম।

১৯১৮ সালে এক্সাম প্রায়োরি আমি কিনে নিলাম। কিন্তু সংস্কারের কাজে নামা তখনই সম্ভব হল না। যুদ্ধ থেকে আমার ছেলে পঙ্গু হয়ে ফিরে এল, আর আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল আমার ছেলের শুশ্রূষার ব্যাপারে। পরবর্তী যে দুটি বছর অ্যালফ্রেড বেঁচে

ছিল, আমি ওর সেবা ছাড়া আর কিছু ভাবিনি। নিজের ব্যাবসার কাজও আমার পার্টনারদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। আলফ্রেড মারা যাবার বছরখানেক পর, ১৯২১ সাল নাগাদ, নিজেকে এতটাই রিক্ত এবং লক্ষ্যহীন মনে হতে লাগল, যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে নতুন-কেনা সম্পত্তির সঙ্গে সময় কাটানোই মনস্থ করলাম। মনে হল, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হয়তো এই চরম একাকিত্ব আর দুঃখ ভুলে থাকা যাবে।

অ্যানচেস্টারে এসে উপস্থিত হলাম ডিসেম্বর নাগাদ। ক্যাপটেন নরিস আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। গোলগাল, হাসিখুশি একটি ছেলে, সারাদিন অ্যালফ্রেডের কথাই বলতে থাকতেন। দেখলাম, বেশ আগে থেকেই দুই বন্ধু মিলে এই জায়গাটির ব্যাপারে অনেক তথ্য, নানা আশ্চর্য জনশ্রুতির সম্ভার আর প্ল্যান জোগাড় করে রেখেছে— যেগুলো আমাকে এই অট্টালিকার সংস্কারসাধনে প্রচুর সহায়তা করবে। এক্সাম প্রায়োরিকে আমি এবার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলাম— ভাঙাচোরা, মধ্যযুগীয় ধ্বংসস্তূপের গাদা জঞ্জালের মধ্যে অশ্বত্থ, ফার্ন গজিয়েছে। জায়গায় জায়গায় মৌচাক আর ঘুঘুর বাসা বিপজ্জনকভাবে এদিক-সেদিক থেকে ঝুলে আছে। ঘরের মেঝে এবং আসবাবের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে স্থানে স্থানে পাথর উঠে গিয়ে।

কয়েকদিন ভালো করে সরেজমিনে পরীক্ষা করার পর, প্রায় তিন শতাব্দী আগে জায়গাটা কীরকম ছিল, সে ব্যাপারে একটা ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট হল। সেইভাবে হিসেব কষে আমি সংস্কারে নামলাম। মিস্ত্রি, শ্রমিক জোগাড় করা শুরু করলাম। প্রত্যেকটি কাজের ব্যাপারে আমাকে লোকালয়ের বাইরে যেতে হচ্ছিল, কারণ অ্যানচেস্টারের লোকজনদের মধ্যে দেখলাম জায়গাটার প্রতি এক অপরিসীম ভীতি এবং অবিশ্বাস্য ঘৃণা এখনও বর্তমান। এই আবেগটা এতই তীব্র ছিল, যে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়ে পড়ত আর যত রাজ্যের গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটত। যত কুসংস্কার আর গুজব শুনতাম, সবই কিন্তু এই বাড়িটা এবং তাতে একদা বসবাসকারী আমার পূর্বপুরুষদের ঘিরেই।

আমার ছেলে একসময় আমাকে বলেছিল, যে, সে যখনই এখানে আসত, ডেলাপোর পরিচয় জেনে সবাই তাকে নাকি কেমন এড়িয়ে চলত। এহ বাহ্য— আমাকে তো এখানে প্রায় একঘরে করে দিয়েছিল লোকজন। আমি অতিকষ্টে ব্যাটাদের বিনীতভাবে বুঝিয়েছিলাম যে, আমি প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটতে আসিনি, কেননা সেসব ব্যাপারে আমার

জ্ঞান ও মানসিকতা দুটোই অপর্যাপ্ত। আমি প্রবাসী, নেহাত পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো পূর্বপুরুষদের জমি-জায়গা হাতে এসেছে, তাই সংস্কার করে নিচ্ছি। দিনকাল যা পড়ছে— এরকম একটা জমকালো সম্পত্তি হাতছাড়া করা উচিত হবে না ইত্যাদি। এসব বোঝানোর পরও ওরা খুব যে আমাকে বিশ্বাস করেছে তা নয়— থেকে থেকেই সন্দেহের চোখে দ্যাখে। তাই যা কিছু জোগাড়পাতি করতে হয়েছে, সবই নরিসের মধ্যস্থতায়। পরে বুঝেছিলাম ওদের রাগের কারণ অন্য। আমি এমন এক স্থান সংস্কার করতে এসেছি, যেটার থেকে বেশি অভিশপ্ত এবং বিভীষিকাময় স্থান ওদের কাছে ও তল্লাটে কিছু নেই। পিশাচ এবং রক্তপায়ী শ্বাপদের বিচরণভূমি হিসাবেই ওরা জায়গাটাকে দেখে এসেছে এতদিন— দূরে থেকেছে অপরিমিত ঘৃণা এবং আতঙ্কে।

বাড়িটা সম্বন্ধে যেসব গ্রাম্য গল্প বা কিংবদন্তি নরিস জোগাড় করে রেখেছিল, সেগুলোকে নিয়ে বসলাম। গল্পগুলোকে জুড়ে জুড়ে আর সেই সঙ্গে এই ধ্বংসস্তূপের ওপর নানা প্রামাণ্য লেখায় চোখ বুলিয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করলাম। আমার যুক্তি অনুযায়ী, এখন যেখানে এক্সাম প্রায়োরি অবস্থান করছে, বহু শতাব্দী পূর্বে সেখানে একটা প্রাগৈতিহাসিক মন্দির ছিল। মন্দিরের বয়স বোধ করি স্টোনহেঞ্জের[53] সমসাময়িক হবে। শোনা যায়, বেশ কিছু সুপ্রাচীন রহস্যময় তন্ত্রানুষ্ঠান ওখানে হত, যা নিয়ে কিছু অস্বস্তিকর রটনাও আছে। কথিত আছে, সেইসব আচার-অনুষ্ঠান নাকি শেষ অবধি ডাকিনী দেবী সিবেলের[54] আরাধনার রূপ নেয়। অট্টালিকার নীচের ঘরের চোরাকুঠুরিগুলিতে এখনও খোদাই করা আছে সেইসব পূজার মন্ত্র— "দিভ... ওপাস... মাগনা— মাতে..."[55] মহাভৈরবীরূপিণী মহাদেবীর স্তুতি। রোমান আক্রমণের পর এইসব গুপ্তবিদ্যাচর্চা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু গোপনে গোপনে এই ভয়ানক আদ্যাশক্তির সাধনা চলতেই থাকে। যত দূর জানা যায়, জুলিয়াস সিজারের আমলে অগস্টাস সেনাবাহিনীর তৃতীয় শাখাটি[56] এই অ্যানচেস্টারেই শিবির স্থাপনা করেছিল। আরও কথিত আছে যে, দেবী সিবেলের অনিন্দ্যসুন্দর মন্দিরের পুরোহিতরা নাকি কোনও অজানা, গোপন তন্ত্রানুষ্ঠান করতেন এক ফ্রিজিয়ান[57] প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে। পরবর্তীকালে মূল ধর্মের মধ্যে নানা পরিবর্তন এলেও, ওই বিশেষ মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান সেই প্রাচীন গোপনীয় এবং মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ীই হত। রোমানদের পতনের পরে এই মন্দিরও নাকি কোনওভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে পরে স্যাক্সনদের[58] প্রচেষ্টায় এর পুনঃসংস্কার ঘটে—

আর এই স্থানটি হয়ে ওঠে সপ্তসাম্রাজ্যের[59] সবচাইতে ভয়াল অঞ্চল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের এক প্রাচীন পত্রিকায়[60] দেখতে পেলাম, এই জায়গাটি নাকি দুনিয়ার পিশাচসিদ্ধ গুপ্তবিদ্যার সাধকদের এক আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল— আর এর চারপাশে ছিল ঘন গাছপালায় ঘেরা এক বাগান। পাথরে ঘেরা এই স্থানটিকে ঘিরে দিয়ে কোনও পাঁচিল না থাকলেও, এই অঞ্চলের শত মাইলের মধ্যে কেউ ভুলেও পা দিত না— এমনই কোনও এক অজানা আতঙ্কে মোড়া স্থান ছিল এটি। ড্যানিশদের[61] আমলেও কেউ এই স্থানটির কোনও ক্ষতিসাধন করেনি, কিন্তু নরম্যানদের আগমনে স্থানটির মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। রাজা তৃতীয় হেনরি[62] শেষ অবধি জায়গাটি আমাদের ঊর্ধ্বতন আদিপুরুষ গিলবার্ট ডেলাপোরের হাতে তুলে দেন, ঘটনাচক্রে তিনিই ছিলেন এক্সাম অঞ্চলের প্রথম ব্যারন— আর সালটা ছিল ১২৬১।

এর পূর্বে আমাদের পরিবারের ওপর কোনও অশুভ অপচ্ছায়ার প্রাদুর্ভাবের খবর জানা যায় না, কিন্তু এখানে আসবার পর থেকেই অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছিল। ১৩০৭ সালের আর-একটা লেখায় দেখতে পেলাম, জনৈক ডেলাপোরকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রাম্য প্রবাদ এবং জনশ্রুতিতে সেই পুরোনো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা এই অট্টালিকাকে চূড়ান্ত অশুভ এবং শয়তানের স্থান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লোকমুখে প্রচলিত গল্পগুলি তো আরও ভয়ানক— প্রতিটি জনশ্রুতি মোটমাট ভয়ংকর সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ভয়ের নানা রূপের প্রকাশ সেসব গল্পে প্রকটভাবে বিদ্যমান, কিন্তু এই বিপুল আতঙ্কের কারণ হিসাবে কোথাও সেরকম কিছু লেখা নেই। ঠিক কী যুক্তিতে এতগুলো মানুষ এত বছর ধরে ভয়ে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এই স্থানকে পরিত্যাগ করে চরম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তা নিশ্চিতভাবে কোথাও খুঁজে পেলাম না। উলটে আমাদের পূর্বপুরুষদের, বলা ভালো, আমার আদি পরিবারকে এমন পৈশাচিক আতঙ্ক এবং ঘৃণার পাত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, যার বর্ণনার তুলনায় গিলস দ্য রেটজ[63] বা মার্কুইস দ্য সাদের[64] মতো অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুরতার বিবরণও নেহাতই ছেলেভুলোনো বলে মনে হতে পারে। গ্রামের কিছু মানুষের হঠাৎ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পরিবারকেই দায়ী করা হয়েছে সর্বতোভাবে।

ব্যারন আর তাদের ছেলেপুলেরাও কিছু কম রহস্যময় ছিলেন না। কানাঘুষো শোনা যায় যে, এই ব্যারন নির্বাচনেও নাকি এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটত। উত্তরাধিকাররা যদি যোগ্য না

হত— তাহলে তারা নাকি কোনও অজ্ঞাত কারণে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করত— যাতে পরের ‘বিশেষ গুণাবলি’সম্পন্ন যোগ্য সন্তান ‘ব্যারন’-এর সেই জায়গাটি নিতে পারে। এটা কীরকম যেন এক পারিবারিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল— যা পরিচালিত হত পরিবারের তৎকালীন যিনি মাথা থাকতেন, তাঁর অধীনে। এখানে বংশপরম্পরাগতভাবে উত্তরপুরুষ নির্বাচনের থেকে লোকটির মেজাজ এবং তার উৎকট আচার-আচরণ বেশি প্রাধান্য পেত। যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত, তারাও এই অদ্ভুত প্রথার অঙ্গ হয়ে যেত। কর্নওয়েলের লেডি মার্গারেট ট্রেভর, যিনি কিনা পঞ্চম ব্যারনের দ্বিতীয় সন্তানের স্ত্রী ছিলেন, তিনি তো বহু দিন এই অঞ্চলে শিশুদের ত্রাস বলে পরিচিত ছিলেন। ওয়েলস সীমানার কাছে এখনও তাঁর নামে এক লোকগাথা আছে— কী ভয়ানক তার কথাগুলি, পড়লেই বুকের মধ্যে কেমন যেন শিরশিরানি জাগে। এরকম আরও এক চরিত্র ছিলেন, লেডি ম্যারি ডেলাপোর। তিনিও নাকি সমান কুখ্যাত ছিলেন— কিন্তু আর্ল অব শ্রেউসফিল্ডের সঙ্গে বিবাহের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি খুন হন। খুনের দায়ে তাঁর স্বামী এবং শাশুড়ি নাকি গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু চার্চে গিয়ে প্রধান পাদরির কাছে তাঁরা নাকি নিজেদের দোষ স্বীকার করে পুরো ঘটনা খুলে বলেছিলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং পুরো বিষয়টা এমনভাবে চেপে যাওয়া হয়, যাতে কাকপক্ষীও না জানতে পারে।

এই লোককথা এবং জনশ্রুতিগুলো, বলাই বাহুল্য, আমাকে বিলক্ষণ বিচলিত করেছিল। নানা বই, খবরের কাগজ, পুথির পাতায় পাতায় এইসব ভয়ানক ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বারংবার আমার বিভিন্ন পূর্বপুরুষের নাম জড়িয়ে আতঙ্কের এক আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া— আমার খুবই বিরক্তিকর লেগিয়েছিল। এইসব আধিভৌতিক ঘটনাপরম্পরার চলচ্ছবি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গেল আমার খুড়তুতো দাদা র‍্যাডল্‌ফ ডেলাপোরের কথা। আমরা যখন কারফ্যাক্সে থাকতাম, তখন র‍্যাডল্‌ফ নিগ্রোদের সঙ্গে ভীষণভাবে মেলামেশা শুরু করেছিল। শুনেছিলাম, পরবর্তীকালে মেক্সিকান যুদ্ধ[65] থেকে ফিরে আসার পর সে নাকি কালাজাদু চর্চা করে এক ভুডু[66] বিশারদ হয়ে উঠেছিল।

যা-ই হোক, এক্সাম প্রায়োরির লাগোয়া যে চুনাপাথরের উঁচু দেওয়ালটা রয়েছে, তার অপর পাড় থেকে শুরু হয়েছে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা— সে কথা আমি আগেও বলেছি। এই উপত্যকাকে নিয়ে এক অদ্ভুত গল্প পড়লাম। উপত্যকার কাছেই যে কবরস্থান আছে,

বসন্তের ঝিরঝিরে বৃষ্টির একরাতে স্যার জন ক্লেভের[67] ঘোড়া অদ্ভুত সাদা কিছু একটাকে মাড়িয়ে ফ্যালে— আর সেই জিনিসটার তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হয়ে, ক্লেভের চাকর প্রায়োরির দিকে মুখ তুলে চেয়ে ছিল। চাঁদনি রাতের মায়াবী জ্যোৎস্নাতে সে প্রায়োরিতে এমন কিছু দেখেছিল, যাতে সে আতঙ্কে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায়। তবে এসব গাঁজাখুরি গপ্প হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটাকে আমার চোখের ভুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। রাতের বেলায় কবরস্থানে দাঁড়িয়ে এসব ভুল দেখা অস্বাভাবিক কিছু না। যদিও আমি সেই সময়ে ভীষণ সন্দেহবাদী ছিলাম। গ্রামের চাষিদের মাঝে মাঝে হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়াটা যদিও সন্দেহজনক, তবুও মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিবেশে এসব খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে এ জিনিসটা খুব অস্বস্তিকর যে, এক্সাম প্রায়োরির বাইরে সুবিশাল পাঁচিলের এদিক-ওদিকে বল্লমের ফলায় মানুষের কাটা মুন্ডু টাঙিয়ে রাখা হত— কেবল বোঝানোর জন্য যে, অতিরিক্ত কৌতূহলের অর্থ মৃত্যু।

এই গল্পগুচ্ছের মধ্যে এমন বেশ কিছু গল্প ছিল, যেগুলো কাহিনি হিসাবে বেশ ভালো। তুলনামূলক পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে কেন আগে একটু পড়াশোনা করিনি, ভেবে রীতিমতো আপশোস হতে লাগল। এরকমই কিছু গল্প, যেমন এই প্রায়োরিতে নাকি রাতের বেলা পিশাচ এবং ডাইনিদের রীতিমতো জমায়েত হত এবং বাদুড়রূপী শয়তানের এক বিরাট বাহিনী সেই জমায়েত পাহারা দেওয়ার জন্য চারপাশ ঘিরে থাকত। প্রায়োরিকে ঘিরে-থাকা বিরাট বাগানটিতে যেসব অদ্ভুত ধরনের খড়খড়ে খোসার ফল চাষ হত, সেইসব নাকি ওই শয়তান বাদুড়বাহিনীর ক্ষুন্নিবৃত্তিতে কাজে লাগত। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ছিল ইঁদুর নিয়ে এক নাটকীয় কাহিনি। পূর্বে বর্ণিত সেই কালান্তক ঘটনায় প্রায়োরি পরিত্যক্ত হবার প্রায় মাস তিনেক পর একরাতে নাকি কিলবিলে জঘন্য এই প্রাণীগুলোর এক বিরাট বাহিনী প্রায়োরি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এদিক-সেদিক। এই নোংরা, হিংস্র এবং বুভুক্ষু শয়তানের দল নাকি পথে যা পেয়েছিল, সব কিছু গোগ্রাসে আত্মসাৎ করতে করতে এগোতে থাকে। মুরগি, শুয়োর, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, এমনকী দুটি হতভাগ্য মানুষও এই রাক্ষুসে বাহিনীর পৈশাচিক খিদের শিকার হয় সেই অভিশপ্ত রাতে। এই ইঁদুরবাহিনীর নারকীয় কার্যকলাপের ওপর স্বতন্ত্রভাবে রচিত বা কথিত প্রচুর ভয়ানক গল্পকথা[68] ছড়িয়ে আছে এই গ্রামের ঘরে ঘরে।

এতসব গল্পকথা, গ্রাম্য প্রবাদ, ভয়ানক ইতিহাসের সারি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বেশ কয়েকদিন। তবে এসবের মধ্যে দিয়েই দীর্ণ শতাব্দীপ্রাচীন আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটের এই ধ্বংসাবশেষের সংস্কারের কাজ প্রায় সমাপ্ত করে এনেছিলাম। শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসের অলৌকিক কর্মকাণ্ড আমার মনকে বিবশ করলেও— ক্যাপটেন নরিস এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ পুরাতত্ত্ববিদরা আমাকে প্রতিমুহূর্তে উৎসাহ জুগিয়েছিল এই প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজে। দু-বছরের ক্রমাগত পরিশ্রমের পর যখন কাজটা শেষ হল, তখন আমি প্রাণভরে পুরো বাড়িটা দেখলাম। খাঁজকাটা কাঠের দেওয়াল, ধনুকের মতো বাঁকা সিলিং, পাথরের গোবরাট-বসানো জানলা, চওড়া সিঁড়ি— সব মিলিয়ে এক প্রাচীন অভিজাত স্থাপত্যরীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিজের পরিশ্রম এবং খরচকে সার্থক বলে মনে হল। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের প্রতিটা অংশে নিখুঁতভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ফেলা গেছে। যে জায়গাগুলো নতুনভাবে বানাতে হয়েছে, সেগুলোর স্থাপত্যও বেশ চমৎকারভাবে অট্টালিকার পুরোনো মেজাজের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। এবার আমার পরবর্তী কাজ হল নিজের পরিবারের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। কারণ আমার পরিবারে শেষ পুরুষ বলতে কেবল আমিই অবশিষ্ট রয়েছি। এখানে বাস করে আমার বাপ-দাদাদের নামে যেসব অভিশাপ আর ঘৃণা ছড়িয়ে আছে— সেগুলো ভুল প্রমাণিত করা এবং ডেলাপোর যে শয়তানের আর-এক নাম নয়, তা প্রতিষ্ঠা করাই আমার মূল কর্তব্য বলে ঠিক করলাম। আমার নিশ্চিন্ত হবার আরও বড় কারণ ছিল এই যে, যদিও বাইরের চাকচিক্যে এক্সাম প্রায়োরি সেই পুরোনো সময়কেই ধরে রেখেছে, তবুও তার ভেতরের অনেক কিছুরই খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে, আধুনিক করে ফেলা হয়েছে এই প্রাচীন অট্টালিকার বেশ কিছু অংশ। তাই ভূত-টুত কিছু থাকলেও তারা এত দিনে পাততাড়ি গুটিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

হ্যাঁ— যা দিয়ে শুরু করেছিলাম— **১৬** জুলাই **১৯২৩** সালে আমি প্রায়োরিতে পাকাপাকিভাবে উঠে এলাম। আমার এখন পরিবার বলতে, সাতটা চাকর আর ন-টা বেড়াল, যার মধ্যে শেষোক্তদের প্রতি আমার ভালোবাসা একটু বেশি। সবচেয়ে বয়স্ক বেড়ালটা, আমার আদরের কালো-মানিক[69] আমার সঙ্গে সাত বছর ধরে রয়েছে সেই ম্যাসাচুসেটের বোলটন[70] থেকে। আর, ক্যাপটেন নরিসের সঙ্গে এখানে এত দিন থাকার সুবাদে বাকি বেড়ালগুলোকে আমিই জোগাড় করেছিলাম।

দিন পাঁচেক একরকম শান্তিতেই কেটে গেল। নিজের পরিবারের ব্যাপারে তথ্যাদি নথিভুক্ত করতেই আমার দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হত। যে রাতের ভয়ানক ঘটনায় আমার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছিল, সেই বিশেষ রাতের ব্যাপারে বিশদে জানার জন্য আমার কৌতূহল ছিল অদম্য। সে ব্যাপারে আমি প্রচুর তথ্য নাড়াঘাঁটা করেছিলাম। এত নথি পড়ে মনে হল, যেন কিছু আনুষঙ্গিক ব্যাপার আমি ধরতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, এই ঘটনার কথাই লিখে সেই চিঠি মুখবন্দি খামে পুরে আমার দাদুকে রাখতে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার প্রপিতামহ, যা কারফ্যাক্সে থাকার সময় ভস্মীভূত হয়ে যায়।

যা জানলাম, তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার প্রপিতামহ নাকি নিজের হাতে, চারজন চাকরের সাহায্যে, পরিবারের বাকি সদস্যদের ঘুমের মধ্যেই হত্যা করেন। এই ঘটনার হপ্তা চারেক আগে তিনি নাকি এমন কিছু একটা আবিষ্কার করেন, যাতে তাঁর স্বাভাবিক চালচলনে আমূল পরিবর্তন আসে[71]। তাঁর এই পরিবর্তন নাকি শুধু ওই চারজন চাকরের কাছেই তিনি নিজে প্রকাশ করেছিলেন— বাকিদের সামনে তিনি স্বাভাবিক আচরণই করে বেড়াতেন। হতে পারে, এই কারণেই চাকরগুলো রক্ষা পায়, এবং সেই ঘটনার পরদিন থেকে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি— যেন তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের বলি হয়েছিল এক বাবা, তিন ভাই এবং দুই বোন— যাদের গ্রামবাসীরা খুব একটা সুবিধের চোখে কোনও দিনই দেখত না। এবং হতে পারে, সে কারণেই আইনের ফাঁস আমার প্রপিতামহের ওপর সেভাবে চেপে বসতে পারেনি, বা ইচ্ছে করেই হয়তো বসেনি। বিচার এমনভাবেই হয়েছিল, যাতে এই 'হত্যাকারী' নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে এবং দিনের আলোয় এই অভিশপ্ত ভিলা ছেড়ে ভার্জিনিয়ায় পালিয়ে যেতে পারে। কানাঘুষো এমন পর্যায়ে চলেছিল যে, তিনি নাকি এই জায়গাটিকে সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে-আসা এক নারকীয় অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন। আমার প্রপিতামহ এমন কী আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁকে ঠান্ডা মাথায় এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড করতে প্রলুব্ধ করল, সেটা আমি কিছুতেই ভেবে পেলুম না। ওয়াল্টার ডেলাপোর তো এই পরিবারেরই মানুষ ছিলেন, এবং নিজের পরিবারের ব্যাপারে কানাঘুষো, জনশ্রুতি, লোককথা সবই ওঁর অবগত ছিল। তাই সেসব গল্পকথা বা ভয়ানক ঘটনার বিবরণ তাঁর ওপর হঠাৎ এতটা প্রভাব নিশ্চয়ই ফেলেনি, যার প্ররোচনায় তিনি নিজের পরিবারকে হত্যার মতো এরকম

বীভৎস পদক্ষেপ নেবেন! তাহলে তিনি কি কিছু দেখে ফেলেছিলেন— কিছু প্রাচীন রীতিনীতি? যা ভয়ানক গোপন কিন্তু সাংঘাতিক? নাকি কিছু গোপন সংকেত রহস্য উদ্ধার করেছিলেন, যার থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কোনও ভয়ংকর পৈশাচিক সত্য? ওয়াল্টার কিন্তু তাঁর নরম স্বভাব এবং মৃদুভাষ্যের জন্য পরিচিত ছিলেন সারাজীবন। ভার্জিনিয়াতে যখন ছিলেন, তখনও চুপচাপ এবং শান্তিপ্রিয়ই ছিলেন। কিন্তু এমন কী ঘটে থাকতে পারে তাঁর সঙ্গে, যে এই শান্ত স্বভাবের মানুষ হঠাৎ রক্তপিপাসু জল্লাদ হয়ে উঠে এহেন নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলেন?

২২ জুলাই থেকে আমার চারপাশেও এমন কিছু ঘটতে আরম্ভ করল, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। প্রথমে অত পাত্তা না দিলেও, এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলিই পরে এমন কিছু ঘটনার সূত্রপাত ঘটাল, যেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে আমি অপারগ। ঘটনাটা যদিও খুবই অকিঞ্চিৎকর— এতটাই যে, প্রায় নজরেই পড়ে না। এত বড় বাড়িতে একপাল চাকরবাকর সমেত আছি, বড় বড় পাথরের নতুন রং-করা দেওয়াল, নতুন কাঠের আসবাব, এক আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে বাস করছি। চাকরবাকররা সারাক্ষণ আমার খিদমত খাটার জন্য মুখিয়ে রয়েছে— এই পরিবেশে ভয়ডর বিশেষ লাগে না। তবুও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমার বুড়ো বেড়ালটা যেন বিনা কারণে খুব উত্তেজিত এবং সতর্ক। কালো মানিকের মুড আমি খুব বুঝি, কিন্তু এ পরিবর্তনটার কোনও বিশেষ কারণ খুঁজে পেলাম না। সে সারা ঘরবাড়ি ছটফট করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর বিশেষ করে পাথরের দেওয়ালগুলো, যেগুলো বাড়িটার স্থাপত্যে একটা গথিক চেহারা দিয়েছে— সেগুলোকে শুঁকতে লাগল। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা কীরকম একটা ক্লিশে হরর মুভির মতো শোনাচ্ছে। ওইসব সিনেমাতে সাধারণত একটা কুকুর থাকে, যে মনিবের সামনে থাকা অদৃশ্য কিছু দেখে চিৎকার করে ওঠে। আমার মার্জার-পর্বও অনেকটা সেরকমই লাগতে পারে, কিন্তু কী করব— ব্যাপারটা না বলেও থাকতে পারছি না।

পরের দিন এক চাকর এসে অভিযোগ জানাল যে, সব ক-টা বেড়ালই নাকি এরকম উত্তেজিত আচরণ করা শুরু করে দিয়েছে। আমার স্টাডিরুমটা বাড়ির দোতলায়। বাঁকানো খিলানের ছাদ, কালো ওক কাঠের কড়িবরগা, বড় বড় পুরোনো আমলের গথিক জানলা— যা দিয়ে বাইরে তাকালে চুনাপাথরের টিলা আর পরিত্যক্ত উপত্যকাটিকে স্পষ্ট দেখা যায়

— সব মিলিয়ে ঘরটির মধ্যে এক প্রাচীন আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। এই ঘরে ঢুকে চাকরটি যতক্ষণ আমাকে মার্জারকুলের গত রাতের ছটফটানির কাহিনির বিবরণ দিচ্ছিল, আমি খেয়াল করলাম— কালো মানিক কাঠের কালো প্যানেলগুলোর কাছে গুটিশুটি মেরে বসে কী শুঁকছে, আর মাঝে মাঝে সেগুলোকে আঁচড়ে চলেছে। অট্টালিকার প্রাচীন পাথরের দেওয়ালের ওপর আস্তরণ হিসাবে জায়গায় জায়গায় কাঠের প্যানেলিং ব্যবহার করা হয়েছে — কিন্তু কালো মানিকের তার ওপর এত আক্রোশ কেন? আমি চাকরটাকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, পুরোনো পাথরের স্তরে কিছু অদ্ভুত গন্ধ থাকে, কাঠের স্তর ভেদ করে যা হয়তো আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু কোনও কারণে তা মার্জারকুলের সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছে। আমার এই ব্যাখ্যা মনে হল, আমার ভৃত্যের ঠিক মনঃপূত হল না। সে চটপট বলে উঠল, “আচ্ছা কত্তা, ইঁদুর বা ছুঁচোও তো থাকতে পারে?” আমি হেসে ওকে জানালাম যে, গত তিনশো বছরে এই অট্টালিকাতে কোনও ইঁদুরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বাইরে মেঠো ইঁদুর হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু কোনও পথভ্রষ্ট মেঠো ইঁদুরও এখানে কোনও দিন ঢুকেছে বলে জানা যায়নি। যা-ই হোক, সে দিন দুপুরে আমি ক্যাপটেন নরিসকে ডাকলাম। তিনি সোজা বলে দিলেন যে, মেঠো ইঁদুরের পক্ষে এত কম সময়ের মধ্যে সুবিশাল অট্টালিকাতে ঢুকে এর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব।

সে দিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে বিশ্রামের আয়োজন করছিলাম। অট্টালিকার পশ্চিম মিনারের একটা ঘরে আমি থাকতাম। আমার স্টাডি থেকে শোয়ার ঘরে পৌঁছোনোর জন্য একটা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোট গ্যালারির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সিঁড়িটা যদিও একই রকম আছে, তবে গ্যালারিটা পুরোপুরি সংস্কার করা হয়েছিল। আমার শোয়ার ঘরটি আকৃতিতে গোলাকার, এবং দেওয়ালে বেশ কারুকার্যময় পর্দা ঝোলানো। ঘরটা সাজাব বলে আমি নিজে পর্দাগুলো লন্ডন থেকে বেছে বেছে কিনে এনেছিলাম। এই ঘরের দেওয়ালগুলোতে সেই জন্য কাঠের প্যানেলিং রাখা হয়নি। যা-ই হোক, কালো মানিককে সঙ্গে করে শোবার ঘরে ঢুকে আমি বিরাট দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম, আর দেওয়ালে মোমবাতিদানের মতো লাগানো ইলেকট্রিক আলো বন্ধ করে সুবিশাল পালঙ্কের নরম গদিতে ডুবে গেলাম। বাধ্য ভৃত্যের মতো কালো মানিক আমার পায়ের কাছটিতেই শুয়ে থাকল। তবে জানলার দিকের পর্দাটা পুরোপুরি টানলাম

না। পর্দার ফাঁক দিয়ে রাতের কালো আকাশের এক অদ্ভুত ফ্যাকাশে আলো এসে আমাকে যেন আরও তন্দ্রাবিষ্ট করে তুলল। জানলার ওপরে চকমকি পাথরের কালো সিল্যুয়েট সেই মায়াবী আলোয় একতাল জমাট অন্ধকারের মতো থম মেরে রইল।

বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরেই বুঝতে পারলাম, বেড়ালটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে। চোখ খুলে সেই আধো অন্ধকারে দেখতে পেলাম, কালো মানিক তার সামনের দুটি পা আমার গোড়ালির ওপর রেখে আর পেছনের পা দুটো টানটান করে ঘরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের দিকে সোজাভাবে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও আমার চোখ কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু তবুও স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলাম। কেন জানি না মনে হল, কালো মানিকের উত্তেজনা অমূলক নয়। পর্দাটা কি একটু নড়ল? হতে পারে। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, পর্দার পেছনে একদল প্রাণীর চলে-ফিরে বেড়ানোর আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম। ইঁদুর না ছুঁচো? কালো মানিক ততক্ষণে খাট থেকে এক লাফে নেমে পড়েছে, এবং সেই বিশেষ দিকের ঝোলানো পর্দার ওপর আক্রমণ শানিয়েছে। ওর শরীরের ভারে এবং দাঁতের টানে সাজানো পর্দা ছিঁড়ে নেমে এল মাটিতে, আর উন্মুক্ত হয়ে গেল পর্দার পেছনের স্যাঁতসেঁতে প্রাচীন পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে এদিক-ওদিক সংস্কারের ছাপ— পাথরের দেওয়ালে কোনও ফাঁকফোকরও নেই। তাই ইঁদুর বা ছুঁচো এসে ঘরে ঢুকে পড়বে, সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু কালো মানিকের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চরম আক্রোশে কাঠের মেঝে আর পাথরের দেওয়ালের সংযোগস্থলে পা দিয়ে আঁচড়াতে থাকল, যেন ওখানে সে কিছুর সন্ধান পেয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ এরকম চলার পর, হতোদ্যম হয়ে ফিরে এসে আবার আমার পায়ের কাছে চুপটি করে শুয়ে পড়ল। আমি একই রকমভাবে শুয়ে শুয়ে সব দেখলাম— একচুলও নড়িনি। আমার বেড়ালটা ঘুমিয়ে পড়লেও সে রাত্রে আমার আর ঘুম এল না।

সকালে উঠে সব ক-টা চাকরকে জড়ো করে জেরা করতে লাগলাম— তারা গত রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কি না। বাকি সবাই মাথা নেড়ে সরে পড়লেও, রাঁধুনি জানাল, তার ঘরের বেড়ালটা কিছু অদ্ভুত আচরণ করেছে কাল রাত্রে। বেড়ালটা ঘরের জানলায় কাঠের গোবরাটটার ওপর শুয়ে ছিল চুপচাপ। কিন্তু মধ্যরাতের কোনও একসময়ে তার গরগর আওয়াজে রাঁধুনির ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখতে পায়, বেড়ালটা খোলা দরজা দিয়ে তিরবেগে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

দুপুরের দিকে আবার নরিসকে ডেকে পাঠালাম। ঘটনাটা শুনে নরিস এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়ল। খুব আহামরি কিছু না হলেও ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিশেষত্ব যে আছে, সেটা নরিস স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু ইঁদুরের উপস্থিতির ব্যাপারটা আমাদের দু-জনকেই বেশ ভাবিয়ে তুলল। ঠিক করা হল, ইঁদুর ধরার কল পাতা হবে বিশেষ কিছু জায়গায়। চাকরবাকরগুলোকে কল কেনার নির্দেশ দিয়ে দুপুরের দিকে একটু বেরোলাম।

সে রাতে বেশ ক্লান্ত থাকায় একটু তাড়াতাড়িই শুতে গেলাম। কিন্তু বিধি বাম। এমন মারাত্মক দুঃস্বপ্ন দেখলাম যে, আমার শরীর কেমন করতে লাগল। স্বপ্নে দেখলাম, আমি অনেক উঁচু থেকে নীচে এক আবছায়া গুহামুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। তবে গুহামুখটা বেশি গভীর না, আবর্জনায় ভরে উঠে তার গভীরতা খুব বড়জোর পায়ের গোড়ালি ডোবাতে পারে। সেই গুহামুখের সামনে দিয়ে এক অপদেবতার মতো অবয়ব কিছু থলথলে ফাঙ্গাসের মতো জিনিসকে চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণীগুলো এতটাই বিশ্রী এবং ভয়ংকর যে, দেখেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। এবার সেই অবয়ব হঠাৎ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নেড়ে কিছু একটা ইশারা করতেই, কোথা থেকে স্রোতের মতো একপাল কালো কুচকুচে ইঁদুর বেরিয়ে এসে ওই সমস্ত জীব, মায় মানুষটাকে অবধি খেয়ে শেষ করে ফেলল।

এরকম একটা আতঙ্কের স্বপ্নদর্শনে ছেদ পড়ল, কারণ গত রাতের মতো কালো মানিকের উত্তেজিত ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে বেশ ভয় পেয়েছে। তার সামনের পা দুটো আমার গোড়ালির ফাঁকে ঢুকিয়ে সে কান খাড়া করে বসে আছে দেওয়ালের দিকে চেয়ে। তবে আজ আর কষ্ট করে শব্দের উৎসের খোঁজ করতে হল না। ঘরের প্রতিটি দেওয়াল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এক খলবলে শব্দে। লোলুপ বিশালকায় ইঁদুরের দলের হুড়মুড়িয়ে চলার আওয়াজে পূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার ঘর। জানলা দিয়ে ঘরে আজ এক ফোঁটা আলোও ঢোকেনি যে, কালকের ছিঁড়ে-যাওয়া পর্দাটার দিকে তাকাতে পারব। আমি লাফিয়ে উঠে ঘরের ইলেকট্রিক আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম।

ঘর আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম, নতুন পর্দাটা বিপজ্জনকভাবে নড়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট দিকে। যেন ঢেউ খেলছে তার ওপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল— সঙ্গে সেই খলবলে শব্দটাও থেমে গেল নিমেষে। খাট থেকে নেমে আমি ফায়ারপ্লেসের শিকটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে পর্দার ওই অংশটাতে একটু খোঁচালাম, তারপর

পর্দাটাকে একটু সরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম ওর পেছনে আছেটা কী। পাথরের নিরেট দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। বেড়ালটাও এখন অনেক স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছিল। মনে হয়, অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতির ভীতিটা সে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এতক্ষণে। এবার আমি ইঁদুর ধরার কলগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলাম, যেগুলো আমার ঘরে রাখা ছিল। প্রত্যেকটি কলের মুখ বন্ধ— তার মানে কিছু তো এদের মধ্যে দিয়ে গেছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তা অক্ষতভাবে কলের মারণ-ফাঁস উপেক্ষা করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

আর ঘুমোনোর প্রশ্ন আসে না। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমি গ্যালারি অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমার স্টাডিতে বসা স্থির করলাম। কালো মানিকও আমার পায়ে পায়ে চলল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছোনোর মুখেই সে আমাকে অতিক্রম করে একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কয়েক ধাপ নামার পরেই বুঝলাম, নীচের বড় ঘরে একটা কিছুর আওয়াজ হচ্ছে— এমন একটা শব্দ, যা চিনতে ভুল হওয়ার নয়। দেওয়ালে লাগানো ওক কাঠের প্যানেলগুলো যেন চলমান হয়ে উঠেছে মূষিকদলের দ্রুত এবং খড়খড়ে চলাফেরার আওয়াজে। কালো মানিক ফোঁস ফোঁস করতে করতে এক দিশাহীন শিকারির মতো সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরে ঢুকেই আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম— কিন্তু আশ্চর্য, এবারে আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ কিন্তু আগের বারের মতো থেমে গেল না। মূষিকদের প্রচণ্ড গতিতে চলাফেরা চলতেই থাকল। তবে অদৃশ্য এই ধাবমান মূষিকদল যে একটি নির্দিষ্ট দিকেই চলেছে, তার আন্দাজ পাওয়া গেল। বুঝলাম, এই সংখ্যায় অগণিত মূষিকশ্রেণি কোনও এক সুউচ্চ স্থান থেকে নীচের কোনও এক অকল্পনীয় গভীরতায় এক অজানার আকর্ষণে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে।

আচমকা হলঘরে পদশব্দ শোনা গেল, আর পরমুহূর্তেই দেখলাম, দু-জন ভৃত্য স্টাডির দরজা ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের মতে, বাড়িতে এমন কিছু একটা ঘটছে, যার ফলে বাড়ির সমস্ত বেড়াল উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি শুরু দিয়েছে। আর প্রত্যেকটি বেড়াল সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে বাড়ির একদম নীচে অবস্থিত চোরাকুঠুরির দরজার সামনে গিয়ে বসে চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইঁদুরের খড়খড়ানি তারা শুনেছে কি না। কিন্তু তারা মাথা নেড়ে না বলল। আমি যখন ঘরের দেওয়ালের ভেতর ধাবমান মূষিকদলের শব্দ তাদের শোনাতে গেলাম, বুঝতে পারলাম,

সেই আওয়াজ অনেকক্ষণ আগেই থেমে গিয়েছে। অগত্যা দুই ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই চোরাকুঠুরি অভিমুখে রওনা দিলাম। যতক্ষণে সেখানে পৌঁছোলাম, মার্জারকুল সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে। পরে অবশ্য এই কুঠুরির তত্ত্বতল্লাশ আমি করেছিলাম, কিন্তু এখন আপাতত এর আশপাশে ঘুরেই আমি ক্ষান্ত দিলাম। এই ঘরের চারপাশেও বেশ কিছু ইঁদুর ধরার কল পাতা ছিল দেখতে পেলাম, আর সেগুলোও যথারীতি বন্ধ। কলে আটকা-পড়া কোনও জীবের চিহ্নমাত্র নেই। তবে ইঁদুরদের উপস্থিতিটা যে আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি, সেটা জেনে একটু নিশ্চিন্ত লাগছিল। নিজের স্টাডিতে ফিরে আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। এই বাড়ি এবং এই পূর্বতন বাসিন্দাদের ব্যাপারে যা কিছু পড়েছিলাম, যতরকম গল্প, লোককথা জেনেছিলাম— এক-এক করে মনে করার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম।

ভোরের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল। দুপুরে জেগে উঠে ক্যাপটেনকে ফোন লাগালাম। তিনি আসার পর দু-জনে মিলে সেই চোরাকুঠুরির ভেতরে ঢুকে খোঁজ চালালাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া গেল না। তবে রোমানদের আমলে তৈরি এই কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল। ঝুঁকে-পড়া প্রতিটি খিলান, প্রতিটি থাম যেন সিজারের সময়কার বিশুদ্ধ এবং সর্বোত্তম রোমান স্থাপত্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে অটলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। দেওয়ালে বেশ কিছু খোদিত লিপি প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে আগ্রহের বিষয়, যেমন— P.GETAE. PROP... TEMP... DONA... এবং L. PRAEC... VS... PONTIFI... ATYS...[72]

অ্যাটিয়াসের নামটা পড়ে শিউরে উঠলাম। ল্যাটিন কবি ক্যাথুলুসের[73] লেখা আমার পড়া ছিল, আর সেই সুবাদে আমি প্রাচ্য দেবদেবীদের বীভৎস পূজাপদ্ধতি একটু হলেও জানতাম। দেবী সিবেলের আরাধনার সঙ্গে এঁর বেশ কিছু মিল লক্ষণীয়। আমি এবং ক্যাপটেন নরিস মিলে লণ্ঠনের আলোয় খোদিত লিপি এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। অধিকাংশই প্রায় মুছে গেছে, কিন্তু ঘরের মাঝে পাথরের মসৃণ বেদি দেখে আন্দাজ করতে কষ্ট হল না, এটা নরবলি বা ওই জাতীয় কিছু দেব-উৎসর্গের জন্য ব্যবহার করা হত।

দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করার সময় কিছু খোদাই-করা ছবি দেখেছিলাম। তাতে দৃশ্যমান সূর্যের বিচ্ছুরিত রশ্মি[74] নিশ্চিতভাবেই রোমান ভাস্কর্য নয়। মনে হয়, রোমান পুরোহিতরা

এসব জায়গা থেকে কিছু আরও প্রাচীন পূজাপদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন। কিছু কিছু পাথরে বাদামি[75] রঙের দাগ দেখে চমকে উঠলাম। ঘরের মাঝবরাবর পাথরের যে চওড়া বেদিটা রাখা ছিল, তার উপরিতল পরীক্ষা করে মনে হল, এর সঙ্গে আগুনের কিছু সম্পর্ক ছিল, কারণ তার ওপর কালো মোটা দাগ বেশ ঘন হয়ে ফুটে রয়েছে। হয়তো এখানে আগুনে দগ্ধ করে বলিদান দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঠিক করলাম, আমি আর নরিস আজ এখানেই রাত্রিযাপন করব, এই চোরাকুঠুরির মধ্যে বসেই। সোফা-টোফাগুলো নামিয়ে আনা হল। চাকরবাকরদের বলে দিলাম, রাত্রে যা-ই ঘটুক, কেউ যেন কিছু না করে। কালো মানিক আমাদের সঙ্গেই থাকল। ঘরের বিশাল ওক কাঠের দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলাম— যদিও কাঠের মধ্যে এমন কিছু ছিদ্র করা ছিল, যা দিয়ে হাওয়া-বাতাস ঢুকতে পারে অবাধে। না হলে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়াও বিচিত্র নয়। যা-ই হোক, সব কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে আমরা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে সোফাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায়োরির পেটের গভীরে, মাটির বেশ খানিকটা নীচে এই কুঠুরিটার অবস্থান। সেক্ষেত্রে হয়তো খলবলে ইঁদুরদের বাসস্থানের জন্য এটা একটা আদর্শ জায়গা হতে পারে, কিন্তু ঠিক কী কারণে ওরা সবাই এদিকেই ধেয়ে আসে, সেটা বলতে আমি অপারগ! বসে পাহারা দেওয়ার অবস্থায় যদিও জেগে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, তবুও ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী এক স্বপ্নালু তন্দ্রাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম মাঝে মাঝেই। পায়ের ওপর দিয়ে বেড়ালের উত্তেজিত চলাফেরা আমার এই আচ্ছন্ন অবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। স্বপ্ন যেটা দেখছিলাম, সেটাও ছেঁড়া-ছেঁড়া, কিন্তু এটাকেও আমার আগের রাতে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নটারই জুড়িদার বলা যেতে পারে। সেই আলোছায়ায় মেশা গুহামুখ, সেই ঘৃণ্য, থকথকে ছত্রাকময় জীবগুলির নোংরার মধ্যে গড়াগড়ি দেওয়া। আমি যতই তাদের দেখতে থাকলাম, জীবগুলো যেন ততই কাছে আসতে থাকল— আর... আর... তাদের অবয়ব স্পষ্টতর হতে থাকল আমার কাছে। এতটাই, যে তাদের প্রতিটা অঙ্গ আমি আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলাম। খুব নিকটে একটা মূর্তিমান আতঙ্ককে দেখে এতটাই ভয়ে পেয়ে গেলাম, যে ঘুমের মধ্যেই প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলাম। কালো মানিক চমকে উঠে দাঁড়াল আর ক্যাপটেন নরিস, যে কিনা এক ফোঁটাও ঘুমোয়নি, হো হো করে হেসে উঠল। কী ভয়ানক দৃশ্য যে আমি স্বপ্নে দেখেছি, সেটা জানলে হয়তো নরিস এরকম আচরণ করতে

পারত না— বা হয়তো এর থেকেও বেশি হাসত। কিন্তু এরপর বহুক্ষণ আমি আমার মধ্যে ছিলাম না— প্রচণ্ড ভয় মাঝে মাঝে মানুষের স্মৃতিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়। এসব ভাবতে ভাবতেই আবার কেমন যেন চোখ লেগে গিয়েছিল।

ঘটনাটা শুরু হতেই নরিস আমাকে ঠেলে তুলল। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, নরিস আমাকে হালকা হালকা ধাক্কা দিচ্ছে আর শোনাতে চাইছে বেড়ালগুলোর সমস্বরে গরগর আওয়াজ। কান পেতে শুনলাম, ভারী ওক কাঠের দরজার বাইরে বেড়ালদের গজরানি আর দরজার ওপর তাদের নখের আঁচড়। কালো মানিক দরজার বাইরে তাদের বন্ধুদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, পাথরের দেওয়ালগুলোর কাছে উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল বারংবার— আর আমি শুনতে পেলাম দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে খলবল করতে থাকা ইঁদুরদের চলাফেরা করার আওয়াজ, যা গত রাতে আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

আতঙ্ক ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করতে শুরু করল— ব্যাখ্যার অতীত অতিপ্রাকৃত ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। এই উন্মত্ত মূষিকের দল নিশ্চিতভাবেই এই দেওয়ালের ভেতর দিয়েই চলাচল করছে— যেটাকে আমি এত দিন কঠিন চুনাপাথরে তৈরি বলেই জানতাম। সম্ভবত সতেরোশো বছরের মধ্যে এই দেওয়ালের ভেতরে চুঁইয়ে জল ঢুকে সেটাকে এমনভাবে ক্ষইয়ে দিয়েছে, যা দিয়ে পরবর্তীকালে এই ধেড়ে ইঁদুরের দল প্রবেশ করে, এবং বাকি এবড়োখেবড়ো অংশগুলো কেটে মসৃণ করে ভেতর দিয়ে চলাচলের দিব্যি রাস্তা বানিয়ে ফ্যালে। এই ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের মনকে বোঝানো সত্ত্বেও চারপাশের ভৌতিক আবহাওয়া কিন্তু একচুলও হালকা হল না। যদি এই মূষিকের দল সত্যি সত্যি দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করছে, তাহলে নরিস সেটা শুনতে পাচ্ছে না কেন? কেন কেবল আমার হতচ্ছাড়া কানেই ইঁদুর-দৌড়ের এই খড়বড়ে আওয়াজ শ্রুতিগোচর হচ্ছে? কেন নরিস কেবল কালো মানিকের অদ্ভুত আচরণ এবং দরজার বাইরে বেড়ালদের ক্রমাগত গজরানিতে অবাক হয়ে গিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে? কেন সে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না মার্জারকুলের এই নিশাচর উত্তেজনা ও আক্রোশের কারণ?

যতক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে নরিসকে আমার শোনা আওয়াজের কথা এবং বেড়ালদের আচরণের সম্ভাব্য কারণ বোঝাতে চেষ্টা করছি, দেওয়ালের মধ্যে ইঁদুরদের চলাচলের আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়ে অর্থাৎ এই কুঠুরির থেকেও আরও গভীরে, হয়তো-বা পাতালে প্রবেশ করল। মনে হতে লাগল, এই পুরো বাড়িটার ভিতের নীচে অতল গভীরে ঘিনঘিনে ইঁদুরের দল চরম আক্রোশে খলবল করে বেড়াচ্ছে।

নরিসকে যতটা অবিশ্বাসী ভেবেছিলাম, বাস্তবে দেখলাম সে ততটা নয়। আমার ব্যাখ্যা মন দিয়ে শুনে যে যেন কিছুটা চমকেই গেল। আমাকে আঙুল তুলে দেখাল, যে দরজার বাইরে বেড়ালদের তর্জনগর্জন অন্তর্হিত হলেও, কালো মানিকের উত্তেজনা তিলমাত্র কমেনি। সে একইভাবে এখনও আঁচড়ে চলেছে ঘরের মাঝের সেই পাথরের বেদির নীচের অংশটা।

ঠিক এই মুহূর্তে কী এক অজানা আতঙ্কের প্রতি অব্যক্ত ভয়ে আমি অবশ হয়ে গেলাম। যেন কিছু একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে। ক্যাপটেন নরিসের দিকে তাকালাম—আশ্চর্যজনকভাবে ক্যাপটেনের মতো হাট্টাকাট্টা, সাহসী, প্রাণোচ্ছল এবং চটপটে যুবকের মধ্যেও আমার আতঙ্কের অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে পড়েছে। হতে পারে, অট্টালিকাকে জড়িয়ে এইসব গেঁয়ো প্রবাদ এবং ভয়াল কিংবদন্তির প্রভাব হয়তো এত দিনে ফলতে শুরু করেছে তার ওপর। আমরা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কালো মানিক সমানে সেই বেদির তলদেশ আঁচড়ে চলেছে, এবং মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিউ মিউ শব্দ করছে। সাধারণত, যখন সে আমার থেকে সাহায্য চায়, তখনই এরকম আচরণ করে থাকে।

নরিস এবার লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বেদির ঠিক সেই অংশটার দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে কালো মানিক তার থাবা দিয়ে কিছু একটা খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছে। হাঁটু মুড়ে বসে, পাথরের বেদি এবং মেঝের সংযোগস্থলে পড়ে-থাকা কিছু টুকরো ভগ্নাবশেষ সরিয়ে ফেলে, সেখানে আলো ফেলে তার চারপাশ পরীক্ষা করেও নরিস কিছু দেখতে পেল না। আলোটা ঘুরিয়ে সে ফিরেই আসছিল। আচমকা আমি এমন কিছু দেখতে পেলাম, যাতে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। নরিসকে আমি ব্যাপারটা দেখালাম, এবং দু-জনেই সেই অস্পষ্ট কিন্তু অপূর্ব আবিষ্কারের উত্তেজনায় স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। লণ্ঠনটা বেদির যেখানে বসানো ছিল, সেখানে তার শিখাটা যেন মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছিল কীসের এক তাড়নায়। ভালো করে দেখে বোঝা গেল, বেদির কোনও এক ফাঁকফোকর দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে, আর সেই হাওয়ার প্রকোপেই লণ্ঠনের শিখার এই

অস্বাভাবিক আচরণ। হাওয়া বেরোচ্ছে বেদি এবং কুঠুরির মেঝের জোড়ের অংশটা থেকে, যেখানে এতক্ষণ নরিস বসে বসে আবর্জনা সরাচ্ছিল। তার মানে বেদির ঠিক নীচেই কোনও গুপ্ত কুঠুরি আছে, যা থেকে উদ্‌গত বাতাস পাথরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

বাকি রাতটা আমার বড়সড়ো স্টাডির উজ্জ্বল আলোতে বসে আলোচনা করেই কেটে গেল। আমাদের দু-জনের মনেই প্রশ্ন— এবার কী কর্তব্য? আমরা এমন এক গুপ্ত কুঠুরি আবিষ্কার করে ফেলেছি, যা গত তিন শতকে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁজে পায়নি। এই প্রায়োরিতে প্রচুর মানুষ নিছক অ্যাকাডেমিক আগ্রহে এবং প্রত্নসন্ধানে এসেছিলেন বহু দিন ধরে। আমরা যে কুঠুরিতে আজ রাতে ছিলাম, সেটিকে এখানকার গভীরতম স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এরও নীচে কিছু একটা আছে, সেটা জানার পরে আমাদের মতো অ-গবেষক মানুষও যেরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, তাতে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক যে উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাবেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

এই ঘটনার পর দুটি সম্ভাবনা উদয় হল। এক, এই প্রায়োরি ছেড়ে চিরতরে পালিয়ে যাওয়া। এই অট্টালিকাকে জড়িয়ে যেসব গা-ছমছমে কুসংস্কার এবং প্রবাদ আছে, তাতে এরকম একটা গুপ্ত কুঠুরির কথা বলা আছে বটে। আর দুই, সাহসে ভর করে একটা রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া— দেখাই যাক-না আর কত গভীরে যাওয়া যেতে পারে, আর সেখানে কী রহস্যই বা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

সারারাত আলোচনা চালিয়ে, ভোরবেলা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যে লন্ডনে ফিরে গিয়ে কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং কিছু বিজ্ঞানীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যাক। তাতে অন্তত এই ঐতিহাসিক আবিষ্কার স্বীকৃতি পাবে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গুপ্ত কুঠুরির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আমরা দু-জনে সে দিন ওই পাথরের বেদিটাকে সরানোর বহু বিফল প্রচেষ্টা করেছিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওই বেদিটাই হল কোনও অজানা গভীরতায়, বিপুল রহস্যময় এক দুনিয়াতে প্রবেশের একমাত্র পথ।

লন্ডনে গিয়ে আমি আর ক্যাপটেন নরিস আমাদের প্রাপ্ত প্রমাণ, মায় প্রায়োরির ইতিহাসের দলিল, তাকে ঘিরে গল্পকথা, প্রবাদ, কিংবদন্তি— সব কিছুই পাঁচজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানবিদের সামনে উপস্থিত করলাম। এমন পাঁচজন, যাঁদের আমাদের পরিবারের গুপ্তকথা বিশ্বাস করে বলা যায়, এবং এঁরা এসব ব্যাপারে আগ্রহ নিয়ে অনুসন্ধানকাজও চালিয়ে থাকেন।

দেখলাম, এঁরা ব্যাপারটাতে বেশ আগ্রহী। হেসে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা কারও ভেতরেই বিশেষ দেখা গেল না, বরং বেশ সমানুভূতি নিয়েই এঁরা আমাদের কথাগুলো শুনলেন। এঁদের সবার নামোল্লখ প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু তবু বিশেষ করে স্যার উইলিয়াম ব্রিন্টনের নাম না নিলে অবিচার করা হবে। ইনি তত দিনে ট্রোড[76] উপদ্বীপে (তুর্কি দেশের অন্তর্গত) খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে বেশ নাম কিনেছেন। এঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে প্রায়োরিতে গিয়ে খননকার্য চালাতে রাজি হলেন। ব্যবস্থা সম্পূর্ন করে যেদিন সবাই মিলে অ্যানচেস্টারের ট্রেনে চেপে বসলাম। সে দিন মনটা যেন কেমন এক অশুভ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার ওপর শুনলাম, দুনিয়ার অপর প্রান্তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে খুন হয়েছেন[77]। খবরটা আমার চারপাশের আবহাওয়াকে আরও বিষণ্ণ করে তুলে এক অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। কেন জানি মনে হতে লাগল, এ যাত্রা মোটেই সুখকর হবে না।

অগাস্টের সাত তারিখ নাগাদ আমরা এক্সাম প্রায়োরিতে পৌঁছোলাম। ভৃত্যেরা জানাল, এ ক-দিনে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। কালো মানিক সমেত আমার বাকি পোষ্য মার্জারশ্রেণি বিলকুল ঠান্ডা হয়ে ছিল। ইঁদুর-ধরা কলের একটা স্প্রিংও বাঁকা হয়নি। ঠিক হল, পরের দিন থেকেই অনুসন্ধান শুরু হবে। আমার অতিথিদের বসবাসের জন্য সব থেকে ভালো ঘরগুলোর ব্যবস্থা করা হল। সব মিটিয়ে, আমার ক্লান্ত শরীরটাকে কোনওমতে টেনে বিছানায় ফেললাম। কালো মানিক অভ্যাসমতো পায়ের কাছটিতে শুয়ে রইল।

শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরমুহূর্তেই সেই বীভৎস দুঃস্বপ্নের করাল ছায়া আমায় নিমেষে গ্রাস করল। স্বপ্নে রোমানদের এক ভোজসভার[78] দৃশ্য দেখতে পেলাম— খাবারের প্রাচুর্যে ভরপুর সেই ভোজসভা। কিন্তু প্রতিটি প্লেট ঢাকা দেওয়া— যেন কী এক অজানা আতঙ্ক সেইসব ঢাকা-দেওয়া প্লেটের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তারপর আবার সেই জঘন্য স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেই শুয়োরের পাল ঘষটাতে ঘষটাতে আলো-আঁধারিতে মোড়া আবর্জনাময় গুহার অন্ধকারে প্রবেশ করল। এসব দেখে যখন আমি চরম অস্বস্তি নিয়ে জেগে উঠলাম, দেখি চারদিকে ফটফটে দিনের আলো। আশপাশে পরিবেশের স্বাভাবিক শব্দ— কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ইঁদুর বা বেড়াল কেউই উৎপাত করছে না। কালো মানিক পায়ের কাছে ঘুমিয়ে কাদা।

ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। চতুর্দিকে নিবিড় নিস্তব্ধতা। আমার এই অনুসন্ধানদলের এক বিজ্ঞানী— তিনি আবার কিছুটা অধ্যাত্মবাদীও বটে— আমাকে বলেছিলেন, এই বাড়িতে নাকি কিছু মহা-অশুভশক্তি রয়েছে। এই শক্তির প্রভাবেই নাকি আমি এসব উলটোপালটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি।

সবাইকে ঘুম থেকে তুলে প্রাতরাশ খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তারপর আমাদের সাতজনের দলটা হাতে বড় বড় টর্চলাইট এবং খোঁড়াখুঁড়ির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমেত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে চললাম। সেই রোমান স্থাপত্যে ঠাসা চোরাকুঠুরিতে পৌঁছে কাঠের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া গেল। কালো মানিক আমাদের সঙ্গেই ছিল। অনুসন্ধানকারীরা তাকে না নিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাননি, তা ছাড়া তার আচরণও আপাতত স্বাভাবিক। কুঠুরির দেওয়ালে রোমানদের শিলালিপি এবং আরাধনা বেদির নানা বৈচিত্র্যময় নকশা খুব সামান্য সময়ের জন্য দেখেই তাঁরা ঘরের কেন্দ্রস্থলে থাকা পাথরের মূল বেদির দিকে অগ্রসর হলেন। দলের দু-একজন প্রত্নবিজ্ঞানী এই অট্টালিকাতে আগে এসে থাকার সুবাদে রোমান শিলালিপির বিষয়ে তাঁরা আগেই পরিচিত ছিলেন। তাই সেসব বাদ দিয়ে সবার আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠল ঘরের মাঝের সেই রহস্যময় পাথরের খণ্ডটি।

অনেক কায়দাকানুনের পর, স্যার ব্র্যান্টন বেদির পাথরটাকে পেছনে হেলাতে সক্ষম হলেন। যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসা সত্ত্বেও, সেই রন্ধ্রপথের গহিন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে আমাদের শ্বাসরোধ হয়ে আসার উপক্রম হল। চৌকো করে কাটা সেই সুড়ঙ্গপথের মুখের কাছে পাথরের সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নেমে গেছে অজানা কোন অন্ধকারে। আর সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে একটা বিশাল স্তূপের মতো বীভৎস নরকঙ্কাল বা মানুষের মতো কিছুর হাড়গোড়ের রাশি ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে যেগুলোকে মানুষের বলে চিহ্নিত করা গেল, সেগুলো বাদে বাকি বিভিন্ন রকমের খুলির উপস্থিতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকালের মানুষের মাথার খুলিও যেমন আছে, তেমনি আছে বামন গোত্রের মানুষের করোটি[79]। তা ছাড়া ইঁদুরে খাওয়া মনুষ্যশরীরের কঙ্কালময় ভুক্তাবশেষও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চারপাশে। সিঁড়ির ধাপগুলো দেখেই বোঝা গেল, কেউ পাথর কেটে মসৃণ করে সেগুলিকে তৈরি করেছে, আর সেই ধাপের পাশে দেওয়ালের খাঁজ দিয়ে বয়ে আসছে ঠান্ডা বাতাসের স্রোত।

আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলাম এই বাতাস বহুকালের সুড়ঙ্গ খুলে বেরিয়ে-আসা বিষাক্ত বা কটু বাতাস নয়। এ বাতাস তাজা, ফুরফুরে। আমরা বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করে দুরুদুরু বুকে সেই সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে থাকলাম। স্যার উইলিয়াম সুড়ঙ্গের পাশের দেওয়ালের গায়ে কাটা খাঁজগুলো পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর তখনই তিনি হাড়-হিম-করা আবিষ্কারটি করলেন। ওঁর অস্ফুট স্বর স্বগতোক্তির মতো ভেসে এল— "ছেনি বা পাথর কাটার যন্ত্রের ঘা দেখে মনে হচ্ছে, এই সুড়ঙ্গ ওপর থেকে নীচের দিকে কাটা হয়নি। বরং কেউ বা কারা এটা নীচ থেকে কাটতে কাটতে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে এসেছে।"

ছড়িয়ে-থাকা হাড়গোড় এবং করোটির স্তূপ সরিয়ে কিছুটা নামার পর দূর থেকে একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পাওয়া গেল। টিমটিমে কোনও মায়াবী আলোর বিচ্ছুরণ নয়— এ রীতিমতো সূর্যের আলো যা কেবল প্রায়োরির পশ্চিমের উপত্যকার দিকে মুখ করে থাকা উঁচু বাঁধের কোনও অজ্ঞাত ফাটল দিয়েই আসা সম্ভব। কিন্তু সারা বাড়ি সংস্কার করার সময়ও এই ফাটলটা চোখে পড়ল না, এটা বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার! তবে ওই পশ্চিম উপত্যকাতে শুধু মানুষ থাকে না তা-ই নয়, উঁচু বাঁধটাও এমন লম্বা এবং খাড়াই যে, বেলুনে চড়েই কেবলমাত্র ওর ওপর উঠে পরীক্ষা করা সম্ভব।

আর কিছুটা এগিয়েই এমন দৃশ্য দেখতে পেলাম যে, আতঙ্কে আমাদের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের দলের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানী থ্রনটন সেদিকে তাকিয়েই জ্ঞান হারিয়ে তাঁর ঠিক পেছনের লোকটির কোলের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। নরিসের গোলগাল মুখও ফ্যাকাশে হয়ে চুপসে গেল, আর সে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল। হয়তো আমিও সেরকমই কিছু একটা শব্দ করে চোখ চাপা দিয়েছিলাম। আমার পেছনে থাকা দলের সদস্যটির গলা দিয়ে বেরিয়ে এল বহুশ্রুত সেই শব্দবন্ধটি— "হে ভগবান!" সাত সাতটা আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাওয়া পুরুষের মধ্যে কেবল স্যার উইলিয়াম ব্রিন্টন বুক চিতিয়ে খাড়া রইলেন। তিনি যেহেতু পুরো দলের নেতা, তাই তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ শোভা দেয় না। আর তা ছাড়া, দলের পুরোভাগে থাকার জন্য তিনি হয়তো আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর আগেই দৃশ্যটি দেখেছিলেন, তাই তাঁর দ্বিতীয়বারের প্রতিক্রিয়া এতটা ভয়াবহ হয়নি।

আমাদের সামনে আলো–আঁধারিতে ঘেরা এক বিশাল গুহামুখ। অকল্পনীয় উঁচু তার প্রাকার। কতটা গভীর যে তার বিস্তৃতি, চোখে দেখে তার কোনও আন্দাজও পাওয়া যায়

না। ভূগর্ভস্থ এই দুনিয়া যেন রহস্যের খাসমহল, ভয়ংকরের অভয়ারণ্য! এদিক-ওদিক নানা স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছে। একঝলক তাকিয়ে দেখলাম, প্রাচীন সমাধিস্তূপের সারি— এক অদ্ভুত বিন্যাসে সাজানো। কবরের উপরে বসানো মাটির স্তূপ[80], রোমানদের গম্বুজাকার স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, স্যাক্সন স্থাপত্যের ছড়িয়ে-থাকা টুকরো, কাঠের তৈরি প্রাচীন ও বিশালাকার ইংরেজ স্থাপত্য— কিন্তু এসব ছাপিয়ে এক হাড়-হিম-করা পৈশাচিক দৃশ্য মেঝের ওপরেই ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার ফুটখানেক দূরেই বীভৎসভাবে জট-পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে মানুষের হাড়। শয়ে শয়ে— স্তূপের মতো। মানুষ এবং মনুষ্যেতর কোনও দু-পেয়ে জন্তুর, যাদের হাড় আমরা সুড়ঙ্গের মুখেও দেখে এসেছি। সমুদ্রের সাদা ফেনার মতো সামনে পড়ে রয়েছে সেই সফেদ চকচকে হাড়ের সারি। কঙ্কালের সারি দেখে আন্দাজ করা কঠিন নয়, এদের কেউ কোনও মাংসাশী দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, কেউ-বা আরও কোনও ভয়ংকরের করাল গ্রাসে প্রাণ দিয়েছে।

ড. ট্রাস্ক, যিনি আমাদের দলের মধ্যে নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন— ঝুঁকে পড়ে কিছু করোটি তুলে নিলেন ভালোভাবে নিরীক্ষণের জন্য। করোটিগুলির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তাঁকে হতবাক করে দিল। এ যে পিল্টডাউন মানুষের[81] (বানর থেকে মানুষে অভিযোজনের মিসিং লিংক এই পিল্টডাউন ম্যান) চেয়েও পুরাতন করোটি, কিন্তু হাড়ের সমুদ্রের মধ্যে অধিকাংশই মানবকঙ্কাল। অনেক কঙ্কালের বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা গেল, তারা কিছুটা উন্নত শ্রেণির মানুষ। তা ছাড়া অতি উন্নত শ্রেণির মানুষের কিছু কঙ্কালও খুঁজে পাওয়া গেল। এদের অধিকাংশ হাড়ই চিবোনো, ছিবড়ে করে ফেলা। হয় কোনও ছোট প্রাণীর দ্বারা, আর না হলে মানুষের মতো দেখতে এমন কোনও মনুষ্যেতর প্রাণীর দ্বারা। অনেক ইঁদুরের হাড়গোড়ও এদের মধ্যে মিশে রয়েছে দেখা গেল। হয়তো এরা সেই প্রাণঘাতী মূষিকবাহিনীর হতভাগ্য সদস্যরা, যাদের মৃত্যু এ প্রাচীন পৈশাচিক মহাকাব্যের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে।

এইসব দৃশ্য দেখার পর মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভাষায় বা অনুভূতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কী অবিশ্বাস্যরকম জান্তব, পৈশাচিক, ঘৃণ্য, বিকৃত বর্বরতার চূড়ান্ত রূপ দেখেছিলাম আমরা সাতজন সেই আলো-আঁধারি ভূগর্ভস্থ গুহার সামনে। প্রতিটা মুহূর্তেই কিছু-না-কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছিল— আর সেদিকে তাকিয়ে

মনে মনে সাজাতে চেষ্টা করছিলাম, কয়েকশো বছর আগে, বা হাজার বছর পূর্বে— না না, দু-হাজার বছর, তা-ও হয়তো নয়— দশ হাজার বছর আগে এখানে ঠিক কী ঘটেছিল। এটা যেন নরকের গর্ভগৃহ, যা মৃত্যুর গন্ধে ম-ম করছে।

এসব কিছু মাঝে থ্রনটনের জ্ঞান এসেছিল বটে, কিন্তু ড. ট্রাস্ক যখন তাঁকে শোনালেন যে, স্তূপের কিছু কঙ্কালের নমুনা হাজার-দু-হাজার বছর পুরোনো চতুষ্পদের নমুনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, ভয়ে তাঁর আবার দাঁতকপাটি লাগল।

স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষগুলো পরীক্ষা করে আমাদের আতঙ্ক যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। বুঝলাম, চতুষ্পদ জীবগুলির মধ্যে দ্বিপদ প্রাণীরাও পাথরের বড় বড় ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত। জেগে ওঠার পর হয় তারা ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করত বা মূষিক-আতঙ্কে মারা পড়ত। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, এই জায়গায় চতুষ্পদ প্রাণীদের একটা পুরো পাল ছিল— তাদের খাওয়ানোর জন্য প্রচুর শাকসবজি রাখা থাকত পাথরের একটা বিশাল কোটরে। সেইসব জাবনার অবশিষ্টাংশ এখনও সেখানে পাওয়া গেল। সেই পাথরের তৈরি বিশাল পাত্রটিরই বয়স আন্দাজে হিসেব কষে দেখা গেল রোমান সাম্রাজ্যের থেকেও বেশি! এখন বুঝলাম, আমাদের পূর্বপুরুষরা বাড়ির সামনে বিরাট শাকসবজির বাগান কাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাজিয়েছিলেন।

রোমান স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্যার উইলিয়াম। তিনি টর্চ হাতে দেওয়ালে খোদাই-করা লিপি থেকে পাঠ করলেন এমন এক গুপ্তবিদ্যার পদ্ধতি, যা আমি আগে কোনও দিন শুনিনি। খ্রিস্টপূর্বোক্ত যুগের কিছু ধর্মবিশ্বাস এবং খাদ্যভ্যাসের বিবরণ পড়ে শোনালেন তিনি, যার সঙ্গে পরবর্তীকালে দেবী সিবেলের পুরোহিতরা নিজেদের কিছু উপাদানও মিশিয়ে দেন। ক্যাপটেন নরিস, যে একদা যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে বীরের মতো চলাফেরা করেছে, ইংরেজ স্থাপত্যের অংশটি দেখে এসে ভয়ে আর বিস্ময়ে জবুথবু হয়ে বসে পড়েছিল। ঘরের মতো অংশটির মধ্যে যুগপৎ কসাইখানা এবং রান্নাঘর দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল সে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা প্রাচীন ইংরেজ নিদর্শন ছাড়াও দেওয়ালে খোদাই-করা প্রচুর শিল্পরীতি তার কাছে বেশ পরিচিত লেগিয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম, এ সব কিছুর বয়সই ১৬১০ সালের কাছাকাছি। ওখানে ঢোকার প্রবৃত্তি হল না আমার— কারণ আমি জানতাম, ওই বাড়ির শয়তানি কার্যকলাপ আমার প্রপিতামহ ওয়াল্টার ডেলাপোরের ছুরিকাঘাতে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমি বরং স্যাক্সন স্থাপত্যের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অট্টালিকার ওক কাঠের দরজা ভেঙে খুলে গেছে। ভেতরে ঢুকেই দেখলাম খান দশেক অন্ধকার কুঠুরি, ঠিক জেলখানার মতো। সামনের লোহার শিকগুলোতে মরচে পড়ে গেছে। তিনটে কারাগারে একটা করে কঙ্কাল শায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদের মধ্যে একজনের হাড়ের আঙুলে একটা আংটি দেখলাম, যার ওপরে খোদিত মোহরটি আমাদের বংশে এখনও ব্যবহৃত হয় নানা সরকারি কাজে। স্যার উইলিয়াম, রোমান প্রার্থনাকক্ষের নীচের অংশে এরকমই আরও একটা কারাগার আবিষ্কার করলেন। সেগুলো যদিও আরও প্রাচীন— তবে সবই খালি। ড. ট্রাস্ক একটা প্রাগৈতিহাসিক সমাধিস্তূপ ভেঙে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেখান থেকে পাওয়া খুলিটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, গোরিলার থেকে সামান্য উন্নতমানের মনুষ্যেতর জীবের মাথার খুলি সেটি— তাতে আবার অদ্ভুত সব প্রাচীন চিত্রলিপি খোদাই করা আছে।

এত ঘটনা এবং নিরন্তর নব নব আবিষ্কারে মধ্যে ডুবে থাকলেও আমি আড়চোখে কালো মানিকের দিকে নজর রেখেছিলাম। এত কিছুর মধ্যেও আমার বেড়াল কিন্তু নিরুত্তাপ থেকেছে। মাঝে একবার একছুটে উঠে গিয়েছিল হাড়ের স্তূপের একদম চূড়ায়, সেখানেই বসেছিল কিছুক্ষণ। ওপর থেকে নীচে তাকিয়ে তার হলুদ চোখের চাহনি দিয়ে হয়তো-বা বুঝতে চাইছিল এই জায়গার রহস্য।

এতরকম ভয়ানক সব অভিজ্ঞতালাভের পর, আমরা গুহার একটু ভেতরে ঢুকতে গেলাম— যেখানে বাঁধের ফাটল দিয়ে আসা কোনও আলোর রশ্মি এখনও ঢুকতে পারেনি। সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম আমি। এ-ও সম্ভব! আমার দুঃস্বপ্নে বারবার যে জায়গাটা আমাকে তাড়া করে এসেছে, আমি ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমাকে কি তাহলে এত দিন এই ভয়ানক রহস্যময় জায়গা হাতছানি দিয়ে এসেছে? আলোর সীমানা অতিক্রম করে আমরা ক্রমশ নিবিড় অন্ধকারের রাজ্যে ঢুকে চললাম। এর ভেতর আরও কি রহস্য তার মায়াজাল বিস্তার করে আছে, সে বিষয়ে জানার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠেছিল। যদিও জানতাম, একসঙ্গে এত কিছু জেনে ফেলা আমাদের পক্ষে মোটেই উচিত কাজ হচ্ছে না।

কিছু রহস্যকে হয়তো রহস্য রেখে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

বেশি দূর যেতে হল না। আমাদের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল গুহার গভীরে ছোটবড় অসংখ্য গর্তের মধ্যে। দেখে বোঝা গেল, এখানেই এই মাংসাশী মূষিকশ্রেণি তাদের

শিকারকে ছিঁড়ে খেত। খাদ্যের অভাব— কেবল খাদ্যের বিপুল অভাবেই তারা তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমে শেষ করেছিল পোষা চতুষ্পদের পালকে, এবং তারপর তাদের বিশ্বগ্রাসী ও রক্তলোলুপ পৈশাচিক খিদে নিয়ে তারা প্রায়োরি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল একদিন রাত্রে।

হে ঈশ্বর। এ কী দৃশ্য! প্রতিটি গর্ত কেবল শুকনো মাংস এবং হাড়ের স্তূপে পরিপূর্ণ। হাড়ের টুকরো এবং খুলির অংশগুলো অবধি ঠুকরে-খাওয়া। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পৈশাচিক শয়তানের দল তাদের বিকৃত ক্ষুধা মিটিয়ে এসেছে নানা ধরনের প্রাণীদের শিকার বানিয়ে। তাদের হাড়গোড়ে পূর্ণ করেছে তাদের অন্ধকার কোটর। এক-একটা যে কত গভীর তা টর্চের আলো ফেলেও পরিষ্কার অনুমান করা সম্ভব নয়। কত শতাব্দী ধরেই না জানি এই হতভাগ্য মূষিকের দল কৃমিকীটের মতো উঠে আসছে এই কুম্ভীপাক নরকের নিঃসীম অন্ধকার থেকে।

হঠাৎ আমার পা পড়ল একটা হাঁ করে থাকা নরকঙ্কালের ওপর। চকিতে কিছুটা পিছলে গিয়েছিলাম। চারপাশে চোখ পড়তেই ভয়ে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। আমি হয়তো দেখতে গিয়ে একটু বেশিই মনোযোগী হয়ে থাকব, তাই খেয়াল করিনি যে, বাকিরা কখন আমার পাশ থেকে চলে গেছে। টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলাম কেবল একটু দূরে ক্যাপটেন নরিস দাঁড়িয়ে। ওঁকে চিৎকার করে ডাকতে যাব, সেই মুহূর্তেই সেই পরিচিত শব্দটা কানে এল। যেন কোন অসীম থেকে ভেসে আসছে সেটা। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে আর ক্রমশ এগিয়ে আসছে। দেখতে পেলাম, আমার কালো বেড়ালটা মুহূর্তে আমার পাশ দিয়ে তিরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। আমিও তড়িৎগতিতে ফেরবার রাস্তা ধরলাম। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। খড়মড় করে বীভৎস শব্দে, খলবলে নারকীয় মূষিকদলের ছুটে আসার আওয়াজ ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। এই পৈশাচিক জন্তুগুলো প্রতি মুহূর্তেই নতুন আতঙ্কের জন্মদাতা। এরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, টেনে নিয়ে যাবে সুদূর নরকে, যেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে আননহীন এক কিলবিলে শয়তান, নায়ারলাথোটেপ[82]— যার মোহনবাঁশির মতো ভয়ংকর আর্তনাদে মোহিত হয়ে ছুটে আসে রক্ত-খদ্যোতের দল।

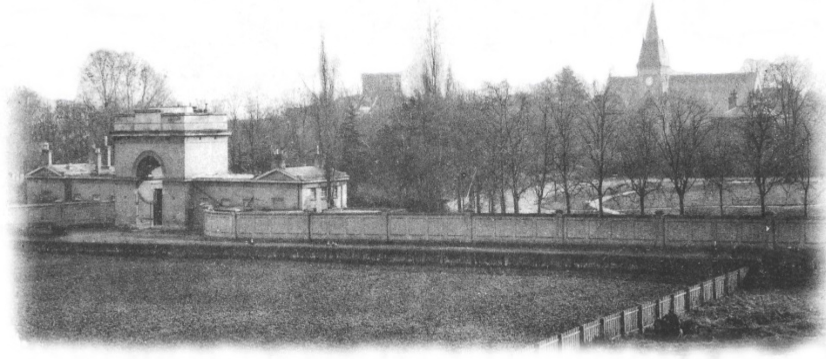
আমার টর্চের আলো নিবে গেছে, কিন্তু তবু আমি দিশাহীনভাবে ছুটে চলেছি উন্মাদের মতো। দূর থেকে যেন কারও গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি। কেউ যেন আর্তনাদ করে উঠছে—

সেই আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই বিশাল ভূগর্ভস্থ নরকের প্রাকারে প্রাকারে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আরও তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে সেই শব্দ— রক্তলোলুপ ইঁদুরের দলের এগিয়ে আসার কুটিল, ভয়ংকর, ঘৃণ্য শব্দ— সেটা বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। ছুটতে ছুটতে কিছুতে একটা যেন হোঁচট খেলাম— কীরকম নরম আর তুলতুলে একটা জিনিস। নিশ্চয়ই সেই রক্তলোলুপ শয়তানের দল গায়ের ওপর এসে গেছে। ঘিনঘিনে থকথকে কি কদাকার সেই পিশাচেরা, যারা মড়া এবং জ্যান্ত— এই দুই ধরনের প্রাণীকেই মহানন্দে ভোজন করে। বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল— তাহলে ইঁদুরগুলো ডেলাপোরদের ভক্ষণ করল না কেন? ডেলাপোররা নিষিদ্ধ কিছু খেত বলে? যেমন যুদ্ধটা আমার ছেলেকে খেয়েছে? মর শালারা!! ইয়াঙ্কিগুলো কিনা কারফ্যাক্সের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল— শয়তানগুলো দাদুকে কিনা জ্বালিয়ে মেরে দিল!!

না না— এসব কী ভাবছি আমি? আমি সে নই, আমি আমার স্বপ্নে দেখা সেই শয়তানরূপী কদাকার অবয়ব নই!! ছত্রাকে পূর্ণ ওই বীভৎস থলথলে মুখটা এড নরিসের হতে পারে না!!

কে বলেছে আমি ডেলাপোর? শালা নরিস বেঁচে রইল, আর আমার ছেলে মরে গেল?? কে নরিস? সে কিনা ডেলাপোরের সম্পত্তি দখল করে থাকবে? ওহে থ্রনটন, চাঁদবদন আমার!! এটাই আসলি কালাজাদু, বুঝলে— সাপের ছোবল— হিস্‌স্‌স্‌!!! আবার জ্ঞান হারাবে নাকি?? কোনও সমস্যা নেই!! আমি তোমাকে দেখাব, কীভাবে আমাদের পরিবারের প্রাচীন কাজকর্মের প্রভাবে তোমার স-জ্ঞানকে অ-জ্ঞানে পরিণত করা যায়।

রক্ত চাই রক্ত, বুঝলি ইতর!! রক্ত— তোর রক্ত চাই। কীভাবে ছোবল মারবি, আমি দেখাচ্ছি, দেখ!! ম্যাগনা মাতের! ম্যাগনা মাতের!! আতিয়াস[83]— দিয়া আদ আওদান— আগুস বাস দুনাত ওরট— আগুস লেট সাআআআআআআ[84]— উররর— রাআআআহহ— সসসসসস[85]!!!!!



চিত্র ৬.৪ : হ্যানওয়েল ইনসেন অ্যাসাইলাম, ১৮৯০

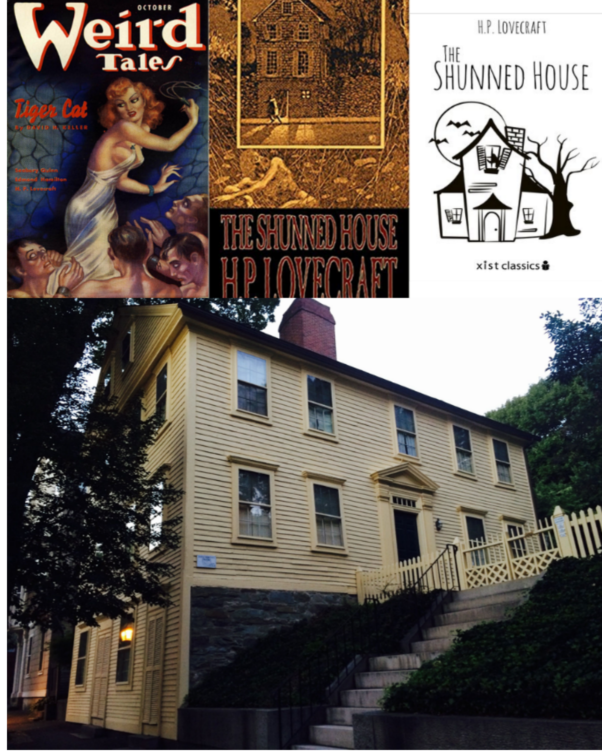
প্রায় তিন ঘণ্টা পর ওরা যখন আমাকে এই অন্ধকার কুঠুরির তলা থেকে উদ্ধার করে, তখন নাকি এই শব্দগুলো আমি ক্রমাগত আওড়ে যাচ্ছিলাম। ওরা আরও বলে, আমি নাকি ক্যাপটেন নরিসের আধখাওয়া দেহের ওপরে হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম। আমার নিজের বেড়াল কালো মানিক নাকি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছিল। এক্সাম প্রায়োরিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চিরকালের জন্য। ওরা কালো মানিককেও আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, আর আমাকে পুরে দিয়েছে হ্যানওয়েলের[86] এই ছোট্ট ঘরে। আমি বুঝতে পারছি, আমার পরিবার নিয়ে, এবং আমাকে নিয়ে নানা কুৎসা রটানো হচ্ছে আমার চারপাশে। প্রায়োরির সব রহস্য চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে এরা!! বেচারা নরিসের কথা জিজ্ঞেস করলে আমার ওপর বীভৎস সব আরোপ লাগাচ্ছে, কিন্তু তাদের জানতে হবে, এসবের জন্য আমি দায়ী নই!! ওদের জানতে হবে ওই ইঁদুরগুলোর কথা। সেই ঘিনঘিনে মূষিকের দল, যাদের খড়খড়ে চলাফেরা, ক্রমাগত উল্লম্ফন আমাকে একটুও ঘুমোতে দেয় না। শয়তানের দল সারাক্ষণ এই ঘরের দেওয়ালের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাকে ডাকছে— মাটির গভীরে, আরও নিবিড় আতঙ্কের যাত্রাতে তাদের সঙ্গে শামিল হতে!

এরা কোনও দিন এই বীভৎস ডাক শুনতে পাবে না। কেবল আমি পেতে থাকব, চিরটাকাল! ওই ইঁদুরের দলের ঘিনঘিনে আওয়াজ— যা ভেসে আসছে ওই দেওয়ালের ভেতর থেকে।



প্রথম প্রকাশ: *গল্পটি ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ‘উইয়ার্ড টেলস’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।*

ভাষান্তর: *সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়*



দ্য শানড হাউস

আপাতদৃষ্টিতে ভূতের বাড়ির গল্প হলেও লাভক্র্যাফট সুচারুভাবে এর সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের জনশ্রুতি ও প্রভিডেন্সের সত্যিকারের ঘটনা ও স্থান মিশিয়ে দিয়েছেন। দ্য ডানউইচ হরর বা দ্য কল অব কথুলুর মতো এই গল্পেও লাভক্র্যাফট বিজ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি সংঘাত ঘটিয়েছেন। প্রথমে ছাপতে অসমর্থ হলেও লাভক্র্যাফটের মৃত্যুর পরে লেখাটি উইয়ার্ড টেলস পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

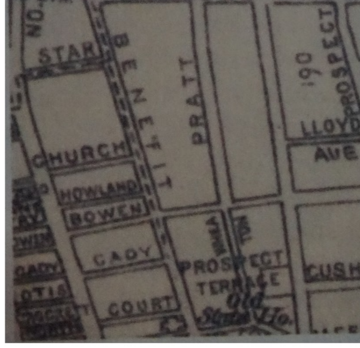
তফাত যাও!
(The Shunned House)



১৮৪০-এর দশকের প্রভিডেন্স। এডগার অ্যালান পো তখন প্রতিভাবান কবি শ্রীমতী ওয়াল্টার হুইটম্যানের[87] প্রেমে পড়েছেন। বেনিফিট স্ট্রিটের ম্যানসন হাউস[88] থেকে হুইটম্যানের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন পো। তাঁর সেই প্রেমনিবেদন সফল হয়নি, এ কথা সবাই জানেন। পো-র সেই যাত্রাপথের ডানদিকে পড়ত একটা পুরোনো বাড়ি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানেন? টিলার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ওই অবহেলিত, জীর্ণ দোতলা বাড়িটার ভেতরে এমন ভয়ানক জিনিস ছিল, এবং আছে, যা পো-র লেখাকেও হার মানাবে। অথচ পো এমন কিছু আন্দাজ করতে পারেননি। সেন্ট জেমস চার্চের লাগোয়া বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র[89] নিয়ে পো অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু ওই বাড়িটা নিয়ে তিনি কিচ্ছু লেখেননি।

অবশ্য পো-কে দোষ দেওয়া যায় না। নিউ ইংল্যান্ডের আদি বাসিন্দারা যখন ওখানে নিজেদের বাড়িঘর বানিয়েছিলেন, তখন ওই সমাধিক্ষেত্রের[90] মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে যেতে হত। পরে রাস্তাটা সোজা আর চওড়া করতে গিয়ে বিস্তর ভাঙাভাঙি হয়। তাই পো রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় একটা ফুট দশেক উঁচু ধূসর দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখেননি। বাড়িটার পেছনে, দক্ষিণদিকে অনেকটা খোলা আর উঁচু জায়গা ছিল, যেটা রাস্তা থেকে দেখা যেত

না। শ্যাওলা-ধরা পাথরে ঘেরা ওই জায়গাটায় কী আছে? ভাঙা সিঁড়ি, মরা ঘাস, বিবর্ণ ইটের দেওয়াল, আগাছা আর আধমরা গাছে ভরা বাগান, আর এসবের মাঝে সময়ের মার খেয়ে কালশিটে পড়ে যাওয়া সদর দরজা। এরপরেও বাড়িটাকে[91] কে মনে রাখবে বলুন?



চিত্র ৭.১ : বেনিফিট স্ট্রিট ম্যাপ

আমি বাড়িটার কথা প্রথম শুনি ছোটবেলায়। ওটাকে লোকে ‘অপয়া’ বাড়ি বলত। ওখানে যারাই থাকে, তাদেরই নাকি আয়ু ফুরিয়ে যায় বড় তাড়াতাড়ি। অথচ আশপাশের বাড়িতে তেমন কোনও সমস্যা ছিল না। সচরাচর এমন বাড়িকে ‘ভূতুড়ে’ বলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সেটাও করা যায়নি, কারণ জানলায় ধোঁয়াটে মুখ, হঠাৎ করে ভেসে-আসা ঠান্ডা হাওয়া, আলোর আচমকা জ্বলা-নেবা... এমন কিচ্ছু হত না ওই বাড়িটায়। তাই এলাকার সবার বক্তব্য ছিল, বাড়িটার জল-হাওয়ায় রোগব্যাধির জীবাণু বড় বেশি। তবে হ্যাঁ, লোকে মুখে মুখে কিছু কথা বলত। ওই বাড়িতে যারা কাজকর্ম করত, তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ-ফুসফুস করে অনেক কিছুই বলত। সেগুলো লোকে পাত্তা দিত না। পরে যখন প্রভিডেন্স জমজমাট এলাকা হয়ে গেল, তখন লোকের ভিড়ে চাপা পড়ে গেল সব কথা।



চিত্র ৭.২ : ইন্ডিয়ান পাইপস ছত্রাক

ছোটবেলায় আর পাঁচটা ছেলের মতো আমিও ওই বাড়িটায় বিস্তর দস্যিগিরি করেছি। ওটা তত দিনে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। মাকড়সার জাল আর অন্ধকার, ভাঙা আসবাব আর সবুজ-হয়ে-যাওয়া দেওয়াল... এগুলোর মাঝে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দশ মিনিটও কাটাতে চাইবেন না। তবে আমাদের কাছে ওগুলো ছিল দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চারের জায়গা। বাড়িটার একমাত্র জায়গা, যেটা আমরা এড়িয়ে চলতাম, সেটা হল মাটির নীচের সেলার। ওখানে এক ধরনের ছত্রাক[92] হত। ছাদ, দেওয়াল, এমনকী মেঝে থেকেও উঠে আসত ছত্রাকগুলো। সেগুলোর বিশ্রী গড়ন দেখে আমাদের গা-শিরশির করত। একটা সময়ে ছত্রাকগুলো ভেঙে গিয়ে সব্জেটে-নীল আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ত। লোকে ভাবত, জলার মতো ওই বাড়ির নীচ থেকেও উঠে আসছে আলেয়া।



চিত্র ৭.৩ : বেনিফিট স্ট্রিটের ব্যাবিট হাউস

(২)

ওই বাড়িটায় আসল 'গোলমাল' কী, সেটা স্রেফ দু-জন মানুষ জানতেন। একজন আমার কাকা ডক্টর এলিহু হুইপল[93]। অন্যজন আমি। আমেরিকার সবচেয়ে বনেদি পরিবারগুলোর মধ্যে একটির সন্তান ছিলেন এলিহু। প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব— এই দুই শাখাতেই তাঁর মতো পণ্ডিত বিরল। বাড়িটার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর বলেই ওখানে এত লোক মারা গেছে, এমনটাই ছিল তাঁর ঘোষিত মত। ভদ্রলোকের যা ব্যক্তিত্ব, তাতে এই নিয়ে তাঁকে খোঁচাখুঁচি করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আদরের ভাইপোর নাছোড় দাবি এড়ানোও কি সহজ? নিরুপায় হয়ে কাকা আমার কাছে একদিন তাঁর খাতাপত্র রেখে দিয়ে "নাও! পড়ো!" বলতে বাধ্য হন। ওই বাড়িটা নিয়ে শ-খানেক বছর ধরে চলে-আসা কানাকানি আর তাঁর নিজের নোট-করা কিছু 'পর্যবেক্ষণ' তখনই আমার সামনে আসে।

সযত্নে সংকলিত ওই রেকর্ড অনুযায়ী বাড়িটা বানানো হয়েছিল ১৭৬৩ সালে। ওখানে বসত-করা প্রথম পরিবারের সদস্য ছিলেন উইলিয়াম হ্যারিস[94], তাঁর স্ত্রী রোবি ডেক্সটার, তাঁদের ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ এলকানা, অ্যাবিগেইল, উইলিয়াম জুনিয়র আর রুথ। হ্যারিস সেই আমলের বেশ নামকরা ব্যবসায়ী এবং নাবিক ছিলেন। হ্যারিস চেয়েছিলেন, তাঁর পঞ্চম সন্তানের জন্ম হওয়ার আগেই যেন নতুন বাড়িটা তৈরি হয়ে যায়। বাড়ি হল, ১৭৬৩-র ডিসেম্বরে তাতে হ্যারিস আর রোবির পঞ্চম সন্তানের জন্মও হল। কিন্তু বাচ্চাটি মৃত হয়েই জন্মায়।

পরের বছর এপ্রিলে হঠাৎ-হওয়া অসুখে অ্যাবিগেইল আর রুথ মারা যায়। স্থানীয় ডাক্তার ওটাকে সংক্রমণ বলেছিলেন। কিন্তু বর্ণনা থেকে ওটাকে স্রেফ শরীরের ক্ষয় ছাড়া কিছু বলা যায় না। সংক্রমণের জন্য কী দায়ী তা বোঝার আগেই জুন মাসে ওই পরিবারের এক ভৃত্য হ্যানা ব্রাউন মারা যায়। অন্য ভৃত্য এলি লিডিয়াসন দুর্বলতা এবং আরও নানা কারণ দেখিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল। হ্যানার জায়গায় মেহিতাবেল পিয়ার্স নামের যে নতুন মেয়েটি আসে, তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ায় সে ব্যাপারটা পিছিয়ে দেয়। ওই দেরিটাই কালান্তক হয়ে যায়। পরের বছরেই মারা যায় এলি। সেই বছরে উইলিয়াম হ্যারিসও মারা যান। বিষণ্ণ বাড়িটায় থেকে যান বিধবা রোবি আর তাঁর দুই ছেলে।

চিত্র ৭.৩ : ব্যাবিট হাউস

দু-বছর পর এলকানার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর ধাক্কায় ইতিমধ্যেই কাহিল রোবি এটা বরদাস্ত করতে পারেননি। ১৭৬৮-র কোনও একসময় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেই সময় এর চিকিৎসা বলে কিছু ছিল না। তাঁকে বাড়ির ওপরতলায় আটকে রাখা হয়[95]। রোবির দিদি মার্সি ডেক্সটার এই পরিবারের দায়িত্ব নিতে আসেন। বোনের আর রুগ্ণ বোনপো উইলিয়ামের যথাসাধ্য দেখভাল করতেন মার্সি।

১৭৬৮-তেই প্রথমে মেহিতাবেল মারা যায়। তারপর অন্য কর্মচারীটিও অসংলগ্ন কিছু গালগল্প শুনিয়ে, শেষে বাড়িটার গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না বলে একদিন হাওয়া হয়ে যায়। একের পর এক মৃত্যু আর এইসব গালগল্পের অবধারিত ফল হয় একটাই। মার্সি এলাকা থেকে এমন কাউকে জোগাড় করতে পারেননি যে, ওই বাড়িটায় কাজ করতে রাজি হবে।

বিস্তর চেষ্টা করে তিনি নুসনেক[96] এলাকার বাসিন্দা অ্যান হোয়াইট নামের এক গম্ভীর, মলিনবদন মহিলাকে এই বাড়িতে কাজ করাতে রাজি করান। বস্টনের বাসিন্দা জেনাস লো বলে এক মোটামুটি করিতকর্মা পুরুষও ওই বাড়িতে এরপর কাজে ঢোকে।

এই বাড়ি নিয়ে গপ্পগুলো জমাট আকার পায় অ্যান হোয়াইটের মাধ্যমে। মাস তিনেকের মধ্যে অ্যানকে বরখাস্ত করে নিউপোর্টের মারিয়া রবিন্সকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তদ্দিনে বাড়িটা নিয়ে বাজারে যা চাউর হওয়ার ছিল, হয়ে গেছে।

এইসবের মধ্যে রোবি হ্যারিসের 'উন্মাদনা' ক্রমেই অন্য চেহারা নিচ্ছিল। ঠিক কী বলে চিৎকার করতেন রোবি, সেই বিষয়ে কাগজপত্র নীরব। তবে ফরাসি ভাষায় কিছুমাত্র দখল না-থাকা সত্ত্বেও ওই ভাষায় তিনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন— এটা লেখা আছে। অপলক চোখে তাঁর দিকে কে যেন তাকিয়ে আছে, কে যেন তাঁকে খেতে আসছে— এইসব বলে আর্তনাদ করতেন রোবি। বাড়ির পরিস্থিতি এতই ঘোরালো হল যে, সাময়িকভাবে উইলিয়ামকে তার খুড়তুতো দাদা পেলেগের কাছে সরিয়ে দেওয়া হয়। উইলিয়ামের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তার ফলে। ১৭৭২ সালে জেনাস মারা যায়। রোবি নাকি পাগলের মতো হেসেছিলেন সেই মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। পরের বছর তাঁরও মেয়াদ ফুরোয়।

১৭৭৫ সালে শুরু হয় গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে তার কলোনির ঝামেলা। সেটা ক্রমে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হয়। উইলিয়াম হ্যারিসের শরীর যতই ক্ষয়াটে হোক-না কেন, মাত্র ষোলো বছর বয়সে সে জেনারেল গ্রিনের[97] বাহিনীতে যোগ দেয়। তারপর উইলিয়ামের স্বাস্থ্য এবং সম্মান, দুয়েরই প্রভূত উন্নতি হয়। ১৭৮০ সালে রোড আইল্যান্ড এলাকার ভারপ্রাপ্ত ক্যাপটেন থাকার সময় এলিজেবেথটাউনের[98] বাসিন্দা ফেবে হেটফিল্ডের সঙ্গে উইলিয়ামের বিয়ে হয়। পরের বছর যুদ্ধ থামলে, সেনাবাহিনী থেকে সসম্মানে অবসর নিয়ে উইলিয়াম সস্ত্রীক তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িটা মজবুত অবস্থায় ছিল। এলাকাটাও বেশ 'পশ' হয়ে উঠেছিল তদ্দিনে, যার ফলে রাস্তাটার নাম ব্যাক স্ট্রিটের বদলে বেনিফিট স্ট্রিট হয়ে গিয়েছিল।

1924

THE SHUNNED HOUSE

From even the greatest of horrors irony is seldom absent. Sometimes it enters directly into the composition of the events, while sometimes it relates only to their fortuitous position among persons and places. The latter sort is spelndidly exemplified by a case in the ancient city of Providence, where in the late forties Edgar Allan Poe used to sojourn often during his unsuccessful wooing of the gifted poetess, Mrs. Whitman. Poe generally stopped at the Mansion House in Benefit Street - the renamed Golden Ball Inn whose roof has sheltered Washington Jefferson, and Lafayette - and his favourite walk led northward along the same street to Mrs. Whitman's home and the neighbouring hillside churchyard of St. John's, whose hidden expanse of eighteenth-century gravestones had for h him a peculiar fascination.

Now the irony is this. In this walk, so many times repeated, the world's greatest master of the terrible and the bizarre was obliged to pass a particular house on the eastern side of the street; a dingy, antiquated structure perched on the abruptly rising side hill, with a great unkept yard dating from a time when the region was partly open country. It does not appear that he ever wrote or s spoke of it, nor is there any evidence that he even noticed it. And yet that house, to the two persons in possession of certain information, equals or outranks in horhor the wildest phantasy of the genius who so often passed it unknowingly, and stands starkly leering as a symbol of all that is unutterably hideous.

The house was - and for that matter still is - of a kind to attract the attention of the curious. Originally a farm or semi-farm building, it followed the average New England colonial lines of the middle eighteenth century- the prosperous peaked-roof sort, with two stories and dormerless attic, and with the Georgian doorway and interior panelling dictated by the progress of taste at that time. It faced south, with one gable end buried to the lower windows in the eastward rising hill, and the other exposed to the foundations toward the street. Its construction, over a century and a half ago, had followed the grading and straightening of the road in that especial vicinity; for Benefit Street - at first called Back Street- was laid out as a lane winding amongst the graveyards of the first settlers, and straightened only when the removal of the bodies to the North Burial Ground made it decently

চিত্র ৭.৪ : "দ্য শানড হাউস" গল্পের টাইপ করা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

দুর্ভাগ্যের বিষয়, উইলিয়ামের প্রত্যাবর্তন সুখের বা আনন্দের হয়নি। তত দিনে মার্সি এবং মারিয়ার শরীর-স্বাস্থ্য জবাব দিয়ে দিয়েছে। ১৭৮২-র শরৎকালে ফেবে একটি মৃত কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ১৭৮৩-র মে মাসে মারিয়াও পাড়ি জমায় দুনিয়া ছেড়ে। এরপর উইলিয়াম হ্যারিসের মনে আর কোনও সংশয় ছিল না। এই বাড়ি যে বিপজ্জনক— এটা বুঝে উইলিয়াম প্রথমে 'গোল্ডেন বল' সরাইয়ে, তারপর বড় ব্রিজের[99] ওপারে

ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্রিটের ওপর নতুন বাড়ি বানিয়ে সেখানেই চলে যান। ১৭৮৫ সালে তাঁদের ছেলে ডাটির জন্ম হয়। ১৭৯৭ সালের মড়কে উইলিয়াম আর তাঁর স্ত্রী-র মৃত্যু হয়। পেলেগ যেভাবে একসময় রুগ্ণ উইলিয়ামের দেখাশোনা করেছিলেন, সেভাবেই তাঁর ছেলে র‍্যাথবোন হ্যারিস এবার ডাটির দায়িত্ব নেন।



চিত্র ৭.৫ : এলিজেবেথটাউনের ছবি

র‍্যাথবোন একটু কড়া ধাঁচের বাস্তববাদী লোক ছিলেন। ডাটির ভরণপোষণে যাতে সমস্যা না হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বেনিফিট স্ট্রিটের বাড়িটা ভাড়া দেন। ভাড়াটেদের মৃত্যু, বাড়িটা ছেড়ে চলে যাওয়া, কানাকানি— এসবে র‍্যাথবোনের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তবে ১৮০৪ সালে প্রায় একসঙ্গে চারজন ভাড়াটের মৃত্যুর পর শহরের কাউন্সিল র‍্যাথবোনকে গন্ধক, আলকাতরা, কর্পূর দিয়ে বাড়িটা শোধন করতে আদেশ দেয়। ডাটি নিজে বাড়িটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না। ১৮১২-য় ব্রিটেনের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধে ডাটি ক্যাপটেন ক্যাহুনের[100] নেতৃত্বে লড়েছিলেন[101]। অক্ষত

দেহেই ডাটি যুদ্ধ থেকে ফেরেন, ১৮১৪-য় বিয়ে করেন, এবং ১৮১৫-য় এক দারুণ দুর্যোগের রাতে[102] ওয়েলকাম নামে এক পুত্রসন্তানের গর্বিত পিতা হন। ওয়েলকাম দীর্ঘায়ু হননি। ১৮৬২ সালে ফ্রেডরিক্সবার্গের যুদ্ধে তিনি মারা যান[103]।

ওয়েলকাম বা তাঁর ছেলে আর্চার ওই বাড়িটা নিয়ে কিছু লিখে যাননি। বাড়িটা ভাড়া দেওয়া এমনিতেই দুঃসাধ্য ছিল। ১৮৬১ সালে আবার পরপর কয়েকটা মৃত্যু ঘটে ওখানে। গৃহযুদ্ধের ডামাডোলে সেসব ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে লোকে আর ওটা ভাড়া নিত না।

(৩)

হ্যারিস পরিবারের এই ইতিহাস আমাকে ঠিক কতটা ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, বোঝাতে পারব না। এতগুলো মৃত্যু, অসুস্থতা এবং সে-ও শুধু ওই পরিবারে নয়, অন্য ভাড়াটেদের পরিবারেও... এর থেকে একটাই জিনিস পরিষ্কার হয়। ওই পরিবারে নয়, বরং ওই বাড়িটায় গণ্ডগোল আছে। সেটাও এমন কিছু, যাকে মামুলি ড্যাম্প বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না।

কোন সে মৃত্যুদূত, যে ওই বাড়িতে শিকার করে চলেছে একের পর এক মানুষকে?

অনেক কিছু রেকর্ড করেছিলেন ডক্টর এলিহু। অনেক গুজব, অভিযোগ, অপবাদ... মুশকিল হল, সেই ডকুমেন্টেড জিনিসগুলোর ভাঁজে ভাঁজে মিশে গিয়েছিল এলাকার মানুষের দীর্ঘলালিত কুসংস্কার। ফলে কোন কথাটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, আর কোনটাকে নয়, সেটা বুঝতেই আমি হিমশিম খেয়ে যাই। একটা উদাহরণ দিই। অন্তত তিনজন মানুষ একেবারে জবানবন্দি দিয়ে বলেছেন, ওই বাড়ির সেলারে যে বিচিত্র ছত্রাক হয়, তার চেহারা, গন্ধ, আলো... এগুলো তাদের প্রভাবিত করেছে। ছোটবেলার স্মৃতি থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম, এটা হতেই পারে। কিন্তু একই নিশ্বাসে সেই লোকেরা ডাইনি আর অপদেবতা নিয়ে যত রাজ্যের ভুলভাল কথাও বলেছিল শ্রোতাদের সামনে।

অ্যান হোয়াইটের কথাই ধরুন। সেলারের ছত্রাকের বর্ণনা দেওয়ার পাশাপাশি ও বলেছিল, ওই বাড়ির নীচে কোনও রক্তচোষার বাস! একেবারে হাল আমলেও এক্সেটারের লোকজন এই ভ্যাম্পায়ার-ট্যাম্পায়ার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। কাজেই তখন এই কথার মহিমা কেমন ছিল ভাবুন! ওই বাড়িটা যে জমিতে বানানো, সেটা কোনও একসময়ে

কবরখানা ছিল। তাই লোকে জুলজুলে চোখে কান খাড়া করে ওই বাড়ির সেলারে অ্যানের কী ধরনের ভয়াল-ভয়ংকর 'অভিজ্ঞতা' হয়েছে তা শুনত। অ্যানের ওই ক্রমাগত "সেলার খোঁড়ো, নয়তো মরো!" কথায় ক্লান্ত হয়ে ওকে বাড়ি থেকে দূরই করে দেওয়া হয়েছিল একসময়।

আমি কিন্তু কথাগুলো পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারিনি। তার কারণগুলো একে একে লিখি।

এক চাকরের জবানিতে আমি কিছু কথা পড়েছিলাম। অ্যানের সঙ্গে তার কখনও কথা হয়নি। অ্যান হোয়াইট ওই বাড়িতে কাজ পাওয়ার আগেই সে ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রিজার্ভড স্মিথ নামের সেই চাকর বলেছিল, রাতে কেউ তার নিশ্বাস কেড়ে নেয়!

১৮০৪ সালে ডক্টর চ্যাড হপকিন্স 'জ্বরের ঘোরে মৃত্যু'র জন্য যে চারটি মানুষের ডেথ সার্টিফিকেট ইশ্যু করেছিলেন, তাতেও একেবারে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল একটা তথ্য। চারজনের শরীরেই রক্ত প্রায় ছিলই না!

রোবি হ্যারিস এমন কারও কথা বলতেন, যে নাকি ধারালো দাঁত বের করে তাঁকে 'খেতে' আসত!

আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার পাওয়া গেল কাগজ থেকে কেটে রাখা খবরে। ১২ এপ্রিল ১৮১৫-র 'প্রভিডেন্স গেজেট' আর 'কান্ট্রি জার্নাল'[104]-এ একটা মৃত্যুর বর্ণনা পাই। ২৭ অক্টোবর ১৮৪৫-এর 'ডেইলি ট্র্যানস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড ক্রনিক্‌ল'[105]-এ ছিল অন্য একটা বিবরণ। ত্রিশ বছরেরও বেশি ব্যবধানে হওয়া এই দুটো ঘটনার মধ্যে এমন একটা মিল ছিল, যাকে মামুলি সমাপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৮১৫ সালে ওই বাড়িতে স্ট্যাফোর্ড নামের এক বয়স্ক মহিলা মারা যান। ১৮৪৫ সালে মারা যান এলিয়াজার ডার্ফি নামের এক স্কুল শিক্ষক। মারা যাওয়ার আগে এঁরা দু-জনেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর সামনে থাকা ডাক্তারের টুঁটি কামড়াতে গিয়েছিলেন! এটাকে জ্বরের ঘোর বলে মানা যায় না। আর-একটা কথাও কাগজে পেলাম। ১৮৬১ সালে যে মৃত্যুগুলোর পর ওই বাড়ি ভাড়া হওয়াই বন্ধ হয়ে যায়, তাতেও প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি সামনে থাকা মানুষের কবজি বা গলা কামড়ে প্রায় ফুটো করে দিয়েছিল!

মোটামুটি ওই সময়েই আমার কাকা তাঁর ডাক্তারি শুরু করেছিলেন ওই এলাকায়। আমার প্রশ্নের উত্তরে থেমে থেমে কাকা কয়েকটা কথা বলেছিলেন।

"শুধু মৃত্যুর মিছিল চলার জন্য নয়।" জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে-পড়া সূর্যের আলোয় ধুলোর নাচ দেখতে দেখতে কাকা বলেছিলেন, "আমার কাছে বাড়িটা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল অন্য একটা কারণে। ওই অপুষ্ট, রুগ্ণ মানুষগুলো এমনিতে মাতৃভাষাই ভালোভাবে লিখতে-পড়তে জানত না। অথচ তারাই অসুস্থ হলে ফরাসি ভাষায় প্রলাপ বকত, চিৎকার করত, হাহাকার করত! ব্যাপারটা কতটা অস্বাভাবিক ভাবতে পারছ?"

"পারছি।" আমি বলেছিলাম, "আচ্ছা, এটা কি শুধু ওই চারজনের মধ্যেই হয়েছিল?"

"উঁহু।" মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন এলিহু, "প্রায় একশো বছর আগে উন্মাদিনী রোবি হ্যারিসের মধ্যে এই জিনিস প্রথম দেখা আর শোনা গিয়েছিল। এই কথাটা জানতে পারার পরেই বাড়িটার ইতিহাস নিয়ে আমার চর্চা শুরু হয়। ডক্টর চেস আর ডক্টর হুইটমার্শের বাড়িতে যাতায়াত করে তাঁদের কেসবুকগুলো উদ্ধার করি। সেগুলো থেকে একটা ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে যাই। ওই বাড়ির ছোঁয়ায় মানুষগুলোর শুধু শরীরে নয়, মনেও কিছু একটা পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু কীভাবে?"

"কারণটা জানতে পেরেছিলেন?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"প্রতিষ্ঠিত মহলে এসব নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব ছিল।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকা বলেছিলেন, "তাই আমি এই প্রসঙ্গটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার তুমিই যখন সেগুলো খুঁড়ে বের করলে, তখন বাকি তদন্তটা তোমাকে চালাতে হবে। কী? পারবে তো?"

এমনিতে আমি যেমনই হই-না কেন, বোধহয় কাকার বিশ্বাসের মর্যাদা দিতেই আমি এই রেকর্ডগুলো নিয়ে দারুণ সিরিয়াস হয়ে পড়ি।

হ্যারিস পরিবারের শেষ সদস্য ক্যারিংটনের সঙ্গে আমি বহুবার কথা বলেছিলাম। সন-তারিখের খুঁটিনাটি মেলানো, মৃত্যুর যে মর্বিড খতিয়ান ডাক্তারদের নোটবুক থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে চার্চ আর অন্য প্রতিষ্ঠানের দস্তাবেজ দিয়ে যাচাই করে নেওয়া— এসবই করেছিলাম আমি। হ্যারিস পরিবারের লোকেরা ওই ফরাসি ভাষা নিয়ে কিছু বলতে পারেনি। শুধু এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে, মারিয়া নামের ওই পরিচারিকা কিছু জানতেন বা আন্দাজ করেছিলেন। ১৭৬৮-তে কাজে লাগার পর থেকে ১৭৮৩-তে ওই বাড়ি থেকে

হ্যারিস পরিবার পাততাড়ি গোটানো অবধি সময়টা ওখানে ছিলেন মারিয়া। রোবির শেষ সময়ের হাহাকার নিয়ে তিনিই একদা অন্যদের কিছু বলেছিলেন। কিন্তু কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে সেই কথাগুলো।

এই এলাকায় একটা শাসনব্যবস্থার পত্তন হওয়ার গোড়ার দিকের রেকর্ড দেখতে গিয়ে আমি অবশেষে কিছু জানতে পারলাম। নারাগানসেট[106] ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে এই এলাকাটা দখল করেছিল প্রথমদিকের বাসিন্দারা। জন থ্রকমর্টন[107] নামের কেউ ওই প্লটটা প্রথম পেয়েছিল। পরে ওই জায়গাটায় রাস্তা বানানো আর নতুন করে জমিজিরেত ভাগাভাগির চক্করে বিস্তর বদল হয়। হ্যাঁ, ওখানে এককালে থ্রকমর্টনদের কবরখানাও ছিল। কিন্তু ব্যাক স্ট্রিট ওরফে বেনিফিট স্ট্রিট বানানোর সময় কবরগুলো নিয়মমাফিক সরিয়ে প'টাকেট ওয়েস্ট রোডে সরিয়ে আনা হয়।

ওই জরাজীর্ণ ধূলিমলিন কাগজের স্তূপ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না, এমনই ভেবেছিলাম। কপালজোরে একটা কাগজ তখনই দেখলাম। সেটা থেকে জানা গেল, জনৈক এতিয়েন রুলে আর তাঁর স্ত্রী-কে এই জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল।

এতক্ষণে আমি একটা 'ফ্রেঞ্চ কানেকশন' খুঁজে পেলাম! নতুন উৎসাহে বলীয়ান হয়ে কাগজে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলাম। জানা গেল, রুলেদের একটা ছোট্ট একতলা কটেজের পেছনেই ছিল তাদের পারিবারিক কবর। ১৭৪৭ থেকে ১৭৫৮-র মধ্যে ব্যাক স্ট্রিটকে সোজা করার জন্য কটেজটা ভাঙা হয়েছিল। কিন্তু ওই কবরগুলো সরানোর কোনও প্রমাণ আমি পেলাম না। পুরোনো ম্যাপ দেখে দেখে আমার চোখে পার্মানেন্ট হলদে ভাব হয়ে গেল। অবশেষে আমি যা খুঁজছিলাম, তা পেলাম।

উইলিয়াম হ্যারিস তাঁর বাড়িটা সেই কবরখানার ওপরেই বানিয়েছিলেন!

অতঃপর রোড আইল্যান্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটি[108] আর শেপলির লাইব্রেরি[109] অভিযান চালালাম। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল, ১৬৯৬ সালে ইস্ট গ্রিনউইচ[110] থেকে এসেছিল রুলে পরিবার। সেখানে ওই পরিবারটিকে স্থানীয় লোকে দু-চোখে দেখতে পারত না। প্রভিডেন্সে অভিবাসী হওয়া ফরাসি পরিবারগুলোর সঙ্গে ইংরেজ বাসিন্দাদের সাংঘাতিক ঝামেলা হয়েছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তার মধ্যেও এই বিশেষ পরিবারটির ওপর লোকজন বিশেষভাবে খেপে ছিল। কেন? সে প্রশ্নের সহজ উত্তর আমি কোথাও পাইনি। তবে মনে হয়, এতিয়েন রুলে চাষবাস বা অন্য কাজকর্মের বদলে কী

সব নিষিদ্ধ বইপত্র পড়ায়, আর বিচিত্রদর্শন নকশা-টকশা আঁকায় পারদর্শী ছিলেন। স্থানীয় লোকেদের চাপেই রুলে পরিবারকে এই একচিলতে জায়গায় থাকতে বাধ্য করা হয়। প্রশাসন তাদের ওপর সদয় হয়ে টাউন স্ট্রিটের জেটিতে এতিয়েনের জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দেয়। তারও প্রায় চল্লিশ বছর পর শহরে একটা বিশাল দাঙ্গা হয়। তারপর থেকে রুলে পরিবারের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বসত করার পর প্রায় শ-খানেক বছর ধরে রুলে পরিবারের উল্লেখ নানা কথায় বা লেখায় পাওয়া যায়। তেমন কিছু ছিল না সেই কথায়। তবে সমুদ্রের ধারে একটা ঝিম-ধরা শহরে আলোচ্য বিষয় হওয়ার জন্য তো তেমন কিছু লাগেও না। এতিয়েনের ছেলে পল ছিল বদমেজাজি এবং অভদ্র। তার আচরণের পরেই শহরের ওদিকে দাঙ্গাটা হয়। কিন্তু কী এমন করেছিল পল? নাহ্, এ প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাইনি আমি। তবে হ্যাঁ, প্রভিডেন্সের বাসিন্দারা আশপাশের লোকেদের মতো অত কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হলেও কিছু জিনিস তাঁরা অপছন্দ করতেন। পল নাকি ভুল সময়ে, ভুল দিকে মুখ করে, ভুল জিনিস বলে উপাসনা করতেন। এই নিয়ে তাঁদের অসন্তোষের আঁচ এত দিন পরেও আমার গায়ে এসে লাগল। সেই সঙ্গে আরও একটা জিনিস জানা গেল।

ষোড়শ শতাব্দীর কডের[111] বাসিন্দা হিউগোনট পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এই রুলেরা। এই তথ্যটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। একটু অপ্রচলিত পুথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি বলে আমি একটা জিনিস জানতাম।

কডের বাসিন্দা জাক রুলেকে ১৫৯৮ সালে দানব উপাসনার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে সেটা রদ করে তাকে সারাজীবনের জন্য একটা ঘুপচি ঘরে কয়েদ করে রাখা হয়। কিন্তু সে যা করেছিল, সেটা তাতে লঘু হয়ে যায়নি।

কী করেছিল জাক? জঙ্গলের মধ্যে দুটি নেকড়ের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া একটি ছেলের শরীরের পাশে জাককে পাওয়া গিয়েছিল রক্ত-মাখা অবস্থায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখান থেকে একটি নেকড়েকেই পালাতে দেখেছিলেন। ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অন্য নেকড়েটি আর কেউ নয়, জাক স্বয়ং[112]। আমি এমন কোনও দলিল পাইনি, যা থেকে মনে হয় যে, এই উপাখ্যান প্রভিডেন্সেও এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু যেভাবে দাঙ্গায় পরিবারটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়, তাতে মনে হয়, কেউ হয়তো কিছু জেনেছিল।

বুঝতেই পারছেন, এই ব্যাপারটা সমাপতন হতেই পারত। কিন্তু আমার তখন 'যেখানে দেখিবে ছাই' দশা। অতঃপর ওই বাড়িতে আমার আনাগোনা বাড়ল। শেষে ক্যারিংটন হ্যারিসের অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি বেনিফিট স্ট্রিট থেকে ওই বাড়ির সেলারে ঢোকার অনুমতি পেলাম। কারণটা ছিল অত্যন্ত সরল। পরিত্যক্ত একতলা, অন্ধকার সিঁড়ি, ছাতা-ধরা দেওয়াল— এসবের মধ্য দিয়ে ওই সেলারে ঢোকার কথা ভেবেই স্নায়ুতে চাপ পড়ছিল। অস্বীকার করব না, দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে প্রায় জ্যাম হয়ে যাওয়া দরজায় জং-ধরা চাবিটা লাগানোর সময় বুক ধুকপুক করছিল। জানলাগুলো তো বটেই, আমি দরজাটাও খোলা রাখতাম। সেখান দিয়ে আসা দিনের আলোয় ঘরটার প্রতি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখেও আমি ওখানে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, ঠান্ডা মেঝে আর অন্ধকার ছাড়া কিছু পাইনি। রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথচারীরা আমাকে দেখে কী ভাবতেন, কে জানে।

অবশেষে ঠিক করলাম, দিনে নয়, বরং রাতে ওখানে যাব। সে দিন মাঝরাতে আমি যখন ফ্ল্যাশলাইট হাতে ওখানে ঢুকলাম, তখন বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছে। ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলোয় উঁচুনিচু মেঝের মধ্যে আমি অবশেষে একটা অস্বাভাবিক জিনিস দেখলাম।

কী দেখলাম আমি?

নোনা-ধরা মাটি, চুন, এমন নানা জিনিসের মধ্যে অনেকটা ঘাড় গুঁজে বসে থাকার মতো করে স্থির হয়ে আছে একটা সাদাটে চেহারা! নিবে-থাকা ফায়ারপ্লেসের গায়ে একটা বড়, প্রায় মানুষ-প্রমাণ ছত্রাকের দাগ-লাগা দেওয়ালের ঠিক পাশেই ওটা রয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বেশ কিছুটা বাষ্প বা কুয়াশা সাদাটে হলুদ রং নিয়ে ঝিলমিল করছে। ছোটবেলায় এমনই কিছু দেখেছিলাম আমি সেলারের অন্ধকারে। সেই স্মৃতি এবং একটা অশুভ আর বিপজ্জনক কিছুর অস্তিত্ব আমাকে মুহূর্তে সজাগ করে তুলল। বুঝতে পারছিলাম, জিনিসটা আমাকে দেখছে... ক্ষুধার্ত চোখে, হিংস্রভাবে! অবস্থাটা বেশিক্ষণ চললে কী করতাম, জানি না। তবে কিছুক্ষণ পর, ঠিক ধোঁয়ার মতো করেই ফায়ারপ্লেসের চিমনির মধ্য দিয়ে জিনিসটা উঠে গেল। পেছনে রয়ে গেল কিছুটা দুর্গন্ধ, আর আমার শরীর-মন জুড়ে একটা কাঁপুনি[113]।

ওখান থেকে ফিরে এসে ঘটনাটা কাকাকে বললাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কাকা। তারপর খুব শান্ত গলায় বলে উঠলেন, "ওটাকে শেষ করতে হবে। আর এই

কাজটা আমাদেরই করতে হবে। ব্যাস।”

(৪)

২৫ জুন, ১৯১৯, এই তারিখটা আমি কখনও ভুলতে পারব না। সে দিন আমি আর কাকা ওই বাড়িতে অভিযান চালালাম। ক্যারিংটন হ্যারিসকে আমাদের অভিযান সম্বন্ধে জানানো হয়েছিল। কেন এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সেই রাতে ওখানে যাচ্ছি, সে বিষয়ে ওঁকে আমরা কিছু বলিনি। তবে আমাদের সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র থেকে ভদ্রলোক কিছু আন্দাজ করেছিলেন। কাকা ওঁকে বুঝিয়েছিলেন, যা-ই হোক-না কেন, সেটা আর কাউকে না-বলাই ভালো হবে। বেচারির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তবে উনি রাজি হয়েছিলেন।

পরিকল্পনা ছিল, আমাদের দু-জনের মধ্যে প্রথমে একজন, পরে আরেকজন পাহারা তথা পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকবে, অন্যজন ঘুমোবে। পরে দু-জনেই জেগে থাকবে। সেইমতো দুটো ক্যাম্প চেয়ার আর একটা ভাঁজ-করা খাট নিয়েছিলাম আমরা। সঙ্গে ছিল বেশ কিছু ভারী, দামি যন্ত্রপাতি। শেষোক্ত জিনিসগুলো ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়[114] আর ক্র্যানস্টন স্ট্রিটের আর্মারি[115] থেকে ধার নিতে হয়েছিল। এমনিতে ওসব জিনিস চাইলে পাওয়া যায় না, তবে ডক্টর এলিহু হুইপল কিছু চাইলে তাতে ‘না’ বলা...!

সেই রাতেও ঝড় উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের মধ্যেও যেন ঝড়ই হচ্ছে। যেসব জিনিসকে কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বস্তু ছাড়া আর কিছু ভাবিনি কখনও, তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মনকে কি তৈরি করা যায় আদৌ? আমি আর কাকা দু-জনেই এই ক-দিনের ঘাঁটাঘাঁটি থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু একটা আছে ওই বাড়ির সেলারে। আমি তাকে দেখেওছি! তবু, মন এই মুহূর্তগুলোয় উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে বলতে চায়, ঝড় ওঠেনি, কোথাও কিচ্ছু নেই, সব ঝুট হ্যায়! কিন্তু এলিহু হুইপলের পাল্লায় পড়লে উটপাখিরাও বোধহয় স্বভাব বদলাত।

রুলে পরিবারের সঙ্গে যে অশুভশক্তির উপাসনা, এবং সেইরকম কিছু বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল— এটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তাহলে কি সেই পরিবারের শেষ পুরুষ পল রুলে কোনওভাবে, যে যা চাইছিল তা-ই পেয়েছিল? মানুষের মতো চেহারা, ছত্রাকের মতোই একটা পরজীবী স্বভাবের বশে বাসিন্দাদের প্রাণরস শুষে টিকে থাকা, এবং মানুষের মতোই ঘৃণা আর হিংস্রতা দিয়ে আমাকে সেই সন্ধ্যায় দেখা— এগুলোর প্রতিটিই

আমাদের বলছিল, পল রুলের একটা অন্ধকার অস্তিত্ব রয়েছে এই বাড়ির সেলারে। কিন্তু ওই অস্তিত্বের বাইরে তার সম্বন্ধে আমরা কিচ্ছু জানতাম না! তাই তার মোকাবিলা করার জন্য আমাকে কাকার বিজ্ঞানচেতনা আর ধারণার ওপরেই ভরসা করতে হয়েছিল[116]।

দুটো অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েছিলাম আমরা।

শক্তিশালী স্টোরেজ ব্যাটারি দিয়ে চালিত কয়েকটা ক্রুকস টিউব[117], স্ক্রিন আর রিফ্লেক্টর দিয়ে বানানো একটা জটিল জাল ছিল প্রথম হাতিয়ার। যদি জিনিসটা একটা উপস্থিতি ছাড়া কিছু না হয়, তাহলে বাতাসে একটা দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু প্রাণঘাতী বিকিরণ ছড়িয়ে তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কাকা।

দ্বিতীয় হাতিয়ারটা আমাদের কারও মনঃপূত হয়নি। তবে ওটা সঙ্গে না রেখে উপায়ও ছিল না। যদি জিনিসটা বায়বীয় না হয়ে নিরেট আকার নেয়, তাহলে সেটাকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের একেবারে আদিম একটি শক্তির প্রয়োজন ছিল। আগুন! তাই মিলিটারির কাছ থেকে ধার-নেওয়া দ্বিতীয় হাতিয়ারটা ছিল ফ্লেম-থ্রোয়ার[118]।

এগুলো আমরা যথাসাধ্য বুঝে-শুনে ফিট করলাম। ফায়ারপ্লেসের সামনে ওই জায়গায় ছত্রাকের দাগটা তখন খুবই ফিকে হয়ে এসেছিল। আমি একবার ভাবলামও, ভুল দেখিনি তো? তারপরেই পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে গেল। নতুন উদ্যমে কোমর বেঁধে, ওই জায়গাটা ঘিরে, এবং আরও যেসব এলাকা আমাদের দু-জনের কাছেই গোলমেলে ঠেকছিল, সেগুলোর দিকে নিশানা করে আমরা গুছিয়ে বসলাম। রাত তখন দশটা।

বৃষ্টির দাপটে বাইরে রাস্তার আলোগুলো টিমটিম করছিল। সেই আলোয় আর ঘরের ভেতরে ছত্রাক থেকে ছড়িয়ে-পড়া আভায় ঘরটা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছিল। দেওয়ালে চুনের লেশমাত্র নেই, বরং ভেজা পাথরগুলোই আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। পায়ের তলায় শক্ত কাঠ নয়, বরং স্যাঁতসেঁতে, ছাতা-পড়া মাটির অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, আমরা একটা বাজে জায়গায় এসে পড়েছি। তার সঙ্গে যোগ করুন পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা আসবাব, মাথার ওপর বিম আর কড়িবরগার জাল, জায়গায় জায়গায় হাঁ করে থাকা ঘোরানো সিঁড়ি! এর মধ্যে বসিয়ে নিন আমাদের সঙ্গে আনা জটিল যন্ত্রপাতি, আর চেয়ারে বসে থাকা আমাদের।

ছবিটা কি খুব মনোরম ঠেকছে?

আমরা রাস্তার দিকের দরজাটা খোলাই রেখেছিলাম। বাইরে থেকে আলো আসার জন্যই শুধু নয়, বিপদে পড়লে পালানোর জন্যও। প্ল্যান হিসেবে যেটা আমাদের মাথায় ছিল, সেটা খুবই সরল। আমরা ওখানে থাকব। ওই বাড়িতে এখন যেহেতু মানুষের পা পড়েই না বলতে গেলে, রাতভর আমাদের উপস্থিতি ওই অশুভ জিনিসটিকে উত্তেজিত বা প্রলুব্ধ করবে। তখন সে আমাদের কাছে এলে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করা যাবে। আমরা নিজেদের মধ্যে নানা এতোল-বেতোল কথা বলে অনেকটা সময় কাটালাম। তারপর দেখলাম, কাকার চোখ বুজে আসছে। ওঁকে কটে শুইয়ে দিলাম। কেন যেন মনে হল, এবারই যা হওয়ার হবে।

একজন ঘুমন্ত মানুষের পাশে বসে কখনও রাত জেগেছেন? বড় একা লাগে ওই সময়টায়। দুনিয়ার যত রাজ্যের ভয় তখন এসে দানা বাঁধে মনের নরম জায়গাগুলোয়। কাকার গভীর শ্বাসের শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়া মিলে তৈরি হওয়া হাহাকার। জানলা দিয়ে আসা আবছা আলোয় দাগে ভরা দেওয়ালের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল জলের দানা। পরিবেশটা এতই শ্বাসরোধী হয়ে উঠল যে, আমি দরজা খুলে দিলাম। বাইরে থেকে আসা ভেজা বাতাসটাই বুক ভরে নিলাম। মাথাটা সাফ হয়ে আসছিল ওই হাওয়ায়। তখনই কাকার শ্বাসের শব্দটা আমাকে সচেতন করল।

গত আধ ঘণ্টায় কাকা বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করেছিলেন ঘুমের মধ্যেই। আমি অবাক হইনি। বয়স হলে মানুষের ঘুম পাতলা হয়। কিন্তু এবার তাঁর নিশ্বাসের আওয়াজটা আমার অন্যরকম লাগল। ওঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে জেনেও আমি ফ্ল্যাশলাইটটা ফেললাম খাটের ওপর। দেখলাম, কাকা ওপাশ ফিরে শুয়ে আছেন। আমি এবার ওপাশে গিয়ে সোজা কাকার মুখে আলো ফেললাম। যা দেখলাম, সেটা আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিল।

এলিহু হুইপলের ঘুমের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। সেই অবস্থায় তাঁর মুখে একটা গভীর প্রশান্তির ভাব থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি কাকার মুখে একটা অস্থিরতা দেখলাম। যেন... যেন কাকা আর নিজের মধ্যে নেই। বরং তাঁর শরীরের মধ্যে যেন বাসা বেঁধেছে অন্য অনেকে! তাদের ধাক্কাধাক্কি আর অস্তিত্বের লড়াই ফুটে উঠছে কাকার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, মুখে, আর খুলে-যাওয়া চোখে!

কাকা বিড়বিড় করতে শুরু করলেন। আমি প্রথমে কথাগুলো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই জড়ানো শব্দ আর নিচু গলার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস

বুঝতে পেরে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে কনকনে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

এলিহু হুইপল ফরাসি ভাষায় বিড়বিড় করছেন!

আমার জ্ঞানগম্যি কাকার তুলনায় কিছুই না। কিন্তু মানুষটার সাহচর্য পেয়েছিলাম বলে আরও একটা জিনিস বুঝতে পারলাম। প্যারির বিখ্যাত জার্নাল রেভ্যু দে দু মঁদ[119]-এর জন্য বিশ্বের ভয়ংকরতম কয়েকটা কিংবদন্তি অনুবাদ করেছিলেন কাকা। এই মুহূর্তে, এই অভিশপ্ত বাড়িতে ঘুমে, বা অজ্ঞান অবস্থায় তিনি সেগুলো থেকেই ছেড়ে ছেড়ে কয়েকটা কথা বলছেন।

হঠাৎ কাকার সারা মুখ জুড়ে ঘামের বিন্দু দেখা দিল। মনে হল, যেন একটা অমানুষিক লড়াই চলছিল ওঁর ভেতরে, যাতে সাময়িকভাবে কেউ পিছু হটেছে। কাকা ফরাসির বদলে ইংরেজিতে ফিরে এলেন, আর আর্তনাদ করে উঠলেন, "দম আটকে যাচ্ছে! আমার দম আটকে যাচ্ছে!" বলে। চোখ খুলে আমাকে দেখেই কাকা উঠে বসলেন। আমি ওঁর হাত ধরে ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। একটু শান্ত হয়েই কাকা মুখ খুললেন।

"আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।" বললেন কাকা, "একটা ভয়ানক স্বপ্ন! কিন্তু সেটা শুরু হয়েছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই। রোজকার কাজ বা কথাগুলো যেভাবে টুকরো টুকরো হয়ে ঘুমের মধ্যে ঘাই মারে, সেভাবেই... আর তারপর...!"

"তারপর?" কাকার দিকে জলের ফ্লাস্ক এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"তারপর চেনাজানা জিনিসগুলো অন্যরকম হয়ে যেতে লাগল! জানি, স্বপ্নে এরকম হয়। কিন্তু এবার মনে হচ্ছিল, যেন জিনিসগুলোর জ্যামিতি বদলে যাচ্ছে। সময় আর স্থান দুটোই যেন গলে গলে পড়ছে। একটা ছবির ওপর চেপে বসছে আর-একটা ছবি। সেটা অন্য জায়গার, না অন্য সময়ের... কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তার কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা আরও ভয়ানক হয়ে উঠল।"

"আপনি কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

"একবার মনে হল, যেন আমি একটা অগভীর গর্তের মধ্যে পড়ে আছি, আর বাইরে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মাথায় তেকোনা টুপি-পরা বেশ কিছু রাগি, হিংস্র লোক!" কাকার গলার কাছটা যেভাবে ওঠানামা করছিল, তাতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, কথাগুলো মনে করতে মানুষটির ইচ্ছে করছে না, "পরক্ষণেই মনে হল, যেন একটা

খুব পুরোনো বাড়ির মধ্যে আছি আমি, যার বাসিন্দারা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে! কিন্তু তার মধ্যেও একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম।”

“কী?”

“আমি যাদের দেখেছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকেই এই হ্যারিস পরিবারের মানুষ। আমি ওদের কয়েকজনকে চিনতাম, ছবিও দেখেছি। তাই ওদের মুখের আর চেহারার বিশেষত্ব চিনতে অসুবিধে হয়নি আমার। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল।”

“হ্যাঁ।” আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললাম, “আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার কি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল?”

“শুধু শ্বাস নিতে নয়।” কাকার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটল, “একাশি বছর বয়সি এই শরীরের সব ক-টা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন লড়াই করছিল। কার বিরুদ্ধে? জানি না। তবে কেউ, বা কিছু একটা আমার শরীর দখল করতে চেষ্টা করছিল ভীষণভাবে।”

আমি জানি, আপনারা কী ভাবছেন। এই বর্ণনা শুনে আমার চোখ থেকে ঘুম-টুম উড়ে যাওয়ার কথা, তা-ই না? কিন্তু বাস্তবে উলটোটাই হচ্ছিল। ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। বাধ্য হয়ে আমি লম্বা হলাম, আর কাকা আমার পাশে বসলেন একেবারে সোজা আর সজাগ হয়ে। ঘুমে আমি একেবারে তলিয়ে গেলাম। স্বপ্ন দেখাও শুরু হল প্রায় তক্ষুনি। কিন্তু স্বপ্নগুলো আদৌ সুখদায়ক ছিল না। অস্বস্তিতে, ভয়ে আমি চ্যাঁচাতে চাইছিলাম, অথচ পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, যেন আমি হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। আমার চারপাশে যেন এমন অজস্র মানুষের ভিড়, যারা আমাকে মারতে চাইছে! এমনকী কাকার মুখটাও যেন বিকৃত হয়ে আমাকে গিলতে আসছিল স্বপ্নে। শেষ অবধি একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার আমার শরীর-মন থেকে ঘুমের কম্বলটা ছুড়ে ফেলে দিল।

(৫)

কাকা যে চেয়ারে বসেছিলেন, শোয়ার সময় আমার মুখ ছিল তার উলটোদিকে। ফলে ঘুম ভেঙে আমি প্রথমে রাস্তার দিকের দরজা, উত্তরের জানলা, মেঝে, দেওয়াল, এমনকী সিলিং— এগুলো সবই দেখতে পেলাম। জিনিসগুলো আমার চোখে এতই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল, যেটা ওই অবস্থাতেও অস্বাভাবিক ঠেকল। ব্যাপারটা ভাবুন। রাস্তা থেকে আসা মলিন আলো, আর ঘরের মধ্যে ওই বিশ্রী ছত্রাক থেকে বেরিয়ে-আসা আবছা দ্যুতি— এই

দিয়ে তো বই পড়াও অসম্ভব ছিল। অথচ ওই মুহূর্তে আমার আর খাটের রীতিমতো ছায়া পড়ছিল সামনের দেওয়ালে! আলোটার মধ্যে একটা জোরালো, হলুদ ভাব ছিল। সেটার উৎস নিয়ে ভাবতে গিয়েই আমার খেয়াল হল, আরও দুটো অস্বাভাবিক জিনিস ঘটেছে ও ঘটছে।

প্রথমত, যে চিৎকারটা আমার ঘুম ভাঙিয়েছে, সেটা কাল্পনিক ছিল না। আমার কান তখনও সেই আওয়াজে একেবারে থরথর করে কাঁপছিল!

দ্বিতীয়ত, একটা বিকট গন্ধে আমার দম আটকে আসছিল।

এক লাফে খাট ছেড়ে উঠে আমি ওই যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে এগোলাম। পেছন ফেরার সময় একটা আশঙ্কা ছিল। ভাবছিলাম, না জানি কী দেখতে হবে এবার! কিন্তু যা দেখলাম...!

মাটি থেকে বাষ্পের মতো করে উঠে আসছিল একটা হলদেটে আলো। সেই আলোয় তীব্রতা ছিল, কিন্তু উষ্ণতা ছিল না। মৃত্যুর শীতলতায় ভরে-রাখা আলোটা একটা দানবিক ছত্রাকের মতো চেহারা নিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমি ওই আলোর মধ্যে কিছু একটা আধা-মানুষ, আধা-পিশাচ চেহারার আবছায়া অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। তার সারা শরীর জুড়ে রয়েছে ব্যঙ্গ আর খিদে! তার মধ্যে দিয়ে পেছনের চিমনি আর সিলিং দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু জিনিসটাকে হাওয়ার মতো কিছু ভাবতে পারছিলাম না। বরং ওটার ডিম্বাকার মাথাটা যেভাবে ভেঙে ভেঙে চিমনির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল, তা দেখে কোনও প্রকাণ্ড অজগরের কথাই মনে হয়।

আলোর কি গন্ধ হয়? হয় না। ওই গন্ধটার ফলেই আমি বুঝতে পারলাম, যেটা দেখছি, সেটা একটা দৈত্যাকৃতি ধোঁয়া বা কুয়াশার পুঞ্জ। মাটি থেকে উঠে এসে জিনিসটা পাক খাচ্ছে। আর তার ঘূর্ণনের কেন্দ্রে রয়েছে একজন মানুষ!

এলিহু হুইপল!

কাকার মুখে তাঁর শান্ত, সৌম্য ভাবের লেশমাত্র ছিল না তখন। বরং তাঁর গোটা শরীর ঢেকে যাচ্ছিল একটা কালচে ভাবে। আর তাঁর মুখে ফুটেছিল একটা ক্রূর হাসি, যা কিছু ভালো সেসবকে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যঙ্গ, আর... খিদে। ওইভাবেই কাকা... না, কাকার শরীরটাকে গ্রাস-করে-ফেলা ওই কুয়াশা আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমি পাগল বা অনড় হয়ে যাইনি। হয়তো এই বাড়িটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে নিজেকে মনে মনে এইরকম একটা মুহূর্তের জন্য তৈরি করছিলাম। মোদ্দা কথা হল, ওই ধোঁয়া বা জিনিসটা আমার দিকে এগোনোমাত্র আমি একটা জিনিস বুঝে ফেললাম। এই আলো বা ধোঁয়া আমাদের চেনাজানা দুনিয়ার কিছু নয়। তাই ফ্লেম-থ্রোয়ার দিয়ে এর কিস্‌সু করা যাবে না। বরং তার মধ্যে বন্দি আমার কাকাই পুড়ে খাক হবেন ওতে। তাই আমার কাছে থাকা অন্য অস্ত্রটি প্রয়োগ করতেই হচ্ছে।

প্রায় লাফিয়ে আমি যন্ত্রটার কাছে গেলাম। ক্রুকস টিউবগুলো নীলচে আলো আর একরাশ ফুলকি ছড়িয়ে ঝলসে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য মনে হল, হলুদ আলোর দীপ্তি কমে আসছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম ওটা স্রেফ চোখের ভুল। আদতে ওই যন্ত্রটা, আর তার থেকে হাওয়ায় ছড়িয়ে-পড়া কম্পন জিনিসটার ওপর কিছুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারছে না।

এরই মধ্যে আমি এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, যার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। দেখলাম, কাকা মাটিতে পড়ে গেছেন। কিন্তু কাকার শরীরটা জমাট না থেকে যেন গলে গলে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য সেটা জমাট বাঁধছে, আবার পরক্ষণেই শরীরটা ভেঙে থলথলে জেলি হয়ে যাচ্ছে! আমি ওই অদ্ভুত পিণ্ডের মধ্যে বহু নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধের আনাগোনা দেখলাম। মনে হল, কাকার শরীরটা যেন একটা প্রকাণ্ড শবাগারের মতো হয়ে গেছে, যেখানে মৃতেরা দলে দলে ঢুকছে, হয়তো তারপর অন্য কোথাও যাবে বলে! এক সেকেন্ডের জন্য হয়তো আমার কাকার শরীরটাও আমি তার মধ্যে মোচড়াতে দেখলাম। মনে হল, তিনি যেন ওই অবস্থাতেও আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। তারপর ডক্টর এলিহু হুইপল হারিয়ে গেলেন ওই আলো আর গন্ধের মধ্যে।

এই দৃশ্যটা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমিও কি কাকার উদ্দেশে বিদায় জানিয়েছিলাম? কী জানি! এটুকু মনে আছে যে, দরজা খুলে আমি কোনওক্রমে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে, রাস্তায়, বৃষ্টির মধ্যে। তারপর কী করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলাম— এগুলো সব ঝাপসা। যদ্দূর মনে পড়ে, আমি লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটেছিলাম। কলেজ হিলের[120] দক্ষিণ দিয়ে, এথেনিয়ামের[121] পাশে, হপকিন'স স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি অবশেষে ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছেছিলাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে। ভোরের ভেজা আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল বড় বড় বাড়ি। ওদের দেখে মনে হল, অতীতের অন্ধকার থেকে

উঠে-আসা ওই হলদেটে কুয়াশাই শেষ কথা নয়। বরং সমকালেরও একটা জোরালো উপস্থিতি আছে আমার চারপাশে।

ওই ধাক্কাটা দরকার ছিল। আমি ফিরে গেলাম বেনিফিট স্ট্রিটের ওই ঠিকানায়। দরজাটা তখনও খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকে মেঝেতে অজস্র ছোট ছোট ফুটো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। হতবুদ্ধির মতো আমি ঘরের সব কিছু দেখলাম। যন্ত্রপাতিগুলো, ফাঁকা খাটটা, উলটে-পড়া চেয়ার দুটো, কাকার মাথার টুপিটা— এগুলো সবই আমার চোখে ধরা পড়ল। কিন্তু কাকা বা ওই ভয়ংকর হলদেটে কুয়াশার কোনও চিহ্ন আমি খুঁজে পেলাম না। একবার মনে হল, সবটাই আমার স্বপ্ন ছিল না তো? কিন্তু কাকার টুপিটাই আমাকে মনে করিয়ে দিল, গত রাতের অভিজ্ঞতাটা স্বপ্ন ছিল না।

কী ছিল ওই জিনিসটা?

পুরোনো রেকর্ড থেকে পড়া একটা কথা মনে পড়ল। এক্সেটারের বাসিন্দা কিছু বুড়োবুড়ির বয়ান রেকর্ড করেছিলেন কাকা। তাদের বক্তব্য ছিল, কিছু খুব পুরোনো চার্চের লাগোয়া কবরখানার ওপর এক ধরনের কুয়াশা বা ধোঁয়া জমে মাঝেমধ্যে। তারা প্রাকৃতিক হয় না। বরং মানুষকে শুষে, নিংড়ে নেওয়ার জন্যই তাদের জন্ম হয়। সেই কথাগুলোর সঙ্গে আমি মেলালাম ফায়ারপ্লেসের পাশে তৈরি-হওয়া সেই অদ্ভুত চেহারার ছত্রাকটাকে।

মনে হল, পালটা মার দেওয়ার একটা উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি।

বাড়ি গেলাম। স্নান সারলাম। ফোনে কয়েকটা জিনিসের অর্ডার দিয়ে বললাম, পরদিন সকালে যেন সেগুলো বেনিফিট স্ট্রিটের ওই দরজার সামনে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারপর বিশ্রাম আর বই-পড়াতেই দিনটা কাটল। আমি জানতাম, খুব বড় কাজ করতে হবে পরদিন ওই জিনিসগুলো দিয়ে।

কী জিনিস?

শাবল আর বেলচা। মিলিটারি গ্যাস-মাস্ক। ছ-টা বড় কন্টেনারে ভরতি সালফিউরিক অ্যাসিড!



চিত্র ৭.৬ : আরও খুঁড়লে কী বেরোতে পারে ভেবে আমার হাত কাঁপছিল

পরদিন সকাল এগারোটায় আমি খুঁড়তে শুরু করলাম। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কারণ ঘরের ভেতরটা যেমনই হোক-না কেন, বাইরেটা রোদে ঝলমল করছিল। আমি একাই যা করার করছিলাম। হ্যারিসকে আমি কিচ্ছু বলিনি। ভয় ছিল, যদি ও আমাকে খোঁড়াখুঁড়ি না করতে দেয়! অনেক পরে আমি ওকে ব্যাপারটা খুলে বলেছিলাম, কারণ না বলে উপায় ছিল না।

আমার লক্ষ্য ছিল ফায়ারপ্লেসের পাশের অংশটা। ওখানকার কালচে, দুর্গন্ধযুক্ত মাটিটা খুঁড়তে খুঁড়তে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। যেখানেই আমার শাবলের ঘায়ে সাদা ছত্রাকগুলো ভেঙে যাচ্ছিল, সেখানেই বেরিয়ে আসছিল একটা দুর্গন্ধযুক্ত হলদে পুঁজের

মতো তরল! আরও খুঁড়লে কী বেরোতে পারে ভেবে আমার হাত কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, কিছু জিনিস মাটির গভীরে, অন্ধকারে থেকে যাওয়াই হয়তো ভালো। তবু আমি থামিনি।

গর্তটা গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলছিল দুর্গন্ধ। বেশ কিছুটা নীচে পৌঁছোনোর পর হঠাৎ খেয়াল হল, এতটা নীচ থেকেই যে জিনিস এমন মারাত্মক খেল দেখাতে পারে, একেবারে সামনে থেকে সেটা কতটা বিপজ্জনক আর বড় হবে! মুহূর্তের জন্য দারুণ ভয় আমাকে অসাড় করে দিল। কিন্তু সাহস আর একটা মরিয়া ভাব আমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করল। আমি লাফিয়ে গর্তটা থেকে উঠে এলাম। চারদিকে ছড়িয়ে-থাকা মাটির স্তূপটা গর্তের দু-পাশে এমনভাবে সরিয়ে রাখলাম, যাতে দরকার পড়লেই তা-ই দিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে দেওয়া যায়। অ্যাসিডের কন্টেনারগুলো হাতের নাগালে সাজিয়ে রাখলাম। ক্রমবর্ধমান গন্ধের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য গ্যাস-মাস্ক পরলাম। তারপর আবার খুঁড়তে শুরু করলাম।

তখন আমি প্রায় ছ-ফুট নীচে নেমে এসেছি। গর্তের কিনারা আমার গলার কাছাকাছি রয়েছে। হঠাৎ আমার শাবল মাটির বদলে একটা নরম কিছুতে আঘাত করল! ভয়ে আমার প্রায় দম আটকে গেল। মনে হল, এত দিন ধরে এতগুলো মানুষকে গ্রাস করেছে যে জিনিস, এখনই যদি সে আমাকেও...! তবু আমি পালাইনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বুঝলাম, সাহস ফিরে আসছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় নীচটা দেখতে দেখতে আমি শাবল চালাচ্ছিলাম। অবশেষে তাকে পেলাম।

যা দেখলাম, সেটার অন্তত ওই অংশটুকু মাছের মতো আঁশওয়ালা চেহারার। আবার কাচের মতো একটা তেলতেলে ভাবও আছে তাতে। মনে হচ্ছিল, যেন জেলির মতো একটা কিছু ভাঁজ হয়ে রয়েছে ওখানে। সেই ভাঁজ বরাবর জমে গেছে তার শরীর থেকে বেরোনো রস। অনেকটা জায়গা ফাঁকা করে মনে হচ্ছিল, একটা সিলিন্ডারের মতো চেহারার জিনিসটা। প্রায় দু-মিটার ব্যাসের ওই বস্তুর অত কাছে দাঁড়িয়ে আমার স্নায়ু প্রায় ছিঁড়ে পড়ছিল ভয়ে। তবে আমি পাগলামো করিনি। বরং ঠান্ডা মাথায় গর্তটা থেকে উঠে এসেছিলাম। তারপর অ্যাসিডের পাত্রগুলো একে একে খালি করতে শুরু করেছিলাম গর্তের মধ্যে।

গর্ত থেকে উঠে-আসা হলদেটে-সবুজ রঙের আর বীভৎসতম গন্ধের সেই কুয়াশাকে আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না। অ্যাসিডের প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল সেই

গন্ধের দাপট। লোকে এখনও ‘হলদে দিন’-এর কথা বলে, যে দিন নাকি প্রভিডেন্স নদীতে কারখানার আবর্জনা পড়ে গন্ধ আর ধোঁয়ায় এলাকা ভরিয়ে রেখেছিল বহু দূর অবধি। তারা কারখানার বেশ কিছু যন্ত্র বিগড়ে যাওয়ার ফলে তৈরি-হওয়া বিকট গর্জনের কথাও বলে।

সত্যিটা শুধু আমি জানি।

ছ-নম্বর কন্টেনারটা খালি করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ওই পূতিগন্ধ আর অ্যাসিডের ঝাঁজ মাস্ক পেরিয়ে আমার নাগাল পেয়ে গিয়েছিল প্রায়। তবে জ্ঞান ফিরে আসার পর বুঝেছিলাম, নতুন করে আর কিছু উঠে আসছে না গর্ত থেকে। তারপর আমি মাটি ফেলে গর্তটা ভরাট করা শুরু করি। প্রায় সন্ধে নাগাদ আমার লড়াই শেষ হয়। হ্যাঁ, মাটিতে তখনও ভিজে ভাব ছিল। দেওয়ালে তখনও নোনা আর ছাতার দাগ ছিল। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, যে জিনিসটা ওই জায়গাটা বিষিয়ে রেখেছিল, তা আর নেই। যে নরক থেকে ওটা এসেছিল, হয়তো সেখানেই তাকে ফেরাতে পেরেছি আমি।

মেঝেটা সমান করার সময় আমি অবশেষে কাঁদতে পারলাম। আমার কাকার জন্য, এই বাড়ির বাসিন্দা হয়ে যত মানুষ ওই অশুভ জিনিসটির শিকার হয়েছিল, তাদের জন্য, হয়তো নিজের জন্যও... কারণ আর কখনও আমি পৃথিবীকে সহজ চোখে দেখতে পারব বলে মনে হয় না।

পরের বসন্তে আর ছত্রাক বা সাদা ঘাস নয়, বরং স্বাভাবিক ঘাস মাথা তুলল বাড়ির পেছনের জমিটায়। বাগানের বন্ধ্যা গাছগুলোয় ফুল ফুটল, পাখিরা বাসা বাঁধল, ফলও হল। ক্যারিংটন হ্যারিস বাড়িটা ভাড়াও দিতে পারলেন।

ডক্টর এলিহু হুইপল সারাজীবন কুসংস্কারের কথা উঠলেই নাক কুঁচকে বলতেন, “সব ঝুট হ্যায়!” বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে দিন মনে হল, তাঁর কথার সূত্র ধরে আমি অন্তত ওই অশুভ জিনিসটাকে এই বাড়ি থেকে দূর করতে পেরেছি। বলতে পেরেছি, “তফাত যাও!”



প্রথম প্রকাশ: *গল্পটি 'উইয়ার্ড টেলস' ম্যাগাজিনের অক্টোবর* ১৯৩৭ *সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।*

ভাষান্তর: *ঋজু গাঙ্গুলী*



ইন দ্য ভল্ট

এই গল্পের সূত্র লাভক্র্যাফটকে দেন 'ট্রাই আউট' পত্রিকার সম্পাদক চার্লস ডব্লিউ স্মিথ। ১৯২৫ সালে 'উইয়ার্ড টেলস' পত্রিকা গল্পটি বাতিল করে দেয় গল্পে প্রচণ্ড হিংস্রতা থাকা অভিযোগে। 'ট্রাই আউট' গল্পটি প্রকাশ করলেও 'ঘোস্ট স্টোরিজ' নামের এক পাল্প পত্রিকায় গল্পটি পরে জমা দেন লাভক্র্যাফট। সেখানেও গল্পটি অমনোনীত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালে গল্পটি ছাপে 'উইয়ার্ড টেলস'।

শবঘর[122]

(In the Vault)



এরকম অবাস্তব আর কিছু কখনও শুনিনি। সাধারণ একজন মানুষের মনস্তত্ত্বে এরকম অদ্ভুত কিছু একটা বাসা বেঁধেছে তা ভাবাও যায় না। আমেরিকান গ্রাম্য পরিবেশ, একটা ষণ্ডামার্কা কবরখানার কর্মচারী আর অনবধানবশত ঘটে-যাওয়া একটা দুর্ঘটনা। যে-কোনও সাধারণ গল্প-বলিয়ে এর থেকে একটা স্থূল রকমের হাস্যরসের গল্প টেনে বার করতে পারত। কিন্তু জর্জ বার্ক যে কীভাবে... লোকটা নিজের জীবন দিয়ে যে পঙ্কিল অন্ধকারকে উপলব্ধি করেছে, তার কাছে আমাদের জীবনের কদর্যতম মুহূর্তগুলিকেও অত্যন্ত ফ্যাকাশে লাগে। আজ জর্জ বার্কের মৃত্যু আমাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার সম্মতি দিয়েছে এই গল্পটা। এই দুনিয়ার এক চরমতম ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

১৮৮১ সাল নাগাদ বার্ক যে কেন হঠাৎ নিজের আদি ব্যাবসা আর বাসস্থান পরিবর্তন করল তা কেউই জানত না। ব্যাপারটা নিয়ে সে কখনওই কারও সঙ্গে কথা বলেনি। জানতেন শুধু তার পুরোনো ফিজিশিয়ান ডক্টর ডেভিস। বেশ কিছু বছর আগেই ডক্টর ভদ্রলোক খবরটা সঙ্গে করে কবরে গেছেন। ডক্টর ডেভিসের মৃত্যুর পরে বার্কের কাউকে দরকার ছিল কথাগুলো বলার। তার বিয়েও হয়নি, দুই কূলে কোনও আত্মীয়স্বজনের

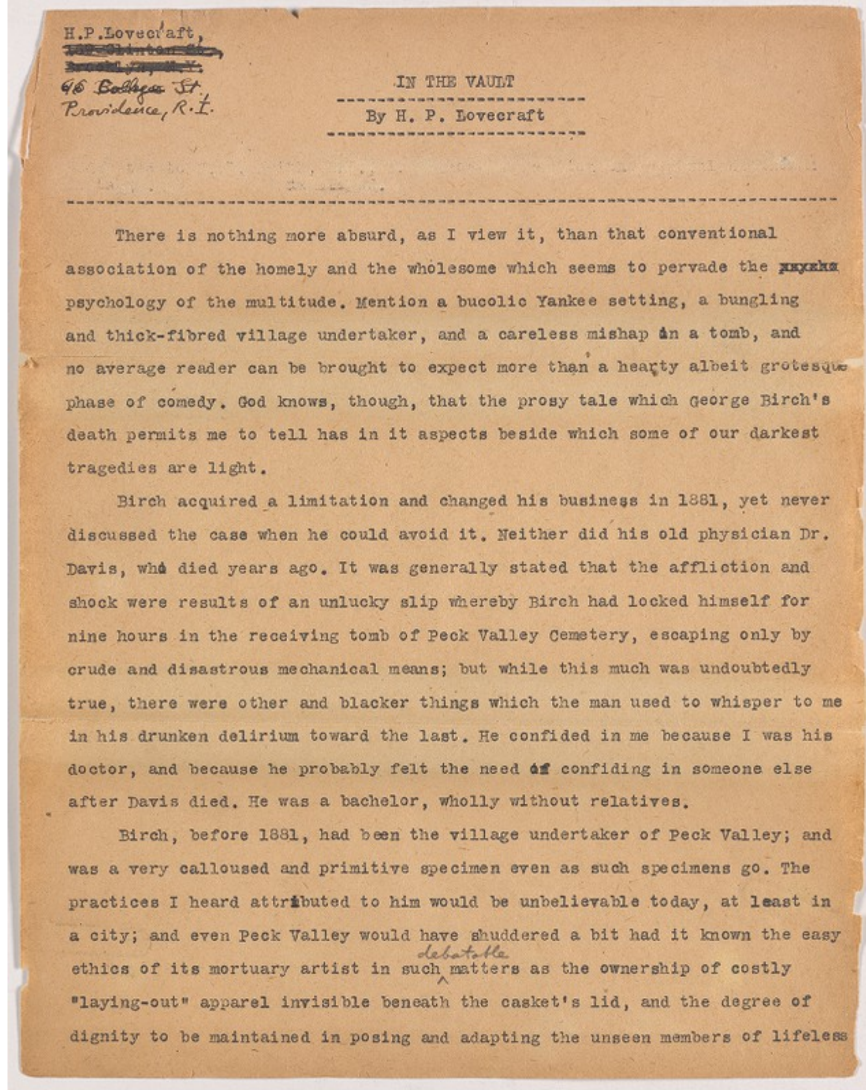
চিহ্নও ছিল না। এমত অবস্থায় নিজের ডাক্তার ছাড়া আর কাকেই বা সে কথাগুলো জানাবে?

সাধারণ মানুষ জানত, ওই দুর্ভাগ্যবশত ঘটে-যাওয়া ঘটনাটাই বার্ককে মানসিকভাবে বিগড়ে দিয়েছিল। যতই শক্তপোক্ত মানুষ হোক, প্রায় নয় ঘণ্টার জন্যে পেক ভ্যালি সিমেট্রির শবঘরে বন্দি থাকা আর শেষ পর্যন্ত ওইরকম সর্বনাশা পদ্ধতিতে রাস্তা বানিয়ে বেরিয়ে আসা! নাহ্, গল্পটা যে-কোনও সাধারণ মানুষের আঁতকে ওঠার জন্যেই যথেষ্ট। কিন্তু ওই সত্য গল্পের পেছনে ছিল আরও কিছু ভয়ংকর সত্য, যা মানুষটা মদের ঘোরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার কানের কাছে ফিশফিশ করে বলে গেছে।

১৮৮১-র আগে জর্জ বার্ক পেক ভ্যালি[123] গ্রামের কবরখানার কর্মচারী ছিল। বার্ককে যে শুধুই অপেশাদার বলা যায় তা-ই নয়, সে নিজের কাজেও যথেষ্ট অমনোযোগী ছিল। শবাগারের মধ্যে যে কাজ সে করেছিল তা আজকের দিনে অকল্পনীয়, অন্তত শহরের বুকে। পেক ভ্যালির লোকজনও যদি ওটা শুনত, তাহলে তারা ভয়ে শিউরেই উঠত, যে তাদের শবাধার শিল্পীর নীতিবোধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক বন্ধ কফিন বক্সের ভেতরের কাপড়ের মতোই দৃষ্টির অগোচর ছিল। মৃতদেহের প্রতি লোকটার ভদ্রতাবোধ কখনও কখনও সঠিক তুল্যমূল্য বিচার করে চলত না। খুব ঠিকঠাকভাবে বলতে গেলে গন্ডারের চামড়াওয়ালা বার্ক ছিল আদতে স্থূলরুচিসম্পন্ন আর অপেশাদার, তবুও আমি বার্ককে খুব শয়তান মানুষ হিসাবে ভাবতে পারিনি। সে খানিকটা মোটা মাথার মানুষ ছিল—অনুভূতিশূন্য, অসাবধান এবং মাতাল। তার অ্যাক্সিডেন্টটাই এটা প্রমাণ করে দেয়। ওই অ্যাক্সিডেন্টটা সে অতি সহজেই এড়াতে পারত। আসলে তার মধ্যে সাধারণ মানুষের রুচি, নীতিবোধ, এমনকী কল্পনাশক্তির বিন্দুমাত্রও ছিল না।

পারদর্শী গল্প-বলিয়ে হলে এসব উলটোপালটা না বলে, বার্কের গল্পটা আমি বেশ জমিয়েই শুরু করতে পারতুম। গল্পটা শুরু হয়েছিল ১৮৮০ সালের[124] সেই শীতল ডিসেম্বর মাস থেকে। সেইবার এতই ঠান্ডা পড়েছিল যে, পেক ভ্যালি গ্রামের মাটিও জমাট বেঁধে গিয়েছিল শক্ত বরফের মতোই। কবরখানার খোদাইকর্মীরা বুঝতে পারছিল, তারা বসন্ত না-আসা পর্যন্ত আর কবর দেওয়ার জন্যে মাটি কাটতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে গ্রামটা ছিল ছোট। মৃত্যুহারও আনুপাতিকভাবে কমই ছিল। বার্কের দায়িত্বে থাকা প্রাণহীন

পদার্থগুলিকে একটা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গলাভের ব্যবস্থার জন্য, পাহাড়ের গায়ে একটা গুহাকে শবঘর বিবেচনা করে, তার মধ্যে তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করা হল।



H.P.Lovecraft,
[illegible]
[illegible]
66 College St.
Providence, R.I.

IN THE VAULT

By H. P. Lovecraft

There is nothing more absurd, as I view it, than that conventional association of the homely and the wholesome which seems to pervade the xxxxx psychology of the multitude. Mention a bucolic Yankee setting, a bungling and thick-fibred village undertaker, and a careless mishap in a tomb, and no average reader can be brought to expect more than a hearty albeit grotesque phase of comedy. God knows, though, that the prosy tale which George Birch's death permits me to tell has in it aspects beside which some of our darkest tragedies are light.

Birch acquired a limitation and changed his business in 1881, yet never discussed the case when he could avoid it. Neither did his old physician Dr. Davis, who died years ago. It was generally stated that the affliction and shock were results of an unlucky slip whereby Birch had locked himself for nine hours in the receiving tomb of Peck Valley Cemetery, escaping only by crude and disastrous mechanical means; but while this much was undoubtedly true, there were other and blacker things which the man used to whisper to me in his drunken delirium toward the last. He confided in me because I was his doctor, and because he probably felt the need of confiding in someone else after Davis died. He was a bachelor, wholly without relatives.

Birch, before 1881, had been the village undertaker of Peck Valley; and was a very calloused and primitive specimen even as such specimens go. The practices I heard attributed to him would be unbelievable today, at least in a city; and even Peck Valley would have shuddered a bit had it known the easy ethics of its mortuary artist in such debatable matters as the ownership of costly "laying-out" apparel invisible beneath the casket's lid, and the degree of dignity to be maintained in posing and adapting the unseen members of lifeless

চিত্র ৮.১ : "ইন দ্য ভল্ট" গল্পের টাইপ করা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

শবঘরের একমাত্র কর্মী বার্ক এই নিদারুণ ঠান্ডা আবহাওয়ায় দ্বিগুণ জবুথবু হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, অলসতায় সে নিজেই নিজেকে টেক্কা দেবে। শবঘরের মধ্যে হাঁটতে গেলেই সে কফিনগুলোয় অনবরত ঠোকা খাচ্ছিল। কোনওরকম সাবধানতা ছাড়াই শবঘরের দরজার পাল্লা দুটোকে দুমদাম করে বন্ধ করছিল।

অবশেষে বরফ-গলানো বসন্ত এল। অনেক পরিশ্রমে নয়খানা কবর খোঁড়া হল কবরখানায়, বহুপ্রতীক্ষিত নয়জন স্বর্গলোভীর কবর, যারা শবঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল, তাদের যাত্রা শুরুর জন্যে। এক দুর্যোগপূর্ণ এপ্রিলের সকালে বার্ক জড়তা কাটিয়ে উঠে কাজ শুরু করল বটে, কিন্তু ঘোড়াটার ত্যাঁদড়ামির চোটে মোটে একটামাত্র কফিনই কবর দিতে পারল। নব্বুই বছরের বুড়ো দারিয়াস পেকের কফিনটা।

বার্ক অবশ্য ভেবেছিল, পরের দিনই ম্যাথু ফেনারকে কবর দিয়ে দেবে। কিন্তু আলসেমি আর ভাগ্য দুইয়ে মিলে বার্ক তিন দিনের আগে কাজে হাতই দিতে পারল না। ১৫ তারিখ গুড ফ্রাইডের দিন সে ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে খুটখুট করে পাহাড়ে উঠল, শবঘরের উদ্দেশে। মাথ্যু ফেনারের কফিনটাকে কবর দিয়ে দেওয়াই যাক। গুড ফ্রাইডের দিন কাজ করা উচিত নয়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হয়ে সে ফেলে-রাখা কাজটা চুকিয়ে দিতে গেল। অবশ্যই সেই দিনের সন্ধের ঘটনাই জর্জ বার্কের জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

১৫ এপ্রিল, শুক্রবার বিকেলে সে সামান্য মদও খেয়েছিল। পরে সে এটা স্বীকার করেছিল। যদিও এখনকার মতো সব ভুলে যাওয়ার মতো পাঁড়মাতাল সে তখন হত না, সে কথাও বলেছিল। সে দিন তার উদোমাদাভাবে গাড়ি চালানোটাই ঘোড়াটাকে যথেষ্ট বিরক্ত করে তুলছিল। বেশ কয়েকবার চিঁহি ডাক ছেড়ে, খুর ঠুকে, কেশর নাচিয়ে বিরক্তির চরম সীমায় গিয়ে ঘোড়াটা কোনওমতে গাড়িটাকে টেনে টেনে পাহাড়ের কাছে নিয়ে এসেছিল। অবশ্য আগের দিনের মতো সেই দিন বৃষ্টি হচ্ছিল না, বিকেলটা বেশ পরিষ্কারই ছিল। কিন্তু পাহাড়ের কাছে আসতেই একঝলক ঝোড়ো হাওয়া টিলাটাকে ঘিরে দাপিয়ে উঠল।

বার্ক বেশ খুশি হল যে, ঝড়বৃষ্টি আসার আগেই সে শবঘরের ছাদের তলায় ঢুকে যেতে পারবে। অন্য কেউ হলে হয়তো ওই ড্যাম্প-ধরা, দুর্গন্ধযুক্ত চেম্বারের মধ্যে আশ্রয়ের লোভে ঢোকার কথা স্বপ্নেও ভাবত না। অন্তত যেখানে আটখানা কফিন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সেই সময় বার্ক এতটাই সংবেদনহীন ছিল যে, ওইসব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তার কিছু যেত-আসত না। সে শুধু চিন্তিত ছিল সঠিক কফিনটাকে সঠিক কবরে ঢোকানো নিয়ে। আগের বার ঘটিয়ে-ফেলা কাণ্ডটা সে একদমই ভোলেনি। কী কেলেঙ্কারি! সেইবার যখন হানাহ্ বিক্সবির আত্মীয়রা চেয়েছিল তাঁর দেহটাকে অন্য

এক শহরে নিয়ে যেতে, যেহেতু তারাও এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কবর খুঁড়ে হানাহ্ বিক্সবির হেডস্টোনের তলায় পাওয়া গিয়েছিল জাজ ক্যাম্পয়েলের কফিন বক্স। খুব গোলমাল আর সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সেইবার তাকে ঘিরে। আর যা-ই হোক-না কেন, ওইরকম ভুল যেন আর না হয়। বার্ক দরজাটা খুলে শবঘরের মধ্যে ঢুকল।

আলোটা টিমটিম করে জ্বলছিল। তাতে অবশ্য বার্কের দেখতে কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। সে আসাফ সইয়ারের কফিনটা টানেনি। যদিও সেটা প্রায় একই রকমের দেখতে ছিল। তার স্পষ্ট মনে আছে, ওই কফিনটা সে ম্যাথু ফেনারের জন্যেই বানিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরিয়ে রেখেছিল ওই বিশ্রী ঠুনকো কাঠের তৈরি কফিনটাকে। এই ব্যাপারটার পেছনে অবশ্যই তার প্রায় হারিয়ে-যাওয়া অনুভূতিটুকু কাজ করেছিল। পাঁচ বছর আগে যে ব্যাঙ্কে সে সমস্ত টাকা গচ্ছিত রাখত, ওটার গণেশ ওলটানোর সময় ওই বৃদ্ধ তাকে কতটা সাহায্য করেছিল। বৃদ্ধ ম্যাথু ফেনারের কফিনটা যতটা যত্ন সহকারে বানানো সম্ভব, সে বানিয়েছিল। আর পরক্ষণেই সমস্ত অনুভূতি শিকেয় তুলে, হিসেবি মানুষের মতোই সরিয়ে-রাখা ওঁচা কফিনটাতে মৃত আসাফ সইয়ারকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বার্ক।

ম্যালিগন্যান্ট জ্বরে মৃত সইয়ার মোটেও ভালো মানুষ ছিল না। ব্যক্তিগত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে লোকটার অনমনীয় স্মৃতিশক্তি এবং অমানুষিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা; তাকে ঘিরে প্রচুর গল্প তৈরি করেছিল। অবশ্যই তার প্রতি বার্কের কোনওরকম ভাবালুতা ছিল না। এমনকী একটা ফেলে-রাখা, মাপ নিয়ে তৈরি না-করা কফিনে সইয়ারের মৃতদেহকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বার্কের কোনওরকম অনুশোচনা ছিল না।

যেইমাত্র সে ম্যাটের কফিনটা চিহ্নিত করেছে, অমনি জোর হাওয়ায় শবঘরের দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরটা আগের থেকেও বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বার্ক হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল। দরজার ওপরে শিক-লাগানো হাওয়া চলাচলের অংশটা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা আসছিল।

সেই শবতুল্য পাংশু গোধূলির আলোতে বার্ক দরজার জং-ধরা হুড়কোটা ধরে ঘড়ঘড় শব্দ করে টানাটানি করতে লাগল। ধাক্কা দিতে লাগল লোহার পাল্লায়। সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকল, এই বিশাল দরজাটার এমন কী হল, যে ব্যাটা এত অবাধ্য হয়ে উঠেছে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোধূলির ম্লান আলোতে সে অনুভব করতে শুরু করল সত্যটা। এইবার বার্ক গলা ছেড়ে চিৎকার করতে শুরু করল। অবশ্য ওই জনহীন প্রান্তরে গুড

ফ্রাইডের বিকেলবেলা মানুষের আসার সম্ভাবনা এতই কম; বার্কের মনে হচ্ছিল, সে যেন এই আশায় চিৎকার করছে যে, বাইরে থেকে তার ঘোড়াটা যেন সহানুভূতিহীন হ্রেষাধ্বনি করা ছাড়া আরও কিছু করতে পারে। অবশ্যই শবঘরের প্রতি দীর্ঘ অবহেলায় দরজার হুড়কোটা ভেঙে গিয়েছিল। এই উদাসীন কর্মচারীটি নিজেই নিজের ভুলে শিকার হয়ে আটকে পড়ল শবঘরের মধ্যে।

ঘটনাটি ঘটেছে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। বার্ক তার বাস্তববাদী স্বভাবের জন্য বেশিক্ষণ চিৎকার করল না। সে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শবঘরের মধ্যে যেখানে কফিন বানানোর যন্ত্রপাতি রাখা ছিল, সেগুলো খুঁজতে শুরু করল। এই ভয়ংকর অবস্থাটার আতঙ্ক এখনও তাকে ছুঁতে পারেনি। কিন্তু গুড ফ্রাইডের দিনে জনমানুষহীন এই প্রান্তরে শবঘরের মধ্যে আটকা পড়ার সত্যটা তাকে ক্রমশই রাগিয়ে তুলছিল। একে তো তার সেই দিনের কাজেরও বারোটা বেজে গেল। এখন হয়তো তাকে সারারাত অথবা কালকের দিনটাও এইখানে বন্দি থাকতে হবে! যতক্ষণ না ভাগ্য সদয় হয়ে কাউকে নিয়ে আসে এই রাস্তায়।

যন্ত্রপাতিগুলো খুঁজে পেতেই বার্ক কাজে লেগে গেল। একটা ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে সে আবার কফিনগুলোর মধ্যে দিয়ে দরজার দিকে ফিরে এল। ইতিমধ্যে বদ্ধ ঘরের বাতাস ক্রমে দুর্গন্ধে ভ্যাপসা হতে শুরু করেছে। কিন্তু মরচে ধরে ক্ষয়ে-যাওয়া ভারী হুড়কোটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সে মাথাই ঘামাল না। অবশ্যই কাজটা আরও ভালোভাবে করা যেত, যদি একটা লন্ঠন বা মোমবাতি থাকত। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে প্রায় অন্ধভাবেই সে কোনওরকমে হুড়কোটাকে ঢিলে করার চেষ্টা করতে লাগল।

যতক্ষণে বার্ক বুঝতে পারল, এই অন্ধকার অবস্থায় এই সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে এই হুড়কোটাকে কোনওভাবেই নড়ানো সম্ভব নয়, ততক্ষণে অন্ধকার জমিয়ে নেমে এসেছে। এবার বার্ক মুক্তির অন্য সম্ভাবনাগুলোর কথা ভাবতে লাগল।

এই শবঘর একটা পাহাড়ের প্রান্তদেশ খনন করে তৈরি করা হয়েছিল। বায়ুচলাচলের চিমনিটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েক ফুট খাড়া উঠে গিয়ে তবে বাইরে বেরিয়েছে। ওই চিমনি বেয়ে ওঠা কোনওমতেই সম্ভব নয়। দরজার ওপরে, অনেকটা উঁচুতে ইটে গাঁথা সরু সরু জানলা, যেটা বার্কের পক্ষে ভেঙে বড় করা সম্ভব।

জানালাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বার্ক মাথা চুলকে টাক করে ফেলল। কীভাবে অত উঁচুতে পৌঁছোনো যায়? শবঘরের মধ্যে কোনওরকম মইয়ের মতো কিছু ছিল না। কফিনগুলো যত্ন করে ঘরের দু-পাশে এবং পেছনদিকে মেঝের ওপরে রাখা ছিল, যেখান থেকে ওগুলোকে টেনে বার করতে বার্কের বেশ অসুবিধা হত।

এবার জানালাটা ছেড়ে বার্ক ঘরের কফিনগুলোর প্রতি মনোযোগ দিল। একমাত্র এগুলোকে দিয়েই সিঁড়ি বানানো সম্ভব। বার্ক হিসাব কষে দেখল, তিনটে কফিন উপর্যুপরি সাজালেই সে পৌঁছোতে পারবে জানালার কাছে। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তাকে ওই জানালাটা কাটতে হবে। কাজটা ভালোভাবে করার জন্যে উপর্যুপরি চারটে কফিন সাজালে ব্যাপারটা সিঁড়ি হিসাবে আরও সন্তোষজনক হয়। বাক্সগুলো উচ্চতায় প্রায় সমান। এদেরকে ইটের মতো স্তূপাকারে সাজানো সম্ভব। এবার বার্ক খুব গভীরভাবে হিসাব করতে শুরু করল, কীভাবে আটটা মাত্র কফিন দিয়ে চারটে দৃঢ় স্তর তৈরি করা সম্ভব। ছক কষার সময় তার মনের মধ্যে একটু ভয়-ভয় করছিল, অবশ্য সেটা কফিন বক্সে ব্যবহৃত কাঠের দৃঢ়তা নিয়ে। স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় পায়ের তলার বক্সগুলো খালি কি ভরতি, সেটা তার কল্পনাতেও আসেনি।

অবশেষে হিসাব ছকা হয়ে গেল। তিনটে বাক্সকে দেওয়ালের সমান্তরালে ভিত্তি হিসাবে সাজাবে, তার ওপরে দুটো স্তরে দুটো-দুটো করে বাক্স রাখবে, একদম শেষে সবার ওপরে একটি বাক্সকে প্ল্যাটফর্ম হিসাবে রাখবে। ওপরে ওঠার এই বন্দোবস্তটাই সব থেকে কম ঝামেলার। এতেই দিব্যি সঠিক উচ্চতা ওঠা যাবে। যদিও বার্ক ভাবছিল, এই সুপার স্ট্রাকচারটার তলায় যদি তিনটের বদলে দুটো বাক্স রাখা যায় তাহলে তার হাতে আরও একটা বাক্স বাড়তি থাকে। আসলে পালাবার জন্যে যদি আরও বেশি উচ্চতার দরকার হয়, তাহলে সে সেটাকে ব্যবহার করতে পারবে।

যা-ই হোক, এবার আমাদের বন্দি প্রায় মিলিয়ে আসা গোধূলি আলোতেই পরিশ্রম করে চলল। নিঃসাড় মৃতদের অবশিষ্টাংশের বাসস্থানগুলোকে সরানোর সময় সে ঘন ঘন ক্রুশ এঁকে নিচ্ছিল বুকের মধ্যে। নাড়াচাড়া করার সময় কিছু কফিন খুলে যেতে শুরু করল। যাতে ওপরে ওঠার সময় পায়ের তলার বাক্সটা ভেঙে না যায়, তাই সে ঠিক করল, বেঁটেখাটো ম্যাথু ফেনারের শক্তপোক্ত আধারটিকে সে একদম ওপরেই রাখবে। এই আলো-আঁধারির মধ্যে সে কফিনগুলো স্পর্শ করে করে সঠিক কফিনটা বোঝার চেষ্টা

করছিল। তৃতীয় স্তরে সে যখন বোকার মতোই নির্বাচিত একটা কফিনকে রাখছিল, তখন হঠাৎ অসতর্কভাবেই কফিনটা উলটে পড়ে যায়। কোনওমতে কফিনগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে একসময় বার্ক ঠিক তার টাওয়ার অব ব্যাবেল[125] তৈরি করে নিল।

অবশেষে টাওয়ার তৈরি শেষ হল। ব্যথা-হয়ে-যাওয়া হাত দুটোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে বার্ক এবার থামল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে এসে বসল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বার্ক আবার তার যন্ত্রপাতি দুটো হাতে নিয়ে ধাপগুলো চড়ে দরজার ওপরের ছোট জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট জানালাটার চারপাশ ইটে গাঁথা। জানালাটা ছেনি দিয়ে ভেঙে ওই ফোকর গলে বের হওয়াটা খুব একটা সহজ হবে না বলেই মনে হচ্ছিল। দমাদম হাতুড়ির বাড়ি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘোড়াটা উচ্চকিত স্বরে ডাকতে শুরু করল। হ্রেষাধ্বনি উৎসাহপ্রদানকারী নাকি ব্যঙ্গাত্মক, বার্ক ঠাওর করতে পারল না। অবশ্য দুটোই উপযুক্ত ছিল তৎকালীন অবস্থায়। ওই আপাত সহজ ইটের গাঁথনিটার অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা জীবিত মানুষটার আশার ওপরে হাতুড়ির ঘায়ের মতোই দমাদম আঘাত হানছিল।

সন্ধ্যা নেমে এল। বার্ক তখনও লড়ে যাচ্ছে জানালার সঙ্গে। আকাশে সদ্য গজানো মেঘের দল চাঁদটাকে ঢেকে দেওয়ার পরে অন্ধের মতোই বার্ক কাজ করে যাচ্ছিল। সাফল্যের গতি অবশ্য খুবই ধীর ছিল। অবশেষে জানালাটার ওপরে আর নীচের খানিক অংশকে ইটমুক্ত করতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হল বার্ক। সে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিল, যে মধ্যরাত্রির আগেই ছাড়া পেয়ে যাবে। অবশ্য এই চিন্তাটা সে সুস্থভাবেই করছিল। এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশের আতঙ্ক তখনও তার হৃদয়কে গ্রাস করতে পারেনি। ওই বিশ্রী ভূতুড়ে স্থান, অলৌকিক সময়, এমনকী তার পায়ের নীচে থাকা পরপারে বন্ধুদের ঘরবাড়ি কোনওটাই তাকে ছুঁতে পারছিল না। সে প্রায় দার্শনিক উদাসীনতায় পাথুরে ইটগুলোকে ভেঙে ফেলছিল। গালাগালি দিচ্ছিল, যখন ইটের টুকরো ছিটকে এসে মুখে লাগছিল। আবার হেসে উঠছিল, যখন বাইরের উত্তেজিত ঘোড়াটাকে গিয়ে আঘাত করছিল ইটের টুকরোগুলো। ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সাইপ্রাস গাছের[126] তলায়। আস্তে আস্তে গর্তটা বড় হচ্ছে দেখে সে পায়ে চাপ দিয়ে নিজের শরীরটা ওর ভেতর দিয়ে গলানোর একটা প্রচেষ্টা করল। আর তক্ষুনি পায়ের তলার কফিনগুলো কড়কড় করে নড়ে উঠল। কিন্তু তার

শরীরটা গর্ত অবধি পৌঁছোল না। সে বুঝতে পারল আরেকটা কফিনের উচ্চতা প্রয়োজন ওই গর্ত দিয়ে শরীর বার করতে গেলে।

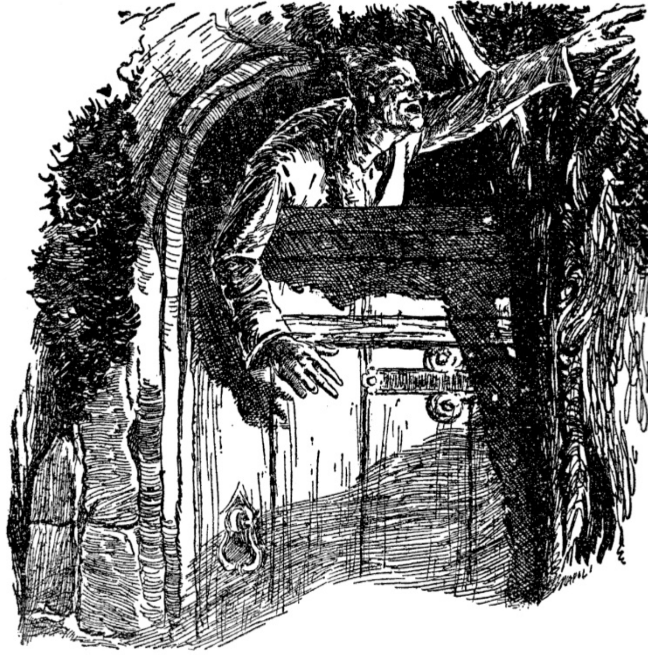
তখন প্রায় মধ্যরাত্রি হবে, যখন বার্ক সিদ্ধান্ত নিল যে, সে এবার জানালা দিয়ে বেরোতে পারবে। অনেকবার বিশ্রাম নেওয়া সত্ত্বেও সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঘেমে-নেয়ে উঠেছে। বাইরের খোলা প্রকৃতিতে বেরোনোর আগে সে একবার কফিনগুলো বেয়ে নীচে নেমে এল। একদম তলার কফিনের ওপরে বসে সে শেষ ঝাঁপটা দেওয়ার শক্তি অর্জন করছিল। বাইরে ক্ষুধার্ত ঘোড়ার ঘন ঘন হ্রেষাধ্বনিটা পরিবেশের গা-ছমছমে ভাবটা ক্রমে বাড়িয়ে তুলছিল। এতক্ষণে সে একবার অস্পষ্টভাবে প্রার্থনা করল, এই আওয়াজটা যেন থেমে যায়। তার আসন্ন মুক্তিতে খুব অদ্ভুতভাবেই সে একদমই গর্ব বোধ করছিল না। বরং, এই যৌবনের প্রান্তদেশে পৌঁছোনো অলস গেঁতো দেহটা এতখানি পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করে ফেলেছে দেখে তার কেমন যেন একটু ভয়ই লাগছিল।

বার্ক আবার চড়তে শুরু করল। ক্লান্ত দেহের ওজনটা তার নিজের কাছেই খুব বেশি বলে মনে হচ্ছিল। এতক্ষণে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চাপে কফিনগুলো প্রায় ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে যখন সে একদম ওপরের কফিনটার ওপরে উঠল, সে স্পষ্ট শুনতে পেল, পায়ের তলার কফিনটা চড়চড় করে শব্দ তুলে ভাঙছে। সে অনেক ভেবেচিন্তেই সবার ওপরে সবচেয়ে শক্ত কফিনটা তুলেছিল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল, তার এতক্ষণ ধরে করা সমস্ত পরিকল্পনাই জলে যেতে বসেছে।

সহসা একদম ওপরের কফিনের পচা ঢাকনা ভেঙে তার সমস্ত শরীরটা দু-ফুট নীচে নেমে এল। বার্কের মতো মানুষও কল্পনা করতে পারল না, এখন তার 'পায়ের তলায় কী আছে', সেই সত্যটা। বিশ্রী পচা গন্ধ এক লহমায় বাইরের বাতাসকে দখল করে নিল। ওই গন্ধে নাকি কাঠ ভাঙার ভয়ংকর শব্দটাতেই ঘোড়াটা মারাত্মক লাফিয়ে উঠে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালাল। এমন উন্মাদের মতো চিৎকার করছিল জন্তুটা, যাকে হ্রেষাধ্বনির বদলে আর্তনাদ বলাটাই ভালো। যেন খুরে খুরে পিষে ফেলতে চাইছিল বাইরের রাত্রিটাকে। এমনকী পেছনে বাঁধা ঠ্যালাগাড়িটাও ঝনঝন করে উঠল ওই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োনোয়।

পায়ের তলার কফিনটা ভেঙে যাওয়ার ফলে এখন বার্ক গর্তটার ধার ধরে ঝুলছে। ওই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যেই বার্ক মনের জোরে নিজের শক্তি একত্রিত করতে লাগল।

কোনওরকমে গর্তের ধারটা দু-হাতে ধরে নিজেকে টেনে ওপরে তুলতে চাইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল, গোড়ালি দুটো ধরে কে যেন তাকে তলার দিকে টানছে। সেই রাত্রিতেই সেই প্রথমবার তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এল। সে ওঠার জন্য যত চেষ্টা করতে লাগল, তত তার পায়ের টান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সেই অমানুষিক হাত দুটো থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না বার্ক। মারাত্মক ক্ষত তৈরি হওয়ার অসম্ভব যন্ত্রণা যেন দু-পায়ের গোছ থেকে বিদ্যুতের মতো উঠে এল। যতই সে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, ওটা বাক্সের ভাঙা কাঠের টুকরো বা খুলে-আসা পেরেক, ততই তার মনের মধ্যে তৈরি-হওয়া সমস্ত যুক্তিবাদ আদতে মিশে যাচ্ছিল এক তীব্র ভয়ের ঘূর্ণিতে। এতক্ষণে সে চিৎকার করে উঠল। প্রায় পাগলের মতোই লাথি মারতে শুরু করল সে। ক্রমশ তার চেতনা ডুবে যাচ্ছিল অন্ধকারে।



চিত্র ৮.২ : প্রায় অচেতনের মতোই গর্তের মধ্যে গলিয়ে দিল নিজের দেহ

অজ্ঞান হওয়ার আগেই বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিতে তার দেহ এক ঝাঁকুনিতে উঠে এল গর্তটার কাছে। পরক্ষণেই প্রায় অচেতনের মতোই গর্তের মধ্যে গলিয়ে দিল নিজের দেহ। সামান্য হামাগুড়ি দিতেই গর্তের অন্য পাশ দিয়ে ধপ করে বার্ক উলটে পড়ল ভেজা মাটির ওপরে। সে বুঝতে পারছিল যে, সে হাঁটতে পারছিল না। উদীয়মান চাঁদটা একমাত্র

প্রত্যক্ষদর্শী ছিল সেই ভয়ংকর ঘটনার। সে কোনওমতে রক্তাক্ত পা টানতে টানতে এগিয়ে যেতে লাগল কবরস্থানের কাছের বাড়িটার দিকে। কোনওমতে কালো মাটি আঁকড়ে ধরে প্রায় অচৈতন্যের মতোই এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ তার গতি কমে আসছে। শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছে না। ঠিক যেমন রাত্রে অমানুষদের তাড়া খেলে ভয়ে দেহ অবশ হয়ে আসে। আসলে তার পেছনে কেউই দৌড়ে আসছিল না। একাকী হামাগুড়ি দিতে দিতে ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় সে কোনওমতে পৌঁছোল বাড়িটায়। আর্মিংটন, বাড়ির মালিক তার দুর্বল আঁচড়ানির শব্দেই দরজা খুলে দিয়েছিল।

আর্মিংটন বার্ককে ধরাধরি করে বসার ঘরের অতিরিক্ত বিছানাটায় শুইয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ তার ছোটছেলে এডউইনকে পাঠাল ডক্টর ডেভিসকে ডেকে আনার জন্য। আর্ত মানুষটি অবশ্য স্বজ্ঞানে ছিল, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনওরকম শব্দ বেরোচ্ছিল না। সে শুধু অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করছিল, “উফ। গোড়ালিটা...” “ছাড় আমাকে।” “হতচ্ছাড়া! পচে মর তুই নরকে।”

অনতিবিলম্বেই ডাক্তার ওষুধের বাক্স নিয়ে এলেন। দু-চার কথাতে জেনে নিলেন, কী ঘটেছে। রোগীর ভিজে-যাওয়া জামাকাপড়, জুতো-মোজা ডাক্তার নিজের হাতেই খুলে নিলেন। দুই পায়ের গোড়ালির সামান্য ওপরে বীভৎস ক্ষতস্থান। পায়ের অ্যাকিলিস টেন্ডনটা[127] (রগ) প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় পরিণত হয়েছে। আঘাতের বহর দেখে বৃদ্ধ ডাক্তারও হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁকে সামান্য ভীতও দেখতে লাগছিল। ডাক্তারি শাস্ত্র ছেড়ে তাঁর প্রশ্নগুলো বিশ্রীভাবে অন্যদিকে বাঁক নিচ্ছিল। এমনকী তাঁর হাত পর্যন্ত কাঁপছিল, যখন তিনি পায়ের ক্ষতবিক্ষত অংশটা পরিষ্কার করছিলেন। তারপরে তিনি অত্যন্ত দ্রুত ক্ষতস্থান দুটি ব্যান্ডেজ করে ফেললেন। তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল, ক্ষতস্থানগুলো ঢেকে ফেলাই বৃদ্ধ ডাক্তারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ডক্টর ডেভিস সাধারণভাবে কৌতূহলশূন্য মানুষ। কিন্তু ডাক্তারের অদ্ভুত রকমের জেরা ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠছিল। প্রায় অর্ধঅচেতন রুগিটিকে তিনি বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন। ওই অস্বাভাবিক ঘটনার প্রত্যেক মুহূর্তের বর্ণনা না শুনে তিনি যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি অদ্ভুতরকম উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলেন একটা ব্যাপারে যে, বার্ক কি আদৌ নিশ্চিত— সম্পূর্ণ নিশ্চিত একদম ওপরের কফিনটার ব্যাপারে? কীভাবে ওটাকে বাছাই করেছিল? ওই অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে নিশ্চিত হল যে, ওটা ফেনারেরই

কফিন ছিল? বার্ক কীভাবে ওই হতচ্ছাড়া আসাফ সইয়ারের কফিনটাকে আলাদা করতে পারল ম্যাথু ফেনারেরটার থেকে? দুটো কফিনই যদি একই রকমের আকৃতির হয়, অন্ধকারের মধ্যে হাত বুলিয়ে কি কাঠের কোয়ালিটি বোঝা সম্ভব? এত সহজে কি ফেনারের শক্তপোক্ত কফিনের ডালাটা ভেঙে যেতে পারে?

গ্রামের পুরোনো ডাক্তার হওয়ার সুবাদে ডক্টর ডেভিস ফেনার এবং সইয়ার দু-জনেরই অন্তিমশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দু-জনেরই শেষকৃত্য দেখেছেন। তিনি তো সইয়ারের শেষকৃত্যের সময় রীতিমতো অবাকই হয়েছিলেন। ওই লম্বাচওড়া চাষিটাকে এত ছোটখাটো একটা কফিন বাক্সে, যা আদতে বেঁটে রোগা ফেনারের মতো করে বানানো, কীভাবে সোজা করে শোয়ানো সম্ভব হল।

ঘটনার প্রায় দু-ঘণ্টার পরে ডক্টর ডেভিস চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি বার্ককে পইপই করে বুঝিয়ে গেলেন যে, সমস্ত ক্ষতই তৈরি হয়েছে কফিনের ভাঙা কাঠ আর পেরেক থেকে। এ ছাড়া তিনি বললেন, আর কী-ই বা প্রমাণ অথবা বিশ্বাসের আছে? সব থেকে ভালো হয়, এই সম্বন্ধে তুমি আর কোনও কথা না বলো এবং অন্য কোনও ডাক্তারকে এই ঘা-গুলো না দেখাও। তিনি শাসিয়েছিলেন বার্ককে।

বার্ক অবশ্য তাঁর সেই উপদেশ বাকি জীবন ধরে মনে রেখেছিল। যত দিন পর্যন্ত না আমাকে তার গল্প বলেছিল। আর আমি যখন সেই পুরোনো এবং সাদা-হয়ে-যাওয়া দাগগুলো দেখছিলাম; তখন আমিও মানতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, ওই বৃদ্ধ ডাক্তার একদম বিচক্ষণের মতোই নির্দেশ দিয়েছিলেন। বার্ক অবশ্য বাকি জীবনের জন্যে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। পায়ের পেশিতন্তুগুলো মারাত্মক আহত হওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি মনে করি, আদতে তার আত্মা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ওই বিভীষিকাময় আঘাতে।

একসময় বার্কের চিন্তাভাবনা যথেষ্ট শান্ত এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে তার স্বাভাবিক চিন্তাভাবনাও সারাজীবনের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখতেও খারাপ লাগত যে, মানুষটা শুধুমাত্র ‘শুক্রবার’, ‘কবরখানা’, ‘কফিন’— এই শব্দগুলো শোনামাত্রই আতঙ্কিত হয়ে উঠত। তার ভয়ার্ত ঘোড়াটি বাড়ি ফিরতে পেরেছিল, কিন্তু তার ভয়ার্ত বুদ্ধিমত্তা আর কোনও দিনই বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি।

বার্ক ব্যাবসা পরিবর্তন করে ফেলল। আর সে কফিন বক্স বানাত না। তবুও কিছু একটা তাকে আজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। ওটা হয়তো-বা শুধুই ভয়, হয়তো-বা ভয়ের সঙ্গে মেশানো কোনও এক বিকৃত অতীত কৃতকর্মের জন্য উৎকট অনুশোচনা। তার মদ খাওয়া, অবশ্যই, সে অনুভূতিটাকে তাড়ানোর জন্যেই খেত, কিন্তু তার পরিবর্তে অনুভূতিটা আরও উগ্রতর হয়ে তার মনের মধ্যে গেড়ে বসত।

সেই রাত্রে বার্ককে আর্মটঙ্গের বাড়িতে রেখে ডক্টর ডেভিস একটা লণ্ঠন নিয়ে সেই পুরোনো শবঘরে গিয়েছিলেন। মাটিতে পড়ে থেকে বিক্ষিপ্ত ইটের টুকরোগুলো তখনও চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিল। চন্দ্রকিরণে স্নাত বড় দরজার হুড়কোটা সামান্য নেমে এসেছে। ওটাকে বাইরে থেকে একটু ঠেললেই খুলে যাবে। এত দিন ব্যবচ্ছেদ ঘরে থেকে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যে ডাক্তারের মনটা পোক্ত হয়ে উঠছে তা বোঝাই যাচ্ছিল। তিনি লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে শবঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ঘরের ভেতরের অবস্থা দেখে ডাক্তারের মাথা ঘুরে গেল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। পরক্ষণেই তাঁর ভয়ানক আঁতকে-ওঠাটা একটু আগের চিৎকারটাকেও পেছনে ফেলে দিল। তিনি একদৌড়ে ফিরে এলেন আর্মটঙ্গের বাড়িতে। ডাক্তারির সমস্ত নিয়ম ভেঙে তিনি চিৎকার করে রোগীকে ডেকে তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রোগীকে ধরে ঝাঁকাতেও লাগলেন। অবশ্য তিনি ফিশফিশ করেই কথা বলছিলেন, কিন্তু উত্তেজনায় সেই শব্দগুলো শিসের মতো গিয়ে কানে বিঁধছিল।

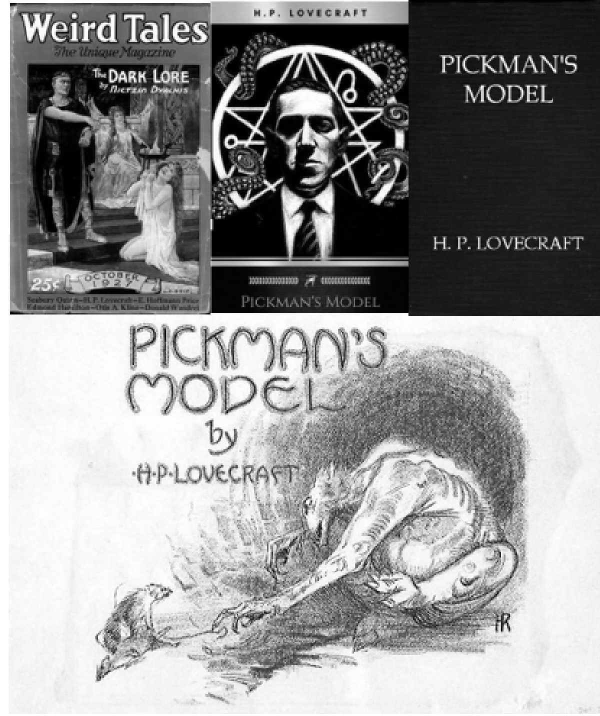
"ওটা আসাফের কফিন। বার্ক। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। ওর দাঁতগুলো আমি দেখেছি। ওপরের চোয়ালের সামনের পাটির একটা দাঁত ভাঙা। শুধু তা-ই না। তোমার এই ক্ষতই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমি ভুল নই। তার দেহটা মোটামুটি নষ্টই হয়ে গেছে, কিন্তু তার মুখে যে আক্রোশ দেখে এলাম তা আগে কখনও দেখিনি। তুমি তো জানোই, কীরকম পাষণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল আসাফ সইয়ার। সেই জমির সীমানা নির্দেশের গোলমালে ত্রিশ বছর পরে এসেও সে বুড়ো রেমন্ডকে প্রায় শেষ করে ফেলছিল। এক বছর আগে আঁচড়ে দেওয়ার প্রতিশোধ তোলার জন্যে সে গত অগাস্টে বাচ্চা কুকুরটাকে মাড়িয়ে মেরে ফেলছিল। শয়তানের অবতার ছিল সে... বার্ক। আমি মনে করি, তার চোখের বদলে চোখ প্রতিশোধের ব্যাপারে সে হয়তো যমকেও ছাড়িয়ে যাবে। কী ভয়ংকর ওই রাগ! ভগবান! আমার ওপরে যেন তা কোনও দিন না এসে পড়ে। বার্ক, তুমি কেন এটা করলে? জানি,

সে এক নম্বরের বজ্জাত ছিল। আমি তোমাকে কোনও দোষ দিচ্ছি না ওকে একটা পরিত্যক্ত কফিনে ঢুকিয়েছ বলে। কিন্তু তুমি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। কৃপণতা করা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো জানতে, ফেনার কতটা বেঁটেখাটো ছিল। হে ভগবান, কেন দেখতে গেলাম? দৃশ্যটা ভুলব কী করে এখন আমি! তুমি একটু বেশি জোরেই লাথি মেরেছিলে। আসাফের কফিনটা পড়ে ছিল মাটির ওপরে। মাথাটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে, পচা ঘিলুও বেরিয়ে এসেছে। এসব আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু এখানে আরও কিছু ছিল। খুলিটা দেখে আমার বমি পেয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তুমি যা করেছ... চোখের বদলে চোখ। মা মেরির দিব্যি! বার্ক, কিন্তু তুমি তোমার প্রাপ্যই পেয়েছ। কী করে করতে পারলে ওটা? ওই ছোট কফিনটার মধ্যে ওই লম্বা দেহটাকে গুঁজেছ তুমি আসাফের পা দুটো গোড়ালি থেকে কেটে!?”



প্রথম প্রকাশ: *১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ‘টাই-আউট’ নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গল্পটি।*

ভাষান্তর: *অঙ্কিতা*



পিকম্যান'স মডেল

পিকম্যান আর লাভক্র্যাফটের মধ্যে মিল প্রচুর। পিকম্যানও তাঁর মতোই বাস্তবতার সঙ্গে মহাবিশ্বের অজানা ভয়ংকরকে নিয়ে ছবি আঁকে। পিকম্যানের অদ্ভুত ছবি যেমন শিল্প হিসেবে অত্যন্ত উঁচুদরের হলেও শিল্পবিশেষজ্ঞরা সেগুলিকে মানতে চান না, সেরকম লাভক্র্যাফটেরও ধারণা ছিল তাঁর গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বোস্টনের উত্তর অংশে যথেষ্ট সময় কাটিয়ে লাভক্র্যাফট গল্পটির পটভূমি সেখানে ফেলেছিলেন।

পিকম্যানের মডেল[128]

(Pickman's Model)



এলিয়ট[129], মোটেই ভেবো না যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। এই পৃথিবীতে অনেক মানুষেরই আমার থেকেও অদ্ভুত ধরনের কুসংস্কার আছে। অলিভারের দাদুকেই দেখো, বুড়োটা মোটরগাড়িতে চাপতে চায় না। তো, আমি যদি ওই ফালতু সাবওয়েটা পছন্দ না করি, সেটা আমার ব্যাপার। আর ট্যাক্সিতে করেই যখন এখানে আরও তাড়াতাড়ি আসা যায়, তাহলে আমি সাবওয়ে ব্যবহার করতে যাবই বা কেন? ট্রেনে করে আসতে চাইলে পার্ক স্ট্রিট থেকে হেঁটে সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠতে হত।

আমি জানি... গত বছর তুমি যখন আমায় দেখেছিলে, তখন আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। কিন্তু তার জন্যে একটা হাসপাতাল সঙ্গে করে নিয়ে চলার তো কোনও কারণ নেই। ভগবান জানেন, আর আমিও বিশ্বাস করি; শুধুমাত্র ভাগ্যের জোরেই আমি সুস্থ আছি আজকে। তা ছাড়া... তুমি তো এত কৌতূহলী ছিলে না কখনও!

ঠিক আছে, যদি তুমি শুনতেই চাও। আর, কেনই বা চাইবে না? তোমারও উচিত তো। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যখন জানতে পারবে, আমি আর্ট ক্লাব[130] থেকে বেরিয়ে গেছি আর পিকম্যানের[131] সঙ্গেও বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ করেছি; তখন তুমি ওই অভিভাবকদের মতো আহা-উহু-মার্কা চিঠি লিখে পাঠাবে। আমি অবশ্য পিকম্যানের খোঁজে একবার ফিরে

গিয়েছিলাম; কিন্তু ততক্ষণে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তবে আমি, 'আমি' ছিলাম না তখন।

না! আমি জানি না পিকম্যানের কী হয়েছিল! আর সে কথা আমি জানতেও চাই না। তুমি নিশ্চয়ই কিছু তথ্য পেয়েছ, যখন আমি ওদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। না, না, আমি ভাবতেও চাই না সে কোথায় যেতে পারে। যদি খোঁজার হয় তাহলে পুলিশকে খুঁজতে দাও। যদিও পুলিশ জানেই না যে, সে পুরোনো নর্থ এন্ড প্লেসটা[132] 'পিটার' ছদ্মনামে ভাড়া নিয়েছে। আমি ঠিক জানি না, ওই জায়গাটা আবার চিনতে পারব কি না—অবশ্য সে চেষ্টা আমি আর করিনি; দিনের আলোতেও না।

হ্যাঁ, আমি জানি... আমি ভয় পাই যে, আমি জানি। আজকাল আমি সাবওয়েও ব্যবহার করতে পারি না। এমনকী, ভাঁড়ারঘরেও নামতে পারি না। উফ! আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝবে আমার সঙ্গে কী হয়েছে! যখন আমি পুলিশের কাছে কিছু জানাতে চাইনি, তখনই বুঝবে তুমি। ওরা আমাকে বলেছিল ওদেরকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে। যদিও রাস্তাটা আমিই একমাত্র জানতুম, কিন্তু ওখানে ফিরে যাওয়া! রক্ষে করো!

বিশ্বাস করো, সেই দিন আমি পিকম্যানের সঙ্গ কোনও সামান্য কারণে ছেড়ে দিইনি। অন্তত ওই ডক্টর রেইড বা জো মিন্ট অথবা বসয়ার্থের মতো কোনও সংকীর্ণমনা বুড়ির মানসিকতায় তৈরি কারণগুলোর জন্য তো নয়ই। ...উঁহু! উঁহু। পিকম্যানের আঁকা ওই অমানুষিক রোগগ্রস্ত ছবিগুলো আমাকে কোনও শক দেয়নি। বরং সেই দিন আমি গর্ব বোধ করছিলাম। পিকম্যানের মতো একজন জিনিয়াসের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। তার শিল্পগুলো মানুষকে যেখানেই টেনে নামাক-না কেন, রিচার্ডের থেকে উঁচুদরের আঁকিয়ে বোস্টন আর কখনও পায়নি, যত দিন না পিকম্যান এসেছে। আমি আগেও এই কথা বলতুম, আর এখনও বলব। আমার বক্তব্য থেকে আমি একচুলও সরে আসিনি, আসবও না। এমনকী ওর ওই বিখ্যাত 'নারকীয় ভক্ষণ'[133] ছবিটা দেখার পরেও।

আসলে, পিকম্যানের শিল্পকলা বোঝার জন্য যেমন অঙ্কনক্ষেত্রে গভীরতার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন জীবনের এক অন্তর্নিহিত উপলব্ধির। আজকাল তো যে-কোনও পত্রিকার প্রচ্ছদই নিজেদেরকে খানিকটা লাল-কালো রঙে চুবিয়ে ঘোষণা করতে থাকে[134]; এই হল অন্ধকারের আতঙ্ক অথবা ডাকিনীর প্রতিহিংসা অথবা খোদ শয়তানের প্রতিবিম্ব।

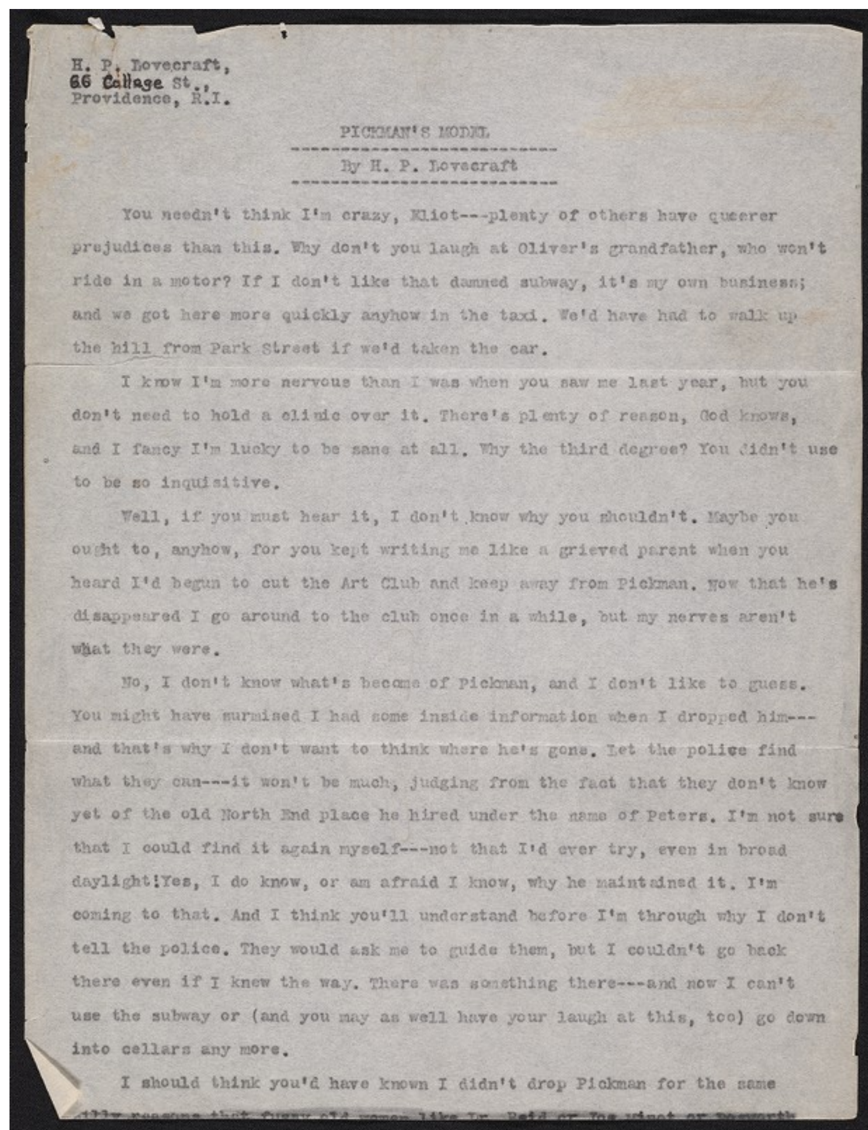
কিন্তু আমি মনে করি, একমাত্র সত্যিকারের শিল্পীরাই পারে প্রকৃত আতঙ্ককে চিত্রকলায় ফুটিয়ে তুলতে। তার অনুষঙ্গে প্রয়োজন শুধু দুটি জিনিস, ভয়ের নিবিড় উপলব্ধি এবং আন্তরিকতা। কারণ একজন প্রকৃত শিল্পীই জানে আতঙ্কের অঙ্গসংস্থান অথবা ভয়ের দেহবিদ্যা। সঠিক লাইন আর অনুপাত, যা সেই প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তিকে অথবা পুরুষানুক্রমে বইতে থাকা জিনের স্মৃতিতে রক্ষিত ভয়কে দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। সঠিক রঙের অনুপাত আর আলোছায়ার খেলাই নাড়িয়ে দেয় অন্তরে লুকিয়ে-থাকা সুপ্ত অজানা বোধটাকে।

তোমাকে অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বলার কিছুই নেই। তুমি তো জানোই, কেন ফুজেলির[135] আঁকা ছবি মনের ভেতরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, আর একটা সস্তা ভূতের গল্পের প্রচ্ছদ মানুষকে হাসতে বাধ্য করে। এই জীবনের বাইরের কিছু একটা ওরা অনুভব করেছে। সেটা দিয়েই ওরা আমাদের মুহূর্তের জন্যে আটকে ফ্যালে। ডোর[136] পেয়েছিল। সাইম[137] পেয়েছে। আঙ্গালোরা[138] অব শিকাগো ছবিতে যা ফুটে উঠেছে। আর পিকম্যান, সে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে এমনভাবে পেয়েছে, যা আগে কেউ কখনও পায়নি। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, কেউ যেন কখনও না পায়।

আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, যে তারা কী দেখেছিল। তুমি কি জানো, সাধারণ শিল্পে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা, আর কৃত্রিমভাবে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের জন্য স্টুডিয়োতে বসে একের পর এক ছবি আঁকার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। তবে আমি বলব, ওই শিল্পীর অদ্ভুত এক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি মডেলের ওপরে ন্যস্ত করতে পারতেন বিশ্বজগতের সেই অলৌকিক দৃশ্যাবলি। যে প্রেততুল্য জগতে তিনি বাস করতেন, সেইসব দৃশ্য। ঠিক যেমন একজন জীবন্ত মানুষ আঁকা চিত্রশিল্পীর কাজের সঙ্গে একজন করেসপন্ডেন্স স্কুলের ছাত্রের তৈরি বিকৃত কার্টুনের পার্থক্য থাকে; ঠিক তেমনই শুধুমাত্র নরকের কসাইয়ের স্বপ্ন-দেখা মানুষদের আঁকা ছবি থেকে নিজের আঁকাতে বৈষম্য তৈরি করতে পারতেন তিনি।

যদি আমি কখনও দেখতে পারতুম, যা পিকম্যান দেখেছিল! তাহলে... আমি হয়তো বাঁচতাম না, যদি আমি দেখতে পেতাম, যা ওই মানুষটা দেখেছিল। যদি সে আদৌ মানুষ হয় তো[139]...। নাহ্! আচ্ছা, আরও গভীরে যাওয়ার আগে, এসো, এক গ্লাস করে খাওয়া যাক।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, পিকম্যানের আসল গুণ ছিল মুখাবয়ব আঁকাতে। গোয়্যার[140] পরে আর কেউ অভিব্যক্তির এমন মোচড় অথবা আকৃতিগত দিক থেকে এতটা খাঁটি নারকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। গোয়্যার আগেও মধ্যযুগীয় কিছু মানুষ ওই বেয়াড়া বিদঘুটে মুখওয়ালা অর্ধমানুষগুলো অথবা ওই বিকট কাল্পনিক জীবগুলো বানিয়েছিল। যেগুলো নোতরদাম বা মন্ট সেইন্ট মিচেল-এর স্থাপত্যের মধ্যে আছে এখনও। তারাও কি ওইসব জিনিসে বিশ্বাস করত? কে জানে, তারা হয়তো ওই জীবগুলোকে দেখেওছিল। মধ্যযুগে বেশ কিছু অবিশ্বাস্য গোপন ও রহস্যময় পর্ব আছে।



H. P. Lovecraft,
66 College St.,
Providence, R.I.

PICKMAN'S MODEL

By H. P. Lovecraft

You needn't think I'm crazy, Eliot---plenty of others have queerer prejudices than this. Why don't you laugh at Oliver's grandfather, who won't ride in a motor? If I don't like that damned subway, it's my own business; and we got here more quickly anyhow in the taxi. We'd have had to walk up the hill from Park Street if we'd taken the car.

I know I'm more nervous than I was when you saw me last year, but you don't need to hold a clinic over it. There's plenty of reason, God knows, and I fancy I'm lucky to be sane at all. Why the third degree? You didn't use to be so inquisitive.

Well, if you must hear it, I don't know why you shouldn't. Maybe you ought to, anyhow, for you kept writing me like a grieved parent when you heard I'd begun to cut the Art Club and keep away from Pickman. Now that he's disappeared I go around to the club once in a while, but my nerves aren't what they were.

No, I don't know what's become of Pickman, and I don't like to guess. You might have surmised I had some inside information when I dropped him---and that's why I don't want to think where he's gone. Let the police find what they can---it won't be much, judging from the fact that they don't know yet of the old North End place he hired under the name of Peters. I'm not sure that I could find it again myself---not that I'd ever try, even in broad daylight!Yes, I do know, or am afraid I know, why he maintained it. I'm coming to that. And I think you'll understand before I'm through why I don't tell the police. They would ask me to guide them, but I couldn't go back there even if I knew the way. There was something there---and now I can't use the subway or (and you may as well have your laugh at this, too) go down into cellars any more.

I should think you'd have known I didn't drop Pickman for the same

চিত্র ৯.১ : “পিকম্যানস মডেল” গল্পের টাইপ করা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

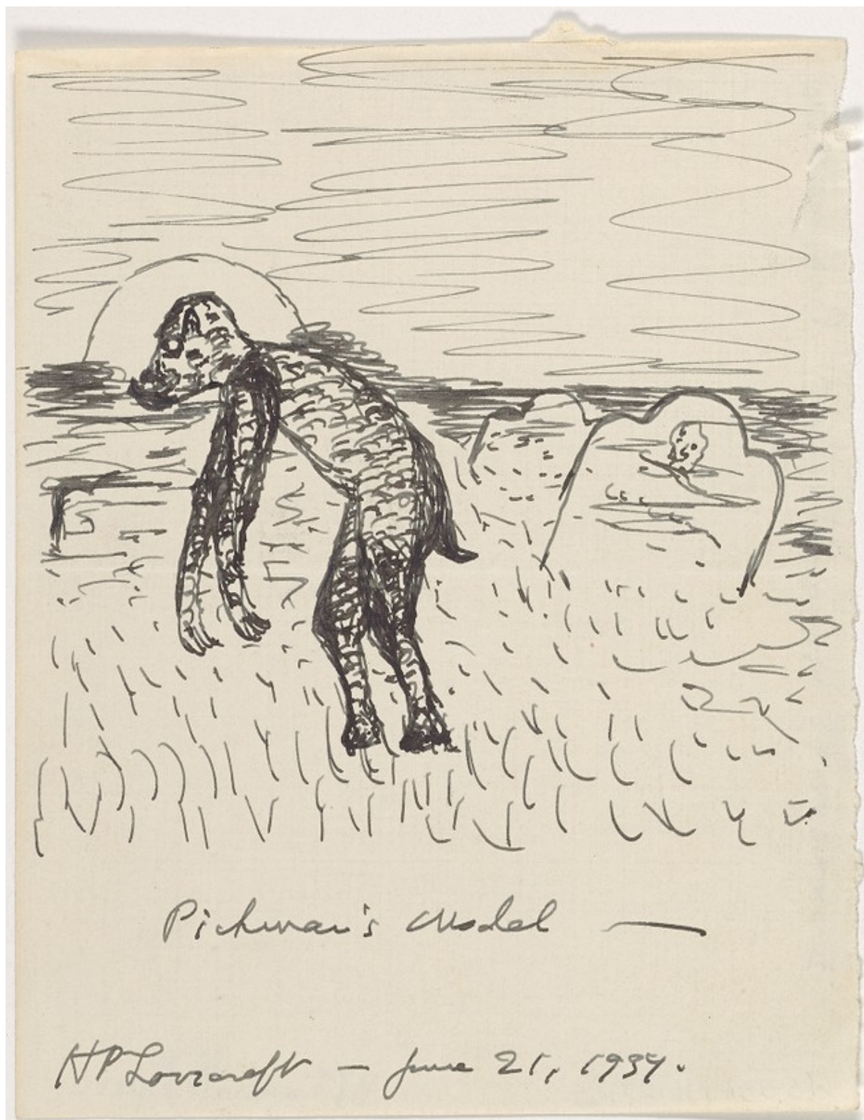
আমার মনে পড়ল, তুমি একবার পিকম্যানকে নিজের থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলে, ওই তুমি চলে যাওয়ার আগের বছরেই, কোন আকাশ থেকে সে অমন কল্পনা আর দর্শন পেল। সে তোমার মুখের ওপরে বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিল না? ওটার খানিকটা কারণ, রেইড সেই সময় পিকম্যানের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিল।

আরে, রেইড। সেই রেইড, যে তুলনামূলক বিকারতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছিল তখন। অবশ্য ওই বিষয়টাই ছিল অমন। ‘কুলকুণ্ডলিনী’-মার্কা বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ দ্বারা ভরতি। এ ছাড়াও ছিল আত্মিক এবং শারীরিক বিভিন্ন বিবর্তনীয় দ্যোতনা। তিনিই বলেছিলেন, পিকম্যান তাঁকে প্রতিদিনই বেশি বেশি করে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। তিনি ক্রমেই আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। রেইড বলেছিলেন, পিকম্যানের আকৃতি এবং অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে এমন দিকে পরিবর্তিত হচ্ছিল যে, ব্যাপারটা তাঁর মোটেও ভালো লাগছিল না। পরিবর্তনটা যেন ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নয়। এমনকী তিনি নাকি এটাও বলেছিলেন যে, পিকম্যান অস্বাভাবিক রকমের ছিটগ্রস্ত হয়ে গেছে।

আমার যত দূর মনে পড়ে, তুমিই রেইডকে বলেছিলে। পিকম্যানের ছবিগুলোই আসলে তার নার্ভের ওপরে চাপ ফেলছে, অথবা তার অস্বাভাবিক কল্পনাই তার চেতনাকে নষ্ট করে ফেলছে। আমি নিজেই যখন রেইডকে এই কথাগুলো জানিয়েছিলাম, তখন রেইডও আমাকে বলেন যে, তুমি আর রেইড এই ব্যাপারে একমত ছিলে।

কিন্তু মনে রেখো, আমি কিন্তু পিকম্যানকে এইসব কিছুর জন্যে ছেড়ে আসিনি। বরং উলটোটাই হচ্ছিল, ওই অসাধারণ কীর্তি ‘নারকীয় ভক্ষণ’ ছবিটার দেখার পর থেকে, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিল। যেমনটা তুমি জানো, তেমনটাই ঘটেছিল। ক্লাবে ওটা প্রদর্শনই করা হয়নি। আর ফাইন আর্টসের মিউজিয়াম[141] তো ওটাকে উপহার হিসাবেও গ্রহণ করেনি। আর আমি এটাও শপথ নিয়ে বলতে পারি যে, কেউ ওটা কিনবেও না। তো পিকম্যান ওটা নিজের বাড়িতেই রেখে দিয়েছিল, চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এখন ওর বাবার কাছে আছে ওটা, সালেমে। তুমি তো জানোই পিকম্যান পুরোনো

সালেমীয়দের একজন। ১৬৯২-তে পিকম্যানের পরিবারের একজন নারীকে ডাকিনী সন্দেহে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল[142]।



চিত্র ৯.২ : লাভক্র্যাফটের হাতে আঁকা পিকম্যানস মডেল

পিকম্যানের ডাকে সাড়া দেওয়াটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষত যখন আমি অদ্ভুত চিত্রকলার বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেছিলাম, তার পর থেকেই। হয়তো তার আঁকাই আমাকে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাতে বাধ্য করেছিল। তথ্যের খনি হিসাবে তাকেই খুঁজে পেয়েছিলাম। অবশ্য আমার লেখাটা তৈরি করতে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামতও আমাকে সাহায্য করছিল।

পিকম্যান আমাকে তার কাছে যে সমস্ত রঙিন ছবি আর রেখাঙ্কন ছিল, সব ক-টা দেখিয়েছিল। ওগুলোর মধ্যে এমন কিছু কালি আর পেনের স্কেচ ছিল, ক্লাবের অন্য সদস্যরা ওগুলো দেখলে তাকে নির্ঘাত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত সদস্যপদ থেকে।

অতএব যেটা বলাই যায় যে, খুব কম সময়ের মধ্যেই আমি পিকম্যানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। একটা ছাত্রের মতোই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতাম পিকম্যানের শিল্পতত্ত্ব আর তাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা। অবশ্য কথাগুলো তাকে ডেনভার পাগলাগারদে[143] পাঠাবার পক্ষে একদম যোগ্য ছিল। তার কাছে অন্যান্য মানুষের আসা-যাওয়া যত কমতে থাকল, ততই আমার বীরভক্তির পারদ চড়তে লাগল। সে আর তার অদ্ভুত চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণভাবে আমাকে পেয়ে বসল।

একদিন সন্ধেবেলা সে আমাকে বলল, আমি যদি একদম মুখ বন্ধ করে থাকি আর একদমই খুঁতখুঁত না করি তাহলে সে আমাকে একদম অন্যরকম একটা জিনিস দেখাবে। এমন একটা জিনিস, যা এত দিন যে সমস্ত জিনিস দেখেছি, সেগুলোর থেকে একটু বেশিই দুষ্পাচ্য।

"তুমি কি জানো?" পিকম্যান বলেছিল, "এমন অনেক জিনিসই আছে, যাদেরকে ওই নিউবেরি স্ট্রিটের[144] শিল্পসভার জন্যে বানানো সম্ভব নয়? এমন জিনিস, যা এখানে মানায় না। এখানে তার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যা-ই হোক গে, আমার কাজ হল আত্মার স্বরূপটাকে ছবিতে ধরা। আর সেটা কোনও ভুঁইফোঁড় রাস্তার ধারে গজিয়ে-ওঠা বাড়িতে করা যায় না। এর জন্য প্রাচীনত্ব লাগে। একটা অতীত লাগে। লাগে স্মৃতি। এই বোস্টন তো এখনও কিছুই হয়ে ওঠেনি। স্থানীয় আত্মাদের আকর্ষণ করার মতো স্মৃতি তৈরি করার সময় কোথায় পেয়েছে? যদি এখানে কোনও ভূত থেকেও থাকে, তাহলে তারা ওই লবণ জলাভূমি আর অগভীর চড়াগুলোতে চরে-বেড়ানো গৃহপালিত পশু বই আর কিছু নয়। আমার চাই মানুষের আত্মা, প্রেত। যারা নরকে উঁকি দেওয়ার মতো ক্ষমতা ধরে আর যে সমস্ত নারকীয় দৃশ্য তারা দেখে, সেইগুলো বোঝার ক্ষমতাও রাখে। মনে রাখবে, ব্যাক বে বোস্টন নয়।

কোনও শিল্পীর আসল থাকার জায়গা হল নর্থ এন্ড। যদি কোনও কলাবিদ্যাবিশারদ তার শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ঐতিহ্যের পিণ্ডি চটকাতে চলে যেতে হবে ওই গ্রামগুলোতে। ওহ্ ভগবান! তুমি কি বুঝতে পারছ না, ওই বসতিগুলো কেউ

‘তৈরি করেনি’, ওগুলো আসলে ‘গড়ে উঠেছে’! প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ ওখানে থেকেছে, জীবনকে অনুভব করেছে এবং মারা গেছে। সেই সময়ে যখন মানুষ থাকতে, অনুভব করতে কি মারা যেতে ভয় পেত না। তুমি কি জানো, ১৬৩২-এ কপ’স হিলে[145] একটা কারখানা ছিল? আর ওখানকার বেশির ভাগ রাস্তাই গড়ে উঠেছিল সেই ষোলোশো পঞ্চাশ নাগাদ। আমি তোমাকে এমন বাড়িও দেখাতে পারি, যেগুলো আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরোনো। সেই সমস্ত বাড়ি যা দেখেছে, তা আজকালকার ওই আধুনিক বাড়িগুলোর গর্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। এই নব্যকৃষ্টিগুলো কী জানে প্রাণ আর জীবনের অন্তঃশক্তির ব্যাপারে?

“সালেম, ডাকিনীবিদ্যাকে তুমি অবহেলায় বলে দিতে পারো বিভ্রমমাত্র। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পিতামহী অবশ্যই অন্য কিছু বলবে এই ব্যাপারে। ওরা তাকে গ্যালোস হিলে ফাঁসি দিয়েছিল। ধর্মধ্বজী কটন ম্যাথার[146] নিজের চোখে দেখছিল সেই ফাঁসি। ম্যাথার শয়তানটা, সারাজীবন ভয়ে ভয়ে ছিল যে, এই বুঝি কেউ গতানুগতিক অভিশপ্ত ধার্মিক চিন্তাভাবনার খাঁচাটা ভেঙে ফেলল। আমি সত্যিই খুশি হতাম, কেউ যদি তাকে অভিশাপ দিত বা রাতের অন্ধকারে তার রক্ত চুষে খেত।

“আমি তোমাকে ওই বাড়িটাও দেখাতে পারি, যেখানে সে থাকত। তোমাকে আরও একটা বাড়ি দেখাতে পারি, অত বারফট্টাই সত্ত্বেও ধর্মের ষাঁড়টা যেখানে পা রাখতে ভয় পেত। সে আসলে কিছু জিনিস জানত, কিন্তু সেগুলোকে ওই বোকা ‘ম্যাগনালিয়া’ অথবা বুড়োর ‘ওয়ান্ডারস অব দি ইনভিসিব্‌ল ওয়ার্ল্ড’[147]-এ ছাপাতে ভয় পেয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই জানো, এই সম্পূর্ণ নর্থ এন্ড একসময় সুড়ঙ্গে ভরতি ছিল। কিছু মানুষ বাকিদের অগোচরে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা চালু করেছিল। এ ছাড়াও ছিল কবরখানা আর সমুদ্র। ওই বোস্টনের বোকাদেরকে মাটির ওপরের জিনিস নিয়েই হয়রান হতে আর নালিশ করতে দাও। প্রতিদিন মাটির গভীরে এমন অনেক কিছুই ঘটে যায়, যেখানে ওদের কল্পনাও কোনও দিন পৌঁছোতে পারবে না। ওইসব হাসির শব্দের হদিশও ওরা কোনও দিন খুঁজে পাবে না।

“কিন্তু কেন? সতেরোশোর আগে তৈরি হওয়া বাড়িগুলির অন্তত দশটার ক্ষেত্রে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মাটির নীচের ঘরগুলোয় তুমি অবশ্যই বীভৎস কিছু জিনিস খুঁজে পাবে। আরে, এই তো মাসখানেক আগেই, কিছু মজুর ইটের গাঁথনি ভাঙতে গিয়ে কুয়ো

খুঁজে পেয়েছে। তুমি পড়োনি? এমন গভীর সব কুয়ো, যেগুলো সুড়ঙ্গ হয়ে কোন পাতালে অদৃশ্য হয়েছে, কেউ জানে না। হেঞ্চম্যান স্ট্রিটে অমন একটা দেখতে পাবে তুমি। ওসব জায়গায় ডাইনিরা থাকত। মন্ত্র পড়ে ডাক পাঠাত। জলদস্যুরাও আসত, সঙ্গে করে নিয়ে আসত লুটের মাল। মৃত মানুষের সম্পদ।

"আমি বলছি তোমায়, আগেকার দিনে মানুষ জানত, কীভাবে বাঁচতে হয়। জানত, কীভাবে জীবনের সীমানাকেও বিস্তৃত করে দেওয়া যায়। জ্ঞানী আর সাহসী মানুষদের কাছে এটাই একমাত্র পৃথিবী ছিল না। আর আজকের অবস্থা দেখো, ঠিক উলটো। ওই ক্লাবের হবু শিল্পীগুলোর ফ্যাকাশে গোলাপি ঘিলুতে কাঁপুনি আর খিঁচুনি ধরে যায়, যদি কোনও চিত্রকলায় বেকন স্ট্রিটের চায়ের টেবিলের সহ্যক্ষমতার থেকে বেশি কোনও অনুভূতি ফুটে ওঠে।

"অতীতকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার না করে অগ্রসর হওয়ার বোকামি করা হয়তো বর্তমানের পক্ষেই সম্ভব। আচ্ছা, এখান থেকে ওই উত্তরদিকের জায়গাগুলোর ব্যাপারে তোমার ম্যাপ, গাইড বই কী বলে? অ্যাঁ? আমি আন্দাজে তোমাকে প্রিন্স স্ট্রিটের উত্তরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা গলিতে নিয়ে যাব— তারও আবার তস্য গলি আছে। বিদেশি পর্যটকের দল হয়তো সেখানেও ভিড় করে মচ্ছব করছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তারা কল্পনাতে আনতে পারবে না সেসব স্থানমাহাত্ম্য। আরে, বিদেশি পর্যটকদের তো ছেড়েই দিলাম। এখানকার কতজনই বা এসব চেনে বলো দিকিনি? দেখাও তো এমন কয়েকটাকে!! থ্রাবার, মেনে নাও, পারবে না। এই প্রাচীন জায়গাগুলো তাদের আতঙ্কের জটার মধ্যে দূর অতীত স্বপ্নের যে ঊর্ণনাভ জাল বুনে চলেছে, তার হদিশ পাওয়া সাধারণের কম্ম নয় হে। সাধারণের থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে এরা সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়। কেউ বুঝতে পারেনি, কেউ না — না না— একজন পেরেছিল। আমি কি বৃথাই এত দিন ধরে অতীতের কবর খুঁড়ে চলেছিলাম নাকি? হুঁ।

"তবে, তুমি এই সমস্ত বিষয়ে কৌতূহলী। বেশ খোলা মনেই গ্রহণ করেছ আমার ছবিগুলোকে। খুব একটা পেট-পাতলাও নও। তাই ভাবছি, তোমাকে বলাই যায়... আমার আরও একটা স্টুডিয়ো আছে, পাহাড়ের ওপরের দিকে। ওখানে আমি সেইসব ছবি আঁকি, যা আমি নিজেই এই নিউবেরি স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করতে পারি না। ক্যানভাস বন্দি-করা প্রাচীন সব ভীতি। অবশ্য ক্লাবের ওই বুড়ি ঠাকুমাদের মতো নীতিসর্বস্ব সদস্যগুলোর

সামনে এই ব্যাপারে আমি কোনও দিনও কিছু বলিনি, আর বলবও না। ওই শয়তান রেইড তো কিছু না জেনেই এমন ফিশফিশ করে, যেন আমি একটা বিকৃত মস্তিষ্কের দানব। এমন এক দানব, যে বিবর্তনের উলটোদিকে গড়িয়ে নামছে। তবে থ্রাবার, বহু দিন ধরেই আমি মানতাম, একজন চিত্রকর যেমন জীবনের সৌন্দর্যটা ফুটিয়ে তোলে, তেমনি আতঙ্কটাও ফুটিয়ে তোলা উচিত। সেই জন্যেই আমি জীবনভর অনুসন্ধান করেছি। অবশেষে কিছু জায়গা খুঁজেও পেয়েছি, জানতেও পেরেছি প্রাচীন আতঙ্কদের।

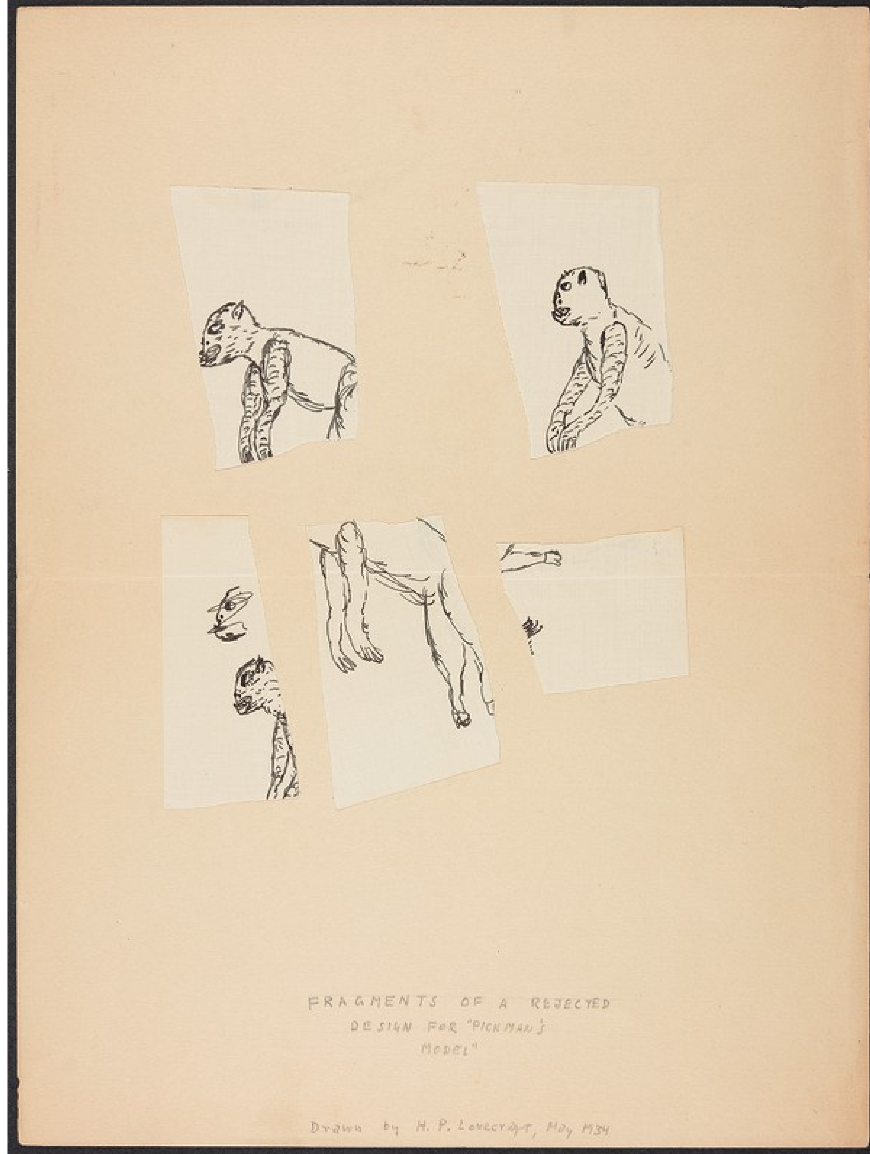
"এমন একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি, যেটা আমি ছাড়া আর মাত্র তিনজন জীবিত নর্ডিক মানুষ দেখেছে। দূরত্ব হিসাবে মাপলে সেটা এমন কিছুই দূরে নয়। কিন্তু, প্রাচীনতার দিক থেকে দেখলে স্থানটার আত্মা শত শত বছরের পুরোনো। আমি ওই বাড়িটা ঠিক করেছিলাম, কারণ ওই বাড়ির সেলারের মধ্যে একটা উৎকট ধরনের কুয়ো রয়েছে। ঠিক যেমন একটু আগে তোমাকে বলছিলাম। কুটিরটা প্রায় ভেঙেই পড়েছিল। ওখানে কেউ বাসও করত না। এত কম দামেই ওটা নিয়েছি যে, ভাবতেও লজ্জা করে। জানলাগুলো কাঠকুটো গুঁজে পুরোপুরি বন্ধ করা। তবে ওটা আমার কাজেই লেগেছে। আমি যা করি, তার জন্যে দিনের আলোর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি মাটির নীচের ঘরে বসেই আঁকি। ওখানেই আমার অনুপ্রেরণারা ভিড় করে আসে। তবে একতলার কয়েকটা ঘরকে আমি পরিষ্কার করে রেখেছি। ওই বাড়িটার মালিক ছিল এক সিসিলিয়ান, আমি ওটা পিটার নামে ভাড়া নিয়েছি।

"এখন তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি। আমার মনে হয়, ছবিগুলো তোমার ভালোই লাগবে। ওখানে আমি প্রায়ই যাই। কখনও কখনও পায়ে হেঁটেই চলে যাই। বারে বারে ট্যাক্সি করে গেলে ওই জায়গাটার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে। বুঝতেই পারছ, সেটা আমি একদমই চাই না। অবশ্য আজকে সাউথ স্টেশন থেকে ব্যাটারি স্ট্রিটের জন্যে আমরা একটা শাট্‌ল নিতে পারি, তারপরে না-হয় বাকি রাস্তাটা হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে।"

ওই জাঁকালো বক্তৃতার পরে, প্রথম খালি ক্যাবটা দেখামাত্রই হাঁটার বদলে দৌড়ে যাওয়া ছাড়া, আমার অবশ্য আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না। সাউথ স্টেশনে ক্যাব চেঞ্জ করে, পুরোনো ওয়াটারফ্রন্টের পেছন দিয়ে সরকারি ঘাট পেরিয়ে, ব্যাটারি স্ট্রিটের সিঁড়ি ভাঙতে

যখন শুরু করেছি, তখন ঘড়িতে পাক্কা বারোটা বাজে। অত গলিঘুঁজির হিসাব রাখতে পারিনি আমি, তবে বলতে পারি, যেখানে আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম, সেটা গ্রিনাফ লেন নয়।

রাস্তাটা বেঁকতেই একটা বহু প্রাচীন আর নোংরা গলির মধ্যে গিয়ে পড়ল। অমনটা আমি জীবনেও দেখিনি। একটা জনমানবশূন্য সরু রাস্তা ক্রমশ ঢাল বেয়ে ওপরের দিক উঠে গেছে। আশপাশের বাড়িগুলোর হাড়গোড়ের মতো বেরিয়ে-আসা কার্নিশ বয়সের ভারে ক্ষয়প্রাপ্ত। ছোট ছোট জানলার কাচগুলো চিড়-খাওয়া। সাবেককালের আধভাঙা চিমনিগুলো চাঁদের আলো ফুঁড়ে বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমার দৃষ্টির মধ্যে ওই তিনটে বাড়ি, কটন ম্যাথারের সময়ের থেকেও প্রাচীন। আচমকাই আরও দুটো বাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার মনে হল, আমি প্রায় ভুলে-যাওয়া ছুঁচোলো তেকোনা ছাদওয়ালা স্থাপত্যের একটা বাড়ি দেখলাম। পুরাতত্ত্বজ্ঞরা নিশ্চয়ই বলবেন, ওরকম বাড়ি বোস্টনে আর দুটি নেই[148]।



চিত্র ৯.৩ : লাভক্র্যাফটের হাতে আঁকা "বাতিল" পিকম্যানস মডেল

আলো-আবছায়ার ওই গলিটা থেকে আমরা বাঁয়ে বেঁকলাম। প্রায় একই রকমের আরেকটা নিস্তব্ধ এবং আরও সরু গলি, এটা একদম অন্ধকার। কয়েক পা পরেই ডানদিকে একটা ত্যারচা বাঁক নিলাম যেন আমরা, অন্ধকারের মধ্যেই। তৎক্ষণাৎ পিকম্যান ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল।

মান্ধাতারও আগের যুগের দশ খোপওয়ালা এক দরজা। ঘুণে খাওয়ার নরকযন্ত্রণাতেই যেন সেটা অমন বেঁকেচুরে গেছে। তালা খুলে, পিকম্যান আমাকে ফাঁকা নির্জন হলওয়েতে

প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাল। হলওয়েরে দেয়াল জুড়ে চমৎকার কালো ওক কাঠের প্যানেলিং। দেখতে খুবই সাধারণ হলেও, অ্যান্ড্রোস ও ফিপ্সের[149] আমলের এবং ডাকিনীবিদ্যার যুগের ওই ব্যাবস্থাটা এক প্রাচীন পরিবেশ তৈরি করেছিল ঘর জুড়ে। তারপরে সে আমাকে বাঁদিকের একটা দরজা দিয়ে ঢোকাল। একটা তেলের বাতি জ্বেলে আমার দিকে ফিরে বলল, "আপাতত এটা নিজের বাড়ি বলেই মনে করো।"

বিশ্বাস করো এলিয়ট, আমি তেমনই মানুষ, যার মানসিক দৃঢ়তা খেটে-খাওয়া কুলিমজুরদের মতোই ইস্পাতকঠিন। তবে আমি তোমাকে বলতে পারি, ওই ঘরের দেওয়ালগুলোতে আমি যা দেখেছিলাম, তাতে আমারও রক্ত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালে ঝুলছিল পিকম্যানের আঁকা বিভিন্ন ছবি। অবশ্যই যেগুলো ও নিউবেরি স্ট্রিটে আঁকতে পারত না বা দেখাতেও পারত না। ও যে বলছিল "মন খুলে আঁকা" তা একদিক থেকে ঠিকই। এসো, আরেক পাত্তর নেওয়া যাক। তুমি না নিলেও, আমার দরকার!

ছবিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষ কোনও লাভ নেই। ক্যানভাসের ওপরে তুলির কিছু সামান্য আঁচড়েই ফুটে উঠেছে ভয়ংকর, অমানবিক আতঙ্ক, অবিশ্বাস্য ন্যক্কারজনক নীতিহীন এক বর্ণনাতীত নরক। এরকম বিজাতীয় টেকনিক সিডনি সাইমের আঁকাতেও দেখা যায় না। এমনকী ট্রান্স সাটার্নিয়ান ল্যান্ডস্কেপ বা লুনার ফাঙ্গি ছবিতে, ক্লার্ক আসটন স্মিথের[150] ওই রক্ত-হিম-করা টেকনিকের থেকেও এ যেন আরও ভয়াবহ কিছু।

দৃশ্যপটগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরোনো চার্চের উঠোন, গভীর অরণ্য, সমুদ্রের ধার থেকে উঠে-যাওয়া খাড়া পাহাড়, ইটের সুড়ঙ্গ, প্রাচীন কড়িকাঠওয়ালা ঘর অথবা সাধারণ অর্ধবৃত্তাকার ডোম— এইসবই। ওই বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরেই যে কপ'স হিলের কবরখানা, সেটা দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহার হয়েছে অনেকবার।

কিন্তু সেই দৃশ্যপটের পটভূমিতে আঁকা চেহারাগুলোর শিরায় শিরায় পাগলামি আর অস্বাভাবিকতা পরিস্ফুট। পিকম্যানের ওই রোগগ্রস্ত চিত্রকলা যেন মাত্রাতিরিক্তভাবেই কোনও শয়তানের প্রতিকৃতি। ছবির চেহারাগুলো কদাচিৎ পুরোপুরি মানুষের মতো। কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্রেও মানবিকতা যেন প্রায় অনুপস্থিত। মোটামুটিভাবে দ্বিপদী দেহগুলো হয় বসে আছে অথবা সামনে ঝুঁকে, তাদের শ্বদন্তের সারি দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। সব থেকে বড় কথা হল, এই বিকট গঠনবিন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক বিশ্রী রকমের প্রাণময়তা।

আহ্! আমি আবার ওগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা দিতে বোলো না। ওগুলোর প্রবৃত্তি... বেশির ভাগ দেহধারী ছিল ভক্ষণরত অবস্থায়... না! কী খাচ্ছিল তা আমি বলতে পারব না!

তারা দলবদ্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছিল কবরখানাগুলোতে অথবা মাটির তলায় সুড়ঙ্গের মধ্যে। অনেকগুলো ছবিতেই তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল শিকার অথবা গুপ্তধন নিয়ে। এই চোখ-মুখবিহীন দেহধারীগুলোর আকৃতিতে কী যে এক অলৌকিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছে পিকম্যান! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। কিছু কিছু ছবিতে দেহগুলো জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাত্রির অন্ধকারে। অথবা, বসে বসে পা দোলাচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তির বুকের ওপর; অধীরভাবে তাকিয়ে আছে মানুষগুলোর কণ্ঠার দিকে। একটা ক্যানভাসে ছিল গ্যালোস হিলের ফাঁসি-দেওয়া এক ডাইনিকে ঘিরে অনেকগুলো জীবের চক্রাকার অবস্থান। ডাইনির মৃত মুখটা ওই জীবগুলোর সঙ্গে প্রায় একই রকম।

একের পর এক ছবিতে ওই উৎকট বিষয়ের পরিবেশের বীভৎস চর্চা দেখতে দেখতে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কোনও শিশু নই, ওইরকম বিষয়বস্তুর ওপরে আঁকা চিত্রকলা আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু ওই মুখগুলো! এলিয়ট! ওই নারকীয় অভিশপ্ত মুখের সারি। কুটিল দৃষ্টি আর লালা-ঝরানো মুখগুলো যেন ভীষণ প্রাণবন্ত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে ক্যানভাস ফুঁড়ে। ওহ্ ভগবান, আমার সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল ছবিগুলো যেন জ্যান্ত! ওই জঘন্য জাদুকর নরকের আগুনের এক-একটা টুকরো তুলে এনেছে ওর ক্যানভাসে। ওর তুলিই যেন জাদুদণ্ড হয়ে প্রসব করেছে দুঃস্বপ্ন। বোতলটা দাও, এলিয়ট! বোতলটা...

একটা ছবি ছিল, নাম 'শিক্ষা'... উফ, কেন যে ওটা দেখতে গেলাম! ভগবান আমায় রক্ষা করুক! একটা ভাঙা চার্চ, উঠোন দখল করে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকটদর্শন কুকুরের মতো দেহধারী জীবগুলো। মধ্যিখানে একটা বাচ্চা। তারা বাচ্চাটাকে শেখাচ্ছে তাদের খাদ্যরীতি। কোটি টাকার ওপরে দাম হবে ওটার। তুমি কি সেই লোককথাটা জানো! কখনও নরকের না-মানুষের দল দোলনা থেকে মানুষের বাচ্চা তুলে নিয়ে তার বদলে রেখে যেত তাদের ছানা। পিকম্যান এঁকেছে, তারপরে কী ঘটত সেইসব মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে— কীভাবে তারা বড় হয়ে উঠত— তারপরেই আমি লক্ষ করতে শুরু

করলাম মানুষ আর অমানুষ দেহধারীগুলোর মুখের মধ্যে এক পাশবিক মিল। ছবিটার মধ্যে অমানবিক দেহধারী জীবগুলো আর অধঃপতিত মানুষদের মধ্যে এক অদ্ভুত ক্রমবিন্যাসের বিকার ফুটে উঠছিল। এ যেন বিবর্তনবাদের ছিঁড়ে-যাওয়া এক পৈশাচিক সুতো। ওই হায়েনাশ্রেণির জীবগুলো যেন মরমানব থেকেই বিবর্তিত হয়েছে।

পরক্ষণেই আমার মাথায় এক চিন্তা এল, ওই হায়েনা জীবগুলো তো লুকিয়েচুরিয়ে নিজেদের বাচ্চা রেখে যাচ্ছে মানুষজাতির মধ্যেই। এরপরেই আরেকটা ছবি আমার চিন্তা দখল করে নিল। ওটা ছিল একটা প্রাচীন হর্ম্যের অন্তঃস্থল। বিশাল বিশাল কড়িকাঠ-দেওয়া উঁচু উঁচু ঘর, জাফরি-কাটা জানালা, চিরস্থায়ীভাবে রাখা ষোড়শ শতকের সব জবরজং আসবাবপত্র। একটি পরিবার সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। গৃহকর্তা নিষ্ঠাভরে বাইবেল পড়ছেন। প্রত্যেকের মুখে সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার ছাপ স্পষ্ট, শুধু একজন বাদে। তার ঠোঁটের কোনা মুচড়ে ঠিকরে আসছে চাপা ব্যঙ্গ-হাসি। এটা নিশ্চয়ই ওই একটা বদলে-দেওয়া 'বাচ্চা', যে যুবক হয়ে উঠেছে বিগত কয়েক বছরে। একজন ধর্মজ্ঞ নিষ্ঠাবান বাবা পেয়েও তার রক্তের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছে জন্মের সময়কার অশুচিতা। আর এই সমস্ত কিছুর থেকে থেকে বড় ব্যাপার হল, ওই যুবকের সঙ্গে পিকম্যান তার নিজের মুখের এক প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য রেখেছে।

এই সময় পিকম্যান পাশের ঘরে গিয়ে আরেকটা বাতি জ্বালল। বিনয়বশত দরজাটাও খুলে ধরল আমার জন্যে। জিজ্ঞাসা করল, আমি কিছু 'আধুনিক চিন্তা' দেখতে আগ্রহ বোধ করব কি না?

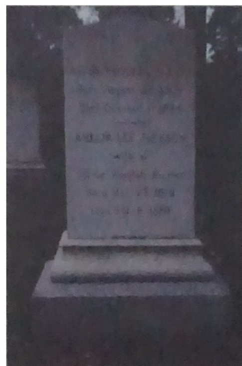
আরও 'আধুনিক'! আমি অবশ্য নিজের মতামত ব্যক্ত করার মতো অবস্থায় ছিলাম না। ভয়ে, ঘৃণায়, কী এক অস্বাভাবিক বোধে, আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তবে আমার মনে হয়, সে আমার অবস্থাটা ভালোই বুঝতে পারছিল, আর নিজের কাজের জন্যে বেশ আত্মশ্লাঘা বোধও করছিল। আমি তোমাকে আবারও নিশ্চিত করছি এলিয়ট, আমি কোনও দুর্বলচিত্ত মানুষ না, যে সাধারণ জীবনের গায়ে একটু ঘা দেখলেই ভয়ে কেঁপে উঠব। আমি প্রায় মধ্যবয়স্ক এবং যথেষ্ট বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। তুমি আমাকে ফ্রান্সে দেখেছিলে, আশা করি বুঝতে পারছ যে, আমি সহজেই উলটে-যাওয়া মানুষ নই। মনে করে দ্যাখো, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে হাওয়া বদলে গিয়ে, আমি কোন সব ছবির ভক্ত হয়ে

উঠেছিলাম। যেগুলোতে কলোনিয়াল নিউ ইংল্যান্ডকে নরকের রাজ্য ভেবে আঁকা হয়েছিল। এসব কিছু সত্ত্বেও, পরবর্তী ঘরের ছবিগুলো সত্যি সত্যি আমার মুখ থেকে আর্তনাদ টেনে বার করে আনতে সমর্থ হল। আমি টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে দরজার হাতলটা চেপে ধরলাম। আগের ঘরটায় দলকে দল পিশাচ আর ডাইনিরা আমাদের পূর্বপুরুষের অতীত হয়ে-যাওয়া মাটিতে চরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই ছবিটাতে আতঙ্ক নিজে উঠে এসেছে আমাদের প্রাত্যহিক বর্তমান জীবনে।

ভগবান, কী করে একটা মানুষ এরকম আঁকতে পারে! এই ছবিটার নাম ‘সাবওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট’। বয়েলস্টোন স্ট্রিটের সাবওয়ের একটা প্ল্যাটফর্ম ভরতি মানুষ। কোন এক অজানা ক্যাটাকুম্বের সুড়ঙ্গের সঙ্গে একটা দীর্ঘ ফাটল সেই প্ল্যাটফর্মকে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই ফাটল বেয়ে উঠে আসছে রাশি রাশি নরকের জীব, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্ল্যাটফর্মের হতভাগ্য মানুষগুলোর ওপরে। অন্য ছবিটায়, কপ’স হিলের ওপরে নৃত্য। দৃশ্যপটে বর্তমান সময়ের শবঘরগুলো। চারপাশে নৃত্য করছে একদল দেহধারী জীব। আরও কয়েকটা ছবিতে বেশ কিছু ভাঁড়ারঘরের ছবি। মাটির নীচের এই ভাঁড়ারঘরগুলোর দেওয়ালের ফাটল আর সুড়ঙ্গ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসেছে কিছু জীব। কড়িকাঠের ওপরে আলো-আবছায়ায় ছুঁচোলো দাঁত মেলে তারা উবু হয়ে বসে আছে। সিঁড়ি দিয়ে যে নামবে, তার ঘাড়েই চোখের পলকে লাফিয়ে পড়বে।

আর-একটা জঘন্য ক্যানভাস জুড়ে বেকন হিলের এক বিস্তীর্ণ ক্রস সেকশন। সেই উপত্যকা বেয়ে দানবীয় পিঁপড়ের মতো উঠে আসছে নরকের পূতিগন্ধময় রাক্ষসদের সেনাবাহিনী। ঠিক মাটির নীচে গর্ত কেটে কেটে মাকড়সার জালের মতোই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তারা। ক্রমশ এগিয়ে আসছে জনবসতির দিকে। বর্তমান সময়ের একটা কবরখানার মধ্যে নৃত্য ছবিটা স্বাভাবিকভাবেই আঁকা। তবে একটা ধারণা আমাকে নাড়িয়ে দিল একেবারে। একটা অজানা সমাধিকক্ষের মধ্যে খান কুড়ি পিশাচ দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে একটা বই। সে সেটা তারস্বরে পড়ছে। বাকিরা সবাই একটা নির্দিষ্ট সুড়ঙ্গের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করছে। তাদের বিকৃত চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে অট্টহাসি। সমস্ত ছবিটা এতটাই সুস্পষ্ট যে, আমি যেন নিজের কানে সত্যি সত্যি শুনতে পাচ্ছিলাম ওই বর্বর পৈশাচিক হাসি। বইটা ছিল আমাদের অতি পরিচিত বোস্টন গাইড

বুক। ছবিটার নাম ছিল, "হোমস, লয়েল আর লংফেলো[151]। এই পাহাড়ের তলায় শুয়ে আছে।"







চিত্র ৯.৪ : মাউন্ট অবার্ন সেমিটারি, কেমব্রিজ - হোমস, লয়েল আর লংফেলো

ধীরে ধীরে আমি দ্বিতীয় ঘরের অত্যুচ্চমানের শয়তানি আর বিকারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে লাগলাম। গা গোলাচ্ছিল তা-ও আমি ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। প্রথমেই আমি নিজেকে নিজে বললাম, পিকম্যানের ঘোরতর অমানবিকতা আর নির্মম নিষ্ঠুরতার প্রতিবিম্ব এই ছবিগুলো। দেহমনের ওপরে এই অবিরাম নিপীড়ন। মানুষের এই পবিত্র আত্মার বাসস্থানস্বরূপ দেহবাড়িকে এইভাবে নিকৃষ্ট রূপ দেওয়া! এই

লোকটা নির্ঘাত মানবতাবাদের এক নির্দয় শত্রু। দ্বিতীয়ত, আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে উঠল ছবিগুলোর উচ্চমানের রূপ দেখে। ছবিগুলোর শিল্পকলা এতই উঁচুদরের যে, ক্রমশ হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যয় জন্মাচ্ছিল তাদের বাস্তবতার প্রতি। বুকের মধ্যে ভয় জমছিল ছবিগুলোর প্রতি। যখন আমরা চিত্রগুলো দেখছিলাম, তখন যেন শুধু চিত্রকলা নয়, ওই পিশাচগুলোকেই আমরা দেখছিলাম। প্রত্যেকটা ছবি এতটাই সুচারুভাবে আঁকা হয়েছিল। আর সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হল, পিকম্যান ছবিগুলোর মধ্যে কোথাও কোনও অবাস্তবতা কিছুই ব্যবহার করেনি। একটা অংশও ঝাপসা, আবছা, বিকৃত বা গতানুগতিক ছিল না। প্রত্যেকটা বস্তু বা জীবের আউটলাইনগুলো পরিষ্কার এবং প্রায় জীবিত মডেল ব্যবহার করার মতোই পরিষ্কার। যন্ত্রণাদায়কের মতোই প্রত্যেকটা ডিটেইল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আঁকা। আর মুখগুলো!

না! যা আমি দেখছিলাম, ওগুলো কোনও সাধারণ শিল্পীর কল্পনার ব্যাখ্যা নয়। বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জলতা, চরিত্রদের ঘৃণ্যতা, সব মিলিয়ে ছবিগুলো নিজেই নরক। হ্যাঁ, নরক! ওহ্ ভগবান! ওই লোকটা মোটেও কোনও কল্পনাপ্রবণ বা ভাববিলাসী নয়। সাধারণ কল্পনার মন্থনপ্রসূত হলাহল সে তুলে আনেনি। সে স্বয়ং নেমে দাঁড়িয়েছে হিমশীতল, বিষাক্ত দুনিয়ায়। একই সঙ্গে দু-হাতে টেনে নামাতে চাইছে আমাদের এই জাগতিক পৃথিবীকেও। যেখানে শত শত রৌরব নরকের জীব ঘুরপাক খাচ্ছে, সড়সড়িয়ে বুকে হাঁটছে অথবা ভেসে বেড়াচ্ছে। ভগবান জানে, কোথায় ও কীভাবে ওই সমস্ত নারকীয় দৃশ্যের একঝলকও তার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল! তবে যেভাবেই সেগুলো মনের আয়নায় বিম্বিত হোক-না কেন, একটা জিনিস খুব পরিষ্কার। পিকম্যানের আঁকা ওই ছবিগুলো, ওই দেহধারীরা, ওই প্রেক্ষাপট— ভাবনাচিন্তা ও চিত্রায়ণের দিক থেকে— একদম নিখুঁত আর প্রায় বাস্তব। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তব।

এইবার গৃহকর্তা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন মাটির তলার ভাঁড়ারঘরটার দিকে, যেটাকে উনি আসলে স্টুডিয়ো হিসাবে ব্যবহার করেন। আমি ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে বুকটাকে শক্ত করতে লাগলাম। আরও কী বীভৎস উৎকট শিল্পকলা অপেক্ষা করছে অসম্পূর্ণ ক্যানভাসে! ড্যাম্প-ধরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে উনি ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে ঘরের একপাশে রাখলেন।

ঘরের মেঝের মধ্যে একটা বিশাল ইটে বাঁধানো কুয়ো। কুয়োর দেওয়ালে আলো লেগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। আমরা ওটার কাছে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ ফুট দূরে থাকাকালীনই আমি ওটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, প্রায় এক ফুট চওড়া সলিড বেড়বিশিষ্ট, মেঝে থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু ষোড়শ শতকের একটা স্থাপত্য।

পিকম্যান জানাল, এই ধরনের স্থাপত্যের কথাই সে বলছিল। এই জিনিসগুলোই সুড়ঙ্গের জাল তৈরি করে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের তলা দিয়ে। ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম জিনিসটা ইটে বাঁধানো নয়। বরং একটা খুব ভারী কাঠের চাকতি দিয়েই তৈরি। ওপরের ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে এই কুয়োর স্থাপত্য ইতিহাস বিশ্লেষণ আমার মোটেও ভালো লাগল না। নিজের অজান্তেই কেমন যেন শিউরে উঠলাম। পিকম্যান পাশের সরু দরজা দিয়ে এক ধাপ ওপরে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমিও তড়িঘড়ি তাকে অনুসরণ করলাম। ঘরটা মেঝে কাঠের আর আসবাবপত্রও একজন শিল্পীর স্টুডিয়োর মতোই। একটা অ্যাসিটিলিন গ্যাসের জোরালো বাতি শিল্পীকে তার প্রয়োজনীয় আলো দিয়ে সাহায্য করে।

ইজেলের ওপরে অসমাপ্ত চিত্রগুলো চাপানো। অনুশীলনের কিছু কিছু ছবি দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দেয়া। সবই ওই ওপরের ঘরের সম্পূর্ণ ছবিগুলোর মতোই। একই রকমের নৃশংস আর যন্ত্রণাদায়ক শিল্পকলায় পরিপূর্ণ। দৃশ্যপটের ব্লকগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে আঁকা। চরিত্রের পেনসিল স্কেচিংগুলোও খুব সূক্ষ্ম। পিকম্যান খুব যত্ন সহকারে ছোট ছোট অনুশীলনেও দৃষ্টিকোণ আর বিজাতীয় দেহের অনুপাত সঠিকভাবে বজায় রেখেছে।

নাহ্! শিল্পী হিসাবে মানুষটা মহান, স্বীকার করতেই হবে! সব কিছু জানার পরে আমি এখনও সেই কথাই বলব। টেবিলের ওপরে রাখা একটা বড় ক্যামেরা হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পিকম্যান বলল, ওটা পটভূমির জন্যে প্রাকৃতিক ছবি তুলতে কাজে দেয়। বিভিন্ন শহরের ছবি অথবা কবরখানা অথবা পাহাড়ের উপত্যকা, সবই যেন এই স্টুডিয়োয় বসেই সে ছবি দেখে অনুপুঙ্খভাবে আঁকতে পারে। সে মনে করে, একটা ছবি অনেকটা প্রকৃত দৃশ্যপটের মতোই হওয়া উচিত। এমনকী মডেলদেরও। সে স্বীকার করল যে, সে প্রায়শই তাদের ভাড়া করে আনে।

ঘরের মধ্যে চতুর্দিক থেকে উঁকি মারছে বমন উদ্রেককারী স্কেচগুলো আর অসমাপ্ত নারকীয় দৃশ্যপটেরা। এই ছবিগুলোতে কী যেন একটা ব্যাপার আছে। কেমন একটা

অস্বস্তি ক্রমে ঘিরে ধরছে আমাকে। পিকম্যান হঠাৎ একটা বিশাল ক্যানভাসের ওপরের সাদা কাপড়টা টেনে সরিয়ে দিল। আমার গলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার আপনা-আপনি ছিটকে বেরিয়ে এল। দ্বিতীয়বার, ওই সন্ধেতেই। প্রাচীন বদ্ধ সেলার ঘরের ভ্যাপসা দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আর্তনাদটা ফিরে ফিরে আসতে লাগল। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমার দম আটকে এল, পরক্ষণেই নিজের অবস্থা বুঝে একটা পাগল-করা হাসি বেরিয়ে এল গলা চিরে।

ভগবানের দোহাই, এলিয়ট, আমি ওটাকে প্রথমে সত্যিই ভেবেছিলাম। জিনিসটা এত বেশি প্রাণবন্তভাবে আঁকা হয়েছিল। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি, পৃথিবীতে কেউ এমনও কল্পনা করতে পারে।

ওটা একটা প্রকাণ্ড ছবি। নামহীন অতলের অন্ধকার থেকে উঠে-আসা এক জীব। তার রক্তচক্ষু জ্বলজ্বল করছে নৃশংসতায়, অস্থিময় নখরযুক্ত হাতে ধরে আছে একটা নরদেহ। একটা শিশু যেরকম লালসার সঙ্গে ললিপপ চুসে খায়, ঠিক সেভাবেই দেহ থেকে মাথাটা ছিঁড়ে খাচ্ছে সেই জীব। জীবটা সামান্য গুঁড়ি মেরে বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, সে যে-কোনও সময়ে হাতের দেহটা ছুড়ে ফেলে দেবে নতুন লজেন্সের সন্ধানে। কিন্তু ওসব কিচ্ছু না, বিষয়বস্তুও কিছু অতিপৈশাচিক নয়, যা কারও হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেবে। ওই কুকুরমুখে ছুঁচোলো কান নয়, ওই রক্তচক্ষু, থ্যাবড়া নাক, ঝোলা ঠোঁট, ওইসবও নয়। দীর্ঘ নখরে দুমড়ে-মুচড়ে-যাওয়া মনুষ্যদেহের ধ্বংসাবশেষও না, না ওই ক্ষুরকায় পদযুগল—ওইসব কিচ্ছু না। যদিও ওইগুলোর মধ্যে যে-কোনও একটাই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে পাগল করার জন্যে যথেষ্ট ছিল, তবু আমি বলব, ওইসব কিচ্ছু নয়।

টেকনিক, এলিয়ট, ওই মারাত্মক শাপগ্রস্ত অবাস্তব টেকনিক! আমি, আমি একটা জ্যান্ত মানুষ হয়ে বলছি, আমি কোথাও দেখিনি, একটা আঁকা ছবিও ওরকম শ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত জীবিত প্রাণীর মতো হতে পারে। ওই পিশাচটা যেন আমার থেকে কয়েক হাত দূরে ওই ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে, বাড়ানো হাতের নখরগুলো যেন এক্ষুনি আমাকে ছুঁয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মের বেড়াজালে থাকলে এই ধরনের চিত্রকলা কোনও মানুষ মন থেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। মডেল ছাড়া এত প্রাণবন্ত ছবি আঁকা কোনওমতেই সম্ভব নয়। ওই নারকীয় জগতের একঝলক সত্য সত্যই না দেখলে, শুধুমাত্র কল্পনা থেকেই এত নিখুঁত চিত্র কোনও মানুষ আঁকতে পারে না।

নরকের শয়তানের কাছে বিক্রি না হয়ে গেলে, এমন কল্পনাই বা কারও মাথায় আসে কী করে! আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

ক্যানভাসের খালি অংশে একটা পিন-গাঁথা কাগজের টুকরো বিশ্রীভাবে গুটিয়ে আছে। ওটা বোধহয় দৃশ্যপটের ছবি। যেগুলো পিকম্যান পার্থিব জগৎ থেকে ক্যামেরাবন্দি করে। এই নৃশংস দানবটার পটভূমিকা আঁকার জন্য হয়তো ওই ছবিটা ব্যবহার করবে। যে পটভূমিকা এখনকার চরিত্রের নৃশংসতাকে আরও দশগুণ বাড়িয়ে দেবে। আমি হাত বাড়িয়ে গোটানো ছবিটা খুলে দেখতে চাইলাম। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম, পিকম্যান যেন মূর্তিবৎ স্থাণু হয়ে গেল। আমি খেয়াল করছিলাম, ওই অন্ধকার ঘরে আমার আর্তনাদ বিশ্রী প্রতিধ্বনি তোলার পর থেকেই সে যেন খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা শোনার চেষ্টা করছে। এখন আচমকাই মনে হল, তার মুখে যেন একটা ভয়ের ছায়া সরে গেল। না, ঠিক আমার মতো মারাত্মক আতঙ্কিত হল না সে, কিন্তু তারা সারা দেহে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে একটা রিভলভার টেনে বের করে, আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ঘরটা থেকে মেইন সেলারে বেরিয়ে গেল। দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার সারা শরীর বুঝি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। পিকম্যানের কান পেতে শোনা ভয়ার্ত ভঙ্গিমাটার কথা মনে পড়তেই, আমি যেন অস্পষ্টভাবে পাথরের ওপরে নখের ছরছর আওয়াজ শুনলাম। কে যেন দ্রুতবেগে ছুটে গেল। তারপরেই বিভিন্ন দিক থেকে খনখন, গোঁ গোঁ শব্দ উঠতে লাগল। কারা যেন পাথরের গায়ে নখ ঠুকে নালিশ জানাচ্ছে। মানুষখেকো ইঁদুরের দল নয় তো! আমি দেখেছি বিড়ালের থেকেও বড় বড় ইঁদুর। দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করে। দুর্বল অসহায় নিরস্ত্র মানুষ পেলে জীবিত খুবলে খেয়ে নেয়। আমি শিউরে উঠলাম। হঠাৎ একটা চাপা গুম শব্দে আমার ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল। আমি যেন শুনলাম না, বরং অনেক বেশিভাবে অনুভব করলাম ওই অদ্ভুত চোরা শব্দটা। যদিও আমি জানি না, আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করব শব্দটাকে। আমার মনে হল, বিশাল ভারী কিছু একটা এসে পড়ল পাথরের মেঝের ওপরে।

আবারও শব্দটা হল। এবার স্পষ্ট এবং আরও জোরে। এমনকী আমিও পায়ের তলার মেঝেতে কাঁপুনি অনুভব করতে পারলাম, যদিও শব্দটা আসছিল অনেকটা দূর থেকে।

গুমগুম শব্দটার সঙ্গে ক্রমে যোগ হল একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ। আমি স্পষ্ট শুনলাম, পিকম্যান খ্রীং ক্রীং জাতীয় আবোল-তাবোল কী সব আওড়াচ্ছে। তারপরেই কান-ফাটানো ছ-ছ-টা গুলির শব্দ। সার্কাসের রিংমাস্টার সিংহকে পোষ মানাতে যেমন ফাঁকা বাতাসে গুলি করে, সেইরকম ফাঁপা আওয়াজ শুনলাম বলেই মনে হল আমার। একটা দমচাপা কর্কশ চিৎকার শুনলাম, পরক্ষণেই দুম করে কী যেন একটা পড়ল। তারপরে সেই একই রকমের গুমগুম শব্দ, পাথরের দেওয়ালে নখ আঁচড়ানোর শব্দ। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে দরজাটা খুলে গেল, যেটার দিকে আমি উন্মাদের মতো তাকিয়ে ছিলাম। পিকম্যান ফিরে এল। হাতের রিভলভারের নল থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছিল। 'জাহান্নমের ইঁদুরের গুষ্টি' বলে সে খিস্তি করল।

"শয়তান জানে, হতচ্ছাড়াগুলো ওই গর্তে কী খায়!" সে ভেংচি কেটে হাসল, "এই সুড়ঙ্গগুলো হয়তো মাটির তলা দিয়ে কবরখানাটাকে ছুঁয়ে গেছে। সেইসব জায়গা থেকেই হয়তো ওইগুলো খাবার জোগাড় করে। তবে যা-ই হোক-না কেন, ওদের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। ওরা বেরিয়ে আসতে চাইছে মাটির ওপরে। তোমার চিৎকার ওদেরকে টেনে এনেছিল বলেই মনে হচ্ছে। এই সমস্ত প্রাচীন জায়গায় একটু সাবধানে থাকতে হয়। এই জাহান্নমের জীবগুলো একটা অসুবিধা তো বটেই। তবে আমার মনে হয়, ওদেরও এই পরিবেশকে তৈরি আর বৈচিত্র্যময় করার পিছনে যথেষ্ট অনুদান আছে। এ তো এক রকমের সম্পদই বটে।"

হ্যাঁ। সেই রাত্রের বিভীষিকাপূর্ণ অভিযানের সেইখানেই সমাপ্তি, এলিয়ট। পিকম্যান আমার কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিল যে, সে আমাকে জায়গাটা দেখাবে, আর সে কথাও রেখেছে। সে আমাকে সেই গোলকধাঁধার মতো গলির মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। চার্টার স্ট্রিটে এসে আমি রাস্তাটা চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি মানসিকভাবে এতটাই অবশ হয়ে পড়েছিলাম যে, বুঝতেই পারিনি, কোথা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তখন অনেকটাই রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকম গাড়ি পাওয়ার জন্যে আমরা বস্তির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হ্যানোভার স্ট্রিটে ফিরে এসেছিলাম। সেই হাঁটার কথা আমার মনে আছে। ট্রেমন্ট আপ বেকনে উঠে আসার পরে পিকম্যান আমাকে একটা কফি শপের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে

যায়। ওখান থেকেই আমি একটা ক্যাব পাই। তারপরে আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

কেন? কেন আমি ওর সঙ্গ ত্যাগ করলুম? আহ্, অধৈর্য হোয়ো না। এক কাপ কফি বলো। অনেক কারণই ছিল, তবে একটাই কারণ যথেষ্ট ছিল। না, না— ওই ছবিগুলো নয়। হতে পারে, ছবিগুলো ভয়ংকর ছিল। অবশ্যই বোস্টনের কলাশিল্পের ক্লাব আর অন্যান্য মানুষজন ছবিগুলো দেখলেই তাকে একঘরে করতে দ্বিধা করত না। তবু আমি বলব, ওই ছবিগুলো না।

এতক্ষণে তুমি বোধহয় একটু একটু আন্দাজ করতে পারছ আমার কুসংস্কারের ব্যাপারটা। বুঝতে পারছ, আমি কেন অন্ধকার সাবওয়ে আর মাটির নীচে সেলার ঘরে যাওয়ার ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছি।

আসলে পরের দিন সকালে আমি আমার কোটের পকেটে একটা দলা-পাকানো কাগজের টুকরো পাই। ওটা সেই গোটানো কাগজের টুকরোটা, যেটা ক্যানভাসের গায়ে পিন দিয়ে আটকানো ছিল। ওই যেটা আমি ভেবেছিলাম পটভূমি আঁকার জন্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্যামেরায় তোলা ছবি। আমি ওটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তারপরেই সেই ভয়ংকর ইঁদুরগুলোর মোকাবিলায় পিকম্যান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমিও উদ্‌বেগে-আতঙ্কে ছবিটা কখন যেন দলা পাকিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছি। মনেই ছিল না।

নাও, এক কাপ কফি খাও এলিয়ট। আহা, কড়া কালো কফিই খাও না-হয়। জানো না, ওটা স্নায়ুকে শক্তিশালী করে।

হ্যাঁ, ওই ছবিটাই, ওই ফোটোগ্রাফিটাই পিকম্যানের সঙ্গ ত্যাগ করার মূল হেতু। রিচার্ড আপটন পিকম্যান, আমার জ্ঞানত এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ওইরকম বিকৃতমনস্করাই জাগতিক জীবন ছেড়ে অকাল্ট আর উন্মাদের গহ্বরে ঝাঁপ দিতে পারে। রেইড ঠিকই বলেছিল, পিকম্যান কখনওই পুরোপুরি মানুষ নয়। হয় সে কোনও অন্ধকার ছায়াময় জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, অথবা সে খুলতে পেরেছে সেই জগতে যাওয়ার দরজাটা। অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না। সে চলে গেছে। যে ভয়ানক অন্ধকার জগৎকে সে ভালোবাসত, তলিয়ে গেছে তারই গহ্বরে।

উঁহু, জানতে চেয়ো না, আমি কী পুড়িয়ে দিয়েছি। এ-ও জিজ্ঞেস কোরো না, ওই অতিকায় জীবগুলো আদতে কী ছিল, যেগুলোকে পিকম্যান শুধুমাত্র ইঁদুর বলে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। কিছু জিনিস রহস্য থাকাই ভালো। সেই প্রাচীন সালেমদের সময় থেকেই চলে আসছে এমন অনেক জিনিস। কটন মাথ্যুরের গল্পেও তারা আছে। তুমি তো জানোই, পিকম্যানের ওই চিত্রগুলো কতটা জীবন্ত ছিল— আর আমরা সবাই অবাক হচ্ছিলাম যে, কোথা থেকে ওই পৈশাচিক মুখাকৃতি সে পেয়েছে।

আসলে, ওই ফোটোগ্রাফটা কোনও দৃশ্যপটের ছবি নয়। ওতে ছিল সেই নারকীয় জন্তুটা, যেটা আমি দেখেছিলাম মাটির নীচের ঘরে বিশাল ক্যানভাস জুড়ে। ওটা আসলে মডেলেরই ফোটোগ্রাফ। আঁকার সময় সে ব্যবহার করছিল। ওটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট একটা ভাঁড়ারঘরের ইটের গাঁথনি, নিখুঁতভাবেই আঁকা। কিন্তু ফোটোগ্রাফটা আদতে ওই জীবটারই।



প্রথম প্রকাশ: *'উইয়ার্ড টেলস' পত্রিকায়, ১৯২৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় লেখাটি।*

ভাষান্তর: *অঙ্কিতা*



দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ

লাভক্র্যাফটের সেরা লেখাগুলির মধ্যে এই গল্পটিতে নিউ ইংল্যান্ডের একটি অখ্যাত গ্রামে অজানা জাতির অমর জীবদের গল্প বলা হয়েছে। লাভক্র্যাফটের নিজের লেখা থেকে পরে জানা যায় গল্পের কথক রবার্ট ওল্মস্টেডের জীবন কীভাবে এক ভয়ংকর অতীতের ছায়ায় অচেনা অন্ধকারে ডুবে যায়। ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে মিলনে লাভক্র্যাফটের ঘোর আপত্তি থাকলেও গল্পে সেটা ছাপিয়ে মানুষের লোভ ও অমরত্বের লালসাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ইন্সমাউথের ইশারা
(The Shadow Over Innsmouth)



১৯২৭-২৮ সালের শীতটা মনে আছে আপনাদের? ওই বছর ম্যাসাচুসেটসের পুরোনো বন্দর ইন্সমাউথে একটা রহস্যময় অপারেশন চালিয়েছিল ফেডারেল এজেন্সিগুলো। ব্যাপারটা সামনে আসে ফেব্রুয়ারি মাসে। ব্যাপক হারে ধরপাকড়, সমুদ্রের লাগোয়া অতগুলো বাড়িকে শুধু জ্বালানো নয়, একেবারে ডিনামাইট দিয়ে ওড়ানো... এগুলো অনেকেরই মনে আছে। লোকে ভেবেছে, এগুলো বেআইনি মদের ভাঁটি ভাঙা বা চোরাচালানের আড্ডা ভেস্তে দেওয়া ছাড়া কিছু না[152]। তবে হ্যাঁ, এত লোক গ্রেফতার হল, অথচ কাউকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল না— এটা ভাববার মতো, তা-ই না?

ওখানে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বোঝেনই তো, সব অপরাধীকে তো আর আইনের সামনে আনা যায় না, কোর্টে দাঁড়িয়ে ‘মিলর্ড’ বলে চ্যাঁচানোর সুযোগও দেওয়া যায় না। তাদের জন্য আর্মি আর নেভির কিছু ব্যবস্থা থাকেই। ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের ডেরা হয়েছিল সেই জায়গাগুলোই। সে জন্যই তো শহরটা এখনও প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। এমনকী প্রেসের লোকেরাও ইন্সমাউথে ঠিক

কী হচ্ছিল, বা কারা সেখানে ছিল— এগুলো জানার পর কেসটা চেপে দেয়। তবে কিছু খবর তো বেরিয়েই যায়। এক সাংবাদিক দাবি করেছিল, নেভির সাবমেরিন থেকে নাকি ডেভিল'স রিফের পাশের গভীর খাতটায় টর্পেডো ফায়ার করা হয়েছিল ওই সময়। সেটাকেও তখন নেভির এক্সারসাইজ বলেই চালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটু একটু করে সব কথা সমুদ্রের নোনা হাওয়া আর বালির তলায় চাপা পড়ে যায়।

ঠিক কী হয়েছিল ওখানে, সেটা খুব কম লোকই জানতে পেরেছিল। আশপাশের এলাকায় যারা থাকে, তারা বাইরের লোকের সামনে মুখে তালা দিলেও নিজেদের মধ্যে বিস্তর গজগজ করেছিল। তবে তারা নিজেরাও সত্যিটা পুরোপুরি জানত বলে মনে হয় না। ডাঙার দিকে জলাজমি আর রুক্ষ পাথুরে এলাকা ইন্সমাউথকে আশপাশের এলাকা থেকে আলাদা রেখেছিল অনেক দিন। শহরটা, আর সেখানে যারা থাকে, দুটোকেই এড়িয়ে চলার একটা অভ্যাস ম্যাসাচুসেটসের পুরোনো বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল।

তবে আমি জানি, কী হয়েছিল ওখানে। যা জানি, সেটা লিখছি। এর চেয়ে বেশি জানতে চাইবেন না, কারণ সেটা আপনাদের পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে।

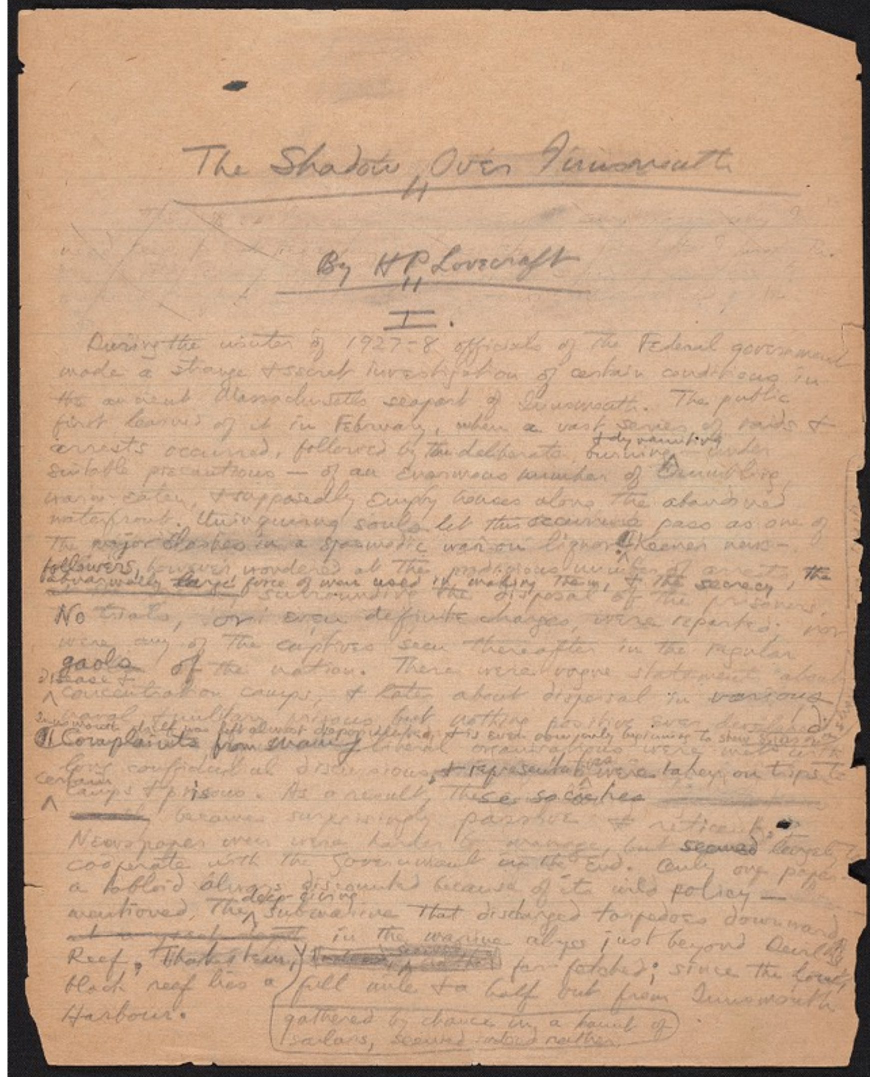
১৬ জুলাই ১৯২৭ আমিই ইন্সমাউথ থেকে পালিয়েছিলাম। আমারই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রথমে কয়েকজন, তারপর একটা সংস্থা, শেষে সেনাবাহিনী ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করে। এত দিন মুখ বন্ধ করে ছিলাম অনেক কারণে, তবে এখন সেগুলো অর্থহীন।

তাহলে বলি?

পড়াশোনা সেরে 'বড়' হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়েছি তখন। ঠিক করলাম, নিউ ইংল্যান্ডের একটু কম-জানা, কম-চেনা জায়গাগুলোয় ঘুরতে যাব। স্রেফ ঝাঁকিদর্শন নয়, বরং স্থানীয় ইতিহাস, সমাজ, আচার-ব্যবহার— এসব দেখা-বোঝাও আমার লক্ষ্য ছিল। সমস্যা হল পয়সাকড়ি নিয়ে। বুঝতেই পারছেন, তখন আমার সংগতি কেমন ছিল। ট্রেন, বাস, ছোটখাটো কোচ— এসবের ভরসাতেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম আমি। ঠিক করেছিলাম, ট্রেনে চেপে নিউবারিপোর্ট[153] থেকে আর্কহ্যাম[154] যাব। টিকিটের ভাড়া শুনে চোখ কপালে উঠল। স্টেশন এজেন্ট ভদ্রলোক বোধহয় স্থানীয় নন। আমার অবস্থা দেখে একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, "আপনি পুরোনো বাসটা নিতে পারেন।"

"পুরোনো বাস?"

"হ্যাঁ।" সেইরকম দ্বিধাভরেই ভদ্রলোক বললেন, "তবে বাসটা ইন্সমাউথের মধ্য দিয়ে যায়। এখানকার কেউ, এমনকী আর্কহ্যামের কোনও বাসিন্দাও ওটাতে চড়ে না। প্রায় ফাঁকাই দেখেছি ওটাকে। শুধু ইন্সমাউথে কারও নামার থাকলে সে-ই চড়ে ওতে। বাসটা চালায়ও জো সার্জেন্ট বলে একজন ইন্সমাউথের লোক।"


The Shadow Over Innsmouth

By H.P. Lovecraft

I.

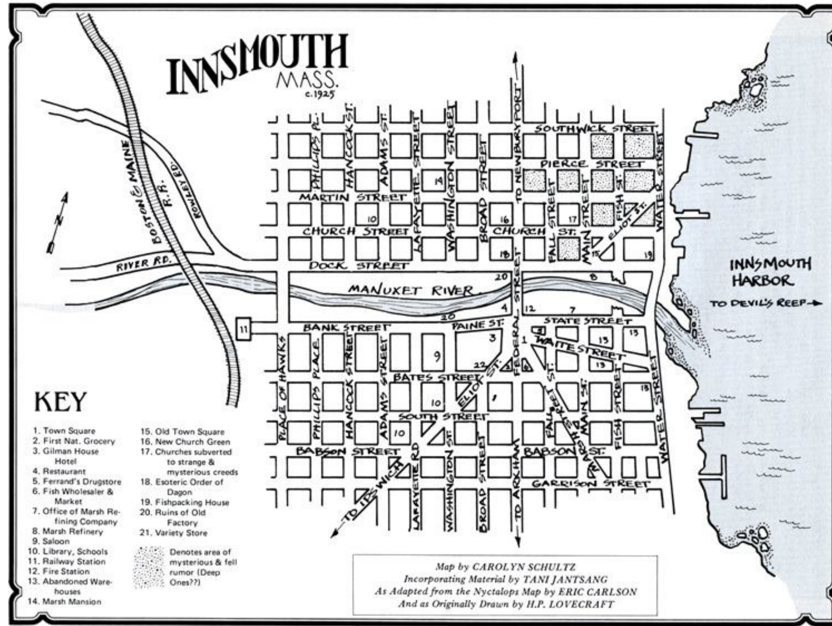
During the winter of 1927-8 officials of the Federal government made a strange & secret investigation of certain conditions in the ancient Massachusetts seaport of Innsmouth. The public first learned of it in February, when a vast series of raids & arrests occurred, followed by the deliberate burning & dynamiting — under suitable precautions — of an enormous number of crumbling, worm-eaten, & supposedly empty houses along the abandoned waterfront. Uninquiring souls let this occurrence pass as one of the major clashes in a spasmodic war on liquor. Keener news-followers, however, wondered at the prodigious number of arrests, the abnormally large force of men used in making them, & the secrecy surrounding the disposal of the prisoners. No trials, or even definite charges, were reported; nor were any of the captives seen thereafter in the regular gaols of the nation.

চিত্র ১০.১ : "দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ" গল্পের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

"বাসটার ভাড়া কি খুব বেশি? মানে ফাঁকা থাকে বলে জানতে চাইছি।"

"আরে না না!" ভদ্রলোক হেসে বললেন, "একেবারে লজ্‌ঝড়ে জিনিস। ওর টিকিটের দর খুব কম। হ্যামন্ডের দোকানের সামনে থেকে বাসটা দিনে দু-বার ছাড়ে। সন্ধে সাতটায়, আর সকাল দশটায়। ওতেই যান বরং।"

আমি সেই প্রথম ইন্সমাউথের নাম শুনলাম। ভাবলাম, আর্কহ্যাম যাওয়ার পথেই যখন পড়ে, তখন ওখানে থেমে জায়গাটা একটু দেখে-শুনে যাব কি না। এজেন্টের কাছেই জায়গাটা নিয়ে জানতে চাইলাম। টিপিক্যাল শহরের লোক যেভাবে গ্রামের বর্ণনা দেয়, সেভাবেই ভদ্রলোক একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন।



চিত্র ১০.২ : ইন্সমাউথের ম্যাপ

"ইন্সমাউথ? মানুক্সেট[155] নদীর মোহানায় একটা এঁদো শহর ওটা, বুঝলেন। ১৮১২ সালের যুদ্ধের আগে বেশ বড় বন্দর ছিল বলে শুনেছি, তবে তারপর সব গেছে। রেললাইন ওদিকে যায়নি। এমনকী রোলি থেকে যে ব্রাঞ্চ লাইনটা ছিল, ওটাও তুলে দেওয়া হয় পরে। তাই অন্য কোনও ব্যাবসাবাণিজ্যও গড়ে ওঠেনি। শুধু মাছ আর চিংড়ির কারবার এখনও হয়। আর একটা গোল্ড রিফাইনারি আছে। ওই রিফাইনারিটা কিন্তু সলিড জিনিস। মার্শ, মানে ওটার মালিক, বিশাল ধনী, এমনটাই শুনতে পাই। ভদ্রলোকের কিছু একটা চর্মরোগ হয়েছে বলে উনি লোকচক্ষুর সামনে আসেন না। উনি ক্যাপটেন ওবেদ

মার্শের নাতি। ওবেদ মার্শ এই ব্যাবসাটা শুরু করেছিলেন। লোকে বলে, মার্শ নাকি দক্ষিণ সমুদ্রের কোনও এক দ্বীপের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এখানকার লোকজনের মন এত ছোট, কী বলব! ভাবুন তো, এক বিদেশিনিকে ঘরে আনার অপরাধে ক্যাপটেন মার্শের পরিবার তো বটেই, গোটা ইন্সমাউথের কোনও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না এখানকার লোকজন।"

"শুধু ওই একটা বিয়ের জন্য?" আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম।

"না। তা অবশ্য নয়।" মেনে নিলেন ভদ্রলোক, "লোকে আরও হাজারটা ভুলভাল কথা বলে ক্যাপটেন মার্শের সম্বন্ধে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, ওরা বলে, ক্যাপটেন মার্শ নাকি শয়তানের সঙ্গে কী সব চুক্তি করেছিলেন। কারা যেন ইন্সমাউথে এসে থাকা শুরু করেছিল। তাদের মাধ্যমে ওখানে শয়তানের উপাসনা, আর আরও সব ভয়ংকর ভয়ংকর প্রথা নাকি শুরু হয়েছিল। ১৮৪৫ সালে নাকি এগুলো সামনেও এসেছিল। জানি না মশাই, আমি নিজে ভারমন্ট[156] থেকে এসেছি অনেক পরে। কিন্তু এইসব হাবিজাবি এরা প্রায় শ-খানেক বছর ধরে কানাকানির মতো করে বলে চলেছে!"

"আচ্ছা, এই যে ইন্সমাউথে কারা এসে থাকছিল বললেন," আমার মাথায় কৌতূহলের পোকাটা নড়েচড়ে উঠেছিল ততক্ষণে, "এরা কোত্থেকে এসেছিল? ওই দক্ষিণের সমুদ্র বা সেখানকার দ্বীপ থেকে?"

"উঁহু।" এই এতক্ষণে ভদ্রলোকের হাবভাবে আমি একটা সিরিয়াস ভাব খুঁজে পাই, "আপনি এদিককার ভূগোলটা জানলে একটা বিশেষ জায়গার নাম শুনবেন। একটা প্রবাল প্রাচীর আছে ইন্সমাউথ থেকে কিছুটা দূরে। জায়গাটার নাম ডেভিল'স রিফ। বেশির ভাগ সময় ওটা জলের ওপরেই থাকে। বেশ কয়েকটা গুহার মতো গর্ত আছে ওতে। ওর পাশেই একটা বেশ গভীর খাত আছে সমুদ্রের তলায়। ওই জায়গাটাকে নাবিকরা এড়িয়ে চলে।"

"সে তো যাবেই।" ওটুকু আমিও বুঝতে পেরে বলি, "ওখানে জাহাজের নীচটা ধাক্কা খেয়ে ফেঁসে গেলে?"

"ওসব নয়।" ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হন, "লোকে বলে, জলের নীচ থেকে উঠে এসে কারা যেন ওখানে প্রায়ই থাকে। বিশ্রাম নেয়। আরও অনেক কিছু করে। আর ক্যাপটেন মার্শের বিরুদ্ধে লোকেদের এত কথার উৎস হল ওই জায়গাটা।"

"মানে?"

"ওবেদ মার্শ নাকি রাতবিরেতে ওখানে যেতেন। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে নৌকো ফিরে আসত। আবার তাঁকে নিয়ে আসত অনেক পরে। সাধারণ ব্যাখ্যা হল, যে সোনা নিয়ে মার্শের কারবার শুরু, সেগুলো আসলে পুরোনো আমলের জলদস্যুদের লুকিয়ে-রাখা মাল। ওই জায়গার নানা গুহায় ওগুলো হয়তো ছিল। কিন্তু লোকে এই সহজ ব্যাখ্যাটা মানে না। বরং মার্শের সঙ্গে ওখানকার বাসিন্দাদের মেলামেশা নিয়েই তাদের সমস্যা।"

"তা এই বহিরাগতরা এখন আর ইন্সমাউথে থাকে না?" আমি জানতে চাই।

"বলা মুশকিল।" ভদ্রলোক ঠোঁট বেঁকালেন, "১৮৪৬ সালে ওখানে কিছু একটা মড়ক হয়েছিল[157]। ঠিক কী হয়েছিল বলা মুশকিল। কেউই কিছু বলতে চায় না, হয়তো জানেও না। তবে শহরটা প্রায় সাফ হয়ে যায় ওতেই। এখন ওখানে মেরেকেটে শ-চারেক লোক আছে হয়তো।"

"কিন্তু এখানকার লোকেরা জায়গাটা এড়িয়ে চলে কেন?" আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না, "মানে এখনও নিশ্চয় সেই মড়কের প্রভাব থাকবে না।"

"তা হয়তো নেই, তবে অন্য কিছু আছে।" এজেন্ট ভদ্রলোক বললেন, "হয়তো ক্যাপটেন মার্শের তিনটে জাহাজের সব ক-টাতেই নাবিকেরা অন্য জায়গায় বিয়েশাদি করেছিল। হয়তো বাইরে থেকে যারা এসেছিল, তারা অন্যরকম ছিল। মোদ্দা কথা হল, ওখানকার বাসিন্দাদের দেখলে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। আপনি সার্জেন্টকে দেখবেন বাসে উঠে। ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের কারও মাথা সরু, নাক চ্যাপটা, অথচ ফোলা ফোলা বিশাল সাইজের চোখ। ওদের চামড়াও কেমন যেন খসখসে, আঁশ-আঁশ টাইপের। এমনকী গলার পাশের অংশটা রুক্ষ, ভাঁজ-পড়া। ওদের চুলও পড়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। সবচেয়ে বড় কথা হল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের চেহারা আরও বিকট হয়ে যায়। বাঁচোয়া এই যে, ইন্সমাউথের কোনও বাসিন্দা খুব বেশি বুড়ো হয়েছে, এমন আমি দেখিনি। বেচারিরা বোধহয় বেশি দিন বাঁচেও না!"

"তাহলে তো..." আমার একটু চিন্তা হয় ব্যাপারটা ভেবে, "ওই ইনফেকশন বা অসুখটা খুব মারাত্মক ছিল বলতে হবে। নইলে এত দিন ধরে এরকম প্রভাব ফেলা তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাহলে এই জন্যই এখানকার লোকে ওদের এড়িয়ে চলে।"

"শুধু লোক নয় মিস্টার। জানোয়াররাও।" গম্ভীর গলায় বলেন ভদ্রলোক, "ঘোড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় জানোয়ার ওদের অপছন্দ করে। এই এলাকায় ওরা আসত-যেত ট্রেনে চেপে, আর তারপর হেঁটে। ব্রাঞ্চ লাইনটা উঠে যাওয়ার পর থেকে ওদের জন্যই ওই বাসটা চলে।"

"তার মানে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা-টাখাও...?" প্রশ্নটা শেষ করি না আমি, "তাহলে ওদের চলে কী করে?"

"মাছ।" গম্ভীরভাবে বলেন ভদ্রলোক, "যখন সমুদ্রের কোথাও মাছ পাওয়া যায় না, তখনও ইন্সমাউথের জেটিতে নৌকো মাছের ভারে টলমল করে।"

"মাছেরা ওদের পছন্দ করে বলছেন?" আমি হেসে বলি, "তা, ওখানে রাত কাটানোর মতো কোনও জায়গা পাওয়া যাবে?"

"ওখানে গিলম্যান[158] হাউস বলে একটা হোটেল আছে বটে।" ব্যাজার মুখে বলেন ভদ্রলোক, "তবে ওখানে থাকাটা... তার বদলে আপনি কাল সকাল দশটার বাস ধরে ওখানে যান, আবার ওখান থেকে রাত আটটার বাস ধরে এখানে ফিরে আসুন।"

"কেন বলুন তো?" ভদ্রলোকের মুখ-চোখ দেখে আমার অস্বস্তি হয়, "ওখানে কি কোনও গোলমাল আছে? মানে বাইরের লোক গেলে ঝামেলা হতে পারে?"

"বছর দুয়েক আগের কথা, বুঝলেন।" ভদ্রলোক থেমে থেমে বললেন, "এক ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর ওই গোল্ড রিফাইনারি দেখার চক্করে ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর গিলম্যান হোটেলেই ছিলেন রাতে। ভদ্রলোক রাতে পাশের ঘরগুলো থেকে কয়েকটা গলা শুনেছিলেন। মানে... গলাগুলো ঠিক... মানুষের গলার মতো নয়। ওঁর মনে হয়েছিল, যেন কোনও জন্তু বা সরীসৃপ টাইপের কিছু কথা বলছে। ভাষাটাও ছিল একেবারে দুর্বোধ্য। তবে সব মিলিয়ে ভদ্রলোক দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। রাতভর চলেছিল ওইসব 'কথাবার্তা'। উনিও না শুয়ে, একেবারে কাঠ হয়ে ছিলেন। ভোর হতেই ভদ্রলোক এলাকা ছাড়েন। ভদ্রলোকের নাম কেসি। আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল ওঁর। কেসি ওই রিফাইনারি ইন্সপেক্ট করতে গিয়ে রীতিমতো চমকে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে সোনা কোত্থেকে আসত, আর সেগুলো কোথায় যেত, তার কিছুই বুঝতে পারেননি উনি। এককালে ওটা একটা পুরোনো মিল ছিল। মানুক্সেটের মুখেই বাড়িটা। কেসিও এখানকার লোকেদের মতো ভেবেছিলেন, ক্যাপটেন মার্শ ভিনদেশি বন্দর বা দ্বীপে গিয়ে গয়নাগাটি

জোগাড় করতেন। সেগুলোই তারপর জাহাজে করে চালান করা হত অন্য কোথাও, তারপর সেখান থেকে গয়না হয়ে বা টাঁকশালে সেগুলো তলিয়ে যেত।”

“ভিনদেশি বন্দর? কিন্তু সেখান থেকে ওগুলো জোগাড় করতে গেলেও তো কিছু দিতে হবে বিনিময়ে, তা-ই না? টাকাপয়সা বা অন্য কিছু।”

“ঠিক বলেছেন। যেহেতু ক্যাপটেন মার্শ শহরগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে কাচের পুঁতি, দানা, এমনই আরও অনেক সস্তা কিন্তু মনোলোভা জিনিস কিনতেন, লোকে এটাই ভাবত যে, উনি এইসব দিয়ে কোনও দ্বীপের সরল বাসিন্দাদের ঠকাচ্ছেন।”

“কোন দ্বীপ, সেটা জানা গিয়েছিল?”

“নাহ্।” ভদ্রলোকের হতাশ মাথা নাড়া দেখে বুঝি, এ ব্যথা কী যে ব্যথা! “তবে ওই সোনা যাতে থাকত, সেই জিনিসগুলো স্থানীয় নয়, এমনকী চেনাজানা দেশেরও নয়। কিছু নাবিক বা ওই রিফাইনারির লোক চোরাগোপ্তা পথে কয়েকটা জিনিস এদিক-ওদিকে বেচেছিল। সেগুলো দেখে লোকেদের চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। মানে ওগুলো যদি গলায় পরার হার হয়, তাহলে সেই গলা...”

“কিন্তু ক্যাপটেন মার্শ তো মারা গেছেন, তা-ই না?”

“কমপক্ষে ষাট বছর আগে। কোনও জাহাজও মানুক্সেট মোহানা দিয়ে বেরোয়নি গত ষাট বছরে। কিন্তু...” ভদ্রলোক আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলেন, “ইন্সমাউথের লোকেরা এখনও কাচের পুঁতি, খেলনা— এসব কিনছে। কাদের জন্য?”

“বুঝলাম।” কিছুই না বুঝেও আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লাম, “তাহলে ওখানে যাব না বলছেন?”

“জায়গাটা সুবিধের নয়। লোকগুলো আরও গোলমেলে।” ভদ্রলোক আমাদের দীর্ঘ আলাপচারিতায় ইতি টানতে উদ্যোগী হলেন, “আমি সেন্সাস ডিপার্টমেন্ট আর আরও কয়েকটা সরকারি বিভাগের কথা শুনেছি, যাদের কর্মচারী ওখানে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। একজন তো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ড্যানভার্স-এ[159] আছে এখন। এই অবস্থায় আপনি ওখানে একদিন একটু ‘ঘুরতে’ গেলে তা-ও ঠিক আছে। কিন্তু ওখানে থাকা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।”

এরপর আর কী করার থাকতে পারে? সেই সন্ধেটা আমি নিউবারিপোর্ট পাবলিক লাইব্রেরিতেই কাটালাম। তার আগে স্থানীয় লোকেদের ইন্সমাউথ নিয়ে জিজ্ঞেস করে হতাশ হয়েছিলাম। দোকান, গ্যারেজ, দমকল— এসব জায়গায় কথা বলতে গিয়ে মনে হল, একটা অস্পষ্ট কুসংস্কার গোছের জিনিস রয়েছে জায়গাটা নিয়ে। যেন জায়গাটা নিয়ে বেশি কৌতূহল দেখালে বিপদ হতে পারে। আবার ওয়াইএমসিএ, যেখানে আমি উঠেছিলাম, সেখানে আমাকে স্রেফ বলা হল, অমন একটা রদ্দি, পিছিয়ে-পড়া জায়গায় গিয়ে যেন আমি দিনটা বরবাদ না করি। তাই লাইব্রেরিই ভরসা।

এসেক্স কাউন্টির ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো পুরোনো। তবে সেগুলো থেকে আমি কাজের জিনিস খুব একটা পেলাম না। ইন্সমাউথ শহরটা ১৬৪৩ সালে পত্তন করা হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ওখানে জাহাজ তৈরি হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জায়গাটার দারুণ আর্থিক উন্নতি হয়। কিন্তু ১৮৪৬-এর মড়ক আর দাঙ্গা নিয়ে খুব কম কথা খরচা করেছিল বইগুলো। তারপরেই ইন্সমাউথের আর্থিক বিপর্যয় হয়। গৃহযুদ্ধের পর মার্শ রিফাইনিং কোম্পানির মাধ্যমে সোনা জোগাড় করা, আর বাট তৈরি করে সেগুলো বেচা, এ ছাড়া ইন্সমাউথে আর কোনও শিল্প বা কলকারখানার কথা পাইনি বইগুলোয়। মাছ থেকে রোজগার কম হলেও ইন্সমাউথে মাছের অভাব কখনওই হয়নি, তাই মাছ ধরে এখনও হয়তো বেশ কিছু মানুষের পেট চলে।

শহরটায় বাইরের লোকজন খুব একটা স্বাগত নয়। একেবারে স্পষ্ট করে বলা না হলেও কয়েকটা জিনিস পড়ে মনে হল, পোল্যান্ড আর পোর্তুগাল থেকে আসা কিছু অভিবাসী ওই শহরে বসতি গড়ার চেষ্টা করেছিল। তার পরিণাম ভালো হয়নি।

তবে হ্যাঁ, বইগুলোতে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস বুঝতে পারলাম। ইন্সমাউথের সঙ্গে কিছু বিশেষ ধরনের অলংকারের কথা জড়িয়ে আছে। হয়তো এগুলো থেকেই সোনাটুকু বের করে নেওয়া হত ওই রিফাইনারিতে। কিন্তু তার যে ক-টা নমুনা জোগাড় করা গিয়েছিল, সেগুলো আর্কহ্যামের মিসকাটোনিক ইউনিভার্সিটি আর নিউবারিপোর্ট হিস্টরিক্যাল সোসাইটির মিউজিয়ামে[160] জায়গা পেয়েছে। ম্যাড়মেড়ে ভাষায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে গয়নাগুলো নিয়ে কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমার মনে হল, ওগুলোতে কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এই অনুভূতিটা এতই তীব্র ছিল যে, আমি সেই রাতেই অন্তত একটা গয়না দেখতে চাইলাম। বইপত্রে জানলাম, একটা বিচিত্র

গড়নের জিনিস, যেটাকে কেউ কেউ টায়রা ভেবেছেন, এই শহরেই আছে। লাইব্রেরিয়ানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করার পুরস্কার পাওয়া গেল। মহিলা স্থানীয় সোসাইটির কিউরেটরের উদ্দেশে একটা নোট লিখে আমার হাতে দিলেন।

কিউরেটর মহিলার নাম মিস অ্যানা টিলটন[161]। আমার কাতর আবেদন আর ওই নোটের সাঁড়াশি আক্রমণে তিনি সদয় হলেন। সোসাইটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবে খুব একটা রাত তখনও হয়নি। তাই তিনি বেশ কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে ওখানে নিয়ে গেলেন। সেই প্রথমবার আমি ইন্সমাউথের কিছু দেখলাম!

প্রথম দৃষ্টিতে জিনিসটাকে এমন কিছু আহামরি মনে হয়নি। কোণের কাবার্ডে রাখা একটা বিটকেল ডিজাইনের জিনিস আলোয় ঝলমল করছে, স্রেফ এটুকুই মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর, একটু একটু করে গয়নাটার সৌন্দর্য আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার দুর্বল লেখনী সেই সৌন্দর্যের রহস্য, তার ব্যাখ্যাতীত জটিলতা বোঝাতে পারবে না। শুধু এটুকুই লিখি, এটা যদি টায়রা হয়, তবে যে মাথার জন্য এটা বানানো, তার শরীরের কল্পনাও করা কঠিন।

জিনিসটা কী দিয়ে বানানো ছিল? আমার তো দেখে সোনা বলেই মনে হল। তবে একটা মসৃণ, হালকা স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে ছিল পুরো গয়নাটায়, যা থেকে মনে হয় যে, ওই সোনায় অন্য কিছু মেশানো হয়েছিল। কিন্তু উপাদান যা-ই হোক-না কেন, জ্যামিতিক মোটিফের সঙ্গে সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীর চেহারার বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে গয়নাটা এমন অসাধারণ কৌশলে আর যত্নে বানানো হয়েছিল যে বলার নয়!

গয়নাটার দিকে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম, এমন একটা অজানা-অচেনা ডিজাইন বলেই হয়তো জিনিসটা এত আকর্ষণীয় ঠেকছে। তারপর বুঝলাম, কারণটা অন্য। গয়নাটার গঠন যে জ্যামিতিক প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে, সেটা অঙ্ক বইয়ে পড়ানো জিনিসের থেকে একেবারে আলাদা। গয়নার গায়ে খোদাই-করা বা উঁচু-হয়ে-থাকা মাছ, সরীসৃপ, উভচর এমন নানা প্রাণীর চেহারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল সেই প্যাটার্নগুলো। ফলে চোখ হয়ে মনে এমন কিছু অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল, যা একই সঙ্গে ভয় আর লালসার জন্ম দেয়।

আমার কথাগুলো যত রোমান্টিক শোনাচ্ছে, গয়নাটার খাতায়-কলমে ইতিহাস ততটাই কেঠো শোনাবে। মিস টিলটন বললেন, ইন্সমাউথের এক বাসিন্দা ১৮৭৩ সালে গয়নাটা

যাচ্ছেতাইরকম কম দামে বন্ধক রেখেছিল। মাতলামি করার ফলে সে তার একটু পরেই ঝামেলায় পড়ে, শেষে খুনই হয়ে যায়! সোসাইটি জিনিসটা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে তারপর। কিন্তু ওটার উৎস যে কী হতে পারে, সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। গয়নাটা ইন্দো-চায়নার হতে পারে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় হতে পারে, এমনকী পূর্ব ভারতের কোনও অজানা জায়গারও হতে পারে! তবে মিস টিলটনের বক্তব্য, নিউ ইংল্যান্ডে এই জিনিস এসে পৌঁছোতে পেরেছে স্রেফ ক্যাপটেন ওবেদ মার্শের জন্য। ওই মানুষটি জলদস্যুদের কোনও একটি লুকোনো ভাণ্ডারের সন্ধান না পেলে এমন বস্তু এখানে আসা অসম্ভব। যুক্তি হিসেবে টিলটন এ-ও বললেন যে, গয়নাটার কথা প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে মার্শ পরিবার ওটা কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

বাড়িটা তালাবন্ধ করে বেরোবার সময় মিস টিলটনের কথা শুনে বুঝলাম, ইন্সমাউথ ওঁর কাছে একটা পিছিয়ে-পড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শহর ছাড়া আর কিচ্ছু না, যেখানে আমার যাওয়া উচিত হবে না। কারণটা উনি অতি সংক্ষেপে, কাটা-কাটা গলায় বলেই দিলেন।

"শ-খানেক বছর আগে ইন্সমাউথে মাছ পাওয়াই যেত না। তারপর ক্যাপটেন মার্শ ফিরে এলেন, আর শহরের ভোলও বদলে গেল! শুধু জলদস্যুদের ভাণ্ডার থেকে পাওয়া সোনাদানাই নয়। মার্শ ইন্সমাউথে একটা অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথাও তৈরি হতে সাহায্য করেন। যারা ওটা মানে, তারা নিজেদের 'ডেগন দেবতার দল' বলে পরিচয় দেয়। তারাই এখন দলে ভারী। আর পাঁচটা ধর্মীয় বিশ্বাস এখন ওই শহরে কোণঠাসা। এই নিয়ে কিচ্ছু বলার নেই, কারণ এখন ওরা সত্যিই মাছ পায়। এত মাছ পায়, যা আশপাশের বন্দরগুলো ভাবতে পারে না! তবে ওইরকম একটা জায়গায় একজন তরতাজা, শিক্ষিত তরুণের গিয়ে লাভ নয়, বরং ক্ষতি হবে বলেই আমার ধারণা।"

মিস টিলটন ভালোই চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বিচিত্র ইতিহাস, আর তার আড়ালে লুকিয়ে-থাকা অনেক না-বলা কথার আভাস আমাকে চুম্বকের মতো শহরটার দিকে টানছিল।

(২)

পরদিন দশটার আগেই আমি পুরোনো বাজারের বাইরে হ্যামন্ডের ওষুধের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গে ছিল শুধু নিজের ছোট্ট ব্যাগটা। ইন্সমাউথের জন্য বাসটা

আসার সময় যত এগিয়ে এল, ততই দেখলাম, আশপাশটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, স্টেশনের ওই এজেন্ট ভদ্রলোক বাড়িয়ে বলেননি। এখানকার লোকজন ইন্সমাউথ তো বটেই, এমনকী বাসটাকেও এড়িয়ে চলতে চায়!

একটু পরেই দেখলাম, একটা লজ্‌ঝড়ে মোটর-কোচ আসছে। সেটার আসল রং যে কী ছিল, তা এখন ময়লা আর চলটা-পড়া গা থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। নোংরা কাচের ওপর প্রায় অপঠ্য অক্ষরে লেখা ছিল: আর্কহ্যাম-ইন্সমাউথ-নিউবারিপোর্ট। বাহন উপস্থিত হলেও তার চেহারা দেখে মুষড়ে পড়লাম।

বাস থেকে তিনজন লোক নামল। উশকোখুশকো চেহারা, নোংরা পোশাক, বদমেজাজি টাইপের মুখ-চোখ, কম বয়স। তাদের গলায় 'তফাত যাও!' লেখা কোনও সাইনবোর্ড ঝোলানো ছিল না বটে। কিন্তু লোকজন তাদের যেভাবে এড়িয়ে গেল, সেটাই যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। স্টেট স্ট্রিট ধরে, কেমন একটা চোর-চোর ভাবে, তারা কোথায় যেন চলে গেল। তারপর বাস থেকে নামল ড্রাইভার। সে ওষুধের দোকানে ঢুকল কিছু একটা কিনতে। আমি বুঝলাম, এই নির্ঘাত জো সার্জেন্ট।

লোকটা দোকান থেকে বেরোলে আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখলাম। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, রোগা, সামনে ঝুঁকে-পড়া লোকটা জীর্ণ, সিভিলিয়ান পোশাকে ছিল। মাথায় একটা গল্‌ফ ক্যাপ ছাড়া লোকটার পোশাকের আর কিছুই নজর কাড়ে না। তারপর একে একে চোখে ধরা পড়ে লোকটার লম্বা আর চ্যাপটা ঠোঁট, কয়েক গাছি লোম ছাড়া মুখে আর কোনও গোঁফ-দাড়ি না-থাকা, প্রায় লেপটে-থাকা কান, গালের জায়গায় জায়গায় অনেকটা চর্মরোগীদের মতো করে ছাল উঠে আসা... তবে এমন সব 'মনোহর' জিনিসের পরেও লোকটার গলার দু-ধার দেখে আমি চমকে উঠলাম। সেখানে এমনভাবে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল, যা আমরা খুব বেশি বয়স ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে ভাবতেই পারি না। অথচ লোকটার বয়স কিছুতেই অত বেশি হতে পারে না! তারপর কিম্ভূত লাগল লোকটার হাতের আঙুলগুলো। কেন যেন মনে হল, ও চাইলে বোধহয় আঙুলগুলো গুটিয়ে মস্ত বড় তালুর মধ্যেই ঢুকে যাবে। হাতের রংও কেমন হলদেটে নীল টাইপের!

লোকটা নিশ্চয় কোনও মাছের বাজারে কাজ করে, কারণ ওর সর্বাঙ্গ থেকে একটা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার চেয়েও বেশি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, লোকটার এমন চেহারা কী ধরনের বর্ণসংকরায়ণের ফলে হতে পারে, সেটা ভাবতে গিয়েই আমি ঘেঁটে

যাচ্ছিলাম। এমন একজনের সঙ্গে একটা লম্বা সফর করতে হবে ভেবেই দমে যাচ্ছিলাম। সেটা আরও বেড়ে গেল, যখন দেখলাম, আমি ছাড়া আর কেউ ওই কোচে চড়বে না। বাধ্য হয়ে আমি লোকটার পিছুপিছু বাসে উঠলাম, আর গন্তব্য হিসেবে ইন্সমাউথ বলে এক ডলারের একটা নোট বাড়িয়ে ধরলাম। জো আমাকে যথেষ্ট কৌতূহলের সঙ্গে শুধু দেখল না, প্রায় মাপল। তারপর চল্লিশ সেন্ট ফেরত দিল, আর কোনও কথা বলল না। আমি ওর দিকেই, কয়েকটা সিট পেছনে বসলাম, যাতে সমুদ্র দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা চলতে শুরু করল। পথেঘাটে থাকা লোকেরা দেখলাম বাসটার দিকে তাকাচ্ছেই না। বুঝলাম, কুসংস্কার হোক বা অন্য কিছু, নিউবারিপোর্টের সাধারণ মানুষের কাছে ইন্সমাউথের মতো এই বাসটাও পরিত্যাজ্য। হাইস স্ট্রিট হয়ে, পুরোনো কলোনিয়াল দালানকোঠা ছাড়িয়ে পার্কার নদী পেরিয়ে আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

দিনটা রোদ-ঝলমলে ছিল। কিন্তু বালি, আধমরা শুকনো ঘাস আর ক্ষয়াটে চেহারার ঝোপ... এসব দেখে আমি ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিলাম। দূরে সমুদ্রের নীল দাগটা দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু পরেই রোলি আর ইপ্সউইচের বড়রাস্তা ছেড়ে আমাদের কোচ একটা সরু রাস্তায় ঢুকল। রাস্তার হাল দেখে বেশ টের পাচ্ছিলাম, খুব কম গাড়িই এই পথে যাতায়াত করে। কিছু দূর পর পর যে টেলিফোন পোলগুলো কাত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলোতেও ছিল মোটে দুটো তার। কিছুক্ষণ পর পরই সরু সরু খাঁড়ি পড়ছিল। কাঠের জীর্ণ ব্রিজের ওপর দিয়ে সেগুলো পার হতে হতে বুঝতে পারছিলাম, ডাঙা আর সমুদ্র দুটোই ইন্সমাউথকে আলাদা করে দিয়েছে আশপাশ থেকে।

মাঝেমধ্যে গাছের কাটা গুঁড়ি আর ভাঙাচোরা দেওয়াল নজরে পড়ছিল। লাইব্রেরিতে পড়েছিলাম, ১৮৪৬-এর মড়কের আগে এই এলাকা রীতিমতো সমৃদ্ধ আর সবুজ ছিল। কিন্তু তারপরেই সব কিছু মরে যায় এখানে। আসলে মড়ক নয়, এদিকের জঙ্গল সাফ করে দিয়েছিল লোকজন। ফলে সমুদ্রের বালি উড়ে এসে মাটি অনুর্বর করে দেয়। তারপরেই এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়।

একটা বাঁক নেওয়ার পর প্লাম আইল্যান্ড আমার নজরের আড়ালে চলে গেল। কিন্তু আটলান্টিক তার অনন্ত নীলিমা নিয়ে আমার বাঁদিকে রইল। দেখতে পাচ্ছিলাম, খানাখন্দে ভরা রাস্তাটা একটু একটু করে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। মনে হল, যেন অদ্ভুতদর্শন ওই চালকের

হাতে গাড়িটা আমাকে রাস্তা ধরে নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কি মাটির নিরেট ভাবটা আর পাব আমি? নাকি তার বদলে সেখানে থাকবে আকাশের শূন্যতা আর সমুদ্রের অতল রহস্য?

একটু পরেই গাড়িটা ওই উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে নীচে নামতে শুরু করল। অনেক দূরে কিংসপোর্টের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল। ওর উত্তরেই ম্যানুক্সেট কেপ অ্যানের দিকে বাঁক নিয়ে সমুদ্রে মেশে। কিন্তু ওদিকে নয়। আমার নজর আটকে ছিল সামনে ছড়ানো জায়গাটার দিকে।

ইন্সমাউথ!

অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছিল শহরটা। বাড়ির সংখ্যা, প্যাঁচালো রাস্তাঘাট... এসব দেখে মনে হয়, শহরটায় অনেকে থাকে, বা থাকত। এখন কিন্তু শহরটা দেখে সবচেয়ে আগে একটাই কথা মনে হয়।

এখানে কি আদৌ কেউ থাকে?

বাড়িগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছিল না[162]। সমুদ্রের দিকের দিগন্তে মাথা তোলা তিনটে বিশাল উঁচু শিখরের মধ্যে একটা তো প্রায় পড়ো-পড়ো চেহারায় ছিল। অন্যগুলোতেও জানলা বা ঘড়ি যেখানে থাকার কথা, সেই জায়গাগুলোয় অন্ধকার গর্ত আর জীর্ণ ইট ছাড়া কিছু দেখলাম না। ভাঙাচোরা টালির সমুদ্র, ঝুঁকে-থাকা ছাদ, পচা কাঠের ফ্রেম... সব কিছু একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল শহরটার পোকায় কাটা দশাটা।

রাস্তাটা নিচু হচ্ছিল। আমি দেখলাম, এমনকী একদা প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতেও ছাদ ধসে পড়েছে। রেললাইনে ঘাস গজিয়েছে। টেলিগ্রাফ পোলে তার নেই। সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থা তো সমুদ্রের ধারের বাড়িগুলোয়। তবে সেখানেও ভাঙাচোরা আর প্রায় বালিতে ডুবে-যাওয়া ঘরের মাঝে একটা বেশ উঁচু আর মজবুত বাড়ি দেখলাম। বাড়িটার মাথায় সাদা রঙের একটা ঘণ্টাঘর দেখে সেটাকে কোনও পুরোনো কারখানা বলেই মনে হল।

একটা পুরোনো পাথুরে দেওয়ালের পেছনে থাকা বন্দরটার বালিতে প্রায় বুজে গেছে দেখলাম। সেখানে কয়েকজন জেলে বা ওইরকম লোক বসে ছিল বোধহয়। তাদের পাশে ভাঙাচোরা কয়েকটা ঘর, জং-ধরা নোঙর, চিংড়ি ধরার পাত্র— এগুলো দেখে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এখানকার লোকজন কি মাছ-টাছ আদৌ ধরে এখন? জায়গাটার

শেষ প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত বাতিঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। ওই কারখানার পাশে যেখানে নদীর একটা শাখা সমুদ্রে এসে পড়েছে, সেই মোহানাতেই কিছুটা গভীর জল আছে বলে মনে হল।

এখানে-সেখানে ভাঙাচোরা জেটি দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা কালো রেখা দেখতে পেলাম। মনে হল, জলের সামান্য নীচেই যেন একটা লম্বা পাহাড় রয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বুঝলাম, এই হল ডেভিল'স রিফ। জায়গাটা আমাকে যুগপৎ বিকর্ষণ আর আকর্ষণ করছিল। কেন... তখন বুঝিনি।

রাস্তায় কাউকে দেখলাম না। বেশ কিছুটা চলার পর কয়েকটা বাড়ি দেখলাম, যেগুলো পোড়ো বাড়ির বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা চলে। জরাজীর্ণ দশা, ভাঙা জানলায় কাচের বদলে কাপড় গোঁজা, উঠোনে মরা মাছ ছড়ানো, মৃতপ্রায় গাছ আর আগাছায় ভরা বাগান, পেছনে মেছো গন্ধ আর নোংরায় ভরা সাগরতটে কিছু লোকের নিষ্প্রাণ খোঁড়াখুঁড়ি...! তবে হ্যাঁ, বাড়িগুলোর দশার চেয়েও ভয়ানক ছিল তাদের বাসিন্দারা। নোংরা-মাখা যে বাচ্চাগুলো খেলছিল আশপাশে, তাদের মুখের মধ্যে একটা বাঁদুরে ভাব ছিল। যারা বড়, তাদের চালচলন দেখেও প্রবল অস্বস্তির ভাব জাগছিল। সব মিলিয়ে... আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না বোধহয়... এমন একটা ছবি মনে ফুটে উঠছিল, যেটা আমি কোথাও, হয়তো কোনও ভয়ের বইয়ে দেখেছি।

মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় আসার পর মূল শহর শুরু হল। বাড়িগুলোর ঘনত্ব আর আয়তন দুইই বাড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল, বাড়িগুলো পরিত্যক্ত। অব্যবহারে আর অযত্নে ধসে গেছে চিমনি, ভেঙে গেছে টালির ছাদ, দেওয়াল বেঁকে বাড়িটাই কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েছে সামনে! রাস্তা, ফুটপাথ, সবই নোনা হাওয়ার নিষ্করুণ আদরে ফুটিফাটা হয়ে আছে। আর এইসব ভরে আছে একটা বিশ্রী মেছো গন্ধে।

কয়েকটা মোড় পেরোল আমার বাহন। তারপর যে বাড়িগুলো দেখলাম, সেগুলো নিঃসন্দেহে একদা বড়লোকদের নিবাস ছিল। এই বাড়িগুলোতে আমি মানুষের বসবাসের কিছু চিহ্ন দেখলাম। জানলায় পর্দা, তোবড়ানো গাড়ি, সামনে মোটামুটি চলনসই রাস্তাঘাট — এসবই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এটা ইন্সমাউথের সমৃদ্ধ অংশ (ছিল?)। বাড়িগুলো কম-সে-কম সওয়াশো বছরের পুরোনো। বিশ্রী আঁশটে গন্ধ, আর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে-থাকা একটা

অস্বস্তিকর ভাব ছাপিয়েও বাড়িগুলোর প্রাচীনত্ব আমাকে আকর্ষণ করছিল। তবে ওই নিয়ে বেশি ভাবার আগেই একটা অন্য জায়গায় এসে পড়লাম।

কোচটা যেখানে দাঁড়ায়, তার আগেই একটা খোলা জায়গা আছে। তার দু-পাশে দুটো গির্জা আছে। সামনে আছে একটা আধমরা ঘাসে ছাওয়া জায়গা। তার আগেই ডান হাতে একটা বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি পড়ল। বাড়িটার রং এককালে সাদা ছিল, এখন সব উঠে গেছে বা জ্বলে গেছে। তাতেও বাড়ির নীচের ধাপে কালো আর সোনালি অক্ষরে 'ডেগন দেবতার দল' লেখা ছিল। বুঝলাম, একদা নামকরা একটা প্রতিষ্ঠানের এটিই সাম্প্রতিক চেহারা। দেওয়ালে লেখা অন্য কথাগুলো পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করছিলাম। তখনই বাঁদিক থেকে একটা ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনি ভেসে এল।

তাকিয়ে বুঝলাম, আওয়াজটা একটা পাথরের গির্জা থেকে আসছে। বাড়িটা অপেক্ষাকৃত নতুন। জবরজং গড়ন, খুব উঁচু বেসমেন্ট, বন্ধ জানলার সারি— এগুলো একে একে আমার চোখে ধরা পড়ল। বাড়ির মাথায় থাকা ঘড়ির কাঁটাগুলো বোধহয় ভেঙে পড়েছিল। তবু বুঝলাম, এগারোটা বাজছে। ঠিক তখনই আমি এমন একটা কিছু দেখলাম, যেটা এক মুহূর্তের জন্য অন্য সব কিছুকে ভুলিয়ে দিল।

কী দেখলাম আমি?

বেসমেন্টের দরজাটা খোলা ছিল। বাইরের আলো-ঝলমলে দিনের তুলনায় দরজার ওপাশটা ঘন অন্ধকার ঠেকছিল। কিন্তু তার মধ্যে আমি একটা অদ্ভুত চেহারা দেখলাম। বিশ্লেষণ নয়, বরং প্রথম দর্শনেই আমার মনে এমন একটা ভয় দানা বেঁধেছিল যে, আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তারপর খেয়াল হল ব্যাপারটা কী, আর তখন নিজেকে প্রভূত গালাগাল দিলাম। বুঝলাম, ওই চেহারাটা নিঃসন্দেহে এই গির্জার প্রধান যাজক বা পুরোহিতের। ডাগনের উপাসনার অঙ্গ হিসেবেই নিশ্চয় তাঁর মাথায় কিছু একটা পরানো ছিল... অনেকটা ওই মিউজিয়ামে দেখা টায়রাটার মতো! কিন্তু আমার মাথায় প্রথম দর্শনে সেসব আসেনি। বরং আলোছায়ায় দেখা চেহারাটা তার উচ্চতা, অলংকার এবং আলখাল্লার আড়ালে থাকা চেহারার আভাস নিয়ে আমাকে রীতিমতো আতঙ্কিত করেছিল।

কেমনধারা লোকজন তাদের যাজকের মাথায় ওই বিচিত্রদর্শন টায়রা বসায়?

ওসব আর ভাবার সময় পেলাম না। আশপাশে দাঁড়িয়ে জটলা-করা গোমড়ামুখো, কুদর্শন কিছু যুবককে দেখলাম। ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর চেনা দৃশ্য ছাপিয়ে বেশ কিছুক্ষণ

ধরেই একটা জলপ্রপাতের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এবার সেটা খুব জোরালো হয়ে উঠল। দেখলাম, একটা গভীর খাতের সামনে এসে গেছি। তার ওপরের ব্রিজটা পেরোবার সময় দূরে, শহরের প্রান্তে কয়েকটা কারখানা গোছের বাড়ি দেখলাম। দু-পাশ দিয়ে লাফিয়ে-পড়া জলপ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। সেই জায়গাটা পেরোতেই একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি খোলা জায়গায় এসে থেমে গেল কোচ। তাকিয়ে দেখলাম, ডানদিকে একটা উঁচু, পুরোনো মডেলের, সর্বাঙ্গে কালের কলঙ্ক লেপে-থাকা হলদেটে বাড়ির সামনে এসে গেছি। ভাঙাচোরা কার্নিশের গায়ে লেখা বাড়ির নামটা পড়া যাচ্ছিল।

গিলম্যান হাউস।

ঝটপট বাস থেকে নেমে হোটেলে গেলাম।

হোটেলের নোংরা লবিতে একটা বুড়োটে চেহারার লোক আমার নাম-ঠিকানা লিখে ঘরের চাবি দিল। ওর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, এর মধ্যে সেই 'ইন্সমাউথীয়' ব্যাপারটা নেই, অর্থাৎ এ স্থানীয় নয়। তা-ও লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি বেরিয়ে পড়লাম স্বচক্ষে শহরটা দেখব বলে। যে জায়গায় বাস আমাকে নামিয়েছিল, সেখানেই গেলাম। তারপর চারদিক যথাসম্ভব খুঁটিয়ে দেখলাম।

পাথর দিয়ে বাঁধানো জায়গাটার উত্তরদিক দিয়ে নদী বয়ে গেছে। অন্যদিকে, মানে দক্ষিণে রয়েছে একশো বছরেরও বেশি পুরোনো একঝাঁক বাড়ি। তাদেরই মধ্য দিয়ে সরু সরু বেশ কয়েকটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্বে, দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে আলোর সাইজ দেখে বুঝলাম, অন্ধকার নামার আগে এখান থেকে বিদায় নেওয়াই ভালো, সে চাঁদ উঠুক বা না উঠুক।

বাড়িগুলোর চেহারা বাইরে থেকে ঠিকঠাকই লাগল। ডজনখানেক দোকান বা অফিসঘর নজরে পড়ল। একটা বেশ নামকরা সংস্থার দোকান, একটা লজ্‌ঝড়ে রেস্তরাঁ, ওষুধের দোকান, এক মাছ ব্যবসায়ীর অফিস... আর একেবারে পূর্ব কোণে এই শহরের একমাত্র কারখানা, অর্থাৎ মার্শ রিফাইনিং কোম্পানির অফিস। সব মিলিয়ে গোটা দশেক লোক, আর খান তিনেক গাড়ি আর লরি, ব্যাস! দূরে একদিকে সমুদ্রের নীল আভাস, অন্যদিকে মার্শ রিফাইনারির সাদাটে চিমনি— এ দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম, এই জায়গাটাই ইন্সমাউথের বাণিজ্যিক এলাকা বলা চলে।

মনে হল, ওই নামকরা সংস্থার দোকানটায় একবার ঢুঁ মারি। ভেবেছিলাম, ওরকম জায়গায় কাজ করার জন্য স্থানীয় কারও বদলে কোনও বহিরাগতের উপস্থিতিই স্বাভাবিক। গিয়ে দেখলাম, ধারণাটা ঠিক ছিল। একটা সতেরো-আঠেরো বছর বয়সি ছেলে ওই দোকানটা চালাচ্ছে। ছেলেটা হাসিখুশি। ও যে এখানে কথা বলার মতো কাউকে পায় না, সেটাও কিছুক্ষণের মধ্যে স্পষ্ট হল। ছেলেটার বাড়ি আর্কহ্যামে। ইপ্সউইচ থেকে আসা একটা পরিবারের সঙ্গে এখানে থাকে ও। ওর বাড়ির লোক চায় না ও ইন্সমাউথে থাকে। কিন্তু চাকরির দায়ে একরকম বাধ্য হয়ে ওকে এই 'আঁশটে গন্ধ আর গোলমেলে লোকে ভরা' শহরে থাকতে হচ্ছে!

"বড়রাস্তা, যেখানে বাস থামে, সেটা ফেডেরেল স্ট্রিট।" বলল ছেলেটা, "তার পশ্চিমে বেশ কয়েকটা পুরোনো আমলের চওড়া রাস্তা আছে— ব্রড, ওয়াশিংটন, লাফায়েত, অ্যাডামস...। পূর্বদিকে, মানে নদীর তীর বরাবর রয়েছে ঘিঞ্জি বস্তি। ওখানে কয়েকটা পুরোনো চার্চ আছে বটে, তবে এখন পরিত্যক্ত। ওসব এলাকায় না-যাওয়াই ভালো।"

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"ওখানকার লোকজন একটু..." ছেলেটা ইতস্তত করে বলল, "বিপজ্জনক। বেশ কয়েকজন বাইরের লোক ওদিকে গিয়ে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!"

"এরকম 'প্রবেশ নিষেধ' এলাকা আর ক-টা আছে?" একটু হতাশ হয়েই জানতে চাইলাম আমি। আসলে শহরটা দেখে যে অ-ভক্তি জন্মেছিল, সেটা ছেলেটার কথা শুনে বাড়ছিল বই কমছিল না।

"মার্শ রিফাইনারি!" স্পষ্টভাবে বলল ছেলেটা, "আর যে চার্চগুলোয় এখনও কেউ যায়, সেগুলো, বিশেষ করে ডেগন দেবতার দল যেখানে উপাসনা করে, সেটা।"

"আচ্ছা..." আমার মাথায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা ঘুরঘুর করছিল, কিন্তু বেরোতে পারছিল না, সেটাই করে ফেললাম, "এখানে চার্চে ঠিক কী হয়?"

"জানি না।" ছেলেটা এবারও স্পষ্টভাবে বলল, "তবে ইন্সমাউথের বাইরের কোনও চার্চ এদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। এগুলোতে এমন সব প্রথা আর পোশাক বা... মানে এই চার্চে উপাসনার নামে যা হয়, সেটা ঠিক ধর্মাচরণ নয়। আমি ওগুলোকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি।"

ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। তবে চার্চের এমন অদ্ভুত বিকৃতি কি এমনি এমনি হতে পারে? হয়তো লোকজনের চাপেই এমনটা হয়েছে। তাই আমার পরের প্রশ্নটা ছিল এখানকার লোকজনকে নিয়েই।

"এখানকার লোকেদের ব্যাপারস্যাপার আমি বুঝি না।" বিরক্তি, হতাশা আর কিছুটা ভয় ফুটে উঠল ছেলেটার গলায়, "এদের দেখলেই প্রবল অস্বস্তি হয়। আর গলার আওয়াজ! আপনি থাকলে বুঝতেন, ওদের চার্চে যে দু-দিন বড় পরব, সেই ৩০ এপ্রিল আর ৩১ অক্টোবর ওই উৎকট গলার আওয়াজে তো প্রাণপাখি উড়ে পালাতে চায়[163]।"

"অন্য সময় লোকগুলো কী করে?"

"মাঝেমধ্যে মাছ ধরে। বাকি সময় হয় বেআইনি মদ গিলে ঝিমোয়, নয় ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ভাবসাব দেখে আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে থাকার বদলে ওরা যেন অন্য কোথাও যেতে পারলেই বাঁচে। সেটা কোথায়, বলতে পারব না। তবে এরা যা জল ভালোবাসে, তাতে সমুদ্রের তলায় থাকতে পারলেই বোধহয় লোকগুলো বেশি খুশি হত!"

"বুড়ো হলে অনেকেরই এরকম ভাবসাব হয়।" আমি বলে ফেললাম।

"বুড়ো?" চোখ কপালে তুলল ছোকরা, "কাদের আপনি বুড়ো বলছেন? যাদের রাস্তাঘাটে দেখা যায়, তারা হল সব কমবয়সি জনতা! বুড়োদের আপনি এখানে দেখতেই পাবেন না।"

"সে কী?" এবার আমিও অবাক হলাম, "কই, আমার হোটেলের ক্লার্কই তো বেশ বুড়ো।"

"আরে, আমি স্থানীয় লোকেদের কথা বলছিলাম!" অধৈর্য কণ্ঠে বলে ছেলেটা, "ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের বয়স বাড়লে তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের আয়ু কম, নাকি তারা দেখতে এতই খারাপ যে, সামনে আনাই যায় না, এ শুধু এখানকার লোকেরাই বলতে পারবে। খারাপ মানে কী বলছি, বুঝছেন তো? তাদের দেখলেই মনে হয়, এদের রক্তে অন্য কোনও জাতি... বা আরও খারাপ কিছু মিশে গেছে। আমি শুনেছি, সরকারি লোকজন এলে নাকি সেইসব লোককে লুকিয়ে রাখা হয়।"

"লুকিয়ে রাখা হয়! কোথায়?"

“সমুদ্রের তীর থেকে শহরের পুরোনো বাড়িগুলোর নীচে নাকি বহু সুড়ঙ্গ আছে। সেখানেই তেমন লোকেদের লুকিয়ে রাখা হয়। সবই শোনা কথা, তবে যেসব ভিনদেশির সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইন্সমাউথের লোকেদের এই চেহারা হয়েছে, তারা নাকি এখনও ওই পথেই যাতায়াত করে।”

“বলো কী!” একটা ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসছিল, “আচ্ছা, এই শহরটার ইতিহাস-ভূগোল নয়, বরং এখন এখানে কী হয়, এটা জানতে গেলে কাকে ধরতে হবে?”

“কেউ মুখ খুলবে না।” ঠোঁট বেঁকাল ছেলেটা, “তবে এখানকার গরিবখানায় এক বুড়ো থাকে। জাডক অ্যালেন। লোকটা দাবি করে, ওর বয়স নাকি ছিয়ানব্বই বছর! হতেই পারে। জাডকের মাথায় একটু গোলমাল আছে। ও এমনিতে চোরের মতো থাকে। মুখ খোলা তো দূরের কথা, বরং সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে, যেন কেউ ওকে ধরে ফেলবে। তবে একবার মদ গিললে ওর মুখও খুলে যায়। তখন ও যা বলে...!”

“কী বলে?” আমি কৌতূহলী হলাম।

“যা বলে, তার প্রায় সবটাই অবিশ্বাস্য, ভয়াল-ভয়ংকর সব গপ্প। মাতাল বুড়োর কথা বলে সেগুলো উড়িয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু...” ছেলেটা ইতস্তত করে আবার মুখ খুলল, “এখানকার লোকেরা চায় না, বাইরের কেউ জাডকের সঙ্গে কথা বলুক। ইন ফ্যাক্ট, ওর গপ্প শুনতে গিয়ে লোকে বিপদে পড়েছে। সে জন্যই মনে হয়, ও যা বলে, তার সবটাই মাতালের খোয়াব নয়।”

“আহা, শুনিই না, কী বলে জাডক।” আমি তোয়াজের সুরে বললাম, “তারপর না-হয় সত্যি-মিথ্যের ব্যাপারটা বোঝা যাবে।”

“ওই আর কী।” বুঝতে পারলাম, ছেলেটা হয় কিছু জানে না, নয়তো বলতে চাইছে না। “জাডক এক ভয়ংকর দানবিক প্রাণীর কথা বলে। বহিরাগতরা সত্যিই নাকি মাঝেমধ্যে ওইরকম একটি প্রাণীকে রাতের ইন্সমাউথে দেখেছে। মুশকিল হল, রাতে এখানকার রাস্তাঘাট ঘোর অন্ধকার থাকে বলে এমনিতেই বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। ফলে কে যে কী দেখেছে, তা বলা কঠিন।”

“এখানে মাছ ধরা ছাড়া আর কিছু হয়?” নিজের টেনশন চাপা দিয়ে, বোর-হওয়া গলায় জানতে চাইলাম।

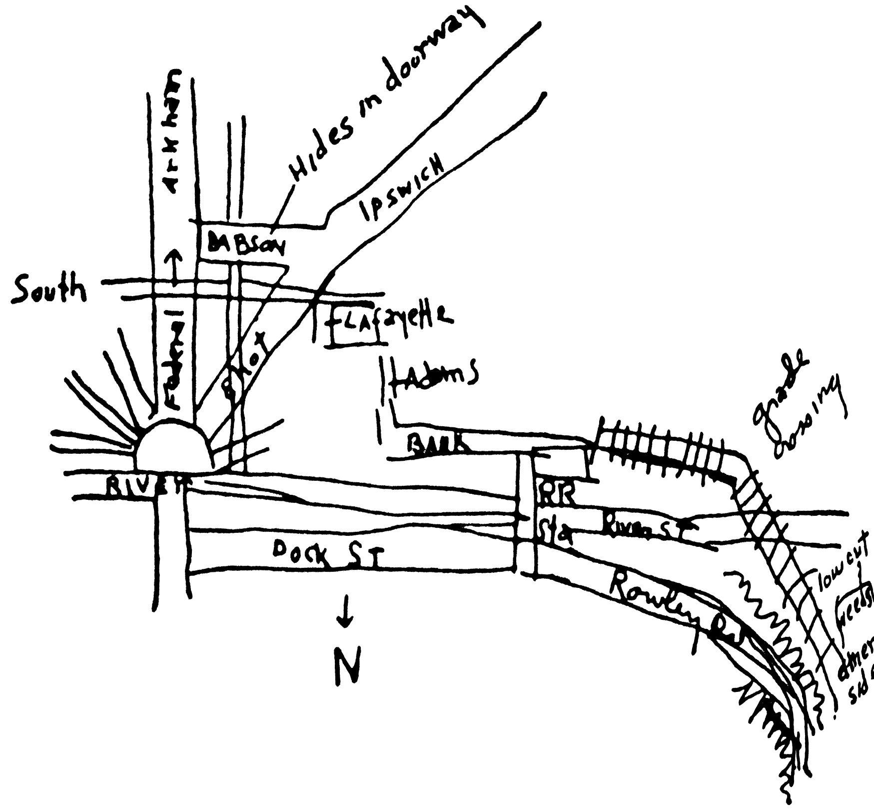
"মার্শ রিফাইনারি!" ছেলেটা সোৎসাহে বলল, "তবে মার্শের সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।"

"আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, তায় ট্যুরিস্ট।" কাঁধ ঝাঁকালাম আমি, "দেখা হওয়ার কারণ থাকবেই বা কেন?"

"সে জন্য নয়।" ছেলেটার মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, "বয়স হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওঁকেও আর দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু উনি নয়, ওঁর ছেলেমেয়েদেরও এখন আর প্রকাশ্যে দেখা যায় না। শুনেছি, ওঁদের সবার স্বাস্থ্যই নাকি ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে ইদানীং। মার্শের এক মেয়ের বীভৎস চেহারার বর্ণনা শুনে তো গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। তবে সেই মহিলা বাইরে বেরোলে অদ্ভুত গড়নের নানা গয়না পরেন। এখানে যে আজব টাইপের চার্চ জনপ্রিয়, তার যাজকরাও শুনেছি ওইরকম উদ্ভট গয়না আর পোশাক পরেন। এই গয়নাগুলোই বোধহয় মার্শ রিফাইনারিতে ঢুকে বাট হয়ে বেরোয়।"

"প্রথমে চেহারা, আর তারপর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার এই 'অসুখটা' তো গোটা শহরেই আছে বলে মনে হচ্ছে।" আমি চিন্তিত গলায় বলি, "এটা ছোঁয়াচে নয় তো?"

"না বোধহয়।" ছেলেটা বলল, "যারা অনেক দিন ধরে এখানে আছে, কিন্তু এখানকার লোকেদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক গড়েনি, তাদের মধ্যে আমি এমন কিচ্ছু দেখিনি। তবে এটাও সত্যি যে, শুধু মার্শ নয়, গিলম্যান, ইলিয়ট বা ওয়েটসদের মতো সব ক-টা বনেদি পরিবারই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে।"



চিত্র ১০.৩ : লাভক্র্যাফটের আঁকা ইন্সমাউথের ম্যাপ

এরপর আর কথা বলার মতো কিছু ছিল না। শহরটার অধিকাংশ আলো কাজ করে না, রাস্তার নাম-লেখা ফলকগুলোও নেই। তাই ছেলেটাই আমার জন্য একটা মোটামুটি স্কেচ ম্যাপ এঁকে দিল[164]। রেস্তরাঁটা দেখে ভক্তি হয়নি। দুপুরের খাবার হিসেবে একগাদা চিজ ক্র্যাকার আর ওয়েফার কিনে আমি ইন্সমাউথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লাম।

আমার প্ল্যান ছিল সরু গলি এড়িয়ে যথাসম্ভব বড়রাস্তায় ঘোরা, কোনও বহিরাগতকে দেখতে পেলে তার সঙ্গে গপ্প জমিয়ে শহরটা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া, শেষে রাত আটটার কোচটা ধরা। সেইমতো বেরিয়ে আমি আগে ব্রিজ পেরিয়ে রিফাইনারির দিকেই এগোলাম। একটা কারখানা বলতেই যে পরিমাণ আওয়াজ বা হট্টগোলের কথা আমরা ভাবি, তার কিছুই শুনতে পেলাম না। ওর চেয়ে বেশি আওয়াজ তুলে মানুক্সেট নীচে, সমুদ্রের দিকে লাফিয়ে পড়ছিল। ওখানে একটা খোলা জায়গার চারপাশে রেডিয়াল প্যাটার্নে বেশ কয়েকটা রাস্তা দেখলাম। মনে হল, টাউন স্কোয়্যার তৈরি হওয়ার আগে ওটাই বোধহয় শহরের প্রধান জায়গা ছিল।

বড়রাস্তা ধরেই এগোলাম। ব্রিজ পেরোনোর পর শহরের যে অংশটায় ঢুকলাম, সেটা পুরোপুরি পরিত্যক্ত বলে মনে হল। বাড়িগুলোর শুধু ছাদ ঢালু হয়ে নীচে নামেনি, আস্ত বাড়িগুলোই পড়ো-পড়ো হয়ে আছে। এর সঙ্গের যোগ করুন সারি সারি খোলা, ফ্রেম-ভাঙা জানলার সারি। কয়েকটা বাড়ির একতলায় লোক থাকে বলে মনে হল, কিন্তু সেগুলোর জানলা একেবারে তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেখলাম। সব মিলিয়ে, রাস্তা ধরে যেতে যেতে অব্যাখ্যাত একটা ভয় আমার ওপর চেপে বসছিল। মনে হচ্ছিল, শহরটা অজস্র অন্ধ চোখ মেলে আমাকে দেখছে আর গিলে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে!

বড়রাস্তা থেকে ফিশ স্ট্রিট। ফাঁকা হলেও তার দু-ধারের বেশ কিছু গুদাম আর বাড়িঘরের অবস্থা বেশ ভালো দেখলাম। ওয়াটার স্ট্রিটের অবস্থাও তথৈবচ। পুরো এলাকায় কয়েকজন জেলে ছাড়া আমি কাউকে দেখতে পাইনি। মানুক্সেটের আছড়ে পড়ার শব্দ ছাড়া কিচ্ছু শুনতেও পাচ্ছিলাম না। স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছিল। ওখানে আর বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পেলাম না। ফিশ স্ট্রিট ব্রিজ ভাঙা, এমনটাই এঁকেছিল ছেলেটা। তাই আমি বড়রাস্তার ব্রিজ ধরেই নদীর উত্তরদিকে এগোলাম। তার মধ্যেও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে হচ্ছিল, কেউ আমার পিছু নিয়েছে কি না!

নদীর উত্তরে মনে হল, লোকজন থাকে। ওয়াটার স্ট্রিটের কয়েকটা গুদামে লোকেদের মাছ প্যাক করতে দেখলাম। চিমনি থেকে ধোঁয়াও বেরোচ্ছিল কোনও কোনও বাড়িতে। আলোছায়ায় ভুলও দেখতে পারি, তবে সরু গলিতে কিছু কিছু চেহারাকে চলতে-ফিরতেও দেখলাম। হ্যাঁ, তাদের দেখে আমার মনে হল, অসুখই হোক বা রক্তের দোষ, 'ইন্সমাউথ লুক' বলতে যে জিনিসটা আমি বুঝেছি, সেটার প্রাদুর্ভাব শহরের এই অংশে আরও বেশি। কিন্তু আমার কাছে পরিবেশটা অস্বস্তিকর হচ্ছিল কিছু শব্দের জন্য। শব্দগুলো খুবই সাধারণ, ঘষটানো, দ্রুতপায়ে কারও সরে যাওয়া, ভারী গলায় কিছু দুর্বোধ্য শব্দ...! এমনিতে এগুলোতে আমার কিছুই মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শব্দগুলো আসছিল এমন সব বাড়ি বা গুদাম থেকে, যার জানলা-দরজা সব একেবারে বোর্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে!

আমার হঠাৎ মনে হল, এই চলাফেরার আওয়াজ যাদের, তাদের গলার আওয়াজ কেমন হবে? তখনও অবধি আমি কারও গলা শুনিনি। শোনার ইচ্ছেও ছিল না, এটাই সত্যি।

বড়রাস্তা আর চার্চ স্ট্রিটে দুটো একদা সুন্দর, এখন স্রেফ ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকা চার্চ পেছনে ফেলে আমি এলাকাটা থেকে বেরিয়ে এলাম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে কতটা টেনশন জমে উঠেছিল আমার মধ্যে! এরপর ভাবলাম, এখানকার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জমায়েতের জায়গা 'নিউ চার্চ গ্রিন'-এ ঢুঁ মারি। কিন্তু দোকানের ছেলেটা বলেছিল যে ওটা এখন ডাগনের দলবলের আড্ডা, তাই বহিরাগতদের পক্ষে বিপজ্জনক। তা ছাড়া ওই বাড়ির বেসমেন্টেই আমি ভয়ানক চেহারাটা দেখেছিলাম। যাজকমশাইয়ের অমন চেহারা বিশেষ গয়না পরার ফলেই হোক বা কোনও শিরস্ত্রাণ পরার ফলে, ওখানে যেতে আমার সাহসে কুলোল না।

চার্চটাকে এড়িয়ে আমি আবার ফেডারেল স্ট্রিট ধরে শহরের বনেদি জায়গাটায় ঢুকলাম। কাউকে দেখতে না পেলেও মনে হল, শহরের এইদিকের বাড়িগুলোয় বোধহয় কিছু লোক থাকে। অবহেলা আর নির্জনতা অধিকাংশ বাড়িকে গিলে ফেললেও জায়গাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমান্স আছে, মানতেই হবে। বাড়িগুলোর পুরোনো গড়নের খুঁটিনাটি, হাড়-বের-করা রাস্তার দু-ধারে গাছের ঝিমন্ত সারি— এসব দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম। ওয়াশিংটন স্ট্রিটে পরপর গোটা চারেক বাড়ি দেখলাম, যারা শক্তপোক্ত অবস্থাতেই আছে। তাদের মধ্যে একটা বাড়ি বিশাল জায়গা জুড়ে বানানো। সেটা দেখতে সুন্দর, তার সবুজ লন আর সযত্নলালিত চেহারা দেখে মনে হল, মার্শ রিফাইনারির মালিকের বাড়ি এটাই হতে পারে।

লোকজন না দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম ততক্ষণে। কিন্তু আমার তাজ্জব লাগছিল এটা ভেবে যে, গোটা শহরে কোনও কুকুর-বেড়াল দেখতে পাচ্ছি না কেন? তা ছাড়া সব বাড়িতে, এমনকী যেগুলোর অবস্থা বেশ ভালো, তাতেও তিনতলা আর ছাদের ঘরগুলো দেখলাম একেবারে সিল করার মতো বন্ধ হয়ে আছে। এর কোনও ব্যাখ্যাও আমি খুঁজে পেলাম না।

গোটা শহরটায় মৃত্যুর এমন একটা ছায়া পড়েছিল, যে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, প্রতিটি বন্ধ জানলার পেছন থেকেই হয়তো বহু চোখ আমায় দেখছে। তখনই বড় ঘড়িতে তিনটে বাজল। সেই শব্দে, আর তার চেয়েও বেশি করে ওই ঘড়ি যে চার্চে আছে, তার কথা ভেবে আমার একেবারে পিলে চমকে গেল!

ওয়াশিংটন স্ট্রিট ধরে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে আমি শহরের আরও একটা একদা ব্যস্ত, এখন পরিত্যক্ত এলাকায় এলাম। কারখানাগুলো ভেঙে মাটি আর বালিতে মিশে যাচ্ছে। রেললাইনে মৃতপ্রায় ঘাসেরা দুলছে। রেল স্টেশনের কয়েকটা টুকরো শুধু পড়ে আছে। রেল ব্রিজটার গায়ে বড় বড় করে 'সাবধান' লেখা থাকলেও আমি কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সেটা পার হলাম। ওপাশে, মানে নদীর দক্ষিণ তীরে আমি আবার কিছু মানুষ দেখলাম। কিন্তু তাদের নিশ্চুপ চলাফেরা, আমাকে আড়চোখে দেখা... এসব আর নিতে পারছিলাম না। ঠিক করে ফেললাম, পেইন স্ট্রিট ধরে আমি হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে যাব, আর রাত আটটায় ওই বদখত কোচ আমাকে এই যাচ্ছেতাই শহর ছেড়ে কত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব, তার অপেক্ষায় থাকব। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, ডানদিকে একটা জরাজীর্ণ দমকল দফতর। সেখানে রংচটা উর্দি-পরা দু-জন দমকলকর্মীকে দেখলাম, যাদের চেহারা অগোছালো হলেও তাতে 'ইন্সমাউথ'-সুলভ কিছু নেই। তারা এক লালমুখো, দাড়িওয়ালা, ঘোলা চোখের বুড়োর সঙ্গে খোশগল্প করছিল।

বুঝতে পারলাম, ভয়াল-ভয়ংকর গল্প আর শোনা কথার ভাণ্ডারী, মাতাল ও অতি-প্রাচীন জাডক অ্যালেনের সন্ধান পেয়ে গেছি!

(৩)

ভাগ্য? নিয়তি?? ওরকম কিছু একটাই সে দিন আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। মন চাইছিল স্কোয়্যারে ছুটে গিয়ে বাসটার জন্য অপেক্ষা করতে, যাতে ওই যাচ্ছেতাই জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়া যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু আমি থেমে গেলাম ওই বুড়োকে দেখে। জানতাম, লোকটা যা বলবে, তার প্রায় সবটাই নেশাগ্রস্ত মগজ আর জরাজীর্ণ স্মৃতির ফসল। এ-ও জানতাম যে, লোকটার সঙ্গে কথা বলছি দেখলে স্থানীয় লোকজন রেগে যাবে। তবু মনে হল, একসময়ে গমগম-করা ইন্সমাউথের আজকের এই দশা হওয়ার কারণটা বুঝতে গেলে আমার জাডক অ্যালেনের সঙ্গেই কথা বলা দরকার। শুনেছিলাম, সবচেয়ে ভয়ংকর বা রং-চড়ানো গল্পগাছার পেছনেও একটা সত্যের বীজ থাকে। তাতেই লুকিয়ে থাকে ইতিহাস। তাই মনে হল, অ্যালেনের সেই গল্পগুলো শোনা যাক। হয়তো সত্যিটা আমি বুঝে, বা খুঁজে নিতে পারব।



চিত্র ১০.৪ : জাডক এসে, একেবারে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো আমার কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে নিল

ওখানে লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গেলে দমকলকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে—এটা ভেবে আমি একটা প্ল্যান করলাম। দোকানের ছেলেটা আমাকে বলেছিল কোথায় মদ কিনতে পাওয়া যায়। ঠিক করলাম, মদের একটা বোতল জোগাড় করে এই জায়গাটার আশপাশে অলসভাবে ঘোরাঘুরি করব। পাঁড়মাতাল জাডক যদি বোতলের টানে আমার সঙ্গে ভাব জমায়, তাহলে নিশ্চয় কারও কিছু বলার থাকবে না।

ইলিয়ট স্ট্রিটের একটা নোংরা দোকান থেকে এক বোতল মদ জোগাড় করলাম। দোকানদারের মধ্যে ইন্সমাউথের চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো সবে দেখা দিতে শুরু করেছিল। হয়তো আমার মতো অনেক 'বাইরের লোক'-এর সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় বলেই লোকটির আচরণ বেশ ভদ্র ছিল। কপাল ভালো বলতে হবে, কারণ বোতল হাতে বেশি ঘুরতে হল না। পেইন স্ট্রিটের বাইরে গিলম্যান হাউসের এক কোণেই জাডক অ্যালেনের শীর্ণ, লম্বা, টলমলে চেহারাটা দেখতে পেলাম। বোতলটা হাতে ধরে ওয়েইট স্ট্রিটের দিকে বাঁক নিতেই বুঝলাম, কাজ হয়েছে। চুম্বকের টানে আলপিনের মতো অ্যালেন আমার পিছু নিয়েছে।

নকশাটা মাথায় রেখে হাঁটছিলাম আমি। আমার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণদিকের জেটি আর রাস্তাগুলো, যার ওপাশেই সমুদ্র। ওইদিকটা যে একেবারে নির্জন— এটা ভেবেই ঠিক করেছিলাম, অ্যালেনের সঙ্গে আলাপ ওখানেই সারব। মেইন স্ট্রিট অবধি পৌঁছোনোর আগেই পেছন থেকে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় একটা "শুনছেন? ও মশাই!" আওয়াজ পেলাম। চুপচাপ দাঁড়ালাম। জাডক এসে, একেবারে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো আমার কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে নিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর চুমুক দেওয়া, আর আমার হালকা-পলকা প্রশ্নমালা চলতে থাকলেও ও সাড়া দিচ্ছিল না। অবশেষে, ওয়াটার স্ট্রিট পেরিয়ে একটা ঘাসজমি দেখলাম। ওটার একদিকে ভাঙাচোরা নিচু দেওয়াল, অন্যদিকে সমুদ্র, আর সামনে থেকে শহরটার দিকে নজর রাখা যায়। ওখানে কয়েকটা শ্যাওলা-ধরা পাথরও ছিল। মাছের আঁশটে গন্ধ আর জায়গাটায় লেগে-থাকা মৃত্যুর আবহ আমার মাথায় চেপে বসছিল। তবু ঠিক করলাম, ওখানেই জাডক অ্যালেনের গুপ্তকথা শুনব।

রাত আটটার কোচ ধরে আর্কহ্যামের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে আমার হাতে ঘণ্টা চারেক সময় ছিল। বুড়োর মুখ খোলানোর জন্য ওকে মদ খাওয়াতে গিয়েও আমাকে খেয়াল রাখতে হচ্ছিল, যাতে বেশি খেয়ে ও ঘুমিয়ে না পড়ে। বুড়ো বকবক করছিল, তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু নিয়ে। এইভাবে প্রায় দু-ঘণ্টা কাটলে আমার চিন্তা শুরু হল। মনে হল, এই এক বোতল মদে বোধহয় বুড়োর গলা আসল কথা বলানোর মতো ভিজবে না। ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল।

সমুদ্রের দিকে পিঠ দিয়ে আমি বসেছিলাম। আমার মুখোমুখি বসেছিল জাডক। তীর থেকে অনেকটা দূরে হলেও জলের ওপর ভেসে-থাকা ডেভিল'স রিফকে তখন একদম স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। দৃশ্যটা জাডকের পছন্দ হয়নি। নিচু গলায় ও গাল পাড়তে শুরু করল। খানিকটা ঝোঁকের মাথায় ও আমার কোটের হাতা ধরে সামনে এগিয়ে এল। তারপর বলল, "ওই যে! শয়তানের জায়গা! ওখান থেকেই গভীর জল শুরু। এত গভীর জায়গাটা, যে কোনও তলই পাওয়া যায় না ওখানে। তবে একজন তল পেয়েছিল। ওবেদ মার্শ!"

ঘড়ঘড়ে গলায় বলা কথাটা সেই কমে-আসা আলোয় আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। কিন্তু একটা কথাও না বলে আমি মুখ বন্ধ করে রইলাম। আমি জানতাম, জাডক অ্যালেনের মুখ খুলে গেছে।

"সময়টা তখন বড় খারাপ ছিল, বুঝলেন। ব্যাবসাপত্তর লাটে উঠেছে। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এক-এক করে। এখানে জাহাজের কারবার যারা করত, সে আইনি হোক বা বেআইনি, সবাই ১৮১২-র যুদ্ধে খুব ঝাড় খেয়ে আর মাথা তুলতে পারেনি! তখন এই শহরে ব্যাবসা করার মতো দম ছিল শুধু ক্যাপটেন ওবেদ মার্শের। ওঁর তিনটে জাহাজ ছিল, ব্রিগ্যান্টাইন 'কলাম্বি', ব্রিগ 'হেটি' আর বার্ক 'সুমাত্রি কুইন'[165]। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর সঙ্গে ব্যাবসা করতেন মার্শ। হয়তো ওখানেই ওঁর মতিগতি বিগড়ে গিয়েছিল। নইলে ওইরকম কথা কেউ বলে?"

"কীরকম কথা?" নিচু গলায় প্রশ্নটা করলাম।

"অসহায় হয়ে যারা ক্রিশ্চান মিশনে সাহায্য চাইত, মার্শ তাদের ব্যঙ্গ করতেন।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জাডক, "উনি বলতেন, লোকেদের উচিত অন্য দেবতার উপাসনা করা। এমন কোনও দেবতা, যে কথা শুনবে। যে ওদের দেওয়া উপচার আর উৎসর্গ গ্রহণ করে ওদের ভালো রাখবে।"

চুপ করে রইলাম। জাডক জড়ানো গলায় বলে চলল।

"মার্শের ফার্স্ট মেট ছিল ম্যাট ইলিয়ট। ওর একটু বকবক করার স্বভাব ছিল। ওর কাছে শুনেছিলাম, নাবিকরা নাকি ধর্মের নামে উলটোপালটা কাজ করছে। আর এই ব্যাপারটা হয়েছে জাহাজগুলো একটা বিশেষ দ্বীপে যাওয়ার পরেই। দ্বীপটার কাছে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। তবে আসল জিনিস ছিল ওই দ্বীপের ধ্বংসস্তূপ! সেগুলোর নাকি বয়সের গাছপাথর নেই। ম্যাট বলছিল, তাতে বিশাল বিশাল সব মূর্তি আছে, প্রাসাদ আছে, আর সেসবের গায়ে এমন সব কারুকাজ আছে, যা দেখলে রাতের ঘুম উড়ে যায়। কিন্তু সব কিছুই দেখে মনে হয়, যেন দ্বীপটা অনেক অনেকদিন জলের তলায় ছিল।"

"সে তো অনেক জায়গা দেখেই মনে হয়।" আলতো করে বললাম, "নাবিকরা তারপর বদলে গেল কেন?"

"ম্যাট বলেছিল, ওই দ্বীপে যারা থাকে, তাদের নাকি মাছের কোনও অভাব হয় না। মানে ব্যাপারটা ভাবুন! প্রায় পাশের দ্বীপে যারা থাকে, তারাও মাছ খুঁজে হয়রান হয়, কিন্তু ওই দ্বীপে মাছের ভারে জাল ছেঁড়ার জোগাড়। আর শুধু কি মাছ? দ্বীপে যারা থাকত, তারা আজব ডিজাইনের গয়না পরত। আজব... মানে তাতে যেসব নকশা থাকত, ওই জিনিস আপনি আর কোথাও দেখবেন না। মাছ আর ব্যাঙের মাঝামাঝি অনেক প্রাণীর চেহারা

নকশা করে বসানো থাকত ওই গয়নাগুলোতে। কোত্থেকে ওই গয়নাগুলো পাওয়া যায়, এই নিয়ে ওখানকার লোকেদের যতই জিজ্ঞেস করা হোক, তারা বলত না, বা বলতে পারত না।

"ওবেদ মার্শের চোখে আরও দুটো জিনিস ধরা পড়ে ওই দ্বীপে থাকার সময়। প্রথমত, ওখানে বুড়ো লোকেদের দেখা পাওয়া যেত না। কমবয়সি যাদের দেখা যেত, তাদের চেহারা ওই তল্লাটের অন্যান্যদের থেকে... আলাদা। দ্বিতীয়ত, দ্বীপের কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ-না-কেউ প্রতি বছরেই উধাও হয়ে যেত। ওদের ভেতরের ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক নয়, কিন্তু জিনিসটা মার্শ খেয়াল করেছিলেন।

"আর কেউ এই জায়গায় কী করত জানি না, কিন্তু মার্শের ধৈর্য আর বুদ্ধি, দুটোই গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি ছিল। ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের নেতার নাম ছিল ওয়ালাকিয়া। ওর সঙ্গে কথা বলে মার্শ জানতে পারেন, কাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ওই গয়নাগুলো। হাহ্, সেসব কি আর কেউ বিশ্বাস করবে! তবে হ্যাঁ, আপনি করলেও করতে পারেন। আপনার চোখজোড়া ক্যাপটেন মার্শের মতোই ধারালো ঠেকছে। তাই আপনাকে বলা যায়।

"কানাকিয়া, মানে ওই দ্বীপে যারা থাকত, সেই উপজাতির লোকেরা এক বিশেষ ধরনের দেবতার পুজো করত। গয়নার গায়ে নকশাগুলো মনগড়া নয়, সেগুলো নাকি ওইসব 'দেবতা'র চেহারা। তাদের পুজো মানেও খুব সহজ ব্যাপার। দ্বীপের কমবয়সি ছেলেমেয়েদের ওই দেবতাদের কাছে বলি দিলেই তাঁরা তুষ্ট হয়ে গয়না, অঢেল মাছ— এসবের ব্যবস্থা করেন। ওই দেবতারা জলের নীচে নানা শহরে বাস করেন। ওই দ্বীপটাও নাকি জলের তলা থেকেই উঠে এসেছে ভূমিকম্পের ফলে। আশপাশের দ্বীপ থেকে যখন লোকে এই দ্বীপে আসে, তখন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওই 'দেবতা'দের কাউকে কাউকে তারা দেখতে পায়। তারপর একটু একটু করে ভাবের আদানপ্রদান হয়। শেষে এই ব্যবস্থা চালু হয়।

"ওই 'দেবতা' বা প্রাণীরা নরবলি জিনিসটা খুব পছন্দ করত। এককালে নাকি মানুষরা ওদের কাছে নরবলি দিত, কিন্তু সে বহু যুগ আগের ব্যাপার। বলি পেলে ওরা গোটা সমুদ্রের মাছ নিয়ে আসবে ওই দ্বীপের কাছে— এই শর্ত দেওয়া হল। তখন ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের আপত্তি করার মতো অবস্থা ছিল না। তারা রাজি হল।

“প্রথমদিকে কানাকিয়ারা ওই আগ্নেয় দ্বীপটার কাছে নৌকো করে যেত বলি হিসেবে ছেলেমেয়েগুলোকে রেখে আসতে, আর ওই প্রাণীদের তরফে উপহার হিসেবে পাওয়া গয়না নিয়ে আসতে। পরে ওই প্রাণীরা মূল দ্বীপেও আসতে থাকে। তারপরেই ওরা...!”

জাডক অ্যালেন চুপ করে যাওয়ায় আমার প্রথম চিন্তা হল, মদ কি শেষ? বোতলে তখনও জিনিস আছে দেখে আমি লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। ওর মুখে ঘেন্না আর ভয়ের এমন একটা মিশ্রণ ফুটে উঠেছিল, যেটা আমি বোঝাতে পারব না। একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলতে শুরু করল।

“তারপরেই ওরা বলে, দ্বীপের মানুষদের সঙ্গে ওরা মেলামেশা করতে চায়। মানে শরীরী মেলামেশা! শুনে কানাকিয়ারাও ভড়কে গিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই। তবে ওই প্রাণীরা ওদের বোঝায়, সৃষ্টির একেবারে আদি যুগে সবরকম প্রাণই তৈরি হয়েছিল জলের গর্ভে। তাই চেহারায় সামান্য কিছু অদলবদল করে নিলে ব্যাপারটা নাকি অসম্ভব কিছু নয়। তা ছাড়া...”

আমার গা গোলাচ্ছিল। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, “তা ছাড়া?”

“তা ছাড়া, ওইরকম... মেলামেশার ফলে যেসব সন্তানসন্ততি জন্মাবে, তাদের কিছু বিশেষত্ব থাকবে। জন্মের পর থেকে একটা বয়স অবধি তাদের চেহারা থাকবে মানুষেরই মতো। তারপর তারা ক্রমেই বদলে গিয়ে ওই প্রাণীদের মতো হয়ে যাবে। তখন জলের অতলে হারিয়ে-যাওয়া শহর, দেশ, মহাদেশ... এগুলোই হবে তাদের বাসস্থান। সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন? সেই সন্তানদের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না, যদি না কেউ তাদের মেরে ফেলে।

“নিজের না হলেও, সন্তানের অমরত্ব... এই জিনিসের টান কতটা ভাবতে পারছেন?”

আমার চোখে অবিশ্বাসের ভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে জাডক একটু থতিয়ে গেল। তারপর আবার বলতে শুরু করল দুলে দুলে।

“এইসব কথা কি আর সহজে মানা যায়? ওবেদ মার্শও মানেননি। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে দ্বীপের লোকজনের সঙ্গে সহজভাবে, সাবধানে কথা বলে মার্শ বোঝেন, ওয়ালাকিয়া মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ওই দ্বীপের সব্বার শিরায় ওইসব প্রাণীর রক্ত বইছে, কম বা বেশি মাত্রায়। একটা বয়সের পর চেহারা পালটে যায় ওদের। যারা জলে যেতে পারে, তারা চলে যায়। মাঝেমধ্যে নিজের বংশজদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তারা ফিরেও

আসে, এমনকী কয়েকশো বছর পরেও, কারণ তাদের মৃত্যু নেই। যারা জলে যেতে পারে না, তারা থেকে যায় ডাঙাতেই, তবে তাদের দেখে মানুষ বলে চেনার উপায় থাকে না। কিন্তু জলে হোক বা স্থলে, ওদের মৃত্যু হয় শুধু অন্য দ্বীপবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে, বলি হিসেবে, আর নয়তো বাইরে থেকে আসা কোনও মানুষের দ্বারা বাহিত রোগজীবাণুর আক্রমণে।

"অন্য কেউ এইরকম অবস্থায় কী করত? বলা কঠিন, তবে ওবেদ মার্শ বিস্তর ভেবে সিদ্ধান্ত নেন, দ্বীপবাসীরা যা করেছে, তার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। অবশ্য জলের নীচ থেকে আসা সেই আদিম প্রাণীদের দেখা পাননি মার্শ। তবে ওয়ালাকিয়াকে বিস্তর চাপ দিয়ে উনি কয়েকটা মন্ত্র শিখে নিয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন একটা ধাতুর টুকরো। ওয়ালাকিয়া মার্শকে বলেছিল, যেরকম জায়গায় ওইসব প্রাণী থাকতে পারে, তেমন কোথাও ওই ধাতুর টুকরোটা ফেলে দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তারা উঠে আসে। তারপর তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা... সেটা মার্শের দায়িত্ব।

"ম্যাট, মানে ওবেদের ফার্স্ট মেট ওই দ্বীপের ত্রিসীমানায় থাকার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু ক্যাপটেন ওর কথা শোনেননি। ওবেদ বুঝে গিয়েছিলেন, ওই গয়নাগুলো সরাসরি বেচতে গেলে লোকে ভড়কে গেলেও ওগুলো গলিয়ে-পাওয়া সোনা বেচে ভালো রোজগার করা যায়। উনি নিজের বাড়ির মহিলাদের কিছু গয়না পরতে দিতেন। আর কিছু নাবিক, তাদের বারণ করা সত্ত্বেও কিছু গয়না বাজারে বেচে দিত। তবে এই কারবার ১৮৩৮ অবধি চালানো গিয়েছিল। ওই বছর দ্বীপে পৌঁছে জানা যায়, দ্বীপে আর কেউ বেঁচে নেই। খোঁজ নিয়ে মার্শ জানতে পারেন, অন্যান্য দ্বীপের বাসিন্দারা খবর পেয়েছিল, ওই দ্বীপে কী হচ্ছে। তারাই নাকি আক্রমণ করে দ্বীপের প্রতিটি প্রাণীকে নিকেশ করেছিল! শুধু প্রাণীই নয়, মূর্তি, প্রাসাদ, ধ্বংসস্তূপ হয়ে-থাকা দালানকোঠা, সবই প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তারা।"

"তারপর?" আমার মুখ থেকে প্রশ্নটা আপনা থেকেই বেরোল।

"ওবেদ মার্শের কারবার মার খেয়ে গেল। ওঁর নিজস্ব জাহাজি ব্যাবসায় তখন মন্দা চলছিল। তা-ও, যদি এটা শুধু ওঁর ব্যাবসার লাভ-লোকসানের কথা হত, তাহলে ব্যাপারটা ওইদিকে বাঁক নিত না।"

"কোন দিকে?"

“আরে বাবা, মার্শের ব্যাবসার ওপর তো সরাসরি বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে গোটা ইন্সমাউথ নির্ভর করত! অন্যান্য ব্যাবসাবাণিজ্য সবই তো প্রায় লাটে উঠেছে তখন। মাছ নেই, কারখানা বন্ধ, আর ওই বছরের পর সোনার কারবারও বন্ধ। কী অবস্থা হল শহরটার, ভাবতে পারেন?

“অধিকাংশ মানুষ ভাগ্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিল। তখনও এই শহরে কিছু কিছু ক্রিশ্চান মিশন ছিল। লোকে পেটের টানে সেখানেই হাত পাতল, সপরিবারে।

“কিন্তু ওবেদ মার্শ সেটা করেননি! উনি অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। উনি সরাসরি বলেন, চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে কোনও লাভ নেই। বরং উনি এমন দেবতাদের কথা জানেন, যারা প্রার্থনায় সাড়া দেয়, এনে দেয় মাছ আর... সোনা! ওঁর জাহাজগুলোয় যারা কাজ করত, তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে, মার্শ কী বলতে চাইছেন। কিন্তু ওরা কথাগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও, শহরের বাকি লোকেদের সেই ইচ্ছে বা উপায় ছিল না।”

এই অবধি বলার পর জাডক অ্যালেন চুপ করে গেল। ও বারবার আশপাশে তাকিয়ে দেখছিল। মনে হল, ও আশঙ্কা করছে, কেউ আমাদের এই কথাগুলো শুনছে। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। এইসব কিংবদন্তির গভীরেও একটা সত্যি থাকে। এখানেও নিশ্চয় সুদূর কোনও দ্বীপ থেকে নিয়ে-আসা একটা চর্মরোগ বা আরও গুরুতর অসুখের কথাই বলা হয়েছে। সঙ্গে মিশে গেছে ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’ গোছের উপদেশ। কিন্তু জাডকের গল্পে এমন একটা আতঙ্কের ভাব ছিল, যেটা নীতিকথার সঙ্গে মেলানো যাচ্ছিল না। তা ছাড়া নিউবারিপোর্ট মিউজিয়ামের সেই টায়রা গোছের গয়নাটা তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাহলে...?

জাডককে বোতলটা দিলাম। একেবারে শেষ বিন্দুটা গলায় না-গড়ানো অবধি ওটাকে ও মুখেই ধরে রইল। লোকটা এতটা মদ, তা-ও একেবারে নির্জলা, খেল কীভাবে? তবে ওসব জিজ্ঞেস করিনি আমি। ওর জড়ানো গলায় বলা কথাগুলোর মানে বোঝার জন্য আমাকে লোকটার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় জাডক অ্যালেন নিজের গলার আওয়াজ খুঁজে পেল, তারপর বলতে শুরু করল।

“ম্যাট চেষ্টা করেছিল। শহরের লোকেদের ও বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, কেন ওইসব ‘দেবতা’ মোটেই সুবিধের জিনিস নয়। কিন্তু কী হল? কিস্‌সু না! মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট...

অন্য যা কিছু চার্চ ছিল তখন এখানে, সেগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। যারা ওদের হয়ে প্রচার করত, তারা হয় শহর ছাড়ল, নয় স্রেফ গায়েব হয়ে গেল। ঈশ্বরের নামের বদলে শহরের বাতাসে ভাসল অন্য অনেকগুলো শব্দ— ডেগন, আশতরেথ[166], বেলিয়াল[167], বিইলজেবাব[168]! কানান আর ফিলিস্তিনের সেইসব ভুলে-যাওয়া, ভয়ংকর দেবতারা...!"

জাডকের চোখ বুজে এসেছিল। আমার ভয় হল, অতখানি তরলের চাপে ও বোধহয় এবার ঘুমিয়েই পড়েছে। লোকটার কাঁধ ধরে আলতো ঝাঁকুনি দিতেই ওর চোখ খুলে গেল। একদম স্পষ্ট গলায় ও বলে উঠল, "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তা-ই তো? তাহলে বলুন তো, ক্যাপটেন ওবেদ মার্শ আর তাঁর সঙ্গে এই শহরের জনা কুড়ি লোক ওই ডেভিল'স রিফ-এ গিয়ে কী করতেন? ওখানে যেদিকটায় সমুদ্র এত গভীর যে, আজ অবধি তল পাওয়া যায়নি, সেখানে ওরা বস্তায় ভরে কী... বা কাদের ফেলত? সেই ধাতুর টুকরোটা দিয়ে কী করেছিলেন ওবেদ মার্শ? বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে ওখানে গিয়ে কোন মন্ত্র পড়া হয়? সবচেয়ে বড় কথা, নতুন-হওয়া এই চার্চগুলোয় যাজকরা কেন কাপড়, ওবেদের আনা ওই গয়নার মতো অলংকার, আর বিশেষ ধরনের শিরস্ত্রাণে নিজেদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখে?"

লোকটার গলায় এমন একটা হিংস্রতা ফুটে উঠেছিল যে, আমি কিছুটা পিছিয়ে গেলাম। সেই দেখে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল জাডক। তারপর আবার কথা শুরু করল।

"ভয় পাচ্ছেন? শুধু আমার কথা, আমার এই 'গল্প' শুনেই ভয় পাচ্ছেন? তাহলে আমি যা দেখেছি তা দেখলে কী করতেন? আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আমি অনেক কিছুই দেখতাম। আড়ি পেতে ওবেদ মার্শের ব্যাবসা আর জাহাজের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের অনেক কথাই শুনতাম। তবে সেগুলো যে সত্যি, সেটা বুঝলাম নিজের চোখে ওদের দেখে।"

"কাদের?"

"ডেভিল'স রিফ থেকে যারা উঠে আসে, তাদের। কী করে দেখলাম জানেন? আমার বাবার একটা নৌকো ছিল। সেটা নিয়ে চুপিচুপি মার্শের নৌকোর পিছু নিয়েছিলাম। মেঘলা রাতেও বুঝতে পারছিলাম, রিফের ওপরে থিকথিক করছে কারা যেন। চাঁদ উঠল। ওই প্রাণীগুলো ঝপাঝপ জলে নেমে পড়ল, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না! আমি দেখেছিলাম, ওরা মানুষ নয়। ওরা কথা বলে, তবে ইশারায়। আর সেই ইশারা...!"

জাডকের কথাগুলো ক্রমেই অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল। তবু আমি বুঝতে পারছিলাম, ও কী বলতে চাইছে।

"একরাতে আপনি দেখলেন, ওখানে কিছু ফেলা হল। পরদিন সকালে আপনি জানলেন, আপনার তরতাজা জোয়ান বন্ধুটি হারিয়ে গেছে। আপনি দুইয়ে দুইয়ে চার করতে পারবেন না? বিশেষ করে যখন ওবেদ মার্শের কপাল খুলে গেল, ঠিক সেই সময়েই! ওঁর পরিবারের মেয়েদের গায়ে নতুন ডিজাইনের গয়না উঠল। ওঁর রিফাইনারির চিমনি দিয়ে আবার ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। নিউবারিপোর্ট, আর্কহ্যাম, বস্টন— এমন নানা বন্দরে আবার শুরু হল জিনিস পাঠানো। আর এল মাছ! এত মাছ, ইন্সমাউথের মানুষ জীবনে দেখেনি।

"আশপাশের জায়গার লোকেদের চোখ টাটাল। কিংসপোর্ট থেকে ক-জন এখানে মাছ ধরতে এল বটে, তবে তারপর তাদের কী হল, কেউ জানে না। কিন্তু সেই নিয়ে কে ভাববে? তত দিনে শহরের লোকেদের হাতে পয়সা আসছে। ব্রাঞ্চ রেললাইন বসেছে। ওই সময়েই মার্শ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা 'এসোটেরিক অর্ডার অব ডেগন' নামে একটা নতুন ধর্ম চালু করেন। সেই ডাগনের দলবল প্রথমেই ক্যালভারি কমান্ডারির[169] লাগোয়া ম্যাসনিক[170] হল কিনে নিজেদের চার্চ বসায়।

ম্যাট একে ম্যাসন ছিল, তায় এই ব্যাপারটা ও কিছুতেই সহ্য করেনি। এবার ও একেবারে রাস্তায় নেমে ওবেদ মার্শ এবং তাঁর চালু করা নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। তারপর ওকেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি! আমি বলছি না যে, মার্শ সরাসরি এতে জড়িত ছিলেন, তবে সোনা আর মাছের লোভ যে কী জিনিস...!

এভাবেই চলল বেশ ক-বছর। তবে ১৮৪৬-এ একটা ঘটনা ঘটল। সেই সময় শহরের সুস্থ মস্তিষ্কের লোকেদের মগজে অবশেষে বোধবুদ্ধি গজাল। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের নিরুদ্দেশ হওয়া, ডেভিল'স রিফ-এ গিয়ে কিছু লোকের রহস্যময় কাজকারবার, এবং অন্য সব চার্চ বন্ধ হয়ে ডাগনের প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়া— এই জিনিসগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, এটা অনেকেই তখন বুঝে ফেলেছিল। একদিন যখন ওবেদের নৌকো ডেভিল'স রিফ গেছে, তখন তাদের পিছু নিয়ে অন্য বেশ কয়েকটা নৌকোও যায় সেদিকে। প্রথমে গুলিগোলা, তারপর একটা বিরাট ধরপাকড় চলে। প্রায় শ-দেড়েক লোক গ্রেফতার হয়, যাদের মধ্যে ওবেদ মার্শও ছিলেন! কিন্তু এই উত্তেজনায় কী হয়েছিল, জানেন?

“কেউ খেয়াল করেনি, কিন্তু প্রায় এক মাস ডেভিল’স রিফ-এ কাউকে বলি দেওয়া হয়নি!

“সেই রাতে আমি ছাদের টালির ফাঁকে লুকিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওই অদ্ভুত না-মানুষ, না-মাছ, না-ব্যাং চেহারাগুলোকে আমি উঠে আসতে দেখি সমুদ্র থেকে। ওরা প্রথমে দরজার কড়া নেড়েছিল। যারা খুলেছিল, তাদের সেখানেই...! নয়তো কারও রান্নাঘরে ঢুকে, কাউকে শোয়ার ঘরে, কাউকে রাস্তায় মেরে ফেলেছিল ওরা!

“জেলের দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছিল সেই রাতে। চারদিকে আর্তনাদ, চিৎকার, কান্না, গুলির শব্দ। রাত ভোর হলে দেখেছিলাম, শুধু ক্যাপটেন ওবেদ মার্শ আর তার সঙ্গী বা অনুগামীরা বেঁচে আছে। বাকি গোটা শহর জুড়ে শুধু লাশের স্তূপ। টাউন স্কোয়্যার, রাস্তা, ঘর... সর্বত্র শুধু রক্ত। মার্শের সঙ্গীরা রটিয়ে দিল, শহরে অজানা রোগের থেকে মড়ক হয়েছিল। সেই ‘মড়কেই’ বাকিদের সঙ্গে আমার বাবাও...!”

থরথর করে কাঁপছিল জাডক। আমার কাঁধ শক্ত করে ধরে ও নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, তবে সেটা অন্য কারণে। ততক্ষণে জোয়ার এসেছে। আমার পেছনের পাথরে ছলাৎছল আওয়াজ তুলছিল সমুদ্রের ঢেউ। কিন্তু আঁশটে গন্ধটা কমছিল না, বরং বাড়ছিল।

“পরদিন সকালে সব সাফ করা হল, কিন্তু রক্তের দাগ কি সহজে মোছে? ক্যাপটেন মার্শকে দেখে বুঝলাম, ওঁর মাথা খারাপ হতে আর বিশেষ বাকি নেই। আমাদের উদ্দেশে চিৎকার করছিলেন উনি। বলছিলেন, যারা আমাদের সোনা আর মাছ দেয়, তাদের পাওনা মেটাতেই হবে। অন্য কারও নয়, শুধু তাদেরই পুজো করতে হবে আমাদের। আমাদের এই মর্মে শপথ করতে হল। বলা হল, আমরা যেন বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। কেউ কিছু জানতে চাইলে যেন মুখ না খুলি। ব্যাস!

“সমুদ্রের লাগোয়া কয়েকটা বাড়ি আলাদা করে দেওয়া হল, যেখানে ওই ‘দেবতা’রা এসে মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন। কথাগুলো না মেনে আমাদের উপায় ছিল না। শুধু লোভ নয়, ভয়টাও কাজ করছিল যে। আগের রাতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, ডেভিল’স রিফ-এর তলায় ওইরকম প্রাণীদের সংখ্যা খুব খুব বেশি। ওদের বিরুদ্ধে লড়ব কী নিয়ে? কানাকিয়ারা এমন কিছু মন্ত্র জানত, বা ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছু থেকে শিখে নিয়েছিল, যা দিয়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখা যায়। আমরা সেগুলো কীভাবে জানব, বলুন?

"আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, সেগুলোর জন্য অনেক আগেই ওরা আমাকে মেরে ফেলত। নেহাত শপথ নিয়ে রেখেছি। তাই যতক্ষণ না ওরা প্রমাণ করতে পারছে যে, আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে বাইরের কারও কাছে এই নিয়ে মুখ খুলেছি, ততক্ষণ ওরা আমাকে কিছু করবে না। এসব কথা বাইরে বেরোলে যে ওদের খুব অসুবিধে হবে। ওরা সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করে ওই ডেগনের চার্চে— ওদের বাচ্চারা নাকি আর মরে না, ফিরে যায় সমুদ্রে মা হাইড্রা[171] আর বাপ ডেগনের কাছে। ওরা গান গায় – লা! লা! কথুলু ফ্যাগন! ফ্যা'গলুই ম্যাগল'নফ কথুলু রে'লিওয় ওয়াহ-নাগল ফ্যাগন –"

"লোকে এসব কথা বিশ্বাসই করবে না।" আমি বলতে বাধ্য হলাম, "তা ছাড়া সোনা এমনই জিনিস যে, গালগল্প ছড়ালে ওই ব্যাবসায় লোকসান নেই, বরং লাভ আছে। তাহলে ভয়টা কীসের?"

"ভয়টা খানপানের নয় স্যার, বরং খানদানের।" ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল জাডক, "লোকে ভাবে, ইন্সমাউথ থেকে বেরোনো সোনার উৎস হল জলদস্যুদের লুটের মাল। সোনা কোত্থেকে আসছে— এটা নিয়ে তারা ভাবতেই রাজি নয়। কিন্তু ইন্সমাউথের লোকেদের চেহারা এরকম হওয়ার কারণটা তারা বুঝলে কী হবে, ভাবতে পারছেন? ওই 'দেবতা'দের সঙ্গে 'মেলামেশা' করার ফলে যারা জন্মায়, তাদের অনেকেই গৃহযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। তারা যখন ফিরে আসে, তখন তাদের চেহারা বদলাতে শুরু করেছে! বাইরের লোকে ভাবে, এটা সেই মড়কের ফল, বা নাবিকদের সঙ্গে অন্য দেশের মেয়েদের...! কিন্তু আসল ব্যাপারটা এখন আন্দাজ করে শুধু অবলা প্রাণীরা। ঘোড়া, খচ্চর — এমন প্রাণীরা ইন্সমাউথের লোকেদের কছে এলেই অস্থির হয়ে ওঠে। গাড়ি আসার পর সেই ঝামেলাটা মেটে, কিন্তু তদ্দিনে শহরের অবস্থা আবার খারাপ হচ্ছে। বন্দরটা বালি আর পলিতে বুজে আসছে বলে জাহাজগুলো আর ভিড়তে পারত না। কারখানা বন্ধ হল। রেললাইনটাও উঠে গেল। কিন্তু ওই 'দেবতা'দের আসা বন্ধ হল না! মেলামেশাও বন্ধ হল না। একটা একটা করে বাড়ির জানলা বোর্ড দিয়ে, পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেওয়া হল, যাতে সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে না পারে। সবাই চলে যেতে শুরু করল... নীচে, মাটির নীচে, তারপর জলের নীচে!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল জাডক। কিন্তু আমার মাথায় ততক্ষণে অন্য একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে।

“এই ‘মেলামেশা’ কারা করত? মানে নাবিকরা বা রিফাইনারির কর্মীরা? নাকি...?”

ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখল জাডক। তারপর আবার কথা শুরু করল।

“১৮৪৬ সালে ওবেদ মার্শ আবার বিয়ে করেন। লোকে বলে, ওঁর ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এ-ও নাকি সেই ‘ধর্মের’ অঙ্গ। সেই বউকে কেউ দেখেনি। তাঁর গর্ভে ওবেদের তিন সন্তান হয়। দু-জন কম বয়সেই নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে একজন, একটি মেয়ের চেহারা একেবারে স্বাভাবিক ছিল। তাকে ইউরোপে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ানো হয়। তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর্কহ্যামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়েও দেওয়া হয়, এমনটাই শুনেছি।

“মার্শের প্রথম পক্ষের বড় ছেলের বউকেও কেউ দেখেনি। শুনেছি, সে-ও নাকি ওই ‘দেবতা’দের একজন ছিল। তার ছেলে, মানে ওবেদের নাতি বার্নাবাস মার্শ এখন রিফাইনারির মালিক। শুনেছি, ওর চেহারাও এখন নাকি একেবারে বদলে গেছে। ওবেদ মারা যান ১৮৭৮-এ। ওঁর প্রথম পক্ষের ছেলেরাও কেউ বেঁচে নেই। বার্নাবাসও প্রায় বছর দশেক ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে আছে। হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যেই ওকে জলে চলে যেতে হবে! মার্শ বংশের আর কেউ আছে কি? মনে তো হয় না।”

জোয়ারের দাপট তখন ক্রমেই বাড়ছে। জলের ছিটে আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমি দেখছিলাম, কীভাবে জলের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল জাডকের পাগলাটে ভাবসাব।

“কিছু বলছেন না যে? অ, আমার কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছে না, তা-ই তো? হবে, হবে। থাকুন-না এই মরা শহরে, সব বিশ্বাস করবেন আপনি। যখন বুঝবেন, বন্ধ জানলার ওপাশে যার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছেন, সে মানুষ নয়, বরং একটা নরকের কীট, তখন বুঝবেন! যখন চোখের সামনে দেখবেন, কার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আপনার মেয়েকে, তখন মানবেন আমার কথাগুলো।

“সবজান্তার মতো আমার দিকে চেয়ে থাকবেন না, বুঝলেন! আমি যা দেখেছি তা দেখলে আপনি এতক্ষণে ল্যাজ গুটিয়ে পালাতেন এই নরক থেকে। কী দেখেছি আমি? জানতে চান, কী দেখেছি আমি? আমি দেখেছি, ওই ‘দেবতা’রা আর জলের নীচে থেকেই খুশি নন। সমুদ্রের লাগোয়া বাড়িগুলো এখন ওদের মেলামেশার জায়গাই শুধু নয়, ওদের

আড্ডা। ওরা আসছে! অসংখ্য, অগুনতি! আর তারপর ওরা কী করবে, বুঝতে পারছেন আপনি?”

জাডকের শেষদিকের কথাগুলো চিৎকার ছাপিয়ে আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। আমি উত্তর দিতে গিয়ে দেখলাম, ওর মুখ বেঁকে যাচ্ছে। ভাবলাম, এটা কি মৃগী বা মদ্যপানের ফল? পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম, নিঃসীম আতঙ্কে প্রায় দিশেহারা হয়ে গেছে জাডক অ্যালেন। আর সেই আতঙ্কের উৎস রয়েছে আমার পেছনেই!

আমি পেছনে ঘুরে ঢেউ ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পেলাম না। কিছুটা দূরে যেখানে ব্রেকারগুলো আছে, তার কাছে কিছু একটা ছিল কি?

জাডকের দিকে ঘুরে দেখলাম, ভয়ে লোকটার মুখ থেকে ফেনা বেরোনোর জোগাড় হয়েছে। চিৎকার করে আমাকে বলল বুড়ো, “বেরোও এখান থেকে! এক্ষুনি! এই মুহূর্তে! ওরা জেনে গেছে যে, আমি তোমাকে সব বলে দিয়েছি। যাও!”

একটা বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ল ভাঙা পাঁচিলের পাথরগুলোর ওপর। জলের গুঁড়োয় ঝাপসা বাতাস একটু পরিষ্কার হলে দেখলাম, প্রাণপণে উত্তরদিকে হাঁটছে... না, প্রায় দৌড়োচ্ছে জাডক অ্যালেন। আশপাশে আর কিছুই বা কাউকে দেখলাম না। চুপচাপ হাঁটা দিলাম। ওয়াটার স্ট্রিটে পৌঁছে আবার এদিক-ওদিক দেখলাম, কিন্তু লোকটাকে আমি আর দেখতে পেলাম না।

(৪)

দোকানের ছেলেটা বলেছিল বটে, কিন্তু জাডক অ্যালেনের গল্পগুলো যে কতটা ভয়ানক, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলাম। ঘড়ির কাঁটা বলছিল, সওয়া সাতটা বাজে। মাতালের প্রলাপ হলেও জাডকের কথাগুলো আমাকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছিল। মনে হচ্ছিল, মাছ আর মৃত্যুর গন্ধ-মাখা এই জীর্ণ শহরটা ছেড়ে যেতে না পারলে খুব বড় বিপদ হবে। তবে আমি দৌড়োইনি। নিজের মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য বাড়িগুলোর স্থাপত্যশৈলী দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু মার্শ স্ট্রিট ধরে হাঁটতে গিয়েই বুঝলাম, কিছু একটা গোলমাল আছে। এতক্ষণ ফাঁকা-থাকা রাস্তাগুলোয় জটলা দেখছিলাম। ছোট ছোট দলে যারা জমা হচ্ছিল, তাদের চেহারায় ইন্সমাউথের লক্ষণ ফুটে উঠছিল স্পষ্টভাবে। আমার দিকে কয়েকজন ইশারা করল। আমার ইচ্ছে করছিল দৌড়োতে, কিন্তু কষ্ট করে

হলেও নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখলাম। গিলম্যান হাউসের কাছে পৌঁছে বুঝলাম, এই দলগুলোর লক্ষ্যও ওই বাড়িটা। ওরা যখন হোটেলটাকে ঘিরে ফেলছে, আমি তখন শান্তভাবে নিজের ব্যাগ নিয়ে হোটেল থেকে চেক-আউট করছি।

আমি শান্তভাবেই স্কোয়্যারে গিয়ে কোচের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে গিলম্যান হাউসের ভেতরে ঢুকে লোকগুলো কিছু একটা করছিল বা বলছিল। কোচ আটটার একটু আগেই এসে গেল। ওখান থেকে ড্রাইভার, মানে ওই সার্জেন্ট নেমে একটা চিঠির বান্ডিল, আর কয়েকটা খবরের কাগজ ছুড়ে দিল বাইরে, তারপর হোটেলে ঢুকল। সকালে যে তিনজন লোক নিউবারিপোর্টে নেমেছিল, তারাই এবার বাস থেকে নামল। ফুটপাথে দাঁড়ানো একটা নোংরা চেহারার লোকের সঙ্গে তারা কী ভাষায় গুজগুজ-ফুসফুস করল, তা আমি জানি না। তবে আমার আর কিছু দেখার ধৈর্য ছিল না। চুপচাপ কোচে উঠে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম শহরটা ছেড়ে যাওয়ার জন্য।

তখনই সার্জেন্ট হোটেল থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এল। ওর নিচু, জড়ানো, অনেকটা ঘোঁত ঘোঁত-করা আওয়াজে বলা কথার মানে বোঝার পর আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল।

কোচ আজ রাতে ছাড়বে না। তাতে গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। না, অন্য কোনও যানবাহনও পাওয়া যাবে না, যা আমাকে আজ রাতে আর্কহ্যাম, নিউবারিপোর্ট, ইপ্সউইচ বা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। তাই আজ রাত্তিরটা আমাকে গিলম্যান হাউসেই কাটাতে হবে। যাতে আমার জন্য স্পেশাল রেট দেওয়া হয়, সেটা সার্জেন্ট নিশ্চিত করবে। সে অত্যন্ত দুঃখিত... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই অবস্থায় কিছুই করার থাকে না। আমি কোচ থেকে নেমে হোটেলে ঢুকলাম। ক্লার্ক চোখ কুঁচকে আমাকে দেখল, তারপর জানাল, ৪২৮ নম্বর ঘরটা আমাকে দেওয়া যাবে। ঘরটায় জলের সাপ্লাই নেই, তবে ওটা বেশ বড়। ভাড়া পড়বে মাত্র এক ডলার। আমি পেমেন্ট করে রেজিস্টারে সই করলাম। তারপর মাথা নিচু করে, আরেক বিষণ্ণবদন অ্যাটেন্ডেন্টের পিছুপিছু, ধূলিধূসর সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে গেলাম। ঘরটা যাচ্ছেতাই, আসবাবগুলো সস্তা এবং জঘন্য, এমনকী জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে একটা নোংরা উঠোন আর দূরে জলাজমি ছাড়া কিচ্ছু দেখা যায় না। ঘরের বাইরে, করিডরের শেষ প্রান্তে একটা দুর্গন্ধযুক্ত, মলিন, নিবু-নিবু আলো-জ্বলা টয়লেট।

থাকার এমন ব্যবস্থা দেখে মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্য খাবারের সন্ধানে নীচে নামলাম। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে বলে বাধ্য হয়ে হোটেলের রেস্তরাঁতেই ডিনার সারলাম। কপাল ভালো, প্যাকেট আর টিনের জিনিসই ওখানে গরম করে দেওয়া হয়। নইলে ওই নোংরা শহরে যে কী খায় লোকে...! খাওয়া সেরে, কাউন্টারের পাশ থেকে একটা খবরের কাগজ আর একটা পত্রিকা নিয়ে আমি নিজের ঘরে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেলাম, কারণ সেটাকে আটকানোর মতো কোনও তক্তা বা পাল্লা ছিল না। এই শহরের আরও অনেক অকেজো জিনিসের মতো ওটাও ভেঙে গেছে ভেবে আমি ঘরের মলিন আলোটা জ্বাললাম। তারপর শব্দছক সমাধান করতে ব্যস্ত হলাম, যাতে ঘুমোনোর আগের সময়টা ঠিকঠাক কাটে।

অনেক চেষ্টা করেও কাগজে বা পত্রিকায় মন বসাতে পারলাম না। জাডকের উপাখ্যান আর গিলম্যান হাউসে সেই ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর কী শুনেছিলেন, সেই নিয়ে ভাবনা, দুইয়ে মিলে আমার মাথায় নানা দুশ্চিন্তার জন্ম দিচ্ছিল। ঠিক কীসের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল, বলতে পারব না। তবে সেই ভয়ের তাড়নাতেই দরজাটা ভালো করে দেখতে বাধ্য হলাম। কম আলোতেও বোঝা গেল, একটা পাল্লা ওখানে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেটাকে সরানো হয়েছে। ঘরটার আগাপাশতলা খুঁজে জামাকাপড়ের আলমারিতে একটা ওই মাপের জিনিস পাওয়া গেল। ঘোরাঘুরি করার অঙ্গ হিসেবে আমাকে নিজের সঙ্গে কয়েকটা জরুরি জিনিস রাখতেই হয়। তেমনই একটা ছুরি-কাম-স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ওটাকে জায়গামতো ফিট করলাম। ঘরে আরও দুটো দরজা ছিল। সেগুলোকেও বন্ধ করে তবে নিশ্চিন্ত হলাম।

আমি জামাকাপড় ছাড়িনি। বরং একেবারে সাজগোজ করেই ওই শক্ত বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ঘুম না-আসা অবধি হাবিজাবি যা পাই তা-ই পড়ব। কিন্তু সারাদিনের হাঁটাহাঁটির ফলে আলো জ্বেলে পড়তে ইচ্ছে করছিল না, আবার যা শুনেছি আর দেখেছি, তার ঠ্যালায় ঘুমও আসছিল না। এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল জানি না, তবে হঠাৎ মনে হল, আমি যেন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। যেন সিঁড়ি দিয়ে কেউ বা কারা সন্তর্পণে উঠে আসছে!

উঠে বসলাম। কান পেতে কিচ্ছু শুনতে পেলাম না। নিজেকে একপ্রস্থ গালাগাল দিলাম উলটোপালটা গল্প শুনে নার্ভ উত্তেজিত করে তোলার জন্য। একবার মনে হল, লাইট জ্বালিয়ে আশপাশটা দেখি, যদি তাতে মাথা একটু ঠান্ডা হয়। নিজেকে এ-ও বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমার কাছে যে টাকাপয়সা নেই, সেটা নিশ্চয় ইন্সমাউথের লোকেরাও বুঝেছে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে লাইটের সুইচ অবধি যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই চুপচাপ শুয়ে রইলাম। সে জন্যই কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম, ওই আওয়াজটা আমি কল্পনা করিনি!

সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে এসেছে। এবং শুধু উঠে আসাই নয়, আমি বুঝতে পারলাম, সে আমার ঘরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করছে!

অন্য সময় বা অন্য কোথাও এই জিনিস হলে বোধহয় ভয়ে আমি জমে যেতাম। কিন্তু হোটেলে ঢোকার পর থেকে নিজের অজান্তেই আমি সতর্ক এবং প্রস্তুত ছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে হয়নি যে, ভুল করে বা মদের নেশায় কেউ আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে। একেবারে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, আমার একেবারে শিয়রে শমন! তবু, আশঙ্কা সত্যি হলেও ধাক্কাটা জোরেই লাগে।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও আমার ঘরের দরজাটা খুলতে পারল না হানাদার, সে যে-ই হোক-না কেন। চাবির আওয়াজ শুনে বুঝলাম, আমার পাশের ঘরে কেউ চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। তারপর ওই ঘর থেকে আমার ঘরের দিকে আসার দরজাটা খোলার চেষ্টা হল। কিন্তু পাল্লাগুলোর জন্য সে গুড়েও বালি পড়ল। একই জিনিস হল একটু পরে অন্য ঘরেও। দরজা না ভেঙে আমার ঘরে ঢোকা যাবে না বুঝে লোকটা এবার চলে গেল। আমি প্রথমে করিডরে, পরে সিঁড়ি দিয়ে তার সাময়িক পশ্চাদপসরণের শব্দ পেলাম।

কিন্তু আমার পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া মন বলছিল, এই শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে নিরস্ত্র অবস্থায় আমার জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমাকে পালাতে হবে। সামনের দরজা বা সিঁড়ি দিয়ে নয়, অন্য কোনও পথে। এখনই!

আমার লক্ষ্য ছিল ব্যাগটা রেখে, স্রেফ জরুরি কয়েকটা জিনিস নিজের সঙ্গে নিয়ে পালানো। লাইটের সুইচ টিপলেও আলো জ্বলল না। বুঝতে পারলাম, আমাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কী করব ভাবছিলাম, কিন্তু তখনই নীচের তলায় বেশ কয়েকটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেগুলোর ওঠানামা থেকে গলার আওয়াজ বলেই মনে হয়। তবে মানুষের

গলায় ওইরকম আওয়াজ...? বেশি ভাবার সময় ছিল না আমার কাছে। ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে নিজের পকেটে জরুরি কিছু জিনিস ভরে নিলাম।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, সরকারি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও হোটেলে কোনও ফায়ার-এসকেপ নেই। লাফালে তিনতলা নীচের উঠোনে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, আমার থেকে দুটো ঘর পরে একটা জানলা দিয়ে লাফালে পাশের একটা বাড়ির নিচু আর ঢালু ছাদের নাগাল পাওয়া যাবে।

কিন্তু ওই ঘর অবধি যাব কীভাবে? করিডরে বেরোনো যাবে না, কারণ তাহলেই নীচে আমার শত্রুরা আওয়াজ পেয়ে যাবে। একমাত্র উপায় হল ঘরের মাঝের দরজাগুলো। সেগুলো যদি এমনি বন্ধ করা থাকে, তাহলে ধাক্কা দিয়ে ভাঙা যাবে, কারণ হোটেলটার সব কিছুই জরাজীর্ণ। কিন্তু আমার মতো করে সেগুলোতেও যদি কেউ পাল্লা লাগিয়ে থাকে? ওসব ভেবে লাভ নেই। আর এই কাজ নিঃশব্দে করাও যাবে না। তাই আমাকে গতির ওপর নির্ভর করতে হবে, যাতে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক ঠিক দরজাটা খোলার আগেই আমি গিলম্যান হাউস থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।

আমি জানতাম, আমার পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া, মোটামুটি অক্ষত দেহে পাশের বাড়ির ছাদে পৌঁছোতে পারলেও নীচে নামা কঠিন। নেহাত, পাশের বাড়িগুলো একেবারে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। গোটা এলাকাতেই খুব বেশি জনপ্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছিল না। তাই যা-থাকে-কপালে ভেবে আমি তৈরি হলাম। অন্ধের যষ্টির মতো ম্যাপটা দেখে ঠিক করলাম, শহর ছেড়ে বেরোনোর সেরা রাস্তা দক্ষিণদিকে যাওয়া। পথে কী কী বিপদ আসবে, সেই নিয়ে ভাবিনি, কারণ ভেবে কোনও লাভ হত না।

আমি আওয়াজ না করে একটা আলমারি নিজের দরজাটার সামনে আনলাম, যাতে ওটা ভাঙতে একটু বেশি কষ্ট হয়। দক্ষিণমুখো যে ঘরটা আমার লাগোয়া, সেটার দরজা পরীক্ষা করে বুঝলাম, ওটা আমার দিকেই খোলে। ওটা ভেঙে পাশের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, বরং ওটার সামনে আমার খাটটা যথাসম্ভব নিঃশব্দে এনে রাখলাম। উত্তরদিকের ঘরের দরজাটা ওই ঘরের দিকে খোলে। চাপ দিয়ে বুঝলাম, ওটা পাল্লা দিয়ে আটকানো আছে। কিন্তু তবু এটা আমার কাছে স্পষ্ট হল, আমাকে ওখান দিয়েই বেরোতে হবে। প্রথমে পাশের ঘর, সেখান থেকে তার পাশের ঘর, সেখান থেকে পাশের বাড়ির ছাদ, সেখান থেকে পেইন স্ট্রিট, আর সেখান থেকে ওয়াশিংটন স্ট্রিট। দমকলের

দফতরটা সারারাত খোলা থাকতে পারে, তাই সেটাকে পাশ কাটাতে হবে। নইলে আমাকে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

চাঁদ উঠছিল। সেই আলোয় বাইরে নিচু আর নোংরা ছাদের সমুদ্রও ঝকমকিয়ে উঠছিল। তার ওপাশে মানুস্ক্রেটের খাত, পরিত্যক্ত কারখানা, ভাঙাচোরা রেল স্টেশন, জং-ধরা আর আগাছায় ঢাকা রেললাইন, ঝোপঝাড়ে ভরা জমি শেষ হয়ে শুরু হওয়া জলা—এগুলো ওই সাদা আলোয় কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। আর্কহ্যামের দিকে যাওয়ার কোনও রাস্তাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে উত্তরে ইপ্সউইচের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তায় পড়ে গেলাম।



চিত্র ১০.৫ : ওই সাদা আলোয় কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল

তাহলে কি উত্তরদিকে যাওয়াই ঠিক হবে? এর বেশি কিছু ভাবার সুযোগ পেলাম না, কারণ তখনই আমার কানে এল একটা অন্যরকম শব্দ। একটা ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম, যা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তার পেছনে একটা গুঞ্জনও উঠছে, যেন বেশ কিছু লোক

উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে কাউকে। কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘরের দরজায় একটা জোরালো নক করল কেউ।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি একদম অনড় হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই একটা তীব্র আঁশটে গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠল। ওতেই আমার মাথা আবার কাজ করতে শুরু করল। দরজায় আওয়াজটা জোরালো হল। বুঝতে পারলাম, ভাবাভাবি পরে হবে, এবার চাই অ্যাকশন! উত্তরদিকের দরজার পাল্লা সরিয়ে নিজের পুরো জোর দিয়ে দরজাটা ভাঙতে চেষ্টা করলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, দারুণ জোরে দরজাটা যে পেটাচ্ছে, তার আওয়াজেই আমার দরজা ভাঙার শব্দ ঢাকা পড়বে।

সর্বাঙ্গে কালশিটে পড়ে গেলেও আমি ধাক্কা মারা ছাড়িনি। তারই পুরস্কার হিসেবে সশব্দে দরজাটা ভেঙে পড়ল ওপাশে। মুশকিল হল, আওয়াজটা এতই জোরালো ছিল যে, আমার শত্রুরা চট করে বুঝে ফেলল, কী ঘটছে। আমার ঘরের দরজায় এবার প্রায় দুরমুশ শুরু হল। তার পাশাপাশিই আমি চাবি ঘোরানোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আগে আমার দক্ষিণের ঘরটাতেই ঢুকল একটা দল। তারপর সেদিকের দরজাটায় শুরু হল খোলা বা ভাঙার চেষ্টা।

প্রায় লাফিয়ে আমি যে ঘরে ঢুকেছিলাম, সেটার পাল্লাটা আটকালাম। মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম দুটো দরজাকেই আলমারি আর খাট দিয়ে আরও দুর্ভেদ্য করে রেখেছি বলে। কিন্তু তখনই দারুণ হতাশায় আমার মনটা প্রায় ভেঙে গেল।

এই হোটেলে আমার অন্তিম গন্তব্য যে ঘরটা, সেটার দরজায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ পেলাম আমি!



চিত্র ১০.৬ : গিলম্যান হাউস থেকে পালানো

তখনও আমি ওই ঘরে যাওয়ার দরজাটা খুলতে পারিনি। যদি পাল্লা না-ও দেওয়া থাকে, তা-ও ওটা ভাঙতে আমার কিছুটা সময় লাগবেই। কিন্তু তার মধ্যে তো ওই ঘরে ঢুকে পড়বে আমার শত্রুরা! যে ঘরে এখন আমি আছি, সেটাতে তো জানলাও নেই। তাহলে? একরকম গা-ছাড়া ভঙ্গিতেই আমি পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা আলগাভাবে ঠেললাম।

দরজাটা খুলে গেল!

আমি কিচ্ছু ভাবিনি। যখন আমি ওই ঘরে ঢুকেছি, তখন করিডরের দিকের দরজাটা খুলে যাচ্ছে। তবে যে ওটা খুলছিল, সে বোধহয় ভাবতে পারিনি, আমি ইতিমধ্যেই ওখানে এসে যাব। তাই আমি যখন দরজাটার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে ঠেলে বন্ধ করলাম, তখন সে বাধা দিতে পারেনি। দরজা বন্ধ করে, পাল্লাটা টেনে দিলাম। তারপর খাট আর আলমারি টেনে ঘরের দুটো দরজাকেই দুর্ভেদ্য করলাম। দুটো দরজার ওপরেই হামলা শুরু হয়েছিল। তবে আমি জানতাম, স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে আমি পেইন স্ট্রিটে পৌঁছোতে পারব। পাশের বাড়ির ছাদটা এমনই ঢালু যে, ওতে লাফালে পা

পিছলে যেতে পারে। একটু ভেবে আমি একটা জানলা বাছলাম, যেখান থেকে লাফিয়ে ছাদে পড়ে একটু গেলেই একটা ভাঙা স্কাইলাইট পাওয়া যাবে। ওটা দিয়ে আমার পক্ষে নীচে, রাস্তায় পৌঁছোনো সম্ভব হবে।

ঘরটা ভালোভাবে দেখে বুঝলাম, আমার ভাগ্য সত্যিই ভালো। জানলার ওপরে ভারী পর্দা আর পর্দা ঝোলানোর স্ট্যান্ড আছে। জানলাটাকে বাইরে খুলে রাখার জন্য ছিটকিনির মতো আংটাও আছে বাইরের দেওয়ালে। ততক্ষণে ঘরের দরজার কাঠ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু খাট আর আলমারি আমার শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই অবস্থাতেও মাথা ঠান্ডা রেখে আমি পর্দা সমেত স্ট্যান্ড টেনে নামালাম। সেটাকে বাইরের আংটায় গুঁজে আমি নীচে নামার মতো একটা দড়ির সিঁড়ি টাইপের জিনিস বানালাম। তারপর ওটা ধরে নীচে ঝুলে, পাকাপাকিভাবে ছাড়লাম আমি।

খাড়া ছাদে লাফিয়ে নামলেও ভারসাম্য রাখতে পেরেছিলাম। দেখলাম, ঘরের জানলা অবধি তখনও পৌঁছোতে পারেনি কেউ। তবে দূরে অর্ডার অব ডেগন আর অন্য চার্চগুলোয় আলো জ্বলছে। স্কাইলাইট থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে ধুলো আর ইট-পাটকেল, ভাঙা পিপে— এসবের স্তূপের মধ্যে পড়লাম, তবে তাতে আমার হাত-পা ভাঙেনি। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ঘড়ি দেখে বুঝলাম, রাত দুটো বাজে। পেইন স্ট্রিটের দিকের দরজাটা খুঁজে পেলেও আমি ওদিকে গেলাম না। বরং উলটোদিকের অন্ধকার চাতাল দিয়ে ওয়াশিংটন স্ট্রিটে যাওয়াটাই আমার কাছে বেশি নিরাপদ মনে হল।

চাতালে চাঁদের আলো তখনও পৌঁছোয়নি। তবে অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছিল। ওয়াশিংটন স্ট্রিটের দিকে পরপর বেশ কয়েকটা দরজা আধভাঙা বা খোলা ছিল। আমি তাদের একটা দিয়ে ঢুকে দেখলাম, একটা অন্ধকার হলঘরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু রাস্তার দিকের দরজাটা দেখলাম, একেবারে তক্তা আর পেরেক দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশের দরজাটা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করতে যাব বলে আবার চাতালের দিকে আসছিলাম। কিন্তু বেরোনোর মুখেই থেমে গেলাম।

গিলম্যান হাউস থেকে ওখানে বেরিয়ে এসেছে একটা বেশ বড়সড়ো দল। চাঁদের আলো না এলেও সেই দলের লোকেদের চেহারা বোঝা যাচ্ছে। তবে তার চেয়েও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে আলখাল্লা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা, অদ্ভুত গড়নের শিরস্ত্রাণ পরে থাকা একজনের চেহারা!

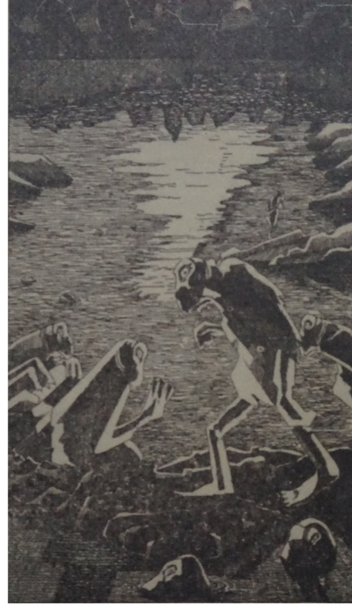
প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হল, আমি কোথায় আছি, সেই সম্বন্ধে ওদের কোনও ধারণা নেই। তবে চাতালে বেরোনো যাবে না আর। কিন্তু এই অন্ধকার হলঘরেও কি আমি নিরাপদ? ওই প্রাণীটির শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা আঁশটে গন্ধের ঢেউ আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। ওখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। হঠাৎ খেয়াল হল, একটা জানলায় লাগানো বোর্ডের নীচটা ফাঁক হয়ে আছে। ঝটপট ওখানে গিয়ে আমি কাজে লেগে পড়লাম। গোটা দুই পেরেক খুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। আমার চেষ্টায় আরও একটা খুলে গেল। নিঃশব্দে তক্তাটা সরিয়ে আমি জনমানবহীন ওয়াশিংটন স্ট্রিটে বেরিয়ে এলাম। তারপর তক্তাটা সযত্নে, বরং আগের চেয়ে একটু ভালোভাবেই জায়গামতো ফিট করে, আমি দক্ষিণদিকে এগোলাম। ততক্ষণে দূরে দূরে আমি গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমাকে খুঁজে বের করার জন্য অনেকগুলো দলকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিছু আওয়াজ শহরের দক্ষিণ থেকেও আসছিল, তবে আমি ওই নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমি জানতাম, এই শহরে এতই ফাঁকা আর ভাঙা বাড়ি আছে যে, আমি ওদের নজর এড়িয়ে যেতে পারব। রাস্তায় আলো জ্বলছিল না। এটা অন্য সময় হলে বাজে লাগত, তবে তখন অন্ধকার আমার কাছে খুব জরুরি ছিল।

ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটছিলাম। আমার চেহারা উশকোখুশকো হলেও এমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তবে আমি ঝুঁকি নিতে চাইছিলাম না। বেটস স্ট্রিটের কাছে দু-জনকে আসতে দেখলাম, যাদের হাঁটাটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ পাশের একটা ভাঙা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু এরপরেই এল একটা চওড়া জায়গা, যেখানে ইলিয়ট স্ট্রিট আর ওয়াশিংটন স্ট্রিট কাটাকুটি খেলেছে। নকশা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা, কারণ এখানে চাঁদের আলো পড়বে একেবারে সোজাসুজি। কাছেপিঠে কোনও বাড়িঘর না-থাকায় আমার পক্ষে লুকোনোও সম্ভব ছিল না। আবার জায়গাটা এড়িয়ে যেতে গেলেও এত ঘুরতে হবে, যার অন্য বিপদ আছে। তাই আমি স্থানীয় মানুষদের হাঁটার ভঙ্গি অনুকরণ করে, যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে জায়গাটা দিয়ে হাঁটলাম।

ঠিক কীভাবে এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শহরে এত রাতেও আলোড়ন চলছে, বুঝতে পারছিলাম না। যদি আমাকে খুঁজে বের করাই এসবের লক্ষ্য হত, তাহলে অন্যরকম হত ব্যাপারটা। তবে আমি শহরটা ছেড়ে বেরোতে চাইছিলাম শুধু। আমি জানতাম, ধুলোয় আমার পায়ের দাগ থেকে সহজেই বোঝা যাবে, কীভাবে আমি গিলম্যান হাউসের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তাই আমার পেছনে একটা বড় দলের লেগে পড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

আমি বিনা ঝামেলায় জায়গাটা পার হচ্ছিলাম। ওখানে একটা পার্ক আছে, যেটা দিনের বেলায় সেভাবে খেয়াল করিনি। কিন্তু চাঁদের আলোয় ওই নিষ্প্রাণ সবুজটুকুও অন্যরকম হয়ে উঠেছিল। ওখান থেকে একদিকে টাউন স্কোয়্যার। শুনতে পাচ্ছিলাম, সেদিক থেকে একটা জোরালো গুঞ্জন উঠছে। ভাবছিলাম, ওদিক থেকে কেউ যদি এইদিকে তাকাইয়, তাহলে ধু-ধু ফাঁকা রাস্তায় আমাকে একেবারে স্পষ্ট দেখা যাবে। সন্দেহ হতেই পারে কারও, তখন...

কিন্তু এই দুশ্চিন্তার পৃথিবী থেকে দু-দণ্ডের জন্য আমাকে সরিয়ে নিল সমুদ্র। চাঁদের আলোয় তার সফেন সৌন্দর্য দেখে আমি সব ভুলে গেলাম। অলসভাবে ওখানে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম, জানি না। তবে আমার খোয়াব চুরমার হল অন্য একটা জিনিসে।



চিত্র ১০.৭ : রিফ আর সমুদ্রতটের মাঝের জল ফাঁকা নয়! সেখানে জেগে উঠেছে অজস্র মাথা।

দূরে ডেভিল'স রিফ-এর কালো রেখার ওপর কয়েকটা আলোর ঝলক দেখলাম।

বিদ্যুৎচমকের মতো আমার খেয়াল হল, কী ভয়ানক বিপদের মাঝে রয়েছি আমি। আপনা থেকেই আমার নজর ঘুরে গেল স্কোয়্যার-লাগোয়া গিলম্যান হাউসের দিকে।

গিলম্যান হাউসের ছাদ থেকেও ভেসে এল আলোর বেশ কয়েকটা ঝলক! আমার জ্ঞানগম্যি খুব একটা বেশি নয়। তবে এটা যে সিগনাল বিনিময় হল, সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল। কীসের সিগনাল, সেই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমার তখন কাজ ছিল নিজেকে সামলানো। আমার শরীর, মন, প্রবৃত্তি প্রবলভাবে বলছিল, "পালাও! পালাও!" কিন্তু আমি জানতাম, দৌড়োতে গেলেই আমি ধরা পড়ে যাব শত্রুদের হাতে। সেই ঘষটে ঘষটে হাঁটা আর ছোটার মাঝামাঝি ভঙ্গিতে এগোনোর অবস্থা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে তার মধ্যেও আমাকে ডেভিল'স রিফ-এর দিকে নজর রাখতে হচ্ছিল। মন বলছিল, নরকের ওই দরজা দিয়ে আজ রাতে বিশেষ কেউ উঠে আসতে পারে, হয়তো আমার খোঁজে!

লনের মতো ঘেরা জায়গাটা পার হয়ে আমি স্বাভাবিকভাবেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস দেখতে পেলাম।

রিফ আর সমুদ্রতটের মাঝের জল ফাঁকা নয়! সেখানে জেগে উঠেছে অজস্র মাথা। কিন্তু তাদের গড়ন, আর যে ভঙ্গিতে তারা সাঁতরে আসছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তারা মানুষ নয়।

আমি পাগলের মতো দৌড়োলাম। একটা ব্লক পেরিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার সন্ধানে একাধিক দল বেরিয়ে পড়েছে। ফেডারেল স্ট্রিট ধরে দক্ষিণে এগোলাম যত দ্রুত সম্ভব। আওয়াজ পেতেই একটা ভাঙা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। বাইরে থেকে আসা আওয়াজ, হইচই, কয়েকটা গাড়ির এদিক-ওদিক যাওয়ার গর্জন— এগুলো থেকে বুঝতে পারছিলাম, ইন্সমাউথ থেকে বেরোনোর সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে!

দারুণ হতাশায় আমার শরীর-মন নুয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল, তাহলে কি এখানেই, এভাবেই আমি শেষ হব? ইন্সমাউথের এই ভাঙা বাড়িটাই কি তাহলে আমার জীবনের শেষ স্টেশন?

স্টেশন!

অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ ঝলসালে যেমন সব কিছু সাদা আর স্পষ্ট হয়, ঠিক সেভাবেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল রোলির দিকের ব্রাঞ্চ রেললাইন! পাথর, ঘাস, আগাছা আর কাঁটালতায় ভরা ওই লাইনটা দিয়ে শহর ছেড়ে পালানোর কথা কেউ ভাববে না। তাই হয়তো ওই রাস্তাটা বরাবর পাহারা থাকবে না। হোটেলের জানলা দিয়ে যা দেখেছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে রোলি যাওয়ার রাস্তা, বা গিলম্যান হাউসের মতো উঁচু বাড়ি থেকে রেললাইনটা অনেক দূর অবধি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু আমি যদি লাইনের পাশের ঝোপঝাড় দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোই তাহলে হয়তো...!

সাবধানে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে নকশাটা দেখলাম। বুঝতে পারলাম, ব্যাবসন স্ট্রিট ধরে সোজা গিয়ে, তারপর লাফায়েত স্ট্রিট ধরে এগোতে হবে আমাকে। তারপর বেটস, অ্যাডামস, এবং অবশেষে ব্যাংক স্ট্রিট ধরে এগোলে আমি নদীখাত একপাশে রেখে পরিত্যক্ত স্টেশনটায় পৌঁছোব। এভাবে গেলে আমি ওই খোলা জায়গাটা আর সাউথ স্ট্রিটের বিশাল চওড়া এলাকাটা এড়িয়ে যেতে পারব। বেরিয়ে পড়লাম তারপরেই।

ফেডারেল স্ট্রিট থেকে আওয়াজ আসছিল। রাস্তার মোড় ঘুরতে গিয়ে বুঝলাম, যে বাড়িটায় আমি সাময়িক আশ্রয় পেয়েছিলাম, সেটার কাছেই আলো নিয়ে একটা দল ঘোরাঘুরি করছে। ব্যাবসন স্ট্রিটের কোণে একটা বাড়ির জানলায় পর্দা দেখে বুঝলাম, সেখানে লোকজন থাকে। তবে বাড়িটা অন্ধকার ছিল, আমিও নির্বিঘ্নেই জায়গাটা পেরিয়ে এলাম। ভাঙা বাড়িগুলোর ছায়ায় নিজেকে মিশিয়ে এগোনোর সময় বেশ কয়েকটা দলকে দেখলাম ইলিয়ট স্ট্রিট হয়ে ইপ্সউইচের দিকে যাওয়ার রাস্তায় উঠতে। একটা দল কাছে আসামাত্র আঁশটে গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। সেই দলে দু-জনের সর্বাঙ্গ আলখাল্লায় ঢাকা ছিল। একজনের মাথায় একটা উঁচু গয়না বা মুকুট চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিল। তবে আমার আতঙ্কের মাত্রাটা বেড়ে গিয়েছিল একটাই কারণে। মনে হচ্ছিল, আলখাল্লার আড়ালে ওই প্রাণী দুটি হাঁটছিল না, থপথপিয়ে লাফাচ্ছিল!

আশপাশটা আবার ফাঁকা হয়ে গেলে আমি লাফায়েত স্ট্রিট, আর তারপর ইলিয়ট স্ট্রিট প্রায় দৌড়েই পেরোলাম। সাউথ স্ট্রিট এড়ানো অসম্ভব বুঝে আমি চেষ্টা করলাম আগের মতোই ঘষটে ঘষটে জায়গাটা পেরোতে। আমার কপাল খুবই ভালো ছিল বলে টাউন স্কোয়্যারের দিক থেকে কোনও দল সেই মুহূর্তে ওখানে আসেনি, নইলে...! জায়গাটা নিরাপদে পেরিয়ে আমি আবার জলের ধারে এসে পড়লাম। আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি অন্যদিকে নজর সরাতে পারলাম না। সমুদ্র আমার নজর টেনে নিল।

না, সমুদ্রে কোনও জাহাজ ছিল না। তবে একটা দাঁড়-টানা নৌকোকে আমি দেখলাম পরিত্যক্ত জেটিগুলোর দিকে যেতে। মনে হল, নৌকোয় কেউ, বা কিছু একটা জিনিস ঢাকা দিয়ে রাখা রয়েছে। যারা দাঁড় টানছিল, তাদের চেহারায় একটা বীভৎসতা ছিল। নৌকোর আশপাশে বেশ কিছু সাঁতারুকেও দেখলাম। দূরে ডেভিল'স রিফ-এ তখন একটা মৃদু, কিন্তু স্থির আলো জ্বলেছিল। আলোটার রং আমার কাছে অজানা[172]। উলটোদিকে গিলম্যান হাউসও তখন একদম অন্ধকার।

রাস্তাটা পুরোপুরি পার হওয়ার আগেই জোরালো গুঞ্জন শুনলাম। দেখলাম, উত্তরদিক থেকে ওয়াশিংটন স্ট্রিট ধরে একটা বড় দল এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলো খুব স্পষ্ট ছিল বলেই লোকগুলোর চেহারার বিকৃতি আমার নজর এড়াল না। শুধু মুখের গড়ন নয়, কয়েকজনের শরীর দেখে মনে হচ্ছিল, তাতে বাঁদর আর ব্যাং, দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে! ওই দলেই আমি আলখাল্লা-পরা, মাথায় টায়রা-চড়ানো একজনকেও দেখলাম। মনে হল, এই

দলটাই গিলম্যান হাউসে আমার সন্ধানে হানা দিয়েছিল। ঠিক তখনই ওদের একজন আমার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য আমি ওখানেই থমকে গিয়েছিলাম। তবে মাথা ওই অবস্থাতেও কাজ করছিল। যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে, একজন স্থানীয় লোকের মতো করেই আমি হেঁটে জায়গাটা পেরোলাম। আমার নকলনবিশি নির্ঘাত জবরদস্ত ছিল, কারণ দলটা আমাকে উপেক্ষা করে, নিজেদের মধ্যে কোনও বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেল।

অন্ধকারে আমি আবার ছোটা আর হাঁটার মাঝামাঝি গতিতে এগোতে থাকলাম। বেটস স্ট্রিটে দুটো বাড়ি দেখে বুঝলাম, তাতে লোক থাকে। তবে আমার নিঃশব্দ পদসঞ্চার কারও ঘুম ভাঙায়নি। অ্যাডামস স্ট্রিটে পৌঁছে আমি নিজেকে একটু নিরাপদ মনে করছিলাম। কিন্তু তখনই একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল। একটা অন্ধকার দরজা থেকে একজন বেরিয়ে একেবারে আমার সামনেই পড়েছিল। আবার ভাগ্য প্রসন্ন হল। লোকটা মদের নেশায় এমনই টলমল অবস্থায় ছিল যে, ও আমার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই আমি ব্যাংক স্ট্রিটের ভাঙা গুদামগুলোর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

নদীখাতের পাশের রাস্তাটা তখন একেবারে শুনশান। জলের গর্জনে আমার পায়ের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। গুদামগুলোর অন্ধকারে কী থাকতে পারে ভাবলে হাত-পা অচল হয়ে যেতে পারে ভেবে আমি মাথাটা ফাঁকা রাখার চেষ্টা করছিলাম। স্টেশনটার আলোছায়া ধ্বংসস্তূপে আমি দাঁড়ালাম না, সোজা রেললাইন ধরে এগোতে শুরু করলাম। জং-ধরা লাইনগুলো ঠিক থাকলেও তাদের মাঝের পাটাতন আর জয়েন্টগুলো খুলে এসেছিল। ওইরকম লাইন ধরে হাঁটা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু ওসব ভাবার অবস্থা ছিল না। নিচু হয়ে, নদীখাত একপাশে রেখে আমি রেললাইনের ওপর হাঁটতে হাঁটতে ঢাকা ব্রিজটার কাছে পৌঁছোলাম। যদি রেল ব্রিজটা আমার শরীরের ভার নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে, তাহলে আমি ওটা পেরিয়ে ওদিকে যাব। নইলে আমাকে একটা রাস্তা খুঁজতেই হবে ওদিকে যাওয়ার।

চাঁদের আলোয় যত দূর বুঝলাম, তাতে সামনের দিকে কয়েকটা জয়েন্ট আমার ভার নেওয়ার অবস্থায় ছিল। কিছুটা এগিয়ে আমাকে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতেই হল। তাতে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বাদুড়দের একটি বিরাট দল বিরক্ত

হয়ে ব্রিজের ছাদ থেকে নেমে আসে। তাতে চমকে গিয়ে আমি আর-একটু হলেই ব্রিজ থেকে নীচে পড়ছিলাম। শেষ অবধি আমার কিছু হয়নি। সাবধানে জয়েন্টে পা রেখে, কয়েক জায়গায় লাফিয়ে ভাঙা অংশ পেরিয়ে আমি যখন ওপাশে পৌঁছে চাঁদের আলোয় দাঁড়ালাম, তখন এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে নিরাপদ মনে হল।

রিভার স্ট্রিটের একধার দিয়ে গিয়েছিল রেললাইন। কিছুটা এগিয়েই আমি বুঝলাম, ইন্সমাউথের ওই ভয়ানক আঁশটে গন্ধের এলাকা ছাড়িয়ে আমি সত্যিকারের গ্রামীণ এলাকায় ঢুকছি। কাঁটা আর ঝোপঝাড়ে আমার পোশাক ছিঁড়ে যাচ্ছিল ঠিকই। তবে আমি জানতাম, রোলি রোড থেকে তাকালেই আমাকে দেখা যাবে, যদি না এই ঝোপঝাড় আমাকে লুকিয়ে রাখে। একটু পরেই জলাজমি শুরু হল। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় রেললাইনটা নিচু একটা খাতের মধ্য দিয়ে গেছে। জায়গাটা কাঁটাগাছ আর বুনো লতায় ভরতি। আমি আবার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম, কারণ রোলি রোড ওই জায়গাটার একেবারে লাগোয়া। নিচু খাতের মধ্য দিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলে রোলি রোড, এবং নজরদারদের থেকে দূরে চলে যেতে পারব আমি।

জায়গাটাতে ঢোকার আগে আমি পেছনে তাকালাম। না, কেউ আমাকে অনুসরণ করছিল না। এক মুহূর্তের জন্য ইন্সমাউথের ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর দিকে আমার চোখ গেল। মনে হল, এখন অভিশপ্ত হলেও একসময় শহরটা সত্যিই সুন্দর ছিল। চোখটা নামাতে গিয়েই অত্যন্ত অসুন্দর কিছুতে আমার চোখ আটকে গেল।

দক্ষিণে আমি একটা নড়াচড়া দেখলাম। অতটা দূর থেকে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, এর একটাই অর্থ হয়। একটা বিশাল বড় দল আমার পিছু নিয়েছে! সেনাবাহিনীর কোনও ইউনিট নয়, বরং জন্তুদের একটা বিরাট দলের কথাই মনে হল তাদের উঠে-নেমে এগোনো দেখে আর গর্জন, ঘোঁত ঘোঁত— এসব শুনে। তাহলে কি ইন্সমাউথের সেইসব প্রাচীন বাসিন্দা, যাদের লুকিয়ে রাখা হয় লোকের নজর থেকে, তারাই আমার পিছু নিয়েছে? কিন্তু এরা সব কি তাহলে মাটির নীচে, সুড়ঙ্গে, গর্তে... বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ছিল? নাকি ডেভিল'স রিফ থেকে হানা দিয়েছে এই বিরাট বাহিনী? কী চায় ওরা?

সবচেয়ে বড় কথা, তাহলে কি অন্য রাস্তাগুলোতেও নজরদারি শুরু হবে?

আমি ওই নিচু জায়গা দিয়ে নিঃশব্দে, সন্তর্পণে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ আঁশটে গন্ধের একটা ঢেউ আমার নাকে এসে লাগল। তাহলে কি হাওয়ার দিক বদলাল? নিশ্চয় তা-ই,

কারণ গন্ধই শুধু নয়, ততক্ষণে শব্দরাও আমার কানে এসে পৌঁছোচ্ছে! বুঝতে পারলাম, রোলি রোড ধরে একটা দল এগোচ্ছে। যেহেতু ওই জায়গাটায় রোলি রোড রেললাইনটাকে প্রায় ছুঁয়ে তারপর আবার পশ্চিমে গেছে, তাই দলটা আমার সামনে দিয়েই যাবে! ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজের পাশাপাশি একটা অন্যরকম শব্দও আমার কানে আসছিল, যেন কোনও একটা প্রাণী থপথপ করে এগোচ্ছে। মনে হল, দূরে আমি যে বিরাট বাহিনীর অস্তিত্ব টের পেয়েছি, তাতেও যেন এমনই কেউ... বা কিছু আছে। কিন্তু নিচু ঝোপ আর বালিতে নিজেকে প্রায় গুঁজে দিয়ে সেই মুহূর্তে আমি শুধু একটাই কথা ভাবছিলাম।

ভাগ্যিস জন্তুজানোয়ার ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের পছন্দ করে না। নইলে, যদি একটা কুকুর ওই দলে থাকত, তাহলে এতক্ষণে আমার খেল খতম হয়ে যেত! অবশ্য এই সাংঘাতিক গন্ধের মধ্যে কুকুরদের নাকও কাজ করত কি?

দলটা আমার সামনে একটা খোলা জায়গা দিয়েই পার হল। চাঁদের আলোয় লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার গা ঘিনঘিন করছিল। এই যদি ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের অন্তিম চেহারা হয়, আর এই চেহারায় যদি এরা অমরত্বও পায়, কী অর্থ সেই জীবনের? ওদের শরীর থেকে বেরোনো গন্ধে আমার দম আটকে আসছিল। কণ্ঠস্বর নয়, বরং গলা আর নাক দিয়ে বের-করা নানা রকমের গর্জন আর ঘোঁত ঘোঁত দিয়ে ওরা ভাববিনিময় করছিল। মানুষের বদলে ওবেদ মার্শের দ্বারা আহূত 'দেবতা'দের কাছাকাছি পৌঁছে-যাওয়া এই প্রাণীদের এত কাছ থেকে দেখাটাও একটা অভিশাপ। আমার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তাই নিজের মাথা নিচু রেখেছিলাম। ভাগ্যিস! নইলে এরপর ওখান দিয়ে যে গেল, তাকে দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারতাম না।



চিত্র ১০.৮ : তারা হাঁটছিল না, বরং লাফিয়ে বা পিছলে এগোচ্ছিল

আমি কি ভুল দেখেছিলাম? হতেই পারে। ইন্সমাউথে গোটা একটা দিন কাটিয়ে, জাডক অ্যালেনের ওইসব আখ্যান শুনে, তারপর অজ্ঞাত শত্রুদের হাত থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে গিয়ে আমার স্নায়ুতে যে কতটা চাপ পড়েছিল, তা আমিই জানি। কিন্তু পরে যখন সরকার ওখানে তদন্ত চালিয়েছিল, তখন জানা গিয়েছিল, আমি ভুল দেখিনি।

কী দেখেছিলাম আমি?

আমি একঝাঁক অদ্ভুত প্রাণীকে সারিবদ্ধভাবে এগোতে দেখেছিলাম। তাদের মাথায় আর গলায় ছিল বিচিত্র গড়নের গয়না বা শিরস্ত্রাণ। কিন্তু তারা হাঁটছিল না, বরং লাফিয়ে বা পিছলে এগোচ্ছিল। মানুষের মতো দ্বিপদ চেহারা ছিল ওই প্রাণীদের। কিন্তু তাদের চকচকে, সবজেটে শরীর, পিঠে খাঁজকাটা ভাব, মুখের দু-পাশের ফোলা কানকো আর সাদা পেট... এগুলো মাছ, ব্যাং, সরীসৃপ— এই তিন ধরনের প্রাণীকেই মনে করায়।

সৃষ্টির কোন পর্যায়ে তৈরি হয়েছিল এই প্রাণীরা? তখন পৃথিবী কি নরক ছিল, না স্বর্গ? জানি না, তবে ওই প্রাণীদের আমি চিনতে পারলাম। নিউবারিপোর্টের মিউজিয়ামে সেই

টায়রাটার গায়ে এদের ছবিই তো নকশা করে আঁকা ছিল।

সংখ্যায় ওরা কত ছিল? অগুনতি! আমি যাদের দেখেছিলাম, সেই বিরাট সংখ্যাও নিশ্চয় ওদের মোট সংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবে আমি আর ওইসব ভাবতে পারিনি। ইন্সমাউথে আসার পর অনেক কিছু দেখেও আমি অনড় ছিলাম। কিন্তু সেই সময় আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

(৫)

বৃষ্টির ছাট যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন দিনের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। নিচু খাত থেকে সাবধানে বেরিয়ে আমি চারপাশে দেখলাম। না, কোনও সাম্প্রতিক পায়ের ছাপ বা দাগ দেখিনি। দূরে তাকিয়ে ইন্সমাউথের জনহীন পরিত্যক্ত বাড়িঘর দেখতে পেলাম, তবে একটাও শব্দ শুনতে পেলাম না। এমনকী আঁশটে গন্ধটাও মনে হল যেন কম লাগছে। ঘড়ি দেখে বুঝলাম, বেলা দুটো বাজে।

খিদেয়, তেষ্টায়, ক্লান্তিতে শরীর ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু ইন্সমাউথ থেকে যথাসম্ভব দূরে যাওয়ার ইচ্ছেটা এতই জোরালো ছিল যে, আমি ওসব পাত্তা দিইনি। রোলি রোড ধরে টানা হেঁটে আমি সন্ধের মধ্যে একটা গ্রামে পৌঁছোই। সঙ্গে যা টাকাপয়সা ছিল তা-ই দিয়ে খাদ্য, পানীয় এবং নতুন এক সেট পোশাক জোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি। সেই রাতের ট্রেনেই আমি আর্কহ্যাম পৌঁছোই। প্রথমে সেখানে, তারপর বস্টনে, তারপর আরও বেশ কয়েক জায়গায় সরকারি দফতরগুলোতে গিয়ে আমি যা দেখেছি আর জেনেছি, তার বিবরণ দিই। তার ফলে কী হয়েছিল তা সবাই জানে। সেই কথাগুলো বলেই আমি এই লেখা শুরু করেছি।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে সবচেয়ে ভালো হত, তা-ই না? কিন্তু বাস্তব আমার-আপনার ইচ্ছেমতো চলে না।

ইন্সমাউথের অভিজ্ঞতার পর আমি আমার পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হই। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল... এসব নিয়ে আর মাথা ঘামানোর ইচ্ছে ছিল না আমার। মিসক্যাটনিক ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামে যেসব রহস্যময় গয়নাগাটি রাখা ছিল, সেগুলোকে তো আমি বিষবৎ এড়িয়ে যাই! তার বদলে, আর্কহ্যামে থাকাকালীন আমি একটু পড়াশোনা করে,

আর স্থানীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে নিজের পরিবারের পুরোনো ইতিহাস জানার চেষ্টা করি। ওখানকার হিস্টরিক্যাল সোসাইটির কিউরেটর ছিলেন মিস্টার ই. ল্যাপহ্যাম পিবডি। আমি ওঁকে জানাই, আমি আর্কহ্যামের এলিজা ওর্নের নাতি, যাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৭ সালে, এবং মাত্র সতেরো বছর বয়সে যাঁর সঙ্গে ওহায়োর জেমস উইলিয়ামসনের বিয়ে হয়েছিল। এই কথাটা শুনেই পিবডি দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

কথায় কথায় জানা গেল, আমার এক মামা নাকি এভাবেই পরিবারের ইতিহাস খুঁজতে আর্কহ্যামে এসেছিলেন। তিনিই খোঁজ নিয়ে জানেন যে, আমার দিদিমার বাবা বেঞ্জামিন অর্নে গৃহযুদ্ধের ঠিক পরেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বধূটির বংশপরিচয় খুঁজতে গিয়ে ব্যাপারটা জটিল হয়। কাগজে-কলমে মেয়েটি নিউ হ্যাম্পশায়ারের মার্শ পরিবারের এক অনাথ ছিল। পরিবারের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ ছিল না। বস্টনের এক ব্যাংকে তার নামে একটা মোটা টাকা কেউ গচ্ছিত রেখেছিল। তা-ই দিয়েই ফ্রান্সে তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এক ফরাসি গভর্নেস তার দেখাশোনা করতেন। নিউ হ্যাম্পশায়ার, এমনকী এসেক্স কাউন্টির মার্শদের মধ্যেও মেয়েটির বাবা এনখ বা মা লিডিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই আদালত একসময় সেই গভর্নেসকেই মেয়েটির অভিভাবক করে দিতে বাধ্য হয়। গভর্নেস মহিলা কারও কাছে পরিবারের ইতিহাস নিয়ে মুখ খোলেননি। তবে যাঁরা মেয়েটিকে দেখেছেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল, মেয়েটির চোখ দেখেই বোঝা যায় যে সে মার্শ পরিবারের একজন। আমার দিদিমার জন্ম দিতে গিয়েই মেয়েটি মারা যায়।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে 'মার্শ' নামটা আমার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। সেই পরিবারের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে জেনে আমি আর এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস পাইনি। তার ওপর পিবডি একেবারে জোর দিয়ে "আপনার চোখজোড়া দেখলেও কিন্তু মার্শদের কথা মনে হয়!" বলায় আমি আরও চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। শেষ অবধি অর্নে পরিবারের ঠিকুজিকুষ্ঠি নোট করেই আমি আর্কহ্যাম ছাড়ি।

বস্টন হয়ে টলেডো, তারপর মাউমি[173]— এই ছিল আমার পরবর্তী যাত্রাপথ। বিশ্রাম নিয়ে শরীর আর মন সারিয়ে নিই আমি। সেপ্টেম্বর থেকে জুন অবধি সময়টা কাটে পড়াশোনায়। এই সময়ের মধ্যে ইন্সমাউথ আমার মন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শুধু মাঝেমধ্যে যখন সরকারি লোকজন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে উদয় হত, তখনই ওই শহর, ওই সমুদ্র আর ওই বিভীষিকারা আমার কাছে ফিরে আসত। পরের জুলাইয়ে, মানে

আমার অ্যাডভেঞ্চারের বর্ষপূর্তির সময়ে আমাকে ক্লিভল্যান্ডে যেতে হয় আমার মা-র পরিবারের কিছু আইনি ব্যাপারের জন্য। তখন, নিতান্তই দায়ে ঠেকে, আমাকে উইলিয়ামসন পরিবারের ইতিহাস নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে হয়।

ওই পরিবারটা আমার কখনওই ঠিক সুবিধের লাগেনি। মা আমাকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করতেন। বিশেষত আমার দিদিমার চেহারায় এমন কিছু একটা ছিল, যেটা দেখলেই আমার খুব অস্বস্তি হত। আমার যখন আট বছর বয়স, তখন দিদিমা হারিয়ে যান। লোকে বলত, তাঁর বড় ছেলে ডগলাস, মানে আমার বড় মামা আত্মহত্যা করায় সেই শোকেই নাকি উনিও বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন। ডগলাসই ছিলেন আমার সেই মামা, যিনি নিউ ইংল্যান্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে বেশ কিছু দিন কিছু একটা বিষয় নিয়ে গবেষণার পর আত্মহত্যা করেন।

আমার মনে পড়ল, ওই মামাটিকেও আমি বিশেষ পছন্দ করতাম না। না, ওঁর স্বভাবটা খুব ভালো ছিল। কিন্তু ডগলাসকেও দেখতে ছিল আমার দিদিমার মতোই। ওঁদের দু-জনেরই একদৃষ্টিতে তাকানোর ধরনটা দেখলে আমার গা শিরশির করত। আমার মা আর ছোট মামা ওয়াল্টার কিন্তু তাঁদের বাবার মতো দেখতে ছিলেন। তবে ওয়াল্টারের ছেলে, আমার মামাতো ভাই লরেন্স আবার দিদিমার চেহারা পেয়েছিল। লরেন্স এখন বদ্ধ উন্মাদ। ওয়াল্টার মামার সঙ্গে আমার শেষ যা কথা হয়েছিল, তাতে জেনেছিলাম, লরেন্সের শরীরও নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে। কতটা খারাপ, সেটা উনি বলেননি, তবে ওকে নাকি আর লোকের সামনে আনা যায় না। এই শোকে ওয়াল্টারের স্ত্রী-ও বছর দুই আগে মারা গিয়েছিলেন। ফলে ক্লিভল্যান্ডের উইলিয়ামসন নিবাসের বর্তমান বাসিন্দা শুধু আমার বৃদ্ধ দাদু, আমার ছোট মামা, আর অনেক অনেক স্মৃতি।

পুরোনো কাগজ থেকে আমার যা জানার তা পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুরোনো বিবর্ণ ফোটোগুলোতে আমার দিদিমা আর মামাকে দেখে অন্য একটা চিন্তা আমার মাথায় চাপল। বহু বছর আগে যা শুধুই অস্বস্তি ছিল, এক বছর আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটা নিশ্চিত আতঙ্কের চেহারা নিল। অর্নে পরিবারের দলিলপত্র হাতড়ে বুঝলাম, আমার মনের মধ্যে আতঙ্কের মেঘটা এবার ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিচ্ছে। জানতাম, আমার বংশপরিচয়ের রহস্যটা উন্মোচিত হলে সেটা আমি হয়তো হজম করতে পারব না। তবু এই জিনিসের শেষ না দেখে আমি থামতে পারছিলাম না।

দাদু একসময় বলেছিলেন, বিয়ের সময় বেঞ্জামিন অর্নে যৌতুক হিসেবে যেসব গয়নাগাটি পেয়েছিলেন, সেগুলো নাকি পারিবারিক ভল্টে রাখা আছে। তাদের ডিজাইন নাকি এমনই কুৎসিত, যে ওগুলো লোকের সামনে বের করা যায় না। আগে এই কথাটাকে গুরুত্ব দিইনি, কারণ গয়নার ডিজাইন নিয়ে আমার কস্মিনকালেও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু এইবার আমি ছোট মামাকে একরকম চাপ দিয়ে অর্নে পরিবারের ভল্ট খোলাই।

কাপড়ের আস্তরণ সরিয়ে গয়নাগুলো বের করার সময় ওয়াল্টার গজগজ করছিলেন। মণিকার, এমনকী পুরাতত্ত্ববিদরাও নাকি গয়নাগুলোর উৎস নিয়ে কিছু বলতে পারেননি। এদিকে নতুন বউয়ের অভিভাবক, আদতে গভর্নেস এক ফরাসি মহিলা নাকি ওগুলোকে নিউ ইংল্যান্ড এলাকায় পরতে বারণই করেছিলেন! এইসব গয়না লোকে কেন বানায়, বোঝা দায়— এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। তবে আমার ওদিকে মন ছিল না। কাপড়ের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে আসা গয়নাগুলোর নকশা দেখতে দেখতে আমার মুখ বেঁকে যাচ্ছিল ভয়ে। সেটা দেখে ওয়াল্টার উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ওঁকে কাজটা চালিয়ে যেতে বলি। অবশেষে বেরিয়ে আসে একটা টায়রা। আর সেটার গায়ের নিপুণ, জটিল, উঁচু-হয়ে-থাকা নকশাগুলো দেখে আমার ঠিক সেই অবস্থাই হয়, যা হয়েছিল এক বছর আগে রোলি রোডের কাছে রেললাইনের খাতে শোয়া অবস্থায়।

আমি অজ্ঞান হয়ে যাই!

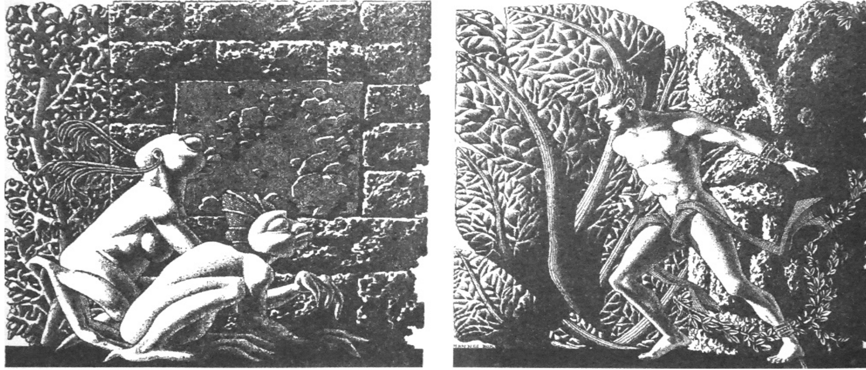
তারপর? তারপর আমার দিনরাত্রি মানে শুধু ভাবনা। সবসময় আমার মনে পড়ত জাডকের বলা একটা কথা। আর্কহ্যামের এক বাসিন্দাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, তাঁর সঙ্গে ওবেদ মার্শের এক মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল! সেই কথাটাকে কেন্দ্রে রেখে আমার মন একটা ভয়ানক জাল বোনে। তাতে সুতো হয় আমার দিদিমা, আমার মামা আর মামাতো ভাইয়ের পরিণতি, আর... অর্নে ভল্ট থেকে পাওয়া ওই যৌতুক!

তা-ও আমি এগুলোকে সমাপতন ভেবে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম প্রায় দু-বছর ধরে। ইতিমধ্যে বাবা আমাকে একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়ে কাজকর্মও করছিলাম। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালের শীত থেকে আমি বিশেষ একটা স্বপ্ন

দেখা শুরু করি। শুরুতে ওগুলো ছিল হালকা, অনেকটা ভোরের স্বপ্নের মতো। কিন্তু ক্রমে সেগুলো ঘন আর জটিল হতে থাকে।

কী দেখতাম আমি স্বপ্নে?

দেখতাম, জলের নীচে প্রকাণ্ড সব ধ্বংসস্তূপ আর শহর। সেই শহরের আনাচকানাচে বিচিত্র চেহারার মাছেদের সঙ্গে আমি সাঁতরে বেড়াচ্ছি। ক্রমে সেই স্বপ্নে অন্য চেহারাও দেখা দিতে শুরু করে। ঘুম ভাঙার পর সেই চেহারাগুলোর কথা ভেবে আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম। অথচ স্বপ্নে আমি ওদের ভয় পেতাম না। মনে হত, ওদের মতো বিচিত্র গয়না বা শিরস্ত্রাণ পরে অতল জলে ঘুরে বেড়ানোই আমার ভবিতব্য।



চিত্র ১০.৯ : স্বপ্নে দেখলাম জলের নীচে প্রাচীন দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে

আমার চেহারা খারাপ হতে শুরু করল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, চুম্বকের টানে লোহার মতো আমিও ওই স্বপ্নগুলোর টানে জাগর দুনিয়া ছেড়ে কল্পনার অতলে ডুবে যাচ্ছি। কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। ঘরবন্দি এক পঙ্গুর মতো জীবন শুরু হল আমার। তবে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতাম প্রায়ই। না, স্বেচ্ছায় নয়। আমার একটা অদ্ভুত রোগ হয়েছিল, যে জন্য আমি চোখের পাতা বন্ধ করতে পারতাম না। বাবা আমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আমিও নাকি দেখতে আমার দিদিমা বা ডগলাসের মতো হয়ে যাচ্ছি।

একরাতে আমি দিদিমাকে স্বপ্নে দেখলাম।

সমুদ্রের তলায় এক বিশাল প্রাসাদে ছিলেন মহিলা। তার বাগান তৈরি হয়েছে ছত্রাক-জড়ানো প্রবাল দিয়ে। একটা সব্জেটে আভায় আলোকিত হয়েছে প্রাসাদের দেওয়াল, ছাদ, প্রতিটি ঘর। সেখানেই তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন।

দিদিমা বললেন, ডগলাস নাকি খোঁজখবর নিয়ে এই জায়গাটার সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি এখানে। সাহস পাননি বলাই ভালো, কারণ নিতান্ত কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করেছিলেন ডগলাস। কিন্তু আমি পারব ওখানে আসতে। ওটাই নাকি আমার আসল জগৎ, যেখানে আমি অমর হয়ে থাকব।

দিদিমা আমাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের কথাও বললেন। তিনি বললেন, ওই প্রাসাদ যেখানে আছে, সেই শহরের নাম র'লিয়েহ। কোনও এক আদিম যুগে আরও শক্তিধর প্রাচীন দেবতাদের জাদু র'লিয়েহ শহরকে জলের নীচে আটকে রেখেছে। কিন্তু একদিন ওঁরা ওপরে উঠবেন। সেদিন থেকে পৃথিবীতে আসবে এক নতুন যুগ। ইন্সমাউথ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, তা একদিন শেষ হবেই।

আমার হঠকারিতায় ইন্সমাউথ শহরে ওঁদের বসতিটা নষ্ট হয়ে গেলেও তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আসল ইন্সমাউথ আছে অনেক নীচে। তবে হ্যাঁ, আমার ওপর ওঁদের রাগ, অভিমান, দুঃখ— এসব আছে। আমাকে র'লিয়েহ গিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তার চেহারাটা দেখে দারুণ ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আয়নায় তাকিয়ে বুঝলাম, আমার মধ্যে 'ইন্সমাউথ লুক'[174] এসে গেছে!

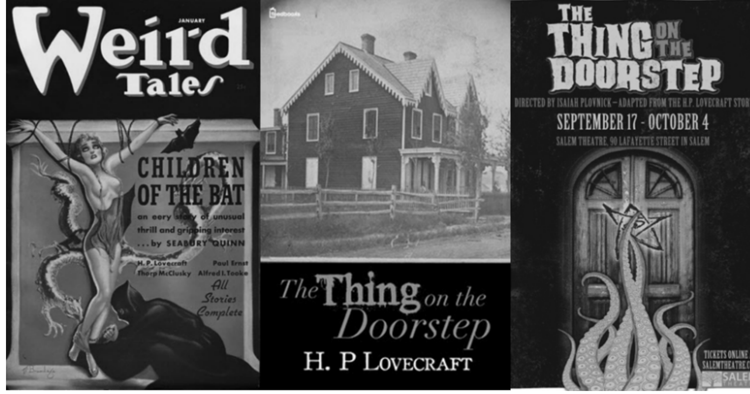
না। আমি এখনও আত্মহত্যা করিনি। আর এই কথাগুলো আপনাদের জন্য লিখতে গিয়ে বুঝলাম, ওসব করার কোনও দরকারও নেই। আমার প্রথম কাজ হবে ক্যান্টনের সেই পাগলাগারদ থেকে লরেন্সকে উদ্ধার করা। তারপর আমরা দু-জনে যাব ইন্সমাউথ। মাটির ওপরে ওই মৃত শহর নয়, বরং ডেভিল'স রিফ-এর ওপাশে জলের নীচে থাকা ইন্সমাউথ। তারপর... যা হওয়ার তা-ই হবে। হয়তো কোরালের সারির মাঝে অন্ধকার সরণী ধরে সাঁতার কেটে ইয়া'হানথেলির পাথুরে প্রাসাদে আর সেই অতলের দেবতাদের রাজত্বে অমর হব[175]। আবার অন্য কিছুও হতে পারে।

মোদ্দা কথা হল, এই রহস্যের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে কী হয়, দেখেছেন তো? ইন্সমাউথের ইশারায় সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না যে!



প্রথম প্রকাশ: *লেখাটি প্রাথমিকভাবে 'উইয়ার্ড টেলস' ম্যাগাজিন ছাপতে অস্বীকার করে এর আয়তনের কারণে। সম্পাদক লেখাটিকে দু-ভাগে ভাগ করে ছাপতে চাননি। অবশেষে* **১৯৩৬** *সালের নভেম্বর মাসে, উইলিয়াম ক্রফোর্ডের ভিশনারি পাবলিশিং লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে।*

ভাষান্তর: *ঋজু গাঙ্গুলী*



দ্য থিং অন দ্য ডোরস্টেপ

লাভক্র্যাফটের একটি প্রিয় বিষয় ছিল গল্পের চরিত্রের মন অন্য কোনও চরিত্রের সঙ্গে বদলে দেওয়া। "বিয়ন্ড দ্য ওয়াল অব স্লিপ" ও "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড"-এর মতোই এই গল্পেও লেখক সেরকমই একটি ঘটনার ছবি এঁকেছেন। মূল চরিত্র এডওয়ার্ড ডার্বিকে লাভক্র্যাফট যেন তাঁর প্রিয় লেখক পো-এর আদলেই গড়ে তুলেছেন। চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের মতো এই গল্পেও মন পালটানোর পিছনে আছে কথুলুর সমগোত্রীয় নিষিদ্ধ দেবতার আরাধনা।

কে?
(The Thing on the doorstep)



বিশ্বাস করুন, আমি খুনি নই!!

যদিও আমার প্রিয়তম বন্ধুর করোটির ভেতর ছ-ছ-টা গরম সিসের গুলি পুরে দিতে সেই মুহূর্তে আমার হাত কাঁপেনি, তবুও আমি পাঠককে অনুরোধ করব, আমার বয়ানটা যেন দয়া করে পড়েন। আমার ওপর অভিযোগের আঙুল ওঠার আগেই আমি নিজের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই।

জানি, লোকে আমাকে পাগল ভাবছে। তবে সুধী পাঠক— আমার পুরো ঘটনা পড়ার পর, সবরকম সম্ভাবনা নিক্তিতে বিচার করলে বুঝতে পারবেন, যে ভয়ংকরের মুখোমুখি আমি হয়েছিলাম, তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এর চেয়ে শ্রেয় আর কিছু ছিল না।

হ্যাঁ— সেই আতঙ্ক নিজে এসেছিল আমার দুয়ারে— আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি নিজেই এখনও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি— এখনও অনুধাবন করতে পারছি না, আমি এটা করলাম কীভাবে। যা জানতে পেরেছিলাম, তাতে হয়তো আমার বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। আমি তো আর জন্ম থেকে পাগল নই! লোকে এডওয়ার্ড আর অ্যাসেনাথ[176] ডার্বির ব্যাপারে যে অদ্ভুত কথাগুলো বলছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই তুম্বোমুখো পুলিশগুলো অবধি সেটা উড়িয়ে দিতে পারছে না। এরা চেষ্টা করছে কয়েকটা

মনগড়া, যুক্তিপূর্ণ গল্প খাড়া করে কেসটা ফাইল করার, কিন্তু তারাও মন থেকে জানে সত্যিটা কী অবিশ্বাস্য রকমের ভয়ানক।

আমি জানি, এডওয়ার্ডকে আমি হত্যা করিনি— তাকে শাস্তি দিয়েছি। সেই সঙ্গে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছি এক ভয়ানক অশুভশক্তির কবল থেকে। এটা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছি। হে পাঠক, আপনারাও হয়তো এ ধরনের কিছু আপনার চারপাশে উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নরকের অন্ধকার ছায়া তার করাল বাহু বিস্তৃত করতে চাইছে আমাদের এই সাধের দুনিয়ার দিকে। বুঝতে না পারলে কিছু করার নেই— কিন্তু টের পেলে, যে-কোনও মূল্যে তাকে রোধ করতে হয়।

নইলে অনেক অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।

এডওয়ার্ড পিকম্যান ডার্বিকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। আমার থেকে বয়সে আট বছরের ছোট হলেও, এডওয়ার্ডের মানসিক বাড়বৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর। হয়তো সে জন্যই এই বয়সের তফাত আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে কোনওরকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার দুর্দান্ত মেধার স্ফুরণ ওই বয়স থেকেই ফুটে বেরুচ্ছিল তার লেখালেখির মধ্যে। গদ্য, কাব্য এবং গম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় তার ব্যুৎপত্তি শিক্ষকদেরও চমকিত করেছিল। তার নিভৃতে পড়াশোনা করার ক্ষমতা এবং নিজের মধ্যে গুটিয়ে-থাকা স্বভাবটাই হয়তো তার এই প্রতিভার বিচ্ছুরণের কারণ। পরিবারের একমাত্র ছেলে সে, স্বাভাবিকভাবেই বাপ-মায়ের নয়নের মণি। আদরের চোটে বেচারার শারীরিক বাড়বৃদ্ধি বড়ই ধীরস্থিরভাবে হয়েছিল— তার মেধার মতো তার শরীর মোটেই চটপটে ছিল না। তা ছাড়া, সে যেখানেই যেত, পরিবারের নির্দেশে তার পেছনে কড়া নজর রাখত তাদের চাকর। সবার সঙ্গে খেলাধুলা করার অধিকারও ছিল না বেচারির। এই একাকিত্বই অবশ্য তাকে নিভৃতে চিন্তা করার অবকাশ দিয়েছিল— আর সেই চিন্তার মধ্যে দিয়েই সে পেত মুক্তির স্বাদ।

তার শেখার ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কিছু বিদঘুটে শিল্পের ওপর হঠাৎ করেই আমার আগ্রহ জন্মেছিল। এডওয়ার্ডের সঙ্গে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, তার সঙ্গে কেমন যেন একটা আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল খুব সহজেই। আমরা যে শহরে বাস করতাম, তার মতো অভিশপ্ত, পিশাচতাড়িত, দুঃস্বপ্নের শহর হয়তো-বা আর দুটি ছিল না। রহস্যময় কিংবদন্তির ছায়ায় ঘেরা এই আর্কহ্যামের ভেঙে-পড়া ছাদ আর মোটা মোটা থামের

ঘরবাড়িগুলি যেন ইতিহাসকে থামিয়ে রেখেছে— থামিয়ে রেখেছে এক প্রাচীন সময়কে। এই অদ্ভুত শহরের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদেও হয়তো আমার বন্ধুত্বটা এতটা গাঢ় হতে পেরেছিল।

স্কুলের পড়াশোনা শেষে আমি স্থাপত্যের ওপর বিশেষভাবে আকর্ষণ অনুভব করি এবং তা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, এডওয়ার্ডের সঙ্গে মেলামেশার সময় হয়ে উঠত না বিশেষ। তাতে অবশ্য আমাদের পুরোনো বন্ধুত্বে কোনও ছেদ পড়েনি। ইতিমধ্যেই যুবক ডার্বির কাব্যপ্রতিভা দুরন্ত ছন্দে গতিমান হয়ে উঠেছিল। আঠারো বছর বয়সে তার লেখা ‘দুঃস্বপ্নের কবিতাগুচ্ছ’ রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল পাঠকসমাজে। আপনারা জাস্টিন জিওফ্রেকে[177] চেনেন? খ্যাপা এক কবি, যিনি ‘মানব ও প্রস্তরখণ্ড’ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন— তাঁর খুব কাছের লোক হয়ে উঠেছিল এই এডওয়ার্ড। তবে কথিত আছে, সেই জিওফ্রে নাকি হাঙ্গেরির কোনও এক অভিশপ্ত গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর **১৯২৬** সালে এক পাগলাগারদে ভরতি হন। আর সেখানেই উন্মত্তের মতো চিৎকার করতে করতে একদিন তাঁর দুঃখজনক অকালপ্রয়াণ ঘটে।

দায়িত্ব নিয়ে কোনও কাজ করার ব্যাপারে ডার্বির কোনও সাড়া পাওয়া যেত না। পড়াশোনা ছাড়া অন্যান্য কাজে তার আত্মবিশ্বাস ছিল বড়ই কম। তার বাপ-মা-র অতিরক্ষণশীল আদরের অত্যাচার থেকে বেচারা তখনও মুক্তি পায়নি। তাই অচিরেই বোঝা গিয়েছিল, চাকরি বা ব্যাবসার মতো কায়িক শ্রম তার দ্বারা কোনওমতেই হওয়ার নয়। তবে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে, এই ‘সামান্য’ অক্ষমতাটুকুর জন্য তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। নীল চোখ, ফরসা সুন্দর মুখের অধিকারী ছেলেটির চেহারাতে একটা আদুরে থলথলে ভাব ছিল, যেটা ওর নিরীহ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল। সুন্দর উচ্চতার, সোনালি চুলের ডার্বি খুব স্বাভাবিকভাবেই জনসমাজে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াতে পারত, যদি না তার অন্তর্মুখীনতা আর গভীর পুস্তকপ্রেম তাকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখত।

ডার্বির বাবা-মা তাকে প্রতি গ্রীষ্মে একবার করে ইউরোপ ঘুরতে নিয়ে যেতেন। ডার্বি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খুব দ্রুত ইউরোপের সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি আয়ত্ত করে নিয়েছিল। সে সময় তার সঙ্গে আমার প্রচুর আড্ডা হত। আমি তখন সবে সবে হার্ভার্ড থেকে পাশ করে বস্টনে এক নামি আর্কিটেক্টের অফিসে কাজ করে হাত পাকিয়েছি। বিয়ে

করে সংসার পেতে আমি আর্কহ্যামে ফিরে এসেছি প্র্যাকটিস করতে। বাবার শরীরটা ভালো না-থাকায় উনি ফ্লোরিডা চলে গিয়েছিলেন তাই আমি সপরিবার সলটনস্টল স্ট্রিটে একটা বাড়িতে উঠলাম। এডওয়ার্ড এই সময়টা প্রায় প্রতিদিন দেখা করতে আসত। আমার বাড়িতে এসে এডওয়ার্ড একটা স্পেশাল কোডে ডোর বেল বাজাত বা দরজাটা নক করত। প্রতিদিন খাওয়াদাওয়ার পর আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, কখন ও এসে দরজায় পরপর জোরে জোরে তিনটে আর তারপর থেমে থেমে দুটো নক করবে। মাঝে মাঝে আমি ওর বাড়িতে গিয়েও ওর ক্রমবর্ধমান দুর্লভ বইয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি দেখতাম আর ঈর্ষান্বিত হতাম।

The Thing on the Doorstep

By H. P. Lovecraft

To Duane W. Rimel, Esq., with the best regards of H.P.Lovecraft

It is true that I have sent six bullets through the head of my best friend, & yet I hope to shew by this statement that I am not his murderer. At first I shall be called a madman — madder than the man I shot in his cell at the Arkham Sanitarium. Later some of my readers will weigh each statement, correlate it with the known facts, & ask themselves how I could have believed otherwise than as I did after facing the evidence of that horror — that thing on the doorstep.

Until then I also saw nothing but madness in the wild tales I have acted on. Even now I ask myself whether I was misled — or whether I am not mad after all. I do not know — but others have strange things to tell of Edward & Asenath Derby, & even the stolid police are at their wits' ends to account for that last terrible visit. They have tried weakly to concoct a theory of a ghastly jest or warning by discharged servants, yet they know in their hearts that the truth is something infinitely more terrible & incredible.

So I say that I have not murdered Edward Derby. Rather have I avenged him, & in so doing purged the earth of a horror whose survival might have loosed untold terrors on all mankind. There are black zones of shadow close to our daily paths, & now & then some evil soul breaks a passage through. When that happens, the man who knows must strike before reckoning the consequences.

I have known Edward Pickman Derby all his life. Eight years my junior, he was so precocious that we had much in common from the time he was eight & I sixteen. He was the most phenomenal child scholar I have ever known, & at seven was writing verse of a sombre, fantastic, almost morbid cast which astonished the tutors surrounding him. Perhaps his private education & coddled seclusion had something to

চিত্র ১১.১ : "দ্য থিংগস অন দ্য ডোরস্টেপস" গল্পের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

ডার্বি মিসকাটনিক বিশ্ববিদ্যালয়[178] ছাড়া আর কোথাও পড়েনি। আসলে ওর বাবা-মা ওকে বাড়ি থেকে বেশি দূরে একা একা যেতেই দেয়নি। যা-ই হোক, মিসকাটনিকে ইংরেজি এবং ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করলেও ওর মার্কস প্রায় সবেতেই ভীষণ ভালো ছিল। কেবল গণিত আর বিজ্ঞানে ও তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু ওর সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় ছিল প্রাচীন গুপ্তবিদ্যা। সেসব বিদ্যা আয়ত্ত করা কেবল দুরূহ নয়, তার অধীত জ্ঞানও বড় ভয়ানক। সেসব নিয়ে পড়ার জন্য সে বার বার ছুটে যেত মিসকাটনিক লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরিতে বসে ডার্বি গোগ্রাসে গিলত অদ্ভুত সব নিষিদ্ধ বইয়ের জ্ঞান— যেসব বইয়ের নাম মনে আনলেও আতঙ্কে শিহরিত হতে হয়, সে পরম পরিতোষে সেগুলো নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিত। কী ছিল না সেসব বইয়ের মধ্যে— হাড়-হিম-করা ‘বুক অব ইবন’[179] যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভন জুন্তের ‘অভিশপ্ত গুহ্যবিদ্যা’[180] এবং উন্মাদ আরব জাদুকর আবদুল আলহাজ্রেডের লেখা ‘নেক্রোনমিকন’[181]। এই শেষোক্ত বইটি সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো— লোকমুখে শোনা যায়, স্বয়ং শয়তান জাগানোর এবং তাকে বশীভূত করার গুপ্তমন্ত্র নাকি লেখা আছে ওই বইতে। এডওয়ার্ড যদিও এসব কাউকে কোনও দিন বলেনি, তবু আমি জানতে পেরেছিলাম। বই-পাগল এই ছেলেটা আমার মনে এতটাই ভালোবাসার উদ্রেক করেছিল, যে আমি ওর নামে আমার ছেলের নামও রেখেছিলাম এডওয়ার্ড ডার্বি আপটন।

পঁচিশ পেরোতে-না-পেরোতেই এডওয়ার্ড রীতিমতো বিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে গুপ্তবিদ্যাতে। কিন্তু তার অন্তর্মুখীনতা এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে চরম উদাসীনতা তার জ্ঞানকে কেবল বইয়ের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। লোকজনের সঙ্গে ডার্বি যে ইচ্ছে করে মিশত না তা ঠিক নয়, বহু দিনের অনভ্যাস, বাবা-মা-র অতিরিক্ত আঁচল-চাপা-দেওয়া স্বভাব— এসবের জন্য অপরিচিত কোনও জনসমাবেশে গেলেই সে বেচারা কেমন কুণ্ঠিত হয়ে খোলসের মধ্যে ঢুকে যেত।

এডওয়ার্ডের যখন চৌত্রিশ বছর বয়স, তখন তার মা মারা গেলেন। তার পর পরই সে বেচারাও কী এক বিশ্রী রোগে বিছানা নিল। বেশ কয়েকদিন যমে-মানুষে হওয়ার পর, তার বাবা তাকে টেনে নিয়ে গেলেন ইউরোপে— ভালো চিকিৎসা করানোর জন্য। ডার্বির

কপাল ভালো বলতে হবে, সে সুস্থ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু এই রোগে ভোগার পর থেকেই ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গেল। ওকে দেখে স্বাভাবিক রোগে ভোগা মনমরা মানুষ লাগত না। খুব আশ্চর্যরকমভাবে উল্লসিত ছিল সে, যেন তার এক বন্ধনমুক্তি ঘটেছে। যে ছেলেটা আগে মুখচোরা হয়ে বই মুখে করে পড়ে থাকতেই ভালোবাসত— সে রাতারাতি হয়ে পড়ল চরম মিশুকে। কেবল তা-ই নয়, সে মিসকাটনিকের নতুন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যেচে মিশতে লাগল, তাদের দলে ভিড়ে করতে লাগল গোপন সব ক্রিয়াকলাপ।

শুনেছিলাম, কোনও একদিন সে এবং একদল ছেলেমেয়ে মিলে চর্চা করেছিল এমন একটা কিছুর, মিসকাটনিকের ইতিহাসে যা কোনও দিন শোনা যায়নি।

এক ভয়াল-ভয়ংকর গুপ্তবিদ্যা সাধনার কথা কানাঘুষোতে জেনে স্তম্ভিত হয়েছিলাম আমি।

(২)

এডওয়ার্ডের যখন আটত্রিশ বছর বয়স, সে সময়েই অ্যাসেনাথ ওয়াইটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। অ্যাসেনাথ তখন তেইশ বছরের যুবতি, মিসকাটনিকে মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে পড়াশোনা করতে এসেছিল সে। আমার এক বন্ধুর মেয়ের থেকে তার ব্যাপারে আমি কিছুটা হলেও শুনেছিলাম। অ্যাসেনাথও যে খুব একটা মিশুকে প্রকৃতির ছিল, তা নয়— তবে তার সঙ্গে বাকি ছাত্রছাত্রীদের দূরত্ব বজায় রাখার কারণ ছিল অন্য।

ছোটখাটো চেহারার সুন্দরী অ্যাসেনাথের চোখগুলো ছিল বেশ ভীতিপ্রদ। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা চোখে যেন সবসময় খেলা করে যেত কী এক অবজ্ঞা, অবহেলা। অন্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় সে যে অনেক বেশি বিদুষী আর ক্ষমতাসম্পন্না, সেই অভিব্যক্তি যেন ফুটে বেরুত তার চোখ দিয়ে। সে ছিল ইন্সমাউথের কুখ্যাত ওয়াইটদের[182] বংশধর। এমনিতেই অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত ইন্সমাউথের নামেই লোকে আতঙ্কিত হত, তারপর অ্যাসেনাথের চলাফেরাতে এমন একটা তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব ছিল, যে ওকে খুব স্বাভাবিকভাবেই লোকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করত।

এপ্রাহিম[183] ওয়াইট এই বংশের সবচেয়ে কুখ্যাত নাম। শুধু নামের দিক দিয়ে নয়— কাজের দিক দিয়েও এপ্রাহিম এক মূর্তিমান আতঙ্ক ছিল। তার স্ত্রী-র মুখ কেউ কোনও দিন দেখেনি, কারণ ভদ্রমহিলা সারাদিন মুখে একহাত ঘোমটা টেনে নিজেকে আড়াল

করে রাখতেন। ইন্সমাউথ শহরে ওয়াশিংটন স্ট্রিটের ধারে যে আধভাঙা পোড়ো দুর্গের মতো বাড়িতে এপ্রাহিম ওয়াইট বাস করত, তার চিলেকোঠার জানলাটা কোনও দিন কেউ খোলা দেখেনি— আজন্ম সেটায় একটা তক্তা মারা থাকত। যারা ওই অভিশপ্ত শহরে পা রেখেছে, তাদের থেকে শুনেছি, রাতের অন্ধকারে ওই চিলেকোঠা থেকে ভেসে আসত অপার্থিব সব শব্দ। এপ্রাহিম তার যুবক বয়সে নাকি জিনিয়াস ধরনের তান্ত্রিক ছিল। জনশ্রুতি আছে, সে নাকি তার নিজের ইচ্ছেমতো সমুদ্রে তুফান আনতে পারত, সৃষ্টি করতে পারত মহাদুর্যোগ। আমি আমার জীবদ্দশায় তাকে এক-দু-বারই দেখেছিলাম। তখন আমি মিসকাটনিকে কী একটা কাজে গিয়েছিলাম, আর এপ্রাহিম এসেছিল লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ সব অকাল্টের বই নিয়ে আলোচনা করতে। নেকড়ের মতো ধূর্ত মুখে ধূসর দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা এপ্রাহিমকে দেখে আমি চমকে পালিয়ে এসেছিলাম।

তবে এপ্রাহিমের অস্বাভাবিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, ওর মেয়ে অ্যাসেনাথ মিসকাটনিকে পড়তে আসে। বাপ আর মেয়ের মধ্যে কেবল যে মুখের মিল ছিল তা নয়— মেয়ে যে বাপের একনিষ্ঠ ছাত্রীও ছিল, সেটা বুঝতে ভুল করেনি মিসকাটনিকের ক্লাসমেটরা। অ্যাসেনাথের নানাবিধ অদ্ভুত ক্ষমতা ওর ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। এমনকী তার রাস্তা এড়িয়ে চলত পশুপাখিরাও। আমার বন্ধুর যে মেয়েটি অ্যাসেনাথের সঙ্গে পড়াশোনা করত, তার মুখ থেকেই আমি বেশির ভাগ খবর জোগাড় করতাম। অনেক কথার মধ্যে অ্যাসেনাথের একটা বিশেষ ব্যাপার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং তা হল, মেয়েটি নাকি চূড়ান্তরকম ভালো সম্মোহন জানত। নিজের চেতনাকে অন্যের শরীরে স্থাপন করে অন্যের চেতনাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারত। এর ফলে সম্মোহিত মানুষটি সভয়ে দেখতে পেত, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে তার নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর সেই শরীরধারীর দুটো চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, আর সে চোখ যেন জ্বলছে এক অনন্ত জিঘাংসায়। শরীরবিহীন চেতনার ওপর অ্যাসেনাথের জ্ঞান ছিল অবাক করার মতো।

অ্যাসেনাথ তার বন্ধুমহলে ক্ষোভ প্রকাশ করত যে, একজন পুরুষ হলে সে এই তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে পারত আরও ভালোভাবে। একটা পুরুষ মস্তিষ্কের ক্ষমতা তার আয়ত্তে এলে, অ্যাসেনাথ হয়তো অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তার বাবাকেও ছাড়িয়ে যেত বহু দিন আগেই।

এডওয়ার্ডের সঙ্গে অ্যাসেনাথের আলাপ হয় একদল বুদ্ধিজীবীর সমাবেশে এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে, পরের দিন একমাত্র অ্যাসেনাথের বিষয়ই ছিল তার কথাবার্তার একমাত্র সারমর্ম। অ্যাসেনাথের জ্ঞান, বাগ্মিতা এবং এডওয়ার্ডের পছন্দের বিষয়ে তার আগ্রহ, তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল মেয়েটির প্রতি। তবে অ্যাসেনাথের ব্যাপারে আগে যা শুনেছিলাম, তাতে আমার এডওয়ার্ডের ওপর করুণাই হল। এত দিন পর ছোকরা কিনা এরকম এক জাদুগরনির পাল্লায় পড়ল!! আমি অবশ্য ওকে কিছু বলিনি— জানতাম, এসব ক্ষণিকের ভালো-লাগা দু-দিনেই হয়তো কেটে যাবে। তা ছাড়া এডওয়ার্ড নিজেও বলল, অ্যাসেনাথের ব্যাপারে সে তার বাবাকে কিছুই জানাবে না।

কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম হল না মোটেই। পরের সারা সপ্তাহ জুড়ে যখনই ডার্বি আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে এল, অ্যাসেনাথ, অ্যাসেনাথ করে আমার কান পচিয়ে ছাড়ল। আমি আগেই বলেছি যে, এডওয়ার্ডকে দেখতে রাজপুত্রের মতো সুন্দর ছিল। তাকে দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না যে, তার বয়স চল্লিশের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়েছে। উলটোদিকে অ্যাসেনাথকে তার বয়সের তুলনায় বেশ বয়স্কই লাগত। যা-ই হোক, এক শরতের সকালে এডওয়ার্ড আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল তার প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করাবে বলে। গিয়ে দেখলাম, ব্যাপার মন্দ না, প্রেমের রং দু-জনের মনেই ভালোভাবে লেগেছে। চোরা চোখের চাউনিতে অ্যাসেনাথ দেখলাম বেশ পটু— যখনই সুযোগ মিলেছে, সে এডওয়ার্ডের প্রতি বিলোল কটাক্ষ হানতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

এর ক-দিন পর মি. ডার্বি, মানে এডওয়ার্ডের বাবা একদিন আমার বাড়িতে হঠাৎ এসে হাজির। ওঁকে রীতিমতো সমীহ করতাম আমি, যথেষ্ট খাতির করেই বসালাম। এ কথা-সে কথার পর বুঝলাম, ভদ্রলোকে বেশ মুষড়ে পড়েছেন। উনি ছেলের বান্ধবীর কথা শুনতে পেয়ে ছেলেকে চাপ দিয়ে সব গুপ্তকথা জেনে নিয়েছেন। কিন্তু ছেলে এর মধ্যে নাকি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে শুধু অ্যাসেনাথকে বিয়ের প্ল্যানই করেনি, অন্য বাসার খোঁজও করছে, যেখানে সে বিয়ের পর উঠে যেতে পারে। মি. ডার্বি আমাকে অনেক অনুনয় করলেন, আমি যেন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাজ করি এবং কোনওভাবেই মতিচ্ছন্ন এডওয়ার্ডের বিয়ে ওই ডাইনিটার সঙ্গে হতে না দিই।

বলাই বাহুল্য, এই প্রস্তাবে আমি মোটেই রাজি হলাম না। এডওয়ার্ডের মধ্যে অনেকদিন পর একজন দায়িত্ববান মানুষ হওয়ার ক্ষমতা এবং ইচ্ছে জাগ্রত দেখে আমার ভালোই

লাগছিল। আর ব্যাপারটা তো শুধু এডওয়ার্ডের দিক দিয়ে নয়, মেয়েটিরও এই সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। এডওয়ার্ডের এই পরিবর্তনটুকুকে আমি মনে মনে স্বাগত জানালাম। বাপের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজে কিছু করার শক্তি যে ছেলেটা জোগাড় করতে পেরেছে— এটা দেখেই আমার গর্ব হচ্ছিল, তাই সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে ছেলেটার জীবন বরবাদ করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হল না।

মাসখানেক পরে একটা ঘরোয়া সমাবেশে ওদের বিয়েটা হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য, আমি এবং আমার পরিবার বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিলাম, এবং মিসকাটনিকের প্রচুর ছাত্রছাত্রীও বিয়েতে উপস্থিত হয়ে আনন্দ করেছিল। অ্যাসেনাথ আর ডার্বি মিলে হাই স্ট্রিটের মোড়ে 'ওল্ড ক্রাউনিংফিল্ড' নামে একটা বড়সড়ো বাড়ি কিনে রেখেছিল। আপাতত স্থির হল যে, নবদম্পতি সপ্তাহখানেকের জন্য ইন্সমাউথে কাটিয়ে আর্কহ্যামে তাদের নতুন বসতবাড়িতে ফিরে আসবে। ইন্সমাউথের বাপের বাড়ি থেকে কিছু আসবাব, বই আর তিনখানা চাকরকেও আনার ছিল অ্যাসেনাথের।

মিসকাটনিকের কাছে থাকার অনুরোধ এডওয়ার্ডের বাবা ফেলতে পারেননি। ছেলে এমনিতেও সারাক্ষণ বই মুখে করে থাকে। আর তা ছাড়া, ওদিকটাতে প্রচুর বিজ্ঞ মানুষের বাস— ওদের সান্নিধ্যে এডওয়ার্ড পরিবার নিয়ে সুখেই থাকবে, সে আশাই করেছিলেন মি. ডার্বি।

মধুচন্দ্রিমা থেকে ফেরার পর এডওয়ার্ড যখন আমাকে প্রথম তার নতুন বাড়িতে ডাকল, তখন লক্ষ করলাম, ছোকরা বেশ কিছুটা বদলে গিয়েছে। ক্লিন শেভ্‌ন এডওয়ার্ডকে বেশ ভদ্রজনোচিত লাগছে ঠিকই, কিন্তু এই ক-দিনেই যেন বেশ বড় হয়ে গেছে সে। মুখে একটা স্পষ্ট চিন্তাক্লিষ্ট ভাব। আমার ব্যাপারটা কেমন জানি ভালো লাগল না। এডওয়ার্ড ক-দিনেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে। আমি অবশ্যই চেয়েছিলাম, যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, নিজের ছেলেমানুষ বদনাম ঘুচিয়ে পৌরুষকে জাগিয়ে তোলে— গড়ে তোলে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তবুও কেন জানি না, ডার্বির এই পরিবর্তনটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। তার ওপর এডওয়ার্ড ইন্সমাউথ থেকে একাই এসেছে, অ্যাসেনাথ আসেনি। তার নাকি কিছু কাজ পড়ে গেছে ওখানে। তবে গুচ্ছ বই দিয়ে এডওয়ার্ডকে সে এখানে পাঠিয়েছে। বইগুলোর নাম উচ্চারণ করলেও দেখলাম, সে বেশ শিউরে উঠছে, নিজের অজান্তেই।

এডওয়ার্ড এমনিতেই গুপ্তবিদ্যা নিয়ে রীতিমতো চর্চা করত, তার ওপর এখন অ্যাসেনাথ সহায়। গিন্নির সাহচর্যে আর তার জ্ঞানের প্রাচুর্যে সে বেশ তাড়াতাড়িই ব্যাপারগুলো শিখে নিতে লাগল। কিন্তু মাঝেমধ্যে অ্যাসেনাথের ক্রিয়াকলাপ বা তার গুপ্তবিদ্যার উপাচার ও উপাসনাপদ্ধতি এতটাই বীভৎস আর আতঙ্কজনক হয়ে উঠত যে, এডওয়ার্ড নাকি রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করত।

বাড়ির তিন চাকরের দু-জন ছিল এক অতিবৃদ্ধ দম্পতি। তারা সেই এপ্রাহিমের সময় থেকেই রয়েছে। মাঝে মাঝেই তারা এডওয়ার্ডকে এপ্রাহিম এবং তার ঘোমটা পরিহিতা স্ত্রী-র রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে বিড়বিড় করে শোনাত। আর ছিল একটি মেয়ে— কালো কষ্টিপাথরের মতো রং তার। শরীরে তার নানা অসংগতি ছিল, কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার— তার গা গিয়ে সারাক্ষণ ভেসে আসত তীব্র আঁশটে গন্ধ।

(৩)

পরের দু-বছর ডার্বি পুরো ডুমুরের ফুল হয়ে গেল। মাসে দু-বার বা নিদেনপক্ষে একবারও তার দেখা পাওয়া ভার হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে ফোন-টোন করলে জবাব দিত বটে, কিন্তু বুঝতাম কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াতে তার বিশেষ আগ্রহ নেই। যেসব গুপ্তবিদ্যাচর্চার ব্যাপারে বা অকাল্টের ব্যাপারে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যেতাম, সেসব নিয়ে আজকাল সে আর টুঁ-শব্দটি করে না। অ্যাসেনাথের ব্যাপারে তো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল সে।

অ্যাসেনাথ দিন দিন কেমন যে বুড়িয়ে যাচ্ছিল। ডার্বি আর অ্যাসেনাথকে পাশাপাশি দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না, যে মেয়েটি ওর থেকে বয়সে এত ছোট। বরং অ্যাসেনাথকেই ডার্বির চেয়ে বড় মনে হত। তা ছাড়া আমার গিন্নি আর ছেলে মিলে এটা লক্ষ করেছিল যে, অ্যাসেনাথের মুখের গাম্ভীর্য যেন অনাবশ্যকরকমভাবে বেড়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা ওদের ফোন করাই বন্ধ করে দিলাম। হয়তো ওরা একাই থাকতে চাইছিল, তাই আমরা ওদের আর বিরক্ত করিনি।

বছরখানেক পর থেকেই এডওয়ার্ডের ব্যাপারে নানা কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল। সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, এডওয়ার্ড আগে নিজে কোনও দিন ড্রাইভ করেনি। গাড়ি চালাতে সে রীতিমতো ভয় পেত। শোনা গেল, সে এখন নাকি পুরো পাকা ড্রাইভারের

মতো গাড়িও চালাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ট্রাফিক সিগনাল বাঁচিয়ে অ্যাসেনাথের গাড়িখানা সে হু হু করে ছুটিয়ে দেয় পুরোনো ক্রাউনিংশিল্ড[184] ড্রাইভওয়ে দিয়ে। অবশ্য সে বেশির ভাগ সময়ে ওই রাস্তাটাই বেছে নেয়, যেটা আর্কহ্যাম থেকে ইন্সমাউথের দিকে চলে গেছে।

ডার্বিকে ড্রাইভিং সিটে যারা দেখেছে, তারা সবাই একটা আশ্চর্য দাবি জানিয়েছিল— ড্রাইভারের সিটে এডওয়ার্ডকে নাকি অনেকটা অ্যাসেনাথের মতো দেখতে লাগছিল। সেই মুখ, সেই চোখ। আমি ব্যাপারটা শুনলেও উড়িয়ে দিয়েছিলাম পুরোপুরি। পরে শুনেছিলাম যে, ডার্বি-দম্পতি কলেজ ছেড়ে দিয়েছে— কারণ তারা নাকি এমন কিছু বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিল, যা জানতে পেরে পিলে চমকে গিয়েছিল প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর।



চিত্র ১১.২ : ক্রাউনিংশিল্ড বেন্টলে হাউস, সালেম, ম্যাসাচুসেটস

বিয়ের বছর তিনেকের মাথায় এডওয়ার্ড আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করল এই বলে যে, তার অ্যাসেনাথের সঙ্গে রীতিমতো সমস্যা হচ্ছে। সারাক্ষণ কিছু একটা ভয় এবং বিরক্তি তাকে গ্রাস করে রাখে। আমাকে সে কয়েকবার বলেছিল বটে যে, অ্যাসেনাথের ব্যাপারস্যাপার তার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। ওর কিছু আচরণ তো একেবারেই

সৃষ্টিছাড়া। আমি সাক্ষাতে কয়েকবার ওকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করে দেখেছি, তবে বিশেষ উত্তর পাইনি।

এর কয়েকদিন পর এডওয়ার্ডের বাবা মারা গেলেন। এডওয়ার্ডের মধ্যে সে জন্য কিছুমাত্র অনুতাপ দেখা গেল না। হতে পারে, বিয়ের পর থেকে তার সঙ্গে মি. ডার্বির একরকম সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও— মি. ডার্বির মৃত্যুর পর এডওয়ার্ডের গাড়ি চালিয়ে হুল্লোড় যে আরও বেড়ে যাবে, সেটা অনেকেই আশা করেননি। নিজের পরিবারের প্রতি এমন ঔদাসীন্য লোকজন মোটেই ভালোভাবে নেয়নি।

এডওয়ার্ডের ফোন আসাটা এরপর কয়েকদিন একটু বেড়ে গেল। ফোনে সে এমন এমন কথা বলতে লাগল, যা বিশ্বাস করা রীতিমতো কঠিন। মেইন-এর ঘন জঙ্গলে কিছু পুরোনো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তারই কিছু ভগ্ন কাঠামোর নীচে রয়েছে গভীর সুড়ঙ্গ। হাজার সিঁড়ি পেরিয়ে সেই গভীরতায় পৌঁছোনো যায়— কেউই এই গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান জানে না। কিন্তু এডওয়ার্ড জানতে পেরেছে। সে এ-ও জানতে পেরেছে যে, সেখানে এমন কিছু আছে, যা ঠিক প্রকাশ করা যায় না— অন্য দেশ-কাল থেকে, অন্য মাত্রা থেকে আগত কিছু ভয়ংকরের ব্যাপারে জানতে পেরেছে সে।

মাঝে মাঝে এডওয়ার্ড আমার কাছে এসে ফিশফিশ করে বলত, "এপ্রাইমের ব্যাপারে জানো ড্যান? আমার স্থির বিশ্বাস, সে বেঁচে আছে। কোথাও একটা আছে, কিন্তু বেঁচে রয়েছে। তার আত্মা এই আমার আশপাশেই কোথাও রয়েছে, শুধু দেহ ধারণ করতে পারছে না।" বলেই সে শিউরে উঠে চারপাশে তাকাত। আমি ওর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

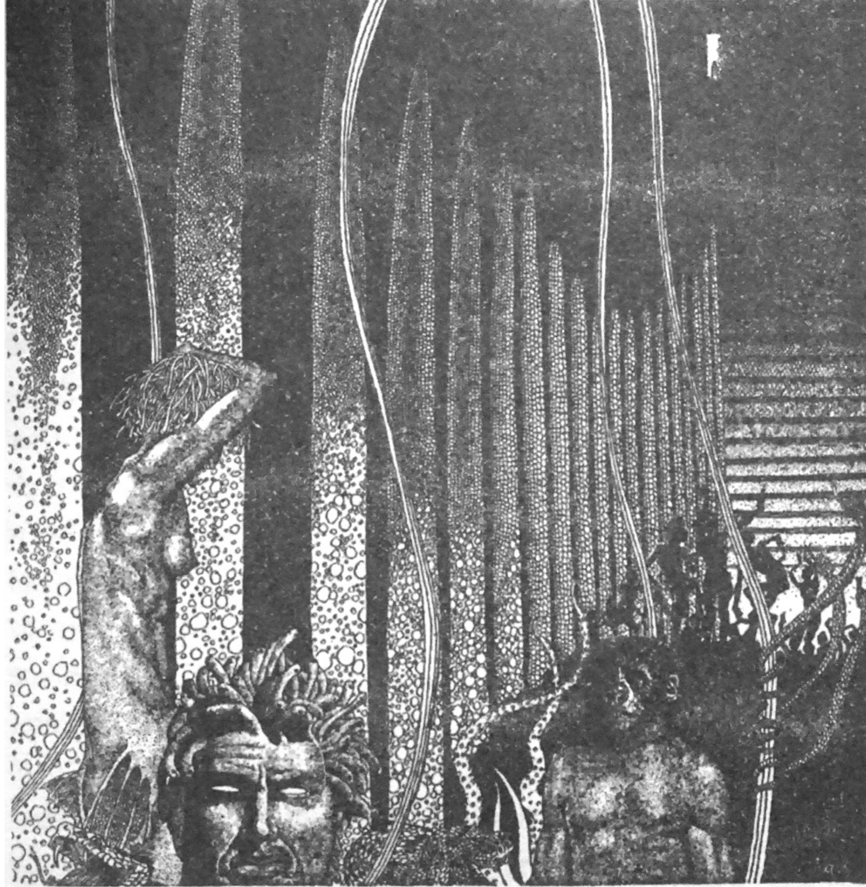
কথা বলার মাঝেই এডওয়ার্ড হঠাৎ কেমন যেন চুপ করে যেত, যেন জোর করে কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে। আমি অ্যাসেনাথের ব্যাপারে যা কিছু শুনেছিলাম, তাতে আমার কেমন জানি মনে হত, অ্যাসেনাথ হয়তো দূর থেকেই ডার্বিকে নিয়ন্ত্রণ করে— সে কী বলবে, কীভাবে চলবে— সব।

এরপর থেকে ডার্বির পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা মুশকিল হয়ে পড়ল। সময়-সুযোগ বুঝে সে আসত বটে, কিন্তু তেমন কথা হত না। আমি ঠিকই বুঝতাম যে, যখন অ্যাসেনাথ আমার থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা করত না, তখনই ডার্বিকে আসতে দিত।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা টের পেলাম কয়েকদিন পরেই।

(৪)

এডওয়ার্ডের বিয়ের ঠিক তিন বছর পর, অগাস্টের এক সকালে আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এল। দেখে আশ্চর্য হলাম— ওটা মেইন থেকে এসেছে। এডওয়ার্ডের থেকে গত দু-মাস সাক্ষাৎ বা ফোন কিছুই পাইনি। শুনেছিলাম যে, সে নাকি 'ব্যাবসা'র কাজে বাইরে গেছে— অ্যাসেনাথকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও অতিরিক্ত কৌতূহলী লোকজন, যারা উঁকিঝুঁকি মেরে পরের হাঁড়ির খবর সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ, তারা জানিয়েছিল যে, ডার্বিদের বাড়ির ওপরতলায়, পর্দার আড়ালে কেউ নাকি রয়েছে। কিন্তু সে যে কে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়নি। চাকরবাকররাই নাকি বাজার-দোকান করছে।



চিত্র ১১.৩ : পাক্কা ছ-হাজার সিঁড়ি নীচে—অন্ধকার, নিবিড় নিকষ অন্ধকার!

টেলিগ্রামটা পড়ে চমকে গেলাম। চেজুনকুক-এর পুলিশ থানা থেকে খবর পাঠিয়েছেন খোদ হেড ইন্সপেক্টর। মেইন-এর জঙ্গল থেকে ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা এক মূর্তিমান উন্মাদকে নাকি প্রলাপ-বকা অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে-ফিরতে দেখা যায়। সে নাকি আমার নাম করে তাকে উদ্ধারের আরজি জানাচ্ছিল, তাই ইন্সপেক্টর বাধ্য হয়েই আমায় তার করে ব্যাপারটা জানায়।

চেজুনকুক গ্রামটি মেইন-এর সবচেয়ে দুর্গম জঙ্গল অধ্যুষিত জায়গা। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছোনো গেল। গিয়ে দেখি, ডার্বিকে একটা খামারের ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেখেই সে তড়বড় করে একগাদা কথা বলে গেল, যার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না।

"ড্যান— তুমি ভাবতে পারবে না— উফফ! ওটা সোগথের জায়গা! পাক্কা ছ-হাজার সিঁড়ি নীচে— অন্ধকার, নিবিড় নিকষ অন্ধকার!! সেখানে থাকে— উহ্! কী বীভৎস! আমি, আমি কোনও দিন আমাকে এখানে আনতে দিইনি, কিন্তু ও-ও আমাকে সেই এনেই ছাড়ল। উফফ, কী হারামি মেয়েছেলে! বিশ্বাস করবে না, সেই পাথরের মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠল। এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। কারা যেন সব অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করছিল। কী একটা নাম বারবার বলছিল, 'কামগ, কামগ।' ওটা নাকি এপ্রাহিমের গুপ্তনাম। কয়েক মিনিট আগে আমি আমার বাড়ির লাইব্রেরিতে বসে ছিলাম, আর পরমুহূর্তেই কিনা এক পাতালের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম! আমি জানি, ওই মেয়েছেলেটা আমার নশ্বর দেহটাকে নিজেই ওখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কী ভয়ানক জায়গা, সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না ড্যান— ওহ্! মনে হল যেন নরকের সমস্ত দ্বার আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অলৌকিক এবং অসম্ভব সব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে ওই অন্ধকার গর্তের গভীরে। চোখের সামনে একটা সোগথকে নিজের অবয়ব বদলাতে দেখলাম। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না— কোনওমতে... দেখে নিয়ো, আর যদি আমার সঙ্গে এরকম বদমাইশি করে তাহলে আমি নিজে হাতে ওই শয়তান মাগিকে খুন করব। কিন্তু ড্যান— আমি এখনও বুঝছি না যে, ওটা কী ছিল? অ্যাসেনাথ নাকি এপ্রাহিম নাকি— নাকি... উফ, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে ড্যান।"

কোনওরকমে এডওয়ার্ডকে শান্ত করলাম। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো গেল। পরের দিন সকালে একপ্রস্থ ভদ্র জামাকাপড় পরিয়ে ওকে নিয়ে ফিরে চললাম আর্কহ্যামে। কাল সারাদিন প্রলাপ বকে এডওয়ার্ডের মনের ভার কিছুটা লাঘব হয়েছে— তাই সে আপাতত চুপচাপ বসে রইল আমার পাশে। গ্রামের গাছপালা, জঙ্গলের আলিঙ্গন পেরিয়ে যখন শহরের মধ্যে আমাদের গাড়ি ঢুকে পড়ল, এডওয়ার্ডের মুখখানা হঠাৎ কুঁচকে যেতে দেখলাম। যেন শহরের সান্নিধ্য ও আর সহ্য করতে পারছে না।

আমি অনুমান করলাম, স্ত্রী অ্যাসেনাথের সম্মোহনের প্রভাব ওর ওপর বেশ ভালোরকমই পড়েছে। সেটা কাটিয়ে উঠতে ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করলেও, ওই মহিলা যে বেশ উচ্চপর্যায়ের জাদুকর তা স্বীকার করতেই হয়। এডওয়ার্ড আমাকে বলেছিল, সে আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছুক নয়। আমিও মনে মনে সেটাই চাইছিলাম। ওকে আমাদের বাড়িতে ক-দিন নিয়ে রাখব। তার মধ্যে আশা করি, আমি ওদের ডিভোর্সের কাগজপত্র সব তৈরি করে নেব।

পোর্টল্যান্ড পেরিয়ে আসার পর এডওয়ার্ডের বিড়বিড়ানি বেড়ে গেল। গড়গড় করে অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল সে। আমি ড্রাইভ করতে করতে চুপচাপ শুনতে লাগলাম— আর বিস্মিত হলাম অ্যাসেনাথের ব্যাপারে কিছু কথা জেনে। মেয়েটি নাকি এডওয়ার্ডের ওপর এই আত্মাবিনিময়ের সম্মোহনপদ্ধতি অনেকদিন ধরেই চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই সে এডওয়ার্ডের দেহধারী হয়ে চলে যায় কোন দূর দূর জায়গায়। অ্যাসেনাথ যখন এডওয়ার্ডের শরীরের মাধ্যমে বাইরে যায়, তখন সে নাকি এডওয়ার্ডের চেতনা বা আত্মাকে অসহায়ভাবে তার নিজের শরীরে বন্দি করে রেখে যায় নিজের বাড়িতে। তবে অ্যাসেনাথ নাকি বেশিক্ষণ তার দেহ ধারণ করে থাকতে পারে না। সম্ভবত সে কারণে অধিকাংশ সময়েই এডওয়ার্ড সংবিৎ ফিরে পাওয়ার পর নিজেকে আবিষ্কার করে বাড়ি থেকে বহু দূরে, ভয়াল, ভয়ংকর সব দুর্গম প্রদেশে— কোন এক অজানা স্থানে, একাকী। সেসব জায়গা থেকে কয়েকবার নাকি সে বহু কষ্টে ফেরত এসেছে। কিন্তু এবারেরটা যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আশঙ্কার কথা হল, অ্যাসেনাথের সম্মোহন এবং শরীর বদলানোর ক্ষমতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আগে যতটা সময় সে এডওয়ার্ডের দেহের ওপর কবজা করতে পারত, এখন আরও বেশিক্ষণ পারে। অ্যাসেনাথ নাকি প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে একজন পুরুষ

হওয়ার— অন্তত এমন একজন পুরুষের শরীর ধারণ করার, যার মস্তিষ্ক ক্ষুরধার, কিন্তু আত্মবিশ্বাস তলানিতে। একদিন সে পুরোপুরি এডওয়ার্ডের শরীর নিয়ে কেটে পড়বে, আর এডওয়ার্ডকে রেখে যাবে অমানুষিক এক নারীদেহের মধ্যে বন্দি করে।

এডওয়ার্ড জানতে পেরেছে এক ভয়াবহ সত্য— এপ্রাহিমের সুপ্ত বাসনা। এপ্রাহিম বরাবর চেয়ে এসেছে, যাতে সে অমর হয়, নশ্বর দেহকে ছাড়িয়ে সে তার চেতনাকে স্থানান্তরিত করতে পারে একের পর এক দেহে। অ্যাসেনাথ সফল হবেই— ইতিমধ্যেই একটা সফল পরীক্ষার ফলাফল সে নিজের চোখে দেখেছে...

এডওয়ার্ড ডার্বিকে আমি এবার পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলাম। তার চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে এ ক-দিনে। পেশিবহুল মেদহীন শরীরটা পুরোনো থলথলে ডার্বির থেকে যথেষ্ট আলাদা। দেখলে বোঝাই যায়, ডার্বি এখন আর ঘরের কোনায় একাকী বসে চিন্তার ঊর্ণনাভ জাল বুনে সময় কাটায় না। সে কায়িক শ্রম করে— বলা ভালো, করতে বাধ্য হয়। 'স্ত্রী' নামক মালকিনের হুকুমে এবং সম্মোহনের বশে এডওয়ার্ড ছুটে বেড়ায় দিগ্‌বিদিকে, নিরন্তর, ক্লান্তিহীনভাবে। তবে শরীরের উন্নতি হলেও, তার মনের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। স্ত্রী-র সম্মোহন, এপ্রাহিমের কালাজাদু, অদ্ভুত সব রহস্য, সব মিলিয়ে তার মনে রীতিমতো জট পড়ে গিয়েছে।

এডওয়ার্ডের অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে জানতে পারছিলাম নিষিদ্ধ অকাল্ট চর্চার এক-একজন গুপ্ত দেবদেবীর নাম। প্রাচীন লোককথা ও পুরাণের কাহিনি বিড়বিড় করে যাচ্ছিল এডওয়ার্ড— হয়তো নিজেকে প্রস্তুত করছিল চূড়ান্ত কথাটা বলবার জন্য। সাহস জোগাচ্ছিল নিজেকেই।

"ড্যান— তোমার মনে আছে এপ্রাহিমের সেই মুখটা? চোখে বন্য দৃষ্টি, মুখে এলোমেলো কাঁচা দাড়ি। একবার, একবার সে আমার দিকে তাকিয়েছিল— উফ, সেই দৃষ্টি ভোলবার নয়। অ্যাসেনাথ, এখন অ্যাসেনাথ আমার দিকে ওভাবে তাকায়। ঠিক সেই বন্য দৃষ্টি। আমি জানি, আমি জানতে পেরেছি। নেক্রোনমিকনের একটা পাতায় এই ভয়াবহ সংকেত লিপিবদ্ধ রয়েছে। তোমাকে পাতার নম্বরটা বলে দিলে তুমি নিজেই দেখে নিতে পারবে ড্যান। আর তখনই বুঝবে, কী অশুভ জিনিস আমাকে গ্রাস করেছে। দেহ থেকে দেহান্তর — অর্থাৎ, মৃত্যুহীন চেতনা। শরীরের মরণ হলেও যে তাতে কীভাবে নিজের চেতনাকে জিইয়ে রাখা যায়, সেই সূত্র ও জানত।

“ড্যান, তুমি অ্যাসেনাথের হাতের লেখা দেখেছ? আমি জানি, আমি ওকে তাড়াহুড়োতে লিখতে দেখেছি। কীরকম অদ্ভুত একটা টান— উলটোদিকে আঁচড় দিয়ে দিয়ে লেখা। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি— কিন্তু পরে যখন আমি এপ্রাহিমের পাণ্ডুলিপি দেখি, পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে। সেই এক ছাঁচে লেখা, এক আঁচড়ের টান।

“...‘অ্যাসেনাথ’— আমার সন্দেহ হয়, সত্যিই এই নামে কারও অস্তিত্ব রয়েছে কি না?? আমার মনে অনেক প্রশ্ন আছে, ড্যান। যেমন ধরো, এপ্রাহিমের পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া গিয়েছিল কেন? ইন্সমাউথে ওয়াইটদের ওই বাড়ির চিলেকোঠায় বিশেষভাবে তৈরি প্যাডেড রুমে তালা মারা ছিল কেন? কাকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল? কেন এপ্রাহিম বারবার নিজেকে অভিসম্পাত দিত তার একটা ছেলে নেই বলে? ওই নরকের জীবটা অভিশপ্ত বাড়িতে বসে কী এমন ভয়ানক ক্রিয়াকলাপ করেছিল, যার ফলে হয়তো সে অ্যাসেনাথের শরীর সারাজীবনের জন্য দখল করে নিতে পেরেছে? আমি জানি, সে প্রাণপণ চেষ্টায় আছে আমার শরীরটা দখল নেওয়ার— কারণ তার একমাত্র বাসনা ছিল উন্নতমস্তিষ্ক কিন্তু দুর্বলহৃদয় এক পুরুষের। বলতে পারো, কী কারণে অ্যাসেনাথ নামের ওই জীবটা হুবহু এপ্রাহিমের ভঙ্গিতে লেখে? কী কারণে...”

আচমকা এডওয়ার্ড চুপ করে গেল। যেন কেউ সুইচ টিপে কলের গান বন্ধ করে দিল— এমনিভাবে। আমাদের বাড়িতেও কয়েকদিন আগে এডওয়ার্ড যখন আসত, গল্প করত— তখনও মাঝে মাঝে এরকম আচমকা চুপ হয়ে গেছে সে। আমি ভাবতাম এ ওর আত্মবিশ্বাসের অভাব। মাঝেমধ্যে মনে হত যে, অ্যাসেনাথ হয়তো দূর থেকে সম্মোহন করে ওকে চুপ করিয়ে রাখছে। কিন্তু এবারে যা দেখলাম, তাতে বিস্ময়ে, ভয় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমার পাশে বসে-থাকা এডওয়ার্ডের মুখটা হঠাৎ কুঁচকে বিকৃত হয়ে গেল। তার সারা শরীরে একটা প্রবল খিঁচুনি হতে লাগল, যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাড়, পেশি সব নিজের জায়গা বদল করে আলাদাভাবে সজ্জিত হচ্ছে। আতঙ্কে আমার শরীর থেকে কুলকুল করে ঘাম ঝরতে লাগল। দেখতে পেলাম, আমি যাকে এডওয়ার্ড বলে চিনি বা চিনতাম, তার জায়গা নিয়েছে এক নতুন কেউ। এইমাত্র যেন কোনও ভিনগ্রহীর আক্রমণে আমার বন্ধুর শরীরটা বেদখল হয়ে কোনও অশুভ মহাজাগতিক শক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। চেহারায়, মুখের আদলে আমূল পরিবর্তন এসে সম্পূর্ণ নতুন কেউ, আমার ঠিক

পাশে— এডওয়ার্ডের জায়গায় বসে রয়েছে। এই নতুন মূর্তির আকৃতি ও প্রকৃতি অদ্ভুত ভয়ংকর। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে আমার সারা অঙ্গ কাঁপতে লাগল— সেই সঙ্গে কাঁপতে লাগল আমার হাতে ধরে-থাকা গাড়ির স্টিয়ারিং। দুর্ঘটনা ঘটেই যেত, যদি না সেই নতুন অতিথি শক্ত হাতে আমার গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরত।

আমরা জায়গা বদলাবদলি করে নিলাম। ভালোই করলাম, কারণ এই অবস্থায় গাড়ি চালানো আত্মহত্যার শামিল। সন্ধের অন্ধকার ততক্ষণে বেশ ঘনিয়ে এসেছে। পোর্টল্যান্ড পেরিয়ে আমরা অনেকটা দূর চলে এসেছি। রাস্তার আলো কমে যাওয়ায়, আগন্তুকের মুখটা ভালো করে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না আমার। কিন্তু তার চোখ দিয়ে যে জ্বলজ্বলে জ্যোতি বেরিয়ে আসছিল, সেটা ভুল হবার নয়। বুঝলাম এটা এডওয়ার্ডের সেই অদ্ভুত শক্তিশালী সত্তা, যার সঙ্গে আমার চেনাজানা এডওয়ার্ডের বিন্দুমাত্র মিল নেই। এডওয়ার্ড, যে গাড়ি চালাতেই জানে না, সে শক্ত হাতে আমার থেকে গাড়ির স্টিয়ারিং কেড়ে নেবে— এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। যা-ই হোক, পাশে বসা মূর্তিটা চুপচাপ ড্রাইভ করে যেতে লাগল, আর আমিও মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম।

শহরের নিকটবর্তী হতে-না-হতেই অন্ধকার ছিঁড়ে আলো এসে ধুয়ে দিয়ে গেল গাড়ির ভেতরটা। আর সেই আলোতে দেখতে পেলাম মূর্তিমানকে। চরম আতঙ্কে দেখলাম, ডার্বির ব্যাপারে লোকজনের কানাঘুষো কিছু মিথ্যে নয়। সত্যিই একে অনেকটা এপ্রাহিমের মতোই দেখতে। ব্যাপারটা যে কী ভয়ানক, সেটা বোঝাতে পারব না। এরকম চমকের জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। হয়তো ডার্বির মুখ থেকে এতক্ষণ ধরে অর্থহীন প্রলাপ শোনার ফলেও আমার এই অবস্থা হতে পারে, কিন্তু আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, আমার পাশে বসে যে গাড়িটা চালাচ্ছে, সে এডওয়ার্ড পিকম্যান ডার্বি নয়, এবং কস্মিনকালেও ছিলও না। এ যেন পাতালের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে-আসা কোনও মূর্তিমান প্রেতাত্মা!

শহর ছাড়িয়ে আবার অন্ধকার রাস্তায় না-পড়া পর্যন্ত মূর্তিটা কোনও কথা বলল না। তারপর যখন সে কথা বলা শুরু করল, তখন সেই গলা শুনেও আমার পিলে চমকে গেল। সম্পূর্ণ আলাদা কণ্ঠস্বর— গভীর, দৃঢ়— অথচ প্রত্যয়ী। একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বপূর্ণ আভিজাত্য আছে সেই কণ্ঠস্বরে, যা কমবয়সি এডওয়ার্ডের কথাবার্তায় কখনও ধরা

পড়েনি। উচ্চারণভঙ্গিমা, বলার ধরন পুরোপুরি আলাদা হলেও, কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল আমার। কিছু যেন মিলছে না, কিন্তু সেটা যে কী, তা তখন মাথায় এল না।

কণ্ঠস্বর বলে চলল, "কিছুক্ষণ আগের আমার নার্ভ ব্রেকডাউনটা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে আপটন। তুমি তো জানো আমার স্নায়ু দুর্বল— আর এ ব্যাপারটা প্রায়ই হয়ে থাকে, তাই অস্বাভাবিক কিছু না। তবে আমাকে বাড়ি পৌঁছোতে সাহায্য করার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

"আর-একটা কথা, আমি আমার স্ত্রী অথবা অন্য ব্যাপারে যা কিছু উলটোপালটা বলেছি, ভুলে যাও। জানোই তো আমার পড়াশোনার বিষয়টা একটু অন্যরকম। এসব নিয়ে সারাক্ষণ নাড়াঘাঁটা করলে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই আপাতত আমি ক-দিন বিশ্রাম নিতে মনস্থ করেছি। হয়তো মাসখানেক আমাকে তুমি দেখতে পাবে না। তা-ই বলে আবার অ্যাসেনাথকে দোষারোপ করতে যেয়ো না।

"আপটন, আমার এবারের যাত্রার জায়গাটা একটু অদ্ভুত ঠিকই, তবে খুব অস্বাভাবিক কিছু না। উত্তরের বনে বেশ কিছু পুরোনো রেড ইন্ডিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে রয়েছে আগাছার আড়ালে। এসবের মধ্যেই তো জমে থাকে ছায়া-ঘেরা কিংবদন্তি, নানারকম লোককথা। অ্যাসেনাথ আর আমি এটার অনেকদিন ধরেই খোঁজ করছিলাম। কিন্তু জিনিসটা নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে আমি এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, যে চারপাশের পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। যা-ই হোক, আমার গাড়িটাকে ওখান থেকে আনার জন্য আবার কাউকে পাঠাতে হবে— মুশকিল আর কী।"

আমার সহযাত্রীর বক্তব্যের মাঝে আমি আদৌ কিছু বলতে পেরেছিলাম কি না, এখন মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, চাক্ষুষ করা ঘটনার সম্পূর্ণ উলটো ব্যাখ্যা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম ভালোমতন। ওই চেহারা আর ভিন্ন কণ্ঠস্বরের আওয়াজে আমি আতঙ্কে এতটাই সিঁটিয়ে ছিলাম যে, বারবার মনে হচ্ছিল, এটাই হয়তো আমার শেষযাত্রা! ভয়ে দিশেহারা হয়ে চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। ডার্বি গাড়িটা ঝড়ের বেগে পোর্টসমাউথ পার করে নিয়ে চলল— আর আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এলিয়ে বসে রইলাম ওর পাশের সিটে।

গাড়িটা যখন আর্কহ্যামের প্রবেশমুখে চলে এল, আমি সভয়ে দেখলাম, সামনে রয়েছে সেই অভিশপ্ত মোড়— যার বাঁয়ে ঘুরলে একটা অন্ধকার রাস্তা সোজা চলে গেছে রহস্যময়

ইন্সমাউথের দিকে। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল— আমার সহযাত্রী যদি গাড়িটা ওই রাস্তায় নিয়ে তোলে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি কাল আর দিনের আলো দেখতে পাব না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে, ইন্সমাউথের রাস্তা না ধরে, ডার্বি তীব্রবেগে গাড়িটা শহরের মধ্যে দিয়েই ছুটিয়ে নিয়ে চলল আমাদের গন্তব্যের দিকে। মধ্যযামের সামান্য আগে ওল্ড ক্রাউনিংশিল্ডের সামনে গাড়ি যখন থামল, তখনও ঘরে আলো জ্বলছে। ডার্বি প্রচুর কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদে আমাকে ভরিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও স্টিয়ারিং চেপে গুটিগুটি ঘরে ফিরে এলাম। সত্যি, একটা দিন কাটল বটে! এই প্রথম ডার্বির আগাম অনুপস্থিতির খবরে আমার কোনও দুঃখ বা উদ্‌বেগ হল না, উলটে যেন বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

(৫)

পরের দু-মাস এডওয়ার্ডের ব্যাপারে কেবল কানাঘুষো শুনেই কেটে গেল। লোকে নাকি ওকে বেশির ভাগ সময়েই এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে দেখেছে। চির-অলস এডওয়ার্ডের শরীরে এখন উদ্দীপনার অবধি নেই। অ্যাসেনাথ নাকি মোটামুটি পর্দানশিন হয়ে পড়েছে— খুব একটা বেরোতে দেখাই যায় না। এর মধ্যে এডওয়ার্ড একদিনই আমার বাড়ি এসেছিল, কয়েকটা বই ফেরত দিতে। অ্যাসেনাথের গাড়িটা দেখে বুঝলাম, সেটিকে মেইন-এর জঙ্গল[185] থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আমার বাড়িতে এলেও, সে বেশিক্ষণ ছিল না। খুব লৌকিকতা করে দু-চারটে মধুর বচন শুনিয়ে দ্রুত বিদায় নিল। যাবার সময় কায়দা করে বিদায়সম্ভাষণটুকুও জানাতে ভুলল না। এসবই ঠিক ছিল, কিন্তু একটা খটকা কিছুতেই গেল না।

প্রতিবার আমার বাড়ির দরজায় এসে সে যেভাবে তিন-দুই কোডে ডোর বেল বাজাত, সেটা এবার বাজল না।

কেমন যেন একটা নিঃসীম আতঙ্কে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, যাক, তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়ে বাঁচাই গেছে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, ডার্বি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য কোথায় একটা গেল। শুনলাম, আর্কহ্যামের বসবাসরত এক প্রাক্তন তান্ত্রিকের[186] সঙ্গে নাকি তার বেশ গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তার ইতিহাস মোটেই সাধারণ নয়। শয়তানের ধাড়ি একটি। ইংল্যান্ড থেকে

বিতাড়িত হয়ে সেই তান্ত্রিক এখন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে বাস করে। যা-ই হোক, সে দিনের মেইন থেকে ফেরার সময়কার ঘটনাটা তখনও আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। বারবার ভেবেও জিনিসটার ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে রীতিমতো অস্বস্তি হতে শুরু হল— আর তার সঙ্গে ছিল এক চোরা আতঙ্ক।

এর মধ্যে একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম, ওল্ড ক্রাউনিংশিল্ডের ডার্বিদের বাড়িতে নাকি রাতের বেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। মেয়েদের গলার কান্না— লোকজন বলল নাকি অ্যাসেনাথের গলা। কান্নার শব্দটা নাকি হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায়— আবার নাকি আচমকা থেমেও যায়। যেন কেউ ক্রন্দনরতার মুখ চেপে তার কান্নাটা জোর করে থামিয়ে দেয়। অনেকে নাকি পুলিশে খবর দেওয়ার তোড়জোড়ও করছিল, কিন্তু তার আগেই অ্যাসেনাথ হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমনভাবে বাজার-দোকান করতে শুরু করল— যেন কিছুই হয়নি। লোকজনের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে লাগল স্বাভাবিকভাবে। শোনা গেল, বস্টন থেকে তার বাড়িতে নাকি কোনও এক আত্মীয় এসেছে, তার ফিটের ব্যামো আছে। মাঝেমধ্যেই সেই মহিলার খিঁচুনি হয়— আর তাই কান্নাকাটির শব্দ শোনা যেত।

অ্যাসেনাথের কথার ওপর কথা চলে না। সেই আত্মীয়কে অবশ্য কেউ চোখে দেখল না — তবে কে নাকি বলল, ক্রাউনিংশিল্ডের বাড়ি থেকে ভেসে-আসা বামাকণ্ঠী কান্নার আওয়াজের পাশাপাশি মাঝে মাঝে নাকি পুরুষের গলার কান্নাও শোনা যেত।

রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ একদিন আমার বাড়ির দরজায় ঘণ্টী শোনা গেল— সেই পরিচিত তিন-দুই আওয়াজ। আমি লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। চৌকাঠের ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই পুরোনো এডওয়ার্ড— সেই অভিশপ্ত রাত্রির পর যাকে আমি আর দেখতে পাইনি। এডওয়ার্ডের মুখে খেলা করছে যুগপৎ ভয় ও সাফল্যের আনন্দ। ওকে তাড়াতাড়ি ঘরে ডেকে এনে বসালাম।

"একটু হুইস্কি মিলবে ড্যান?" ঘরে ঢুকে প্রথমেই বলল এডওয়ার্ড। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার গ্লাস পূর্ণ করে দিলাম আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য, যখন সে নিজের থেকে কথা শুরু করবে।

“অ্যাসেনাথ বিদেয় হয়েছে ড্যান। কাল রাত্রে চাকরবাকরগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর হেব্বি ঝগড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমি ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি যেন আমাকে আর এইভাবে উত্ত্যক্ত না করে। ওর সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়। আমারও কিছু ক্ষমতা আছে, ড্যান— তোমাকে এত কথা যদিও আগে বলিনি আমি। ওই ক্ষমতা আমি অনেক চর্চায় আয়ত্ত করেছিলাম। সেই দিয়ে ওর জাদুকে কেটে আমি ওকে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করলাম। আমার প্রতিরোধে রাগে ওর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। কী বিড়বিড় করতে করতে নিজেই সব গুছিয়ে নিল। তারপর তড়বড় করে বেরিয়ে গেল সেই ভরসন্ধেবেলাতেই ট্রেন ধরে বস্টন থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে রওনা দেবে বলে। লোকে অবশ্য ঠারেঠোরে অনেক কিছু রটাবে, কিন্তু আমি নাচার। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বলে দেবে, একটা রিসার্চের কাজে অ্যাসেনাথ বাইরে গেছে।

“আমার বিশ্বাস, নিউ ইয়র্কে গিয়ে কোনও এক গোপন তান্ত্রিক দলের সঙ্গে যোগ দেবে সে। তারপর আরও পশ্চিমের দিকে চলে যাবে। হয়তো সেখান থেকেই ডিভোর্স দেবে আমায়। যাক গে, আপদ বিদেয়! উফ, ড্যান— জানো না কী দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে আমার এ ক-দিন। আমার দেহ চুরি করে, আমাকেই নিজের দেহে বন্দি বানিয়ে রাখত ওই মাগিটা। আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম— সঠিক সময়ের অপেক্ষায়। ওকে বুঝতেই দিইনি আমার মনে কী চলছে— কতটা ঘৃণা জমে রয়েছে সেখানে। ও আমাকে খুব অসহায় ভেবে নিয়েছিল— কিন্তু আমারও দু-চারটে বিদ্যা যে জানা আছে, সেটা বুঝতে পারেনি ডাইনিটা।”

সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখে নিয়ে ডার্বি আবার শুরু করল, “ওর পেয়ারের চাকরগুলো সকালে কাজে এসে ডাইনিটাকে না দেখে আমাকে রীতিমতো জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিল। টাকা মিটিয়ে দিয়ে ব্যাটাদের বিদেয় করলাম। অ্যাসেনাথের বাপের বাড়ির উন্মাদের দল— সব ক-টাকে তাড়িয়েছি। হতচ্ছাড়াগুলো কেমন হাসতে হাসতে চলে গেল — যেন খুব একটা কৌতুকের ব্যাপার!!! আমি দ্রুত বাবার পুরোনো চাকরবাকরদের ডেকে নিয়ে একত্র করলাম। এবার ওই হানাবাড়ি ছেড়ে নিজের পৈতৃক বাড়িতেই ফিরে যাব।”

“তুমি আমাকে হয়তো উন্মাদ ভাবছ, ড্যান। তবে বিশ্বাস করো, আমি যা বলছি, তার বর্ণে বর্ণে সত্যি। আর্কহ্যামের প্রাচীন ইতিহাস যদি তুমি পড়তে, এখানে ঘটে-যাওয়া

রহস্যময় ঘটনা সম্পর্কে যদি তোমার ধারণা থাকত, তাহলে হয়তো তোমার বিশ্বাসে জোর আসত। যা-ই হোক, সে দিন রাতের ঘটনা হয়তো তুমি বিস্মৃত হওনি। অ্যাসেনাথের ভয়ানক কার্যকলাপের ব্যাপারে বলার সময়েই ওর আত্মা এসে আমার চেতনাকে দখল করে নেয়, আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করি আমার বাড়ির লাইব্রেরিতে। ওই জাদুকরির দেহের মধ্যে বন্দি অবস্থায়। আমাকে পাহারা দিচ্ছিল অ্যাসেনাথের ওইসব চাকরবাকরের দল, যাতে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও কাণ্ড না ঘটাতে পারি।

"ওটা কি মানুষের শরীর, ড্যান? উফ— কী ক্লেদাক্ত ঘিনঘিনে সেই শরীর। আর ড্যান, সে রাতে তুমি নিশ্চয়ই ওই ডাইনিটার সঙ্গে পাশাপাশি গাড়িতে চড়ে এসেছ। নিশ্চই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছ..."

নিজের অজান্তেই কেমন যেন কেঁপে উঠলাম সেই রাতের কথাটা মনে করে। ব্যাপারটা মনের ভুল ভেবেই এত দিন নিজেকে প্রবোধ দিয়ে এসেছি আমি— কিন্তু এ কী বলছে ডার্বি! আমার বিস্ময় আর আতঙ্কের বুঝি তখনও কিছু বাকি ছিল। এডওয়ার্ড বলে চলল স্খলিত স্বরে, "নিজেকে বাঁচাতেই হত, ড্যান। আমি শুনে ফেলেছিলাম যে, আমার শরীরটা পাকাপাকিভাবে দখল করে নেওয়ার ফন্দি কষেছে অ্যাসেনাথ। হ্যালউইনের পরের দিনই, চেসুনকুক[187] থেকে খানিক দূরে তান্ত্রিকদের এক গোপন সমাবেশ ডাকা হয়েছিল। আর সেই সমাবেশেই... আমার শরীর চিরজীবনের জন্য হয়ে যেত অ্যাসেনাথের, আর তার শরীরে জোর করে প্রবেশ করানো হত আমাকে। তারপর কিছু একটা করে, অ্যাসেনাথরূপী এডওয়ার্ডকে হয়তো বিষ খাইয়েই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিত ওই ডাইনিটা — বা সেই শয়তানটা।"

চরম বিতৃষ্ণায় এডওয়ার্ডের মুখটা কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে আমার সামনে অনেকটা ঝুঁকে এসে প্রায় ফিশফিশিয়ে বলল, "তুমি জানো না, ড্যান, আমি জানি। আমি জানি, অ্যাসেনাথের শরীর পাকাপাকিভাবে দখল নিয়েছে ওই শয়তান এপ্রাহিম। এপ্রাহিম বেঁচে থাকতে চেয়েছিল আজন্মকাল— ওর বাসনা ছিল অমর হবার। তাই যখন ও বুঝল যে তার নশ্বর দেহের মরণ নিকটেই, তখন সে খুঁজে নিল এমন এক শরীর, যা আমারই মতো, অর্থাৎ তুখোড় মস্তিষ্কসম্পন্ন অথচ ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। অ্যাসেনাথের শরীরে বাসা বেঁধে সে অ্যাসেনাথের আত্মাকে স্থানান্তরিত করল তার প্রাচীন জরাগ্রস্ত দেহে। বিষ খাইয়ে মারল তাকে— অবশ্য তার আগে বন্দি বানিয়ে তাকে রেখে দিয়েছিল

ইন্সমাউথের বাড়ির চিলেকোঠার ছাদের ঘরে। তাই সেখান থেকে দিনের পর দিন ভেসে আসত অসহায় এপ্রাহিমরূপী অ্যাসেনাথের বিলাপ— ককিয়ে ককিয়ে।"

ডার্বির গলা ধরে এল, "ড্যান— আমি দেখেছি এপ্রাহিমকে। অ্যাসেনাথের ওই বড় বড় তীব্র চোখের দৃষ্টিতে দেখেছি, ওর হাতের লেখার মধ্যে দেখেছি। ওকে এমন সব কথাবার্তা আমি বলতে শুনেছি, যা কেবল বিটকেল বুড়োরাই বলতে পারে। আমি বলছি, ড্যান— অ্যাসেনাথের আর অস্তিত্ব নেই। আছে ওই শয়তান, নরকের কীটটা।"

এতটা একটানা বলার পর এডওয়ার্ড কিছুটা শান্ত হল। গলার স্বর আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল তার। বুঝলাম, ছেলেটার ওপর বিশ্রীরকম ধকল গেছে। যদিও তাকে একবার মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু আমি সেরকম কিছু করতে উদ্যোগী হলাম না। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ক-দিন নিঃসঙ্গ, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নিলেই ডার্বির এই অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তবে এই ধাক্কায় হয়তো তার এইসব কালাজাদুচর্চা একটু হলেও কমতে পারে।

"আমি তোমাকে পরে আরও কথা বলব, তবে আমার এখন একটু বিশ্রাম চাই", শ্রান্ত গলায় বলল ডার্বি, "ড্যান, এগুলো অতি পুরাতন কিন্তু বীভৎস ধরনের গুপ্তবিদ্যা। এর সাধকও গুটিকয়েক— তারাও বিশ্বের কোনও কোনায় হয়তো ছড়িয়ে রয়েছে। এ পৃথিবী রহস্যময়ী, তার সব রহস্য কেউ জানে না, কারও জানতে পারার কথাও নয়। আর এসব গূঢ় রহস্যের কিয়দংশও পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। আমি নিজে এই ভয়ানক বিদ্যাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যদি মিসকাটনিকের লাইব্রেরিয়ান হতাম, তাহলে আমি আজই ওই অভিশপ্ত নেক্রোনমিকন আর বাকি ওই ধরনের যত বই আছে, সব পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতাম।"

আমি বুঝলাম, এডওয়ার্ডের আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না।

এডওয়ার্ড বিড়বিড় করতে লাগল, "খুব শিগগিরি ওই বাড়ি ছেড়ে আমি আমার নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠব। এই হতচ্ছাড়া চাকরগুলোকে তাড়িয়ে পুরোনো লোকজনকে আনব। ড্যান, তুমি আমাকে সাহায্য করবে না? বলো? যদি কেউ অ্যাসেনাথের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তাকে তুমি সামলে নেবে তো? জানোই তো, এত লোকজন আমাদের ব্যাপারে জানে — আমাদের বিচ্ছেদটা বেশি জানাজানি হলে সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।"

সে রাতটা আমার বাড়ির গেস্টরুমে কাটিয়ে, পরের দিন সকালে ডার্বিকে বেশ চাঙ্গা লাগল। ব্রেকফাস্টের টেবিলে দু-জনে আলোচনা করলাম, কীভাবে পুরোনো ডার্বি ম্যানসনকে সারিয়ে তুলে তাতে দ্রুত থাকার ব্যবস্থা করা যায়। বুঝলাম, ডার্বি আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

পরের দিন থেকে ডার্বির ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠে গেল। তবে মাঝে মাঝেই সে আমাদের বাড়িতে এসে আড্ডা দিয়ে যেত আমার সঙ্গে, সেই পুরোনো এডওয়ার্ডের মতোই। আমরা ওইসব গুহ্যবিদ্যার মন্ত্র নিয়ে আলোচনাই করতাম না— বিভিন্ন দরকারি কাজের ব্যাপারে কথা হত। ঠিক হল, সব মিটে গেলে সামনের গরমের ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য বেড়িয়ে আসা যাবে আমার ডার্বি জুনিয়রকে সঙ্গে নিয়ে।

অ্যাসেনাথের ব্যাপারে আমরা আর উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু হলে কী হবে, গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সেটাও নয় সহ্য হত, কিন্তু ডার্বির একটা ব্যাপার আমার পছন্দ হল না। ক-দিন আগে মিসকাটনিকের এক সমাবর্তনে গিয়েছিলাম। সেখানে আর্কহ্যামের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একটু বেশিই পান করে আমার সামনে একটি অদ্ভুত তথ্য উগরে দেন।

মোজেস, অ্যাবিগেল সার্জেন্ট আর ইউনিস ব্যাবসনের নামে নাকি প্রতি মাসেই একটা মোটা অঙ্কের চেক ডার্বি পাঠিয়ে থাকে ইন্সমাউথের ঠিকানায়। ওল্ড ক্রাউনিংফিল্ডের অভিশপ্ত বাড়ির বিতাড়িত চাকরাকরদের প্রতি ডার্বির কীসের টান, সেটা বুঝতে পারলাম না। ডার্বি আমাকে ব্যাপারটা জানায়ওনি। আরও একটা খটকা রয়ে গেল। ওল্ড ক্রাউনিংশিল্ডের অনেক রহস্যের সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি রহস্য।

আমি চাইছিলাম, গরমের ছুটিটা দ্রুত আসুক, যাতে এডওয়ার্ডকে এই শহরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে কয়েক দিনের জন্য বের করে নিতে পারি। কিন্তু যতটা সহজে সে আরোগ্য পাবে ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা ততটা সহজ হচ্ছিল না। এডওয়ার্ডের পৈতৃক ম্যানসনের মেরামতি ডিসেম্বরের মধ্যে হয়ে গেলেও, সে ঠিক সুস্থির হতে পারল না। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে, ওল্ড ক্রাউনিংফিডল্ডের বাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দেবার দিনক্ষণ পেছোতে লাগল সে। যেন কী একটা অস্থিরতা গ্রাস করেছে এডওয়ার্ডকে। তার ছটফটানি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। যদিও সে ওই বাড়িটায় থাকত না— বা ওখানে আর থাকার

তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, তবুও বাড়িটা যেন কী এক অমোঘ আকর্ষণে এডওয়ার্ডকে রোজ টানতে থাকল।

এডওয়ার্ডের বাপের আমলের যে খানসামা, তার সঙ্গে দেখা করে খবর জানতে চাইলাম। সে জানাল, এডওয়ার্ডের অবস্থার বিশেষ উন্নতি নেই। একা একা লাইব্রেরিতে সারাক্ষণ ছটফট করে বেড়ায় সে। আমি ভাবলাম, অ্যাসেনাথ হয়তো তাকে ভুলভাল চিঠিপত্র লিখছে, যার ফলে সে মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু খানসামা জানাল, এরকম কোনও চিঠি এডওয়ার্ডের নামে আসেনি— অন্তত এ বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে তো নয়ই।

(৬)

ক্রিসমাসের সময়ের একদিনের কথা। এডওয়ার্ড তখন আমার বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই আসে। সে দিনও সন্ধেটা আমার ঘরে বসে আগামী গরমের ছুটির ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল। আচমকা এডওয়ার্ড লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে— বিষম আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত। যেন সে জেগে জেগেই ভয়ানক কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে।

"আমার মগজ... ড্যান— কেউ যেন টানছে, পেছন থেকে টানছে। তাকে আঁচড়াচ্ছে, খাবলাচ্ছে। ওই ডাইনিটা, ওই ওই শয়তান এপ্রাহিমের কাজ এটা। কামগ— কামগ!! মহান সোগথ, সোগথের গহ্বর— ইয়াআ— সাব নিগুরাথ! সহস্র তারুণ্যের নিয়ন্ত্রক অজ!! আগুন— আগুন। লেলিহান আগুনের শিখা— দেহহীন, মৃত্যুহীন। এই তো, এখানেই, এই ধরিত্রীতেই..." ডার্বি চিৎকার করে উঠল।

আবার শুরু হল!! ডার্বিকে হাত ধরে বসালাম। জোর করে গিলিয়ে দিলাম খানিক হুইস্কি। চরম ঔদাসীন্যে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তারপর আবার বিড়বিড় করতে লাগল নিজের মনে।

"আবার আবার— সে চেষ্টা করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। আমার বোঝা উচিত ছিল আগেই— এ জিনিস বন্ধ হওয়ার নয়। কিছু দিয়েই নয়— না দূরত্ব, না জাদু, না মৃত্যু, কেউই আমার এই অভিশপ্ত ভবিতব্যকে আটকাতে পারবে না। এরা আসে, শুধুমাত্র রাতেই আসে— হানা দেয় নিঃশব্দে। আমি, আমি পালাতে পারব না, ড্যান। উফফ— কী ভয়ানক, কী বীভৎস। ড্যান, আমি বোঝাতে পারব না..."

চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল ডার্বি, আর কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল। পতনোন্মুখ ডার্বিকে জাপটে ধরে আমার ঘরে শুইয়ে দিলাম। প্রথমে ভাবলাম, ডাক্তার ডাকব, কিন্তু পরে বুঝলাম, ডাক্তার এলেই ডার্বির মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। দেখাই যাক-না— নিজে থেকে ঠিক হয় কি না। এতশত ভেবে আমিও শুতে গেলাম।

সকাল উঠে দেখি, ডার্বি খুব ভোরেই বেরিয়ে গেছে— নিঃশব্দে। ওর খানসামাকে ফোন করে জানতে পারলাম, নিজের বাড়িতে পৌঁছে একতলার লাইব্রেরিতে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে ডার্বি।

এরপর থেকে ডার্বির মানসিক অবস্থা খুব ঠুনকো হয়ে পড়ল। আমি প্রায় প্রতিদিনই ওর বাড়ি যেতাম, আর ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে আড্ডা মেরে ওকে প্রফুল্ল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে আমার কথার উত্তর দিলেও, মাঝে মাঝেই ডার্বি শূন্যদৃষ্টিতে একমনে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকত। কোনওভাবে অ্যাসেনাথের প্রসঙ্গ, ডার্বির বিবাহিত জীবন বা আনুষঙ্গিক কিছুর খোঁজ উঠে পড়লে, এডওয়ার্ডকে আর রোখা যেত না। উন্মাদের মতো চিৎকার করে হাত-পা ছুড়তে শুরু করে দিত সে।

ডার্বির ডাক্তার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আর উকিল— তিনজনের সঙ্গেই আমি ওর অবস্থা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করলাম। ডাক্তারবাবু তাঁর দুই সহকর্মীকে নিয়ে ডার্বিকে দেখতেও এলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপনে ডার্বির শারীরিক খিঁচুনি এবং মানসিক পরিবর্তন এত তীব্র হতে লাগল, যে আমার পক্ষে তা সহ্য করা মুশকিল হয়ে উঠল। শেষমেশ যা আশঙ্কা করেছিলাম, সেটাই ঘটল। অ্যাম্বুলেন্সে করে ডার্বিকে আর্কহ্যামের পাগলাগারদে নিয়ে গেলেন ডাক্তার।

সপ্তাহে দু-দিন আমি ওকে দেখতে যেতাম। যেহেতু ওর অভিভাবক বলতে কেউ ছিল না, আমিই ওর অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলাম। গরাদের ওপার থেকে ডার্বির রক্ত-জল-করা বন্য চিৎকার, নিশ্বাসের শব্দের মতো ফিশফিশানি আর প্রলাপ শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যেত আমার। একটা অসংলগ্ন বাক্য সে পুনরাবৃত্তি করে যেত, "আমায় করতে হত... করতে হতই এটা আমায়। ওরা নিয়ে যাবে, আমায় ধরে নিয়ে যাবে— ওইখানে, ওই অন্ধকার নরকে। ও মা গো— ড্যান, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও।"

ডার্বির সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, এই পর্যায়ে সেটা আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল। কেবল আমিই আশায় বুক বেঁধে ছিলাম। ডার্বি ম্যানসনে আমি ওর পুরোনো চাকরবাকরদের আবার বহাল করলাম। ওল্ড ক্রাউনিংফিল্ডের বাড়িটার কী গতি করব, সেটা আমি ভেবে পেলাম না। নানা প্রাচীন ও গুহ্যবিদ্যার আকরগ্রন্থ ও জিনিসপত্র সংবলিত বাড়িটির ভাগ্য ডার্বির হাতেই ছেড়ে দেওয়া মনস্থ করে আমি একজন সাফাইকারীকে সপ্তাহে দু-দিন গিয়ে বাড়িটির বড় ঘরগুলি ঝাড়পোঁছ করতে আর ফার্নেসে আগুন জ্বেলে রাখতে নির্দেশ দিলাম।

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যা যুগপৎ আশাপ্রদ এবং ভয়ংকর। পাগলাগারদ থেকে আমার কাছে আচমকা ফোন এল এই মর্মে যে, ডার্বির চেতনা এবং যুক্তিবোধ ফিরে এসেছে। বেশির ভাগ স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেলেও, মানসিক সুস্থতাটুকু যে ফিরিয়ে আনা গেছে, সে ব্যাপারে ডাক্তাররা নিশ্চিত। যদিও তাকে এখন কয়েকদিন নজরদারিতে রাখা হবে, তবে ডার্বির অবস্থা বেশ আশাজনক। পুরোনো মতিচ্ছন্নতায় ফেরত যাবার সম্ভাবনা কম। হয়তো হপ্তাখানেক বাদেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে আমি প্রায় ছুটে গেলাম হাসপাতালে। কিন্তু যখন নার্স আমাকে এডওয়ার্ডের কাছে নিয়ে গেল, বিস্ময়ে, আতঙ্কে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলাম। বিছানার ওপর বসে আমার দিকে যে রুগি হাত বাড়িয়ে দিল, তার এনার্জি এবং ব্যক্তিত্ব দেখে চমকে গেলাম। এডওয়ার্ডের পক্ষে এত চনমনে থাকা তো অসম্ভব। যে এডওয়ার্ডকে আমি চাক্ষুষ করেছি এই সেদিন পর্যন্ত, তার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার সঙ্গে এই মানুষটার তুলনাই চলে না। কেউ এত চটপট ঠিক হতে পারে নাকি? তা-ও ওরকম পর্যায়ের এক মানসিক আঘাত অতিক্রম করে?

আমি বুঝলাম, গণ্ডগোল রয়েছে, বিস্তর গণ্ডগোল। যখন রুগি আমার সঙ্গে কথা বলল, আমার দিকে তাকাল— আমি চকিতে বুঝে গেলাম এ সেই অ্যাসেনাথ বা এপ্রাহিম। একই চাহনি, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, মার্জিত কিন্তু বিদ্রুপাত্মক কথা বলার ভঙ্গি— আমাকে মুহূর্তে সেই রাতের গাড়ির স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। আমি বুঝলাম, এ সেই— যে সে রাত্রে আমাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, আমার বাড়িতে এসে ভুলে ভরা সংকেতে ডোর বেল বাজিয়েছিল। কিছুক্ষণ পূর্বের আমার হর্ষোৎফুল্ল মন কী এক নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কে আর বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেল।

ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার আর কোনও কারণ বা যুক্তি দিতে পারলাম না। কিন্তু আমার বারংবার মনে হতে লাগল যে, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। এ যদি এডওয়ার্ড না নয়, তাহলে সে এখন কোথায়? এই মূর্তিমান আতঙ্ককে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? একে কি দুনিয়ার বুকে চলে-ফিরে বেড়াতে দেওয়াটা উচিত হবে?

হাজার প্রশ্নের ভিড়ে আমার মাথাটা সারাদিন ব্যস্ত রইল। এডওয়ার্ডের দেহের মধ্যে ঠিক কে রয়েছে? কী রয়েছে? ওই বড় বড় চোখের তারায় যে জ্যোতি দেখেছি, সেটা কার? কে ওই দেহের মধ্যে দিয়ে আমাদের দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করছে, অনুভব করছে? রহস্যের খাসমহলে যেন আমি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। বাকি কাজকর্ম শিকেয় উঠল। পরের দিন সকালে হাসপাতাল থেকে ফোন এল, যে এডওয়ার্ড একই রকম রয়েছে, অবনতির কোনও লক্ষণ নেই। পরের দিন সকালেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু সে দিনই রাত্রের দিকে আমার চরম স্নায়ুবৈকল্য হবার উপক্রম হল।

সেই ঘটনাই আমি এবার আপনাদের বলব।

(৭)

সেই রাতের কথা মনে করলে এখনও নিঃসীম আতঙ্কে শিউরে উঠি— ভয়ের এই আদিম অনুভূতি কীভাবে যে আমার মনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে, তা আমার ধারণার বাইরে। কিছুতেই সে অবস্থা থেকে আমি আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি।

মাঝরাতের একটা টেলিফোন কল দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। বাড়িতে আমি একাই জেগে ছিলাম। ফোনের আওয়াজ শুনে লাইব্রেরিতে গিয়ে ফোনটা ধরলাম। নিঃশব্দ। কয়েকবার ‘হ্যালো’ ‘হ্যালো’ করে রিসিভারটা সবে ক্র্যাডেলে রাখতে যাচ্ছি, আচমকা একটা শ্বাসের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ ভীষণ কষ্ট করে কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্বর ফুটছে না। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম সেই দূরাগত শব্দের অর্থ। জলে ডোবা কোনও ব্যক্তি যেমন কথা বলতে গেলে ‘গ্লাব, গ্লাব’ শব্দ করে, ঠিক সেরকম কিছু একটা যেন শুনতে পেলাম। মনে হল কেউ যেন শব্দ বা বাক্য ভেঙে নির্দিষ্ট ছন্দে কিছু একটা বলতে চাইছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কে, কে? কে বলছেন?”

উত্তর এল, "গ্লাব গ্লাব গ্লাব।"

আওয়াজটা যান্ত্রিক। হতে পারে, ও প্রান্তে যে রয়েছে, তার মাইক্রোফোনটা খারাপ আছে। তাই কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। আমি গলাটা খানিক চড়িয়েই বললাম, "শুনুন, আপনার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আপনি বরঞ্চ ফোনটা রেখে দিন।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ কলটা কেটে দিল।

পরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল, কলটা এসেছিল ওল্ড ক্রাউনিংফিল্ডের থেকে। সে বাড়ির পরিচারিকার রাত্রে থাকার কথাই নয়। পুলিশ যখন বাড়িটা তল্লাশি নিতে গিয়েছিল, তখন ভূগর্ভস্থ ঘরে গিয়ে দেখতে পায়, সব কিছু কীভাবে ওলটপালট হয়ে আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চতুর্দিকে। আলমারি তছনছ করা, টেলিফোনের ওপর অদ্ভুত সব হাতের ছাপ। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা বিকট পূতিগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ অবশ্য নিজের মতো একটা থিয়োরি খাড়া করে ফেলে বাড়ির চাকরবাকরগুলোকে ধরার জন্য হুলিয়া জারি করে তৎক্ষণাৎ।

ধরা পড়ার পর চাকরগুলো স্বীকার করেছিল, পূর্বেকার কোনও কৃতকর্মের পৈশাচিক প্রতিশোধ নিতে এসব করা হয়েছে। কে বা কারা করেছে, সে বিষয়ে তারা অবগত নয়। তবে সেই প্রতিশোধের আগুনে আমিও জ্বলেছি, কারণ এডওয়ার্ডের বন্ধু, পরামর্শদাতা বলতে কেবল আমিই ছিলাম।

ওই মূর্খ পুলিশের দল কী জানে? ওরা জানতেও পারবে না, কী হয়েছিল এডওয়ার্ডের সঙ্গে। কিছু আদিম রহস্য সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে পৃথিবীর বুকে তাদের অধিকার কায়েম করে এসেছে। সেই রহস্যের অন্তে যে ভয়ানক সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তাকে অনুধাবনের ক্ষমতা ছিল কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের। তারা এই রহস্যের চাবিকাঠিকে লুকিয়ে রেখেছিল মানুষের অধীত জ্ঞানের সীমানা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু কেউ কেউ তার সন্ধান পায়— খুঁড়ে তুলে আনে সেই গুপ্তজ্ঞান— মুক্তি দিতে চায় সেই মূর্তিমান আতঙ্কদের। বিপন্ন হয়ে পড়ে পৃথিবী, বিপন্ন হয়ে পড়ে তার মনুষ্যজগৎ। এপ্রাহিম, অ্যাসেনাথ— এরা ওই পিশাচের এক-একটা রূপ। এডওয়ার্ডকে তারা নরকে টেনে নিয়ে গেছে— এবার, এবার আমার পালা।

আমি কীভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারতাম? ওই বিপুল পৈশাচিক শক্তি মানবদেহের সীমানা অতিক্রম করেছে বহু আগেই। পরের দিন দুপুরবেলা, নিজের শরীর আর মনকে

সুস্থির করে, মানসিক হাসপাতালে নিজের পিস্তলটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এডওয়ার্ডের খুলি তাক করে আমার পিস্তলটা খালি করে দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি যে, এই অভিশাপ পৃথিবীর বুক থেকে চিরনিশ্চিহ্ন হল কি না— আমি চাইছিলাম ওর দেহটা দাহ করতে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে ওর প্রতিটা অংশ। কিন্তু হা হতোস্মি!! দেহটাকে নাকি এখনই কবর না দিয়ে সুরতহালের জন্য কাটাছেঁড়া করা হবে। আমি বারবার বলছি, ওকে পোড়াও, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। না হলে কারও মুক্তি নেই।

ওই জীবন্ত দেহটাকে যখন আমি গুলি করি, আমি নিশ্চিত ছিলাম সে এডওয়ার্ড নয়। তবে আমি জানি, ওরা আমার জন্য ফিরে আসবে— আসবেই। তবে আমার ইচ্ছাশক্তি এত দুর্বল নয়, আমি প্রাণপণে বাধা দেব। আমার পুরুষকার ওই আতঙ্কের সামনে মাথা নত করবে না। কোনও অবস্থাতেই না। একটা প্রাণ, তার জন্য তিন তিনটে দেহ বিসর্জন দিতে হল। এপ্রাহিম, অ্যাসেনাথ এবং এডওয়ার্ড। এবার কে?? আমি নয়— না— না, আমার শরীর আমি ওই দানবকে দেব না, আমি জুঝব— সর্বশক্তি দিয়ে।

কী যে বলছি, নিজেও জানি না। আবোল-তাবোল কথা ছেড়ে আমি বরঞ্চ আসল ঘটনাতে ফিরি। সেই ভয়াল, সৃষ্টিছাড়া, ক্লেদাক্ত, পূতিগন্ধময় নরকের জীবটার কথা আর বলতে চাই না। পুলিশ কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। রাত দুটো নাগাদ ওই বস্তুটাকে তিন তিনজন পথচারী দেখতে পায়— হাই স্ট্রিটের ওপর চলাফেরা করতে। তার পদচিহ্নও পুলিশ খুঁজে পেয়েছে।

রাত দুটোর কিছু পরে, আমার বাড়ির দরজায় ঘণ্টাটা বেজে ওঠে। বোঝাই যাচ্ছিল আগন্তুক যথেষ্ট উত্তেজিত। সে মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছিল এডওয়ার্ডের তিন-দুই সংকেত নকল করার।

গভীর ঘুমের থেকে আচমকা জেগে উঠে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে গিয়েছিল। ডার্বি এসেছে? আমার বাড়িতে? জানি, ওর বহু স্মৃতি হারিয়ে গেছে, তাই হয়তো কোডটা মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সে। হয়তো নতুন এডওয়ার্ড তার পুরাতন চেতনার স্মৃতি খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছে সংকেতটাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সতর্ক হলাম, এত রাতে কী ব্যাপার? ওকে কি আগেভাগেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল? নাকি ও পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে? হাউসকোটটা জড়িয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। নামতে নামতে চিন্তা করলাম, আমি হয়তো সব কিছুই একটু বেশি বেশিই ভাবছি। হয়তো এডওয়ার্ড সুস্থ হয়ে

গেছে— পূর্বের জীবনে ফিরতে চেয়ে সে নিজে কিছুটা উত্তেজিত, উদ্‌গ্রীব। যা-ই হোক-না কেন, এডওয়ার্ড আমার বৈমাত্রেয় ভাই, ওকে আমি সাহায্য করবই।

ওক কাঠের ভারী দরজাটা খুলতেই একটা বিকট বিশ্রী গন্ধ এবং হাওয়ার একটা তীব্র ঝটকা আমাকে পেড়ে ফেলল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি ছিটকে পড়ে গড়িয়ে গেলাম খানিকটা। কিছুক্ষণ সেই পূতিগন্ধময় ভারী বাতাসে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল আমার। কয়েকবার বমি করার জন্য ওয়াক তুললাম। তারপর একটু সুস্থির হয়ে তাকিয়ে দেখি, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালচে ছোটখাটো কুঁজো অবয়ব। আমি চমকে উঠলাম— এটা আবার কে? আমি তো একে এডওয়ার্ড ভেবেছিলাম।

ম্লান আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, অবয়বটার শরীরে লেপটে রয়েছে এডওয়ার্ডেরই ওভারকোট। কিন্তু আগন্তুক এতটাই বেঁটে যে, কোটের নীচের অংশটা পুরোপুরি মাটি স্পর্শ করছে। হাতা গোটানো হলেও, সেখান থেকে ডার্বির হাতও দেখা যাচ্ছে না। আগন্তুকের মাথাটা কেমন যেন ঘাড়ের ওপর জবুথবু হয়ে বসানো। সারা মুখে এডওয়ার্ডের স্কার্ফটা জড়িয়ে রাখা, তার ফলে মুখটাও দৃশ্যমান নয়। এটা কী? বিপুল কৌতূহলে দ্বিধাগ্রস্তভাবে মূর্তিটার দিকে এক পা এগোতেই, সেটা একটা শব্দ করে উঠল, “গ্লাব গ্লাব।” শব্দটা করেই সে আমার দিকে একটা দলাপাকানো কাগজ ছুড়ে দিল। কাগজটা তুলে দেখি, সেটা ঘন হাতের লেখায় ভরতি একটা চিঠি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আমি চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

নিশ্চিতভাবেই এটা এডওয়ার্ডের হাতের লেখা। কিন্তু সে এত বড় একটা চিঠি লেখার কষ্ট করতেই বা গেল কেন, যখন একটা ফোন করলেই আমাদের মধ্যে কথা হতে পারত? আর লেখাটাই বা এত অপরিষ্কার, কাঁপা-কাঁপা কেন? বাইরের হালকা আলোতে চিঠিটা ভালোভাবে পড়া গেল না— তাই ঘরের মধ্যে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিলাম। বাইরের ওই মূর্তিটাও থপথপ করতে করতে আমার সদর দরজা পেরোল, কিন্তু আমার পড়ার ঘরের চৌকাঠ পেরোল না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল। ভাগ্য ভালো, এত কিছুর মধ্যেও আমার স্ত্রী-র ঘুম ভাঙেনি, না হলে এই বস্তুটিকে দেখে তিনি যে কী করতেন তা ভাবতেও ভয় করছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার হাঁটু কাঁপতে লাগল। বেশিক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি আমি— জ্ঞান হারিয়েছিলাম সামান্য পরেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি, সেই অভিশপ্ত

চিঠিটাও হাতেই ধরা রয়েছে। চিঠির বয়ান এরকম—

"ড্যান, হাসপাতালে যাও আর ওটাকে খতম করো, নির্মূল করো ওটাকে। ওই জিনিসটা আর এডওয়ার্ড ডার্বি নয়। ওর মধ্যে এখন কে বসে আছে জানো? অ্যাসেনাথ। সাড়ে তিন মাস আগেই যে মৃত!! আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, ড্যান। অ্যাসেনাথ বাড়ি ছেড়ে যায়নি, আমি ওকে হত্যা করেছিলাম। আজ না-হয় কাল আমি সেটা করতামই। আচমকাই আমি এই সিদ্ধান্তটা নিই। সে রাতে আমরা একা ছিলাম, আর আমার আত্মা আমার নিজের দেহেই ছিল। ওর অন্যমনস্কতার সুযোগে হাতের কাছে রাখা মোমবাতিদানটা দিয়ে ওর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দিই। না হলে, হ্যালোইনের পরদিনই গুপ্তবিদ্যার মাধ্যমে আমার দেহকে কবজা করে নিত ও।

"সেলারের মধ্যে পুরোনো বাক্সগুলো যেখানে ডাঁই করা আছে, তার নীচে ওকে মাটিচাপা দিই। আর সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করি। পরের দিন সকালে চাকরগুলো কিছু সন্দেহ নিশ্চয়ই করেছিল, কিন্তু ওদের নিজেদেরই এত কুকর্ম রয়েছে যে, ওরা যেচে পুলিশের কাছে যেতে সাহস করেনি। আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধও রাখতাম, কিন্তু জানতাম না— এই বিশেষ কাল্ট-এর লোকজন পরে কী করতে পারে। প্রথমে আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম, আমার মগজটাকে, আমার আত্মাকে যেন বাইরে থেকে থেকে কেউ টানছে, উপড়ে নিতে চাইছে আমার চেতনাকে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, এপ্রাহিম বা অ্যাসেনাথের মতো আত্মারা তাদের দেহ থেকে ততক্ষণ পুরোপুরি মুক্ত হয় না, যতক্ষণ তাদের দেহটার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অ্যাসেনাথ তাই আমাকে ছেড়ে যায়নি, আমাকে টেনে রাখত, চেষ্টা করত, কীভাবে আমার মধ্যে ঢুকে পড়বে, দখল করবে আমার শরীরটা। আর বদলে আমার আত্মাকে ঢুকিয়ে রেখে যাবে সেলারের তলায় বাক্সের নীচে পোঁতা ওই দেহাবশেষের মধ্যে।

"আমি জানতাম, কী হতে চলেছে। আমি তাই মরিয়া হয়ে অভিনয় করলাম হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এত করেও কিছু হল না। একদিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম নিকষকালো অন্ধকারের মধ্যে দমবন্ধ অবস্থায়। অ্যাসেনাথের পূতিগন্ধময় শবদেহের মধ্যে, সেলারের তলায়।

“আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার শরীরে অ্যাসেনাথ পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়েছে। সে হাসপাতালেই রয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। হ্যালোইনের পরে যে গুপ্ত অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তাতে তার শারীরিক উপস্থিতির আর দরকার নেই। সে যে ফিরে এসেছে, এটুকু বার্তাই সেই ভয়ানক তন্ত্রানুষ্ঠান সম্পন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সেই ভয়ানক উপাসনার ফলশ্রুতি হিসাবে এই পৃথিবীর যে কী হবে, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। আমি আর থাকতে পারলাম না। কোনওমতে সেলারের সেই বন্দিদশা থেকে হাঁচোড়পাঁচোড় করে বেরিয়ে এলাম।

“আমি এখন আর কথা বলার অবস্থায় নেই। তাই টেলিফোন করে লাভ নেই, বন্ধু। তবে দেখলাম, আমি এখনও মোটামুটি লিখতে পারি। কোনওমতে জোড়াতালি দিয়ে তোমাকে আমার শেষ চিঠিটা লিখে পাঠাচ্ছি। ধরে নাও এটাই আমার অন্তিম ইচ্ছে এবং নির্দেশ। ওই শয়তানটাকে মেরে ফেলো। যদি এই পৃথিবীতে শান্তি চাও, তাকে বাঁচাতে চাও, তাহলে ওই মৃতদেহটাকে জ্বালিয়ে দেবে। কোনও অস্তিত্ব যেন না থাকে ওটার। আর যদি থাকে, তাহলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে, ওটা ফিরে এসে কী করতে পারে।

“গুপ্তবিদ্যা, অকাল্ট, কালাজাদু থেকে দূরে থাকো ড্যান। বিদায়। তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। পারলে পুলিশকে বুঝিয়ে বোলো। তোমাকে এসবের মধ্যে টেনে আনার জন্য আমায় ক্ষমা করে দিয়ো ড্যান। আমার চিরশান্তির সময় ঘনিয়ে আসছে। এই নড়বড়ে কাঠামো আর আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

“ওটাকে নিশ্চিহ্ন করো ড্যান। চিরতরে।

তোমারই—

এড।”

চিঠিটার শেষাংশ পড়েছিলাম জ্ঞান ফেরার পর। প্রথম কিছুটা পড়ার পরই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি আমি। যখন জেগে উঠি, তখন দরজার কাছে পড়ে-থাকা জিনিসটা দেখে আর গন্ধ শুঁকে আবার অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম হয়। অবশ্য ততক্ষণে এই চিঠির বার্তাবাহকের দেহে আর প্রাণ ছিল না।

আমার খানসামাটি বেশ শক্তপোক্ত বলতে হবে। সকালে উঠে আমার ঘরের চৌকাঠে জিনিসটা দেখেই সে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ আসার আগেই আমি

ওপরের ঘরে বিছানায় স্থানান্তরিত হয়েছিলাম।

এডওয়ার্ডের নোংরা কোট আর প্যান্টের মধ্যে থেকে যা বেরোল, সে বীভৎসতা হাড় হিম করে দেওয়ার মতো। চটচটে হয়ে-যাওয়া গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্যে কয়েকটা হাড়ের টুকরোও ছিল— ছিল ভাঙা খুলির টুকরোও। দাঁতের গঠন দেখে পরে জানা গিয়েছিল— খুলিটা অ্যাসেনাথের।



প্রথম প্রকাশ: *১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'উইয়ার্ড টেলস' পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশ পায়।*

ভাষান্তর: *সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়*



দ্য শ্যাডো আউট অব টাইম

লাভক্র্যাফটের শেষ জীবনের এই গল্পটির সঙ্গে একমাত্র "অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস" গল্পটিরই তুলনা করা যায়। এখানেও এসেছে লাভক্র্যাফটের প্রিয় থিম, মানুষের মনের অদল-বদল। কিন্তু তার সঙ্গে এই গল্পে এসেছে কথক পিসলির জীবন কাহিনি, আশা নিরাশায় দুলতে থাকা মানুষটি বোঝার চেষ্টা করছিল তার হারিয়ে যাওয়া বছরগুলির অর্থ। গল্পের শেষ চমকে লাভক্র্যাফট বুঝিয়ে দিয়েছেন এই বিশাল মহাবিশ্বে মানুষের স্থান কতই না নগণ্য।

অকাল তমসা

(The Shadow out of Time)



আমার নাম ন্যাথানিয়েল উইনগেট পিসলি। ছ-সাত বছর আগে যদি কেউ খবরের কাগজ বা বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল জার্নাল নিয়মিত ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকেন তাহলে তাঁদের কাছে আমার নামটা চেনা-চেনা ঠেকতেও পারে। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩ সাল অবধি আমার স্মৃতিবিলোপ তথা স্মৃতিবিভ্রাট নিয়ে ওই সময় কাগজে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছিল। এ ছাড়া ম্যাসাচুসেটস শহরে ক্রমাগত ঘটতে-থাকা ভৌতিক, অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে ডাকিনীবিদ্যার যোগসাজশ নিয়েও লেখা হয়। যার সূত্রপাত ঘটে আমার বাড়িতে। আমি জানি, আমার এই উন্মাদনা আমার মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে আসেনি। বাইরের সমান্তরাল কোনও জগৎ থেকে হঠাৎ করে অন্ধকার কেন নেমে এল এই পৃথিবীর বুকে! আমার এই লেখা পড়তে পড়তে আপনিও যখন সেই উৎস সন্ধান করবেন, তখন এই তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখার প্রথমদিকের অংশগুলো বাড়ি ফেরার পথে জাহাজের কেবিনে বসে লেখা। এইসব লেখাই আমি আমার মেজ ছেলে উইনগেট পিসলিকে দেব। উইনগেট এখন মিসকাটনিক ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রফেসার। ও-ই আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য, যে আমার ওই স্মৃতিবিভ্রাটের সময় থেকে সবসময় আমার পাশে ছিল। শুধু তা-ই নয়, উইনগেট আমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করেছিল, এবং আমার এই বিচিত্র কেসের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করেছিল। আমি উইনগেটকে মুখেও বলতে পারতাম, কিন্তু আমার এলোমেলো কথা দিয়ে সবটা হয়তো বোঝানো সম্ভব নয়। এই লেখা পড়ে আসল সত্যিটা কী, সেটা ও ঠিক খুঁজে বের করবে। দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্কের মধ্যে বাইশ বছর কাটানোর

পর ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসের ১৭-১৮ তারিখ নাগাদ একরাতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় অবশেষে আমি খুঁজে পাই বহু যুগ ধরে সংরক্ষিত সেই প্রাচীন ভয়ংকর সূত্র। এই সূত্রের আসল সত্যি এতটাই ভয়ানক যে, আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যদি সত্যিই এটা ঘটতে থাকে, তাহলে পৃথিবীর আসন্ন বিপদ প্রতিরোধের জন্য গোটা মনুষ্যজাতিকে প্রস্তুত থাকতে হবে। হয়তো সেই কারণেই আমি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সারাজীবন খুঁজে বেরিয়েছি সেই আদিম অজানা অপার্থিব শক্তির কারিগরকে। আমার ধারণা, সেই অভিশপ্ত বৃহস্পতিবার আমার যে নারকীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা আর কোনও জীবিত মানুষের হয়নি। সেই আতঙ্কের সময় আমি একা ছিলাম। আমার মানসিক সুস্থতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি আমার কাছে ছিল না। আর এখন আমি শুধু নিজের মানসিক সুস্থতা প্রমাণ করতেই নয়, সমস্ত মানুষকে সতর্ক করার জন্যই এটা লিখছি।

আমি আগেই বলেছি, আমার এই উন্মাদনা বংশানুক্রমিকভাবে আমার মধ্যে আসেনি। আমার বাবা জোনাথন আর মা হানা দু-জনেই ছিলেন হ্যাভারহিল শহরের একেবারে আদ্যিকালের মানুষ। আমার জন্ম, লেখাপড়া সব কিছুই হ্যাভারহিলের গোল্ডেন হিলের কাছে বোর্ডম্যান স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতে। ১৮৯৫ নাগাদ আমি মিসকাটনিক ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ঢুকি। তার আগে আর্কহ্যামের সঙ্গে আমার কস্মিনকালেও কোনও যোগাযোগ ছিল না। ১৮৯৬ সালে অ্যালিস সিজার বলে হ্যাভারহিলেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করি। তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমাদের জীবন বছর তেরো বেশ ভালোভাবেই কাটছিল। প্রথমে ইউনিভার্সিটির সহকারী ও পরে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলাম। এই সময়গুলো আমার কাজের চাপ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, এইসব গুপ্তবিদ্যা, পরা-মনোবিজ্ঞান বা অপ-মনোবিজ্ঞান— কোনও কিছু নিয়েই মাথা ঘামাবার মতো অবস্থা আমার ছিল না।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিনটা। দিনটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার মনে আছে। দিনটা ছিল, ১৪ মে, ১৯০৮— বৃহস্পতিবার। এই দিন থেকেই শুরু হল আমার মগজের যাবতীয় স্মৃতির ওলটপালট। ব্যাপারটা প্রথমে তেমনভাবে টের না পেলেও, পরে যখন হঠাৎ করে মৃদু আলোয় ঝড়ের গতিতে শেষ কয়েক ঘণ্টার সব দৃশ্য দেখতে লাগলাম, বুকটা ছ্যাঁত

করে উঠল। এলোমেলো ওই দৃশ্যগুলো আমার মাথা পুরোপুরি ঘেঁটে দিল। হঠাৎ করেই যেন কোনও অশুভ ইঙ্গিত টের পেলাম। মাথায় যেন কেউ হাতুড়ি পিটতে লাগল। আর-একটা জিনিস টের পেলাম, কেউ যেন আমার মগজের যাবতীয় চিন্তাভাবনাকে দখল করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বেলা দশটা কুড়ি নাগাদ যখন আমি ক্লাস নিচ্ছি, হঠাৎ করেই চোখের সামনে বিদঘুটে কিছু অপরিচিত জ্যামিতিক আকার ভেসে উঠল। ক্লাসরুমটা মনে হল যেন অন্য কোনও একটা অদ্ভুত আকারের ঘর। এরপর অর্থনীতির ছ-নম্বর অধ্যায় থেকে সরে গিয়ে ছাত্রদের খুব গুরুত্ব সহকারে কী বলেছিলাম, এখন মনে নেই। তবে ছাত্রদের চাউনি দেখে টের পেয়েছিলাম, তারা ভয়ে হতবাক হয়ে গেছে। এরপর আমি প্রায় অচেতনভাবে চেয়ারে বসে পড়ি। আমি নাকি এমন অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম যে, কেউ আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলতে পারেনি। যেমন তারা পারেনি পাঁচ বছর চার মাস তেরো দিনে, দিনের আলোয় এই দুনিয়ার বিপর্যয় ঠেকাতে। এর পরের ঘটনাগুলো লোকের মুখে শুনেছিলাম। ২৭ নং ক্রেন স্ট্রিটের বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা শুরু হলেও প্রায় সাড়ে ষোলো ঘণ্টা আমার কোনও হুঁশ ছিল না।

১৫ মে ভোর ৩টে নাগাদ আমি চোখ খুলে কথা বলতে শুরু করি। কিন্তু আমার সেই বিচিত্র ভাষা আর চাউনি দেখে বাড়ির লোকজন আর ডাক্তার রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। আমি যে স্মৃতিশক্তি লোপাট হবার ফলে নিজের পরিচিতি পুরোপুরি ভুলে গেছি— এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়। যদিও আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম স্মৃতিবিভ্রাটের ব্যাপারটা গোপন করার। ওই সময় আমি আমার আশপাশের লোকজনদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। আমার মুখের পেশির নড়াচড়ার সঙ্গে সেই চাউনির কোনও মিল ছিল না। এমনকী আমার কথাবার্তাও কেমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল। গলা দিয়ে যে আওয়াজগুলো বের হত, সেগুলো শুনলে হয়তো কারও মনে হবে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই ক-টা ইংরেজি শব্দ আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি।

প্রায় বছর কুড়ি বাদে ১৯০৮ সালে আর্কহ্যামের সেই বিচিত্র পেশেন্টের রহস্যময় কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে আমেরিকায়। আর্কহ্যামের ডাক্তারবাবুরাও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন। আমার শারীরিক শক্তি ফিরে এলেও হাত-পা ও

অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালানোর জন্য আমাকে বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হত ডাক্তারবাবুদের কড়া তত্ত্বাবধানে। যখন আমি দেখলাম, আমার স্মৃতিবিভ্রাটকে লুকোবার যাবতীয় প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেল, তখন বাধ্য হয়ে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। ডাক্তারবাবুরা ভাবলেন, ওই স্মৃতিবিভ্রাটকে আমি মেনে নিয়েছি স্বাভাবিক হবার বদলে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা, শিল্প, উপকথা ইত্যাদি বিষয়ে আমার তুমুল আগ্রহ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল। আবার কিছু আচরণ নেহাতই খোকাগিরি মনে হল তাঁদের। বলাই বাহুল্য, এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপারগুলো শুধুই জটিলতা বাড়ায়, আর কিছু নয়। এই সময় আমি লক্ষ করলাম, কোনও অদ্ভুত ভাষায় কে যেন আমার মাথার ভেতর থেকে আমাকে ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে চলেছে। এই ভাষাটাকে পার্থিব কোনও কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই এই ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখাই শ্রেয় বলে মনে করি। অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা আমার কাছে ছেলেখেলার মতো হয়ে যায়। অবশ্য এই ভবিষ্যৎ বলাটা দু-তিনবার মিলে যাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয় চারপাশে। একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম, এই ভবিষ্যৎগুলো যখন বলতাম, একটা ভূতুড়ে বিদ্যুতের ঝলক এসেই গায়েব হয়ে যেত। এই ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কেউ লক্ষ করেনি। এদিকে আমি চেষ্টা চালাতে লাগলাম, যত জলদি পারিপার্শ্বিক সব কিছু শিখে নেওয়া যায়। দূর দেশ থেকে কোনও পর্যটক নতুন জায়গায় এলে যেমন করে আর কী। ডাক্তারবাবুদের অনুমতি পাবার পর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটাতে লাগলাম। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জোগাড় করা, তথ্য আর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যেসব গুপ্তবিদ্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেইসব বিষয়ের ওপর লাগাতার গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। যেগুলো পরবর্তীকালে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ইতিমধ্যে সমসাময়িক মনোবিদদের কাছে আমি তখন রীতিমতো এক সেলেব্রিটি। দ্বৈত সত্তার আদর্শ উদাহরণ হিসেবে আমাকে পেশ করে নানা জায়গায় বক্তৃতাও দেওয়া হয়। যদিও বক্তারা আমার আচরণ নিয়ে বক্তৃতায় যা যা বলেছিলেন, সেগুলো আদৌ গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন, নাকি মজা করে তা আমার কাছে আজও রহস্য। এই সময় কারও কাছ থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পাইনি। আমার হাবভাব সবার মনেই ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। আমি যেন সুস্থ স্বাভাবিক সব কিছু ছেড়ে ধীরে ধীরে এক আদিম অন্ধকার ও

গোপন আতঙ্কের জগতে প্রবেশ করছিলাম। আমার নিজের পরিবারও কোনও ব্যতিক্রমী আচরণ করেনি। আমার স্ত্রী আমাকে দেখে ভয়ে শিউরে উঠত। যেন আমি কোনও ভিন গ্রহের বাসিন্দা। ১৯১০ সালে তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়। এমনকী ১৯১৩ সালে আমি স্বাভাবিক হবার পরেও সে আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। এরপর আমার বড় ছেলে আর ছোট মেয়ে কারও সঙ্গেই আমার আর কোনও দিন দেখা হয়নি।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আমার মেজ ছেলে উইনগেট, যার কথা এই লেখার গোড়াতেই আমি বলেছি। আমার আচরণ অচেনা লোকের মতো হলেও উইনগেট সেই ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। হয়তো ওর কচি মাথা ওকে ভরসা জুগিয়েছিল যে, একদিন ওর বাবা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। পরে যখন আমি আদালতের নির্দেশে রেহাই পেলাম, আমি উইনগেটের কাছেই ছিলাম। উইনগেট আমাকে সমস্তরকম সাহায্য করত। অনেক পড়াশোনা, গবেষণা সে চালায় আমার ওই পরিস্থিতির ওপর। এখন ও মিসকাটনিক ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, সে কথা তো আগেই বলেছি।

আমি যদিও এগুলো নিয়ে আর ভাবছিলাম না। কারণ সেই অভিশপ্ত বৃহস্পতিবারে আমার যা যা পরিবর্তন হয়েছিল, সেটা আমার এই স্বাভাবিক সত্তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩— এই পাঁচ বছরে আমার জীবনে ঠিক কী কী ঘটেছিল, হাজার চেষ্টা করলেও আমি আর মনে করতে পারব না। যদি পাঠকরা বিশেষ কৌতূহলী হন তাহলে পুরোনো খবরের কাগজ বা সায়েন্স জার্নালের সাহায্য নিতে পারেন। আমি নিজেও তা-ই নিয়েছি। আমার যা কিছু পুঁজি ছিল, খুব বুঝেসুঝে খরচা করতে হত। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গবেষণা, পড়াশোনা করতে হত। যদিও আমি একাই যেতাম, কিন্তু জায়গাগুলো এমন পাণ্ডববর্জিত যে, যেতে প্রচুর সময় লাগত, তাই খরচাও যেত বেড়ে।

১৯০৯ সালে হিমালয়ে প্রায় এক মাস কাটাই। ১৯১১ নাগাদ আবার আরবের এক অচেনা মরুভূমিতে উটের পিঠে চেপে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালাম[188]। অবশ্য ওই অভিযানগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কিছু জিনিস আমি শিখতে পেরেছিলাম। ১৯১২-র গ্রীষ্মে একটা চার্টার্ড জাহাজে করে উত্তর মেরু রওনা হলাম। গন্তব্য স্পিৎজ বার্গেনের উত্তরদিক[189]। এবারেও হতাশ হলাম। ওই বছরেরই মাঝামাঝি পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় একটা পেল্লায় চুনাপাথরের গুহার সন্ধান পেলাম[190]। গুহা তো নয় যেন গোলকধাঁধা! আমার নিজের পায়ের ছাপ খুঁজতেই অসুবিধে হচ্ছিল রীতিমতো। এদিকে আমার নিজের আচরণ

দেখে আমি নিজেই ঘাবড়ে যেতাম। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া যেখানে থাকতাম, সেখানে সব জায়গায় আমার উন্মাদনার ছাপ ছড়িয়ে ছিল। সব থেকে ঘাবড়ে দেবার মতো ব্যাপার ছিল, সবসময় যেন কোনও দ্বিতীয় সত্তা আমাকে গ্রাস করতে চাইত। যে-কোনও বই আমি একঝলক দেখেই মুখস্থ করে ফেলতাম। যে-কোনও জটিল ধাঁধা যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে ফেলতাম, তা সত্যিই তারিফ করার মতো। এই সময় ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আমার পড়ানো ও অন্যান্য আচরণ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আসতে লাগল। যদিও এই চাকরি নিয়ে আমার তেমন কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এদিকে আর-একটা রিপোর্ট এল, যার বক্তব্য ছিল, আমার সঙ্গে বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যার চক্রের নেতাদের যোগাযোগ আছে। ছাত্ররা সন্দেহ করতে লাগল সমান্তরাল জগতের কোনও বাসিন্দাই এই গুপ্তবিদ্যার উপাসক। যদিও এগুলো গুজব হিসেবেই থেকে যায়। কিছুই প্রমাণ হয়নি। আমার ধারণা, আমি লাইব্রেরি থেকে যেসব প্রাচীন আর নিষিদ্ধ বই নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলাম, সেগুলোই এই গুজবের উৎস। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি বলে কথা! গোপন করা যায়নি। অবশ্য যে বইগুলো থেকে আমি নোটস নিতে শুরু করি, সেগুলো দেখে যে-কোনও কারওই সন্দেহ করার কথা। ডি এরলেটসের কাল্টস ডি গাউলস[191], লুডউইগ প্রিনের ডি ভারমিন মিস্ট্রিজ[192], ভন জানৎসের আনঅসপ্রেলিচেন কাল্টেন[193] বা সেই উন্মাদ আরব আবদুল **আলহাজ্রেডের** লেখা কুখ্যাত 'নেক্রোনমিকন'[194]। নিঃসন্দেহে কোনও সক্রিয় অশুভশক্তিই ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার ভেতর এক অন্য সত্তার সৃষ্টি করেছিল।

১৯১৩-র গ্রীষ্মকালে আমি গতানুগতিক কিছু বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে শুরু করলাম। সবাই ভাবল, খুব শিগগির হয়তো আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠব। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ শুরু করলাম। যদিও মনোবিদদের কাছে এগুলো নিছক মেকি বলেই মনে হতে লাগল। হয়তো তারা ভেবেছিল, আমি নিজের পুরোনো লেখালেখি থেকেই এগুলো আয়ত্ত করেছি।

আগস্টের মাঝামাঝি আমি আর্কহ্যাম থেকে ফিরে এসে আস্তানা গাড়লাম বহু দিন ধরে খালি পড়ে-থাকা ক্রেন স্ট্রিটের বাড়িতে। ইউরোপ আর আমেরিকায় নতুন যত কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, খুব সাবধানে আনাতে লাগলাম। অবশ্যই একেবারে নয়,

বারে বারে। কারণ একটাই, যদি কোনও অতিচালাক জিনিসটা বুঝতে পেরে যায় তাহলে মহাসমস্যার সৃষ্টি হবে। যদিও একজন মজুর, কাজের লোক আর হাউসকিপার ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানত না। আর তারা এ ব্যাপারে কী-ই বা বুঝত? কাঁড়িখানেক রড, হুইল আর আয়নাসমৃদ্ধ খুড়োর কল। এই খুড়োর কল লম্বায় ছিল দু-ফুট, চওড়ায় এক ফুট আর এর ঘনত্ব ছিল এক ফুট। এর কেন্দ্রের আয়নাটা ছিল উত্তল গোলাকার।

২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধেবেলায় আমি হাউসকিপারকে তার হিসাবপত্র বুঝিয়ে বিদায় করলাম। আর কাজের লোককে বললাম পরের দিন দুপুরের আগে না আসতে। সে দিন অনেক রাত অবধি আমার ক্রেন স্ট্রিটের বাড়িতে আলো জ্বলেছিল। আর কথামতোই এক রোগা, শ্যামলা ভিনদেশি গাড়ি চড়ে এসে হাজির হয়েছিল ক্রেন স্ট্রিটের বাড়ির সামনে। রাত একটা নাগাদ বাড়ির সব আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। রাত দুটো পনেরো নাগাদ একজন টহলদারি পুলিশ নাকি দেখেছিল গোটা বাড়িই অন্ধকার, কিন্তু বাড়ির সামনে সেই ভিনদেশির গাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে। ভোর চারটে নাগাদ হঠাৎ করেই গাড়িটা যেন গায়েব হয়ে যায়। সকাল ছ-টা নাগাদ খসখসে, ভাঙা গলায় বিদেশি উচ্চারণে কেউ ড. উইলসনকে ফোন করে জানায় আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা। পরে ওই ফোন কলের হদিশ পাওয়া যায়। ফোনটা করা হয়েছিল বোস্টনের নর্থ স্টেশনের[195] এক পাবলিক বুথ থেকে। দূরপাল্লার ওই কলের হদিশ পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়নি ওই রহস্যময় ভিনদেশির কোনও হদিশ।

ড. উইলসন যখন আমার বাড়ি এলেন, তখন আমি আরামকেদারায় বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছি। সামনে একটা টেবিল। ড. উইলসন টেবিলের ওপর অনেক আঁচড়ের দাগ দেখতে পান, যেন কোনও ভারী জিনিস ওপরে আছড়ে পড়েছে। বিদঘুটে সেই খুড়োর কলমার্কা যন্ত্রটাও গায়েব। নিঃসন্দেহে সেই রোগা, শ্যামলা ভিনদেশিই ওটা নিয়ে গিয়েছে। স্মৃতিবিভ্রাটের পর আমি টুকরো কাগজে যা যা লিখেছিলাম, তার সব কিছু পোড়ানো হয়েছে নিপুণভাবে। লাইব্রেরির ঝাঁজরি সেই কাগজ-পোড়া ছাইয়ে ভরতি। ড. উইলসন লক্ষ করেন, আমি খুব অস্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিচ্ছি। তিনি একটা হাইপোডারমিক ইনজেকশন দেবার পর সেটা স্বাভাবিক হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটা পনেরো নাগাদ জোরে ঝটকা মেরে নড়ে উঠি; এবং আমার সেই পাথুরে মুখে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফিরতে থাকে। ড. উইলসনের মতে, আমার ওই অভিব্যক্তিগুলো কোনও দ্বৈত সত্তার অভিব্যক্তি ছিল না। একেবারেই আমার নিজস্ব ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ১১.৩০টা নাগাদ আমি বিড়বিড় করে কিছু বলতে আরম্ভ করি। ড. উইলসনের মতে সেগুলো কোনও পার্থিব ভাষা ছিল না। আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আমি যেন কোনও কিছুর বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। দুপুরের দিকে বাড়ির কাজের লোক এসে দেখে আমি স্বাভাবিক ভাষায় বিড়বিড় করছি, "ওই সময়ের অর্থনীতি ছিল নিতান্তই একমুখী। জেভনস[196] ব্যাখ্যা করেন, ওই সময় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী যে-কোনও বাণিজ্যই বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওঁর মূল প্রচেষ্টা ছিল বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির চক্রের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন...।"

ন্যাথানিয়েল উইনগেট প্রিসলি হিসেবে আমি ফিরে এলাম নিজের মধ্যে। যদিও আমার কাছে দিনটা ছিল সেই অভিশপ্ত বৃহস্পতিবার। ১৪ মে ১৯০৮। আমি অর্থনীতির ক্লাস নিচ্ছি।

এই অবধি পড়ার পর কেউ হয়তো ভাবছেন, ১৯১৩ সালে আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পর সব কিছু হয়তো খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু আদপেই তা হয়নি। জীবন থেকে যে পাঁচ-পাঁচটা বছর বেমালুম গায়েব হয়ে গেল, সেই ঘাটতি পোষাতে যে আমাকে কী পরিমাণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা কেউ ধারণাও করতে পারবেন না। ক্রেন স্ট্রিটের বাড়িতে বসে বসে এই পাঁচ বছর আমার আচরণ (অন্যদের থেকে শোনা) নিয়ে অনেক দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধোপে টেকেনি। ভাবতে ভাবতে নিজেই অবাক হয়েছি, আবার বিরক্তও হয়েছি। এই সময় আমার মেজ ছেলে আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাবার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯১৪-র ফেব্রুয়ারি নাগাদ ইউনিভার্সিটির চাকরিটায় আবার যোগ দিলাম। আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলাম, যাতে সব ভন্ডুল না হয়ে যায়। কোনওমতে যাতে চাকরিটা টিকে যায়। এই পাঁচটা বছর যে আমাকে কীভাবে ঘেঁটে দিয়েছে, পদে পদে টের পেতে লাগলাম। আমার

আগের মতো মনের জোর আর না থাকলেও নিজের হাবভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু নানারকম অদ্ভুত চিন্তা আর দুঃস্বপ্ন আমাকে নাজেহাল করে রেখেছিল। এদিকে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আমিও ইতিহাসের বিভিন্ন কালান্তক ঘটনা নিয়ে ভাবতে বসে গেলাম (অবশ্যই একটু অন্যরকমভাবে)। সময় সম্পর্কে আমার ধারণা পুরো পালটে গিয়েছিল। সময়ের বিবর্তন, ধারাবাহিকতা সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। সময় নিয়ে নিজেই এক নয়া কাল্পনিক ধারণা বানিয়ে বসলাম। যুগের ঘেরাটোপে আটকে না থেকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ছড়িয়ে-থাকা সেই অনন্তব্যাপী জ্ঞানের সমুদ্রে নিজেকে সঁপে দিলাম। এই বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি কী হতে চলেছে তা যেন আমার সামনে ছবির মতো ভেসে উঠল ভবিষ্যতের আলোয়। যুদ্ধের সব ভয়াবহ স্মৃতি মগজে জমা রইল, এবং কিছু মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ কীরকম কৃত্রিমভাবে এই যুদ্ধের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার ভোল পালটে দিচ্ছে, সেটাও টের পেলাম। আমি অনেককেই আমার এই ধারণার কথা বলেছিলাম। কেউ কেউ আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যেন আমিই পৃথিবীর সেই অষ্টম আশ্চর্য! গণিত বিভাগের কয়েকজন অবশ্য কিছুটা মন দিয়ে আমার এই ব্যাখ্যা শুনলেন এবং আপেক্ষিকতার ওপর নয়া নয়া আবিষ্কারের ওপর কিছু জ্ঞানও দিলেন আমাকে। ওঁরা যে নিজেদের চেনা গণ্ডির বাইরে বেরোতে চান না, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। সময়কালের ওপর আইনস্টাইনের মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও দু-চার কথা শুনতে হল। বিশেষ করে ওই অতিমাত্রিক মতবাদের সমালোচনা।

যা-ই হোক, আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। ওইসব দুঃস্বপ্নের ভয়ানক অনুভূতির প্রভাব আমার ওপর এতটাই পড়েছিল যে, ১৯১৫ নাগাদ চাকরিটা ছাড়তে বাধ্য হলাম। যদিও ওই দুঃস্বপ্ন আমার রোজকার রুটিনে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু যেটা বলার ব্যাপার, সেটা হল, এই সময় ওই দুঃস্বপ্ন একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করল। টের পেলাম, আমার স্মৃতিবিভ্রাট কোনও সাধারণ ব্যাপার ছিল না। একটা অশুভ ইঙ্গিতের পূর্বাভাস ছিল মাত্র। আমার মনের ঘরে সেই দ্বিতীয় সত্তা অনধিকার প্রবেশ শুরু করে দিল রীতিমতো। উদ্দেশ্য একটাই, আমার প্রাথমিক সত্তাকে হটিয়ে দিয়ে সে-ই থাকবে আমার মগজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, একজন চালাতে লাগল আমার শরীর, আর-

একজন আমার মগজ। এই সময় আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ঘেঁটে আমার এই আচরণ সম্পর্কে খোঁজ লাগালাম এবং আরও ভয় পেয়ে গেলাম। আমার আচরণ হয়তো অন্যদের পিলে চমকে দিয়েছিল, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা হল, আমার সচেতন আর অবচেতন মনের গণ্ডি গেল ঘুচে। বিভিন্ন অশুভ জ্ঞান আমার মাথায় কিলবিল করে ঘুরত। ওই অভিশপ্ত পাঁচ বছরে বিভিন্ন বইপত্র ঘেঁটে আর নানা জায়গায় ঘুরে আমি যা যা তথ্য পেয়েছিলাম, তার ওপর শুরু করলাম আরও পড়াশোনা আর গবেষণা। যদিও আমার আসন্ন সব বিপদ একই রকম অদ্ভুত ছিল না। এমন কিছু কিছু স্বপ্ন দেখতাম, যেগুলো সেই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ধারণা আরও মজবুত করে তুলত। আমার মেজ ছেলে উইনগেট আর কিছু পরিচিত মনোবিদ ছাড়া কাউকেই কিছু বলিনি। পাশাপাশি স্মৃতিবিভ্রাটের বিভিন্ন কেস নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলাম নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য। আগেই বলেছি, সেই সময়কার মনোবিজ্ঞানের দুনিয়ায় আমি একজন সেলেব্রিটি হয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমার এই দ্বৈত সত্তার কেস নিয়ে যে যে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, পরা-মনোবিজ্ঞানী, এমনকী প্রেততত্ত্ববিদরাও যা যা লিখেছিলেন বা বলেছিলেন, সেগুলো পড়ে ফেললাম। প্রথমে একটু ভয়ের উদ্রেক হলেও, সত্যি বলতে কী, পরের দিকে কিছুটা সান্ত্বনাও পাই। কারণ আমি বুঝেছিলাম যে, আমার ওইসব স্বপ্ন বা আচরণ কোনও সাধারণ স্মৃতিবিভ্রাটের কেস ছিল না। কারণ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি পাঁচ বছর কাটিয়েছি, তার কাছে এগুলো শিশু। কিছু চিকিৎসা হয়েছিল মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে, আর কিছুটা ছিল সাংবাদিকদের রং-চড়ানো আষাঢ়ে গপ্প। আরও বুঝলাম যে, মানুষের বিবর্তনের বহু যুগ বাদে এই বিরল ঘটনা ঘটেছে, যার শিকার ও সাক্ষী শুধু আমি। হয়তো বিগত কয়েক শতকের ইতিহাস ঘাঁটলে আরও এরকম একটা-দুটো কেস পাওয়া যেতে পারে, আবার না-ও পারে। এত ঘাঁটাঘাঁটি করে যেটা সারমর্ম বুঝলাম যে, এই ঘটনার শিকার হয়েছে সবসময় কোনও ভাবুক বা কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি— যেমন এক্ষেত্রে আমি। এবং সৃষ্টি হয় এক দ্বিতীয় সত্তার, যা সচেতন ও অবচেতন মনকে শুরু করে দেয় নিয়ন্ত্রণ। এই অপার্থিব সত্তার প্রভাবে কণ্ঠস্বর, আচার-আচরণ সবই যায় পালটে। আগ্রহ জন্মায় ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা সম্পর্কে। এবং শুধু আগ্রহই জন্মায় না, তার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে জ্ঞান আহরণ। এবং ফলস্বরূপ দেখা দেয় ভয়ংকর সব স্বপ্ন, যার প্রভাবে স্বাভাবিক জীবন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। এই অবধি জানার পর

আমার সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নগুলোর প্রকৃতি যে ঠিক কীরকম তা বুঝলাম। দু-একটা কেস দেখলাম, যেখানে মহাজাগতিক যোগাযোগের কথাও বলা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, সেগুলোর সঙ্গে নিজের ঘটনার মিল পেয়ে আমি আরও আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তিনটে কেসে স্পষ্টভাবে কোনও অজানা যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আমার মনে পড়ে গেল আমার স্মৃতি ফিরে আসার আগের ঘটনা, এইরকম একটা যন্ত্র তো আমিও বানিয়েছিলাম! যে মহাজাগতিক সংযোগের কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়ংকর ও অপার্থিব যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। আরও কয়েকটা জিনিস লক্ষ করলাম। এইসব কেসেই আক্রান্ত ব্যক্তি মাঝারি মানের বুদ্ধিবিশিষ্ট, ওই ধরনের যন্ত্র তৈরির কথা ভাবাও তাদের সাধ্যের বাইরে। দ্বিতীয়ত, এরা প্রত্যেকেই চালিত হয়েছে কোনও অশুভ ভিনগ্রহী শক্তির দ্বারা। তারপরেই সেই স্মৃতিবিভ্রাট ও মগজে থেকে যাওয়া সেই অপার্থিব আতঙ্কের ক্ষীণ স্মৃতি।

এতক্ষণ যা যা লিখেছি তা থেকে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন তথা দুঃস্বপ্নগুলো কতখানি ভয়ানক ছিল তা বোঝা গেছে। ইতিমধ্যে আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম যে, বদ্ধপাগল হবার প্রাথমিক ধাপে আমি প্রবেশ করে ফেলেছি। মাঝে মাঝে ভাবতাম, আমার আগে যারা এই ঘটনার শিকার হয়েছে, তারাও কি এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল? কে জানে! একদিকে এই সচেতন আর অবচেতন মন যুদ্ধ চালাত, আর অন্যদিকে আমার মগজে এইসব বিদঘুটে ভাবনা পাকাপাকি জায়গা দখল করে বসেছিল। ওহ্‌, একটা কথা বলাই হয়নি। আমার ওই উপকথার থিয়োরিগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে স্বীকৃতির তকমা পেয়েছিল। এমনকী ভিনগ্রহীদের মতবাদে বিশ্বাসীরাও আগে ঘটে-যাওয়া অনেক কেসের হদিশ দিয়ে আমাকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন। সব থেকে আনন্দদায়ক বিষয় হল, তাঁরা আমাকে পাগল তো বলেনইনি, বরং এটাকে সাময়িকভাবে স্নায়ুবৈকল্যের উপসর্গই বলেছিলেন। আমার কাজ ছিল শুধু তথ্যসংগ্রহ আর বিশ্লেষণ আর ওঁদের কাজ ছিল মনোবিজ্ঞানের আলোকে সেগুলোর ভুল সংশোধন। এমনকী কিছু ডাক্তার তো আমার আর আমার ওই দ্বৈত সত্তার ওপর রীতিমতো পড়াশোনা আরম্ভ করে ফেলেছিলেন।

যখন আমার প্রথম স্মৃতিবিভ্রাট ঘটে, তখন কিন্তু এগুলো টের পাইনি। সত্যি বলতে কী, ওইসব উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার তখন আমাকে পুরোপুরি ঘেঁটে দিয়েছিল। একটা অজানা আদিম অপার্থিব আতঙ্ক আমাকে সবসময় কুরে কুরে খেত। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল

যে, যাতে নিজের চেহারা দেখতে না হয় তাই আয়না দেখার পাটই দিয়েছিলাম চুকিয়ে। দাড়িও কাটতাম নাপিতের কাছে গিয়ে। আমার চোখ সবরকম রং সহ্য করতে পারত না তাই নীল বা ছাইরঙা পোশাক-পরা কোনও লোককে দেখলে একটা অদ্ভুত স্বস্তি পেতাম। বাদবাকি সময় চাউনি নীচের দিকেই রাখতাম; সরাসরি কোনওদিকে তাকাতাম না। অবশ্য এগুলো আমার ওই উদ্ভট কল্পনার কায়িক আকার নেওয়ার অনেক আগের ঘটনা। ইতিমধ্যে আমি কিন্তু টের পাচ্ছিলাম, কেউ যেন ইচ্ছে করে ওইসব দৃশ্যের ঝলকগুলো আমার সামনে হাজির করছে, যাতে আমি যোগসূত্রগুলো খুঁজে পাই। সত্যি বলতে কী, মানেগুলোও আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম। কালের চক্রের সঙ্গে সঙ্গে ওই অদ্ভুত জ্যামিতিক আকার, পৈশাচিক দৃশ্য— অন্যদিকে আমি আর মাঝখানে সেই যোগসূত্র। এটাও বুঝলাম, কেউ ওগুলোর সঙ্গে আমার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছে।

এবার আসা যাক আমি যে ঝলকগুলো দেখতাম, সেগুলো প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলি, ওগুলো যতটা না ভয়ানক ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল উদ্ভট। যেটা আপনা-আপনিই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। ঘোরের মধ্যে দেখতাম, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি পেল্লায় পেল্লায় পাথুরে খিলানওয়ালা একটা কুঠুরির মধ্যে। অনেকটা রোমান কায়দায় তৈরি ওই খিলানগুলো এমনই সোজা খাড়া উঠে গিয়েছে যে, যতই মাথা উঁচিয়ে দেখি-না কেন— ওগুলোর চূড়া দৃষ্টিগোচর হত না! খিলানগুলো আশপাশে কেবল তৈরি করেছে আলো-আঁধারি কিছু ছায়া। রোমান কায়দায় তৈরি বিরাট বিরাট গোলাকার জানলা, খিলানওয়ালা দরজা, মাঝে মাঝেই গোলাকার বেদির মতো টেবিল, দেওয়ালে আলো-আঁধারি ঢাকা কাঠের তাক— যেগুলো ঠাসা থাকত আঁকাবাঁকা হায়ারোগ্লিফিকের মতো ভাষা খোদাই করা বইয়ে— এই হল ওই কুঠুরির বর্ণনা। এখন বলার বিষয় হচ্ছে, সব কিছুই ছিল সাধারণ ঘরের থেকে অনেক অনেক বড়। পাথুরে কুঠুরিতে অদ্ভুত সব প্রাগৈতিহাসিক জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা থাকত। গোটা কুঠুরিটাই ছিল যেন পেল্লায় আকারের এক গম্বুজ! আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ওখানে কোনও চেয়ার ছিল না। কাঠের তাকে হায়ারোগ্লিফিক মার্কা বইয়ের সঙ্গে থাকত কিছু কাগজের তাড়া— যেন লেখার কাজে কেউ ওগুলো ব্যবহার করে। আর থাকত চকচকে ধাতুর তৈরি কিছু বয়াম, যার ছুঁচোলো ছিপিগুলোতে মরচে পড়ে গেছে। কুঠুরিতে একটা উঁচু পাদানি ছিল, তাই মাঝে মাঝে আমি ওই পাদানিতে উঠে ওপর থেকে গোটা ঘরটাই দেখতে পেতাম। আলোর কাজ করত ওই

কুঠুরিতে রাখা কিছু গোলাকার স্ফটিক। ওই আলোতে বেশ অদ্ভুত ধরনের কিছু যন্ত্রও দেখতে পেতাম। যন্ত্রগুলো অনেকটা আমার সেই অভিশপ্ত দিনে তৈরি করা বিটকেল রড আর নলওয়ালা খুড়োর কলের মতোই দেখতে ছিল। কিছু মোটা গরাদওয়ালা জানলাও ছিল, যদিও আমি কখনওই ওগুলোর ধারেকাছে যাওয়ার সাহস দেখাইনি! এরপর স্বপ্নে আরও কিছু জিনিস যোগ হল। আমি দেখতাম, ওপরে-নীচে দানবীয় নকশাওয়ালা এক পাথুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। কোনও রাস্তাই তিরিশ ফুটের কম চওড়া ছিল না এবং কোথাও ছিল না কোনও সিঁড়ি। রাক্ষুসে মূর্তিগুলো কম করে হাজার ফুট লম্বা ছিল, কারণ ওগুলো দেখলে মনে হত, ওগুলো যেন আকাশে মিলিয়ে গেছে। এ ছাড়াও ছিল কালো রঙের নানা আকারের খিলান আর মুখ আটকে-রাখা কিছু দরজা। হয়তো ওগুলোর আড়ালে কোনও ফাঁদ পাতা ছিল, দেখলেই মনে হত, ওগুলো কখনও খোলা হয়নি। একটা আবছা, ভয়ংকর বিপদের আভাস পেয়ে আমি শিউরে উঠতাম। আমার নিজেকে ওই আতঙ্কপুরীতে এক বন্দি মনে হত। দেওয়ালে আঁকাবাঁকা হায়ারোগ্লিফিক নকশাগুলো যেন আমাকে দেখে ঠাট্টা করে বলত, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে হে!

এরপর আমার স্বপ্নে যোগ হল বেশ সুন্দর দেখতে গোল গোল কিছু জানলা আর ওই আতঙ্কপুরীর ছাদ। বিরাট ওই ছাদ থেকে আমি একটা বাগান দেখতে পেতাম। বাগানের বেশির ভাগটাই ছিল পাথুরে আর ঢালু। বাগানের চারদিকে আরও অনেক বিরাট বিরাট বাড়ি দেখতাম। ওই বাড়িগুলোতেও এরকম বাগান ছিল। বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে কম করে দু-শো ফুট চওড়া রাস্তা থাকত। বাড়িগুলোর এক-একটার আকার ছিল এক-একরকম। কিন্তু কোনওটাই চওড়ায় পাঁচশো ফুট আর লম্বায় হাজার ফুটের কম ছিল বলে মনে হয় না। এক-একটা এতই উঁচু ছিল যে মনে হত, কোনও পাহাড়ি টিলার ওপর রয়েছে। আর মিশে গেছে কোনও ধূসর জগতে, হয়তো যেটাকে আমরা স্বর্গ বলে থাকি। বাড়িগুলো দেখলে মনে হত পাথর আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। এবং ওই বাড়িগুলোর গায়েও আমার আতঙ্কপুরীর মতো হায়ারোগ্লিফিক নকশা আঁকা থাকত। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ওই বাড়িগুলোর কোনও কোনওটার সমান ছাদেই বাগান থাকত। আর যে বাড়িগুলো আমার নজরের আওতার বাইরে থাকত, সেগুলোতে কোনও বাগান দেখতে না পেলেও মনে হত, ভেতরে বাগান রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় নলের মতো দেখতে কিছু উঁচু টাওয়ার দেখতাম। সব কিছু ছাপিয়ে-যাওয়া এই টাওয়ারগুলোর গায়ে খোদাই-

করা বিটকেল কারিগরিওয়ালা নকশাগুলো দেখে আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেতাম। টাওয়ারগুলোর ওপরটা ছিল গোলাকার আর তাতে মোমবাতির মতো একটা ক্ষীণ আলো দেখা যেত। টাওয়ারগুলোতে কোনও দরজা বা জানলা দেখতে পেতাম না। এ ছাড়াও কিছু ছোট ছোট ভাঙাচোরা বাড়ি দেখতে পেতাম। দেখলে মনে হত, অগুনতি বছর ধরে ওগুলো একইভাবে রয়েছে। অবশ্য দেখতে ছোটখাটো হলেও, ওগুলো দেখে ওই বন্ধ দরজাগুলোর মতোই ভয় পেতাম।

আবার আসি ওই বাগানের কথায়, যেগুলো দেখলেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা ভয়ের স্রোত নেমে যেত। বারবার বাগান বলছি, কারণ ওখানে নানারকম অদ্ভুত ফুলবিহীন ছত্রাকের মতো ফ্যাকাশে গাছপালা দেখতাম। আর ছিল সব কিছুকে টেক্কা-দেওয়া পাম গাছের মতোই দেখতে একটা ভূতুড়ে গাছ। ক্যালামাইটের[197] পেল্লায় ওই গাছ থেকে নেমে-আসা শুঁড়গুলো দেখলে আবার মনে হত বাঁশ গাছ। এ ছাড়াও ছিল পাহাড়ি এলাকার মতো কিছু ঝোপঝাড় আর গাছপালা। কিছু কিছু বাড়ির ছাদের বাগান থেকে আবার কিছু দানবীয় ছত্রাক বাড়ির গা বেয়েই নেমে আসত। দেখলে মনে হবে যেন গিলে খেতে আসছে। তবে কোথাও কোথাও আবার শৌখিন টপিয়ারি ধাঁচের গাছও দেখা যেত। বাগান, বাড়ি, রাস্তা যেমনই হোক, আকাশ সবসময় মেঘলা থাকত। কোনও কোনও সময় প্রবল বৃষ্টি হতেও দেখেছি। শুধু একবার বোধহয় সূর্যের মতো কোনও কিছুর একটা ঝলকানি দেখেছিলাম। সূর্যের মতো বললাম, কারণ সূর্যের থেকে আকারে ওটা ছিল অনেক অনেক বড়[198]। রাতের আকাশ খুব কমই বুঝতে পারতাম। একবার কিছু তারা দেখতে পেলেও ভালো করে বুঝতে পারিনি। মনে হত, আমি যেন পৃথিবীর এক অজানা গোলার্ধে রয়েছি।

১৯১৪-র অক্টোবর মাসের পর থেকে কিছু খাপছাড়া স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমি দেখতাম, আমি যেন একটা শহরের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। সেই শহর, যেখানে আমার ওই আতঙ্কপুরীও ছিল। ওপর থেকে নানা রঙের জঙ্গল দেখতে পেতাম। ওই জঙ্গলগুলোর এক-একটা গাছ এতটাই বড় ছিল যে, দেখলে শিউরে উঠতাম। আমার বন্দিনিবাস আতঙ্কপুরী যে শহরে ছিল, তার আশপাশেও আরও অদ্ভুত দেখতে কিছু শহর দেখতাম। একবার তো মাইলের পর মাইল জোড়া ব্যাসাল্ট পাথরের ধ্বংসাবশেষও দেখেছিলাম। সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ওই ব্যাসাল্টগুলোর গায়েও নকশা আর

কারিগরির মতো দেখেছিলাম, ঠিক যেমনটা দেখেছিলাম আতঙ্কপুরীর দেওয়ালে! আর-একবার ওই গম্বুজের ধারেই ধীরস্থির, স্রোতহীন এক সমুদ্র দেখেছিলাম।

আমি আগেও বলেছি, যেসব দৃশ্যের ঝলক আমি দেখতাম, তার থেকে ঢের বেশি ভয়ের স্বপ্ন অনেকে দেখে থাকেন। এবং একটা সময় আমি এগুলোকে স্বাভাবিক বলে মেনেও নিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী, ওই ঘটনার আগে কস্মিনকালেও আমি স্বপ্নবিলাসিতা করিনি। বরং স্বপ্ন নিয়ে এযাবৎ যা যা তর্ক চালিয়েছি, সবই ছিল কিছু মান্ধাতার আমলের পুঁথিগত বিদ্যার প্রতিফলন। কয়েক মাস পর থেকেই কিন্তু গল্প আর এক রইল না। যা যা স্বপ্ন দেখতাম, তার প্রায় সবটাই স্মৃতির মধ্যে থেকে যেত; ফলে আমার মনের ভেতর জমে-থাকা ভয় এক নারকীয় আকার ধারণ করল। শুধু তা-ই নয়, আমার মগজ ওই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে আমার সচেতন অবস্থায় থেকে দেখা ঝলকগুলোকে মেলাতে শুরু করল। আমি পরিষ্কার বুঝলাম, ১৯০৮ থেকে ১৯১৩— এই সময়ের মধ্যে আমার যে দ্বিতীয় সত্তার সৃষ্টি হয়েছে, তার কাছে আমার ন্যাথানিয়েল উইনগেট পিসলি নামক সত্তাটা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে।

ইতিমধ্যে আমার দুঃস্বপ্নে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আসতে শুরু করেছে, ফলে ভয়াবহতা বেড়ে গিয়েছিল কয়েকশো গুণ। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার কিছু করা উচিত, কিন্তু আদপে আমার কিছুই করার ছিল না। ১৯১৫-র অক্টোবর মাসের আগে পর্যন্ত এই স্বপ্ন তথা দুঃস্বপ্নের জাল বিছোনোর পর্ব চলল বেশ ভালোভাবেই। এরপরেই আমি বিস্মৃতি আর দৃষ্টিবিভ্রমের ওপর বিভিন্ন কেস ঘাঁটতে শুরু করলাম। গবেষণার উদ্দেশ্য একটাই, যদি ওই দ্বিতীয় সত্তাকে হারিয়ে ন্যাথানিয়েল উইনগেট পিসলিকে জেতানো যায়! আগেই বলেছি, এতে ফল হয়েছিল বিপরীত! আমার মনে এমন ধারণাও আসতে শুরু করেছিল যে, এইসব গবেষণার ফলেই হয়তো আমার অবচেতন মনে তার ছাপ পড়ছে এবং ফলস্বরূপ ওই দুঃস্বপ্ন। কারণ ওইসব কেস ঘেঁটে দেখলাম, আগের অধিকাংশ ব্যক্তিরই ভূতত্ত্ব সম্পর্কে না ছিল কোনও জ্ঞান আর ওই কেসগুলোতে তারা ঠিক কী ধরনের দৃশ্য দেখত, সে সম্পর্কেও ছিল না কোনওরকম উল্লেখ। যেটুকু ছিল তা থেকে বুঝলাম, এরা বিভিন্ন অতিকায় বাড়ি, জংলা বাগান ইত্যাদি দেখত। আর একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো ছিল, এদের সবাই ধর্মবিরোধিতা করতে গিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসেছিল। সব থেকে জঘন্য ব্যাপার, ইতিমধ্যে আমার ওই দ্বিতীয় সত্তা ক্রমাগত আমাকে ওইসব ভয়ংকর

স্বপ্ন আর বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাভাস দেখিয়ে চলেছিল। আর এদিকে বিভিন্ন ডাক্তারবাবু আমার কেসটাকে দ্বৈত সত্তার আদর্শ কেস হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমি আমার মেজ ছেলে উইনগেটের ব্যাপক উৎসাহে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। উইনগেটও অবশ্য অধ্যাপনার পাশাপাশি একই কাজ করছিল। ১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ আমি মিসকাটনিকে স্পেশাল কোর্সও করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমার চিকিৎসাবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাসের হরেকরকম নথি ঘাঁটার রোজনামচায় আরও একটা ব্যাপার যোগ হল, সেটা হচ্ছে আমার ওই দ্বিতীয় সত্তার যেসব বিষয়ে প্রবল উৎসাহ— যেমন গুপ্তবিদ্যা সংক্রান্ত যতরকম বই আছে, দূরদূরান্তের লাইব্রেরিতে গিয়ে সেগুলো নিয়ে চর্চা করা। এক-একটা বই এতই বীভৎস ছিল যে, আমি নিজেও শিউরে উঠেছিলাম। শুধু এটুকুই বলছি, আমি আমার দ্বিতীয় সত্তার প্রভাবে যেসব বীভৎসতার মুখোমুখি হয়েছিলাম, এগুলোর বীভৎসতা ছিল তার থেকে অনেকটাই বেশি। কিছু কিছু বইয়ের আধুনিক সংস্করণে আমি কিছু শব্দ আর বাগ্‌ধারার পরিবর্তন দেখলাম, কারণ মূল শব্দগুলো এতটাই বীভৎস ছিল যে, কোনও আধুনিক সভ্যতা ওগুলোকে মেনে নেবে না। বইগুলো নানা ভাষায় লেখা হলেও কিছু কিছু চিহ্ন সব বইয়েই দেখেছিলাম। আর আমার ধারণা, যাঁরা এই সংশোধনের কাজ করেছিলেন, মূল শব্দগুলোর অর্থ তাঁদের অজানা ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, ভন জানৎসের লেখা 'আনঅসপ্রেলিচেন কাল্টেন' বইটার কথা। এতে যে হায়ারোগ্লিফিক মার্কা সাংকেতিক চিহ্নগুলো ছিল, সেগুলোর সঙ্গে কোনও পার্থিব চিহ্নের কোনওরকম মিল নেই। কিন্তু সব থেকে অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, ওই চিহ্নগুলো যে কালিতে আঁকা ছিল, সংশোধনও করা হয়েছে একই কালিতে!! তাহলে লেখক আর সংশোধক কি একই লোক? তিনি কি জানতেন, এই বই সঠিক হাতে না পড়লে কী কী বিপর্যয় হতে পারে? এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কোনও আসন্ন অপার্থিব বিপর্যয় থেকে বাঁচাবার জন্যই কি এই সংশোধন করা হয়েছে? বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আর সব থেকে পিলে চমকে দেবার মতো বিষয় হল, হায়ারোগ্লিফিক মার্কা সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে যখন আমি চিনতে পারলাম— না, ওগুলোর মানে বুঝতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু ওই চিহ্নগুলোই যে আমার স্বপ্নে ঘুরে-ফিরে আসত, সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ ছিল না।

যেহেতু আমার দ্বৈত সত্তা তখন খবরের কাগজে একটা আলোচিত বিষয় তাই অনেক লাইব্রেরিয়ান আমার ধোঁয়াশা কাটাতে এটাও বলল যে, ওই চিহ্নগুলো আমি নিজেই অচেতনভাবে আমার দ্বৈত সত্তার প্রভাবে ঘোরের মধ্যে এঁকে ফেলেছি। তাদের ধোঁয়াশা কাটাবার ঠ্যালায় আমার ঘিলু আরও ঘেঁটে গেল। এইসব নথিপত্র ঘেঁটে একটা কথা সার বুঝলাম, এইসব গুপ্তবিদ্যায় ব্যবহৃত তিনটে ভাষা সম্পর্কে আমার কোনওরকম ধারণা নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞান আর নৃতত্ত্বের পুরোনো আর নতুন সমস্ত নথি থেকে বিভিন্ন ছড়ানো-ছিটোনো তথ্য এক জায়গায় করে দেখলাম, এগুলো অধিকাংশই অলীক আর প্রচলিত কিছু ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্যালেওজোইক, মেসোওজোইক, জুরাসিক, ট্রায়াসিক যুগের কিছু ছবি তুলে ধরেছে। আমি এটা ভেবে স্বস্তি পেলাম যে, ১৭ থেকে ২৫০ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর কিছু উপকথামার্কা থিয়োরি নিয়ে হয়তো সত্যিই তেমনভাবে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু এগুলোর বীভৎসতা আমার মাথার মধ্যে পোকার মতো কিলবিল করতে লাগল। এত পুরোনো দিনের ঘটনা শুধু ধোঁয়াশাই বাড়ায়। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, আর সবার মতো আমিও ওই অজানা আদিম আতঙ্ককে ভয় পেতে লাগলাম। যুগে যুগে এইসব উপকথায় একটু একটু করে রং চড়েছে, আর সেটা আমার মতো স্মৃতিবিভ্রাটের রুগির চিন্তনের জগতে একটা কাল্পনিক দুনিয়া তৈরি করে তালুক গেড়ে বসেছে। আমি নিজেই তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

আবার কিছু কিছু উপকথা, বিশেষ করে কিছু হিন্দু পুরাণে মানবসভ্যতার সৃষ্টির আগে থেকে কালচক্রে কী করে আধুনিক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, তার উল্লেখ আছে। এসব পড়লে যে কোনও লোক শিউরে উঠবে বা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাবে, কিন্তু আমি ক্রমশ এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পুরাণ আর বিভ্রান্তি সব কিছুর সারসংক্ষেপ থেকে এটা প্রমাণিত যে, এই পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে যতই রহস্য থাকুক, মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে সব ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে শুধু টিকেই থাকেনি, সারা দুনিয়ায় তার আধিপত্য কায়েম করেছে। কিন্তু ওইসব পুরাণে এ কথাও উল্লেখ আছে, মানুষ সৃষ্টির তিনশো কোটি বছর আগেই এক প্রজাতি মেঘলোক থেকে হাজির হয়ে আয়ত্ত করেছিল এই প্রকৃতির সমস্ত রহস্য। তাদের আকার, প্রকৃতি কোনও কিছু নিয়েই ওইসব বইয়ে কোনও উল্লেখ ছিল না। তাদের কেউ কেউ হয়তো এসেছিল আমাদের এই মহাবিশ্ব বা তার থেকেও প্রাচীন কোনও নক্ষত্রলোক থেকে। আর খুব দ্রুতভাবে সৃষ্টি করেছিল জীবনচক্রের সেই প্রথম

জীবাণু। সৃষ্টির হাজার-লক্ষ বছরের বিবর্তনে আমরা যে জিনিসটাকে সময় বলে মেনে নিয়েছি, আদপে নাকি তার কোনও অস্তিত্বই নেই!!

কিন্তু এ ছাড়াও ওইসব পুরাণে অপেক্ষাকৃত নবীন এক প্রজাতির কথা বলা হয়েছে। জটিল আর বীভৎস আকৃতির ওই প্রজাতির তথাকথিত বিজ্ঞানের আলোকে পরিচিত কোনও আকার ছিল না। এরা মানুষ সৃষ্টির পঞ্চাশ কোটি বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যেই এরা আয়ত্ত আর জয় করে ফ্যালে সময়ের সেই গোপন রহস্য। আর সেই জন্যই এদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ওইসব পুরাণে উল্লেখ করা আছে। এই পৃথিবীর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের যাবতীয় জ্ঞান এদের আয়ত্তে চলে আসে। নিজেদের তীব্র মানসিক ক্ষমতা দিয়ে তারা অনায়াসে চলে যেত অতীত কিংবা বর্তমানে। এবং সেই সময়ের সমস্ত জ্ঞান পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে আসে। এমনকী মানবসভ্যতার যাবতীয় পুরাণও ছিল তাদের নখদর্পণে!! এদের একটা কেতাবি নামও অবশ্য উল্লেখ আছে ওইসব বইয়ে— ইথ! ইথদের বিশালাকার লাইব্রেরিতে এই পৃথিবীর বছরের পর বছরের সমস্ত প্রজাতির শিল্প, ভাষা, মনোবিজ্ঞান, কৃতিত্ব— সব কিছুর সচিত্র বিবরণ ঠাসা থাকত। ইথরা প্রত্যেক যুগ থেকেই নিজেদের স্বভাব আর পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই কাউকে বেছে নিত। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের এই জ্ঞান তাদের আয়ত্তে থাকার ফলে তাদের কোনও সমস্যাই হত না। পরবর্তীকালে উপযুক্ত যন্ত্র এসে যাওয়ার ফলে এদের কাছে এই কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। তখন ইথরা অনায়াসে তাদের সময়-ভ্রমণে ইচ্ছেমতো যুগে নিজেদের সশরীরে হাজির করতে পারত। প্রাথমিক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবার পর এরা সেই যুগের সেরা প্রজাতিকে বেছে নিত। তারপর তাদের কাজ ছিল চিন্তন তরঙ্গের মাধ্যমে সেই জীবের মস্তিষ্কে নিজেদের ভাবনাকে চালান করা। খুব স্বাভাবিকভাবেই যে জীবের মগজে ওই ভাবনাপ্রবাহের আমদানি হত, সময়চক্রের এক বিপরীত প্রবাহের সৃষ্টি হত তার শরীরে। সে তখন সেই ইথদের উত্তরসূরি ছাড়া কিছুই নয়। তার কাজ হত বেছে নেওয়া যুগের যাবতীয় তথ্য আর কারিগরি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে নেওয়া। ব্যাপারটা এমনি ভাবলে হয়তো বেশ মজা লাগবে, যেন চাহিদা আর জোগানের খেলা। কিন্তু এরপর যেটা হত, সেটা আরও ভয়ংকর। ইথরা তাদের পরীক্ষার গিনিপিগের চিন্তন আর মননকে ফিরিয়ে আনত নিজেদের যুগে এবং নিজেদের শরীরে। তারপর যত্ন নিয়ে সেগুলো রক্ষা করত। এইভাবেই ছোট প্রজাতির সঙ্গে ভরের আদানপ্রদান ঘটিয়ে ইথরা নিজেদের অস্তিত্ব

লোপকে ঠেকিয়ে রাখত আর হয়ে উঠত সর্বজ্ঞ। কোনও প্রজাতির ভাষা তাদের অজানা থাকলেও, তাদের কাছে এমন যন্ত্র ছিল, যা দিয়ে তারা অনায়াসে ওই ভাষার অনুবাদ করে ফেলতে পারত। ইথদের চেহারার বর্ণনাও দেওয়া ছিল কিছু বইয়ে। ইথরা আকারে ছিল প্রায় দশ ফুট লম্বা। দেখলে মনে হবে ঠিক যেন শঙ্কু আকৃতির কিছু কুঁজো হয়ে রয়েছে। ওই শঙ্কু আকৃতির ধড়ের ওপর থাকত মাথা। সেই মাথা থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ছড়িয়ে থাকত। তারা কথা বলত তাদের বিশাল আকারের শুঁড় দিয়ে ক্লিক ক্লিক শব্দ করে। চলাফেরার দরকার হলে স্যাঁতস্যাঁতে জেলির মতো ওই দশ ফুটের অবয়বকে হড়কে হড়কে নিয়ে যেত এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়।

যেসব প্রাণীর চিন্তাভাবনা ইথরা বন্দি করত, তারা প্রথমে খুব ভয় পেত বা আশ্চর্য হয়ে যেত, কিন্তু পরে অভ্যস্ত হয়ে যেত ইথদের দুনিয়ায়। যেমন হয়েছিলাম আমি— যা-ই হোক, সে কথায় পরে আসছি। যদিও তাদের এই নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণভাবে ইথদের ইচ্ছা অনুযায়ীই হত। বন্দিরা এরপর রাক্ষুসে উড়োজাহাজ বা পারমাণবিক ইঞ্জিনওয়ালা বোটে করে যেত ইথদের লাইব্রেরিতে। সেখানে তাদের বিভিন্ন গ্রহের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা করতে দেওয়া হত। এরপর অনেক বন্দি একজোট হয়ে লেগে পড়ত পৃথিবীর গোপন সব রহস্যভেদে। অতীতের বহু হারানো অধ্যায় আর সুদূর ভবিষ্যতের অগ্রগতি দেখে তারা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত।

অনেক সময় হয়তো ভবিষ্যৎ থেকে বন্দি হয়ে আসা কারও সঙ্গে জ্ঞানের আদানপ্রদান হত। তারপর তাদের কাজ হত নিজেদের ভাষায় বিভিন্ন যুগের ওইসব নথি ইথদের লাইব্রেরিতে জমা করা। কোনও কোনও বন্দি অবশ্য কিছু বাড়তি সুবিধা পেত। তবে তারা সংখ্যায় ছিল খুবই কম। মুমূর্ষু এইসব বন্দিকে পাঠানো হত চিরনির্বাসনে। তার অবশ্য কারণও ছিল। ভবিষ্যতে এদের কায়িক অবয়ব হয়তো কোনও ইথের হাতে বন্দি। ইথরা খুব সম্ভবত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, তাই মানসিক অবলুপ্তির হাত থেকে মুক্তির জন্যই তাদের এই ফন্দি। তবে এই ঘটনার সংখ্যা ছিল খুবই কম। বন্দি মন যখন তার ভবিষ্যতের ইচ্ছা জানতে পারত, তখন একটা যন্ত্রের সাহায্যে সে এই গোটা পদ্ধতিটাই উলটোদিকে চালাত। ফলে ভবিষ্যতে সঠিক শরীরে সে ফিরে যেতে পারত। অবশ্য শরীর নষ্ট হয়ে গেলে এটা সম্ভব ছিল না। তখন ওই মন হয় কোনও ভিনগ্রহীর আকার ধারণ করত, আর না-হয় চিরকালের মতো বন্দি হয়ে থাকত ইথিয়ান জগতে। অবশ্য বন্দি-

হওয়া মন যদি কোনও ইথের হত তাহলে ব্যাপারটা এতটা ভয়ানক হত না। নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ইথরা যথেষ্ট সচেতন ছিল। যখন কোনও ভিনগ্রহী প্রজাতির বন্দি মন তার নিজের শরীরে ফিরে যেত, তখন যান্ত্রিকভাবে হিপনোসিসের মাধ্যমে ইথিয়ান দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান ও স্মৃতি মুছে ফেলা হত। এর কারণ অবশ্যই ভবিষ্যতের ঝামেলা এড়ানো। পৃথিবীতে বিভিন্ন বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে এগুলোই ওইসব পুঁথিতে উল্লেখ করা আছে। অবশ্য এই সব কিছুই যুগযুগান্ত দূরের ঘটনা, যার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সমুদ্রের গভীরে। কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে ভয়ানক প্লাকোটিক[199] পাণ্ডুলিপিতে। ইথিয়ান দুনিয়া থেকে যেসব মন চিন্তন তরঙ্গের মাধ্যমে নিজের শরীরে ফিরে আসত, ওই জগতের ছিটেফোঁটা স্মৃতিও তার থাকত না। সব পুরোপুরি মুছে দেওয়া হত।

যেসব সংগঠন গুপ্তবিদ্যাচর্চার সঙ্গে জড়িত, তারা অবশ্যই এই ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে জানত। নেক্রোনমিকন-এ তো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির কথা, যারা কালসমুদ্রে ইথিয়ান দুনিয়ায় পাড়ি জমাত। ইথরা শুধু পৃথিবীই নয়, আরও বিভিন্ন গ্রহে চিন্তন আর মনন আদানপ্রদানের কাজ শুরু করেছিল। খুব সম্ভবত ইথরা নিজেদের সেই উৎসের সঙ্গে কালচক্রকে মেলাতে পেরেছিল, যার শুরু হয়েছিল সেই বিগ ব্যাং-এর আমলে। ইথদের শরীরের থেকেও তাদের মানসিক বয়স ছিল বহু প্রাচীন। শরীরী অবয়ব তারা অনেক পরে লাভ করে। নিজেদের বিলুপ্তির কথা জানতে পেরেই তারা তাদের চিন্তনকে ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় পাঠাতে চেয়েছিল কয়েক লক্ষ-কোটি বছর আগে, এবং সফলও হয়েছিল।

১৯২০ সাল নাগাদ আমি আমার জট-পাকানো চিন্তাভাবনাগুলোকে একটা ঠিকঠাক জায়গায় আনতে পেরেছিলাম। আমার ওই উদ্‌বেগ আর উত্তেজনাও অনেক কমে গিয়েছিল। আমি আস্তে আস্তে আমার স্মৃতিবিভ্রাটের সময়ের ঘটনাগুলোকে এক সুতোয় বাঁধতে চাইছিলাম। ওই সময় আমি যে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতাম বা ওই হায়ারোগ্লিফিক চিহ্নগুলো স্বপ্নে দেখতাম, নিঃসন্দেহে ওইসব পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার ফল। আমার অবচেতন মনে ব্যাপক ছাপ পড়ার ফলেই ওগুলো ঘটত। আমি এই সময় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলাম এইসব বিষয় নিয়ে— কিন্তু কোনও কূলকিনারাই পাইনি।

নানা সময়ে আমি যে কেসগুলো ঘেঁটেছিলাম, প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে রুগিদের মিল দেখে প্রচণ্ড ভয় পেতাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, ওইসব পুঁথিতে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা নেহাত উপকথারই শামিল, কারণ এখনকার সময়ের থেকে অতীতের সঙ্গেই ওগুলোর মিল বেশি। আমার আগে যাদের এরকম ঘটেছিল, খুব সম্ভবত স্মৃতিবিভ্রাটের পর তারা তাদের পারিপার্শ্বিক কিছু চালু ধারণার সঙ্গেই নিজেদের জড়িয়ে ফ্যালে, তারপর সেখান থেকে বেরোতে না পেরে নিজেদের কল্পনাতেই এক অমানবিক জগৎ বানিয়ে সেখানে পাড়ি জমায়। আমার ক্ষেত্রে এগুলো হয়নি, কারণ আমি এগুলো নিয়ে চর্চা আরম্ভ করি প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পরে। আমার আগের রুগিদের স্মৃতিশক্তি ফিরে এলেও ওই কাল্পনিক দুনিয়া থেকে তারা আর বেরোতে পারেনি। আমি আমার মনে কখনওই এইসব চিন্তাভাবনাকে গেড়ে বসতে দিইনি। সবসময় যুক্তি-পালটা যুক্তি দিয়ে ভাবতাম। পরে বিভিন্ন নামকরা মনোবিদ আর নৃতত্ত্ববিদও আমার সঙ্গে একমত হন।

যা-ই হোক, আমি কিন্তু ওইসব ভূতুড়ে স্বপ্ন আর চিন্তাভাবনার থেকে আত্মরক্ষার বেশ ভালো একটা উপায় ঠাওরেছিলাম। রাতে যদি কোনও অদ্ভুত স্বপ্নও দেখতাম, বুঝতাম, ওইসব পুঁথিপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলেই আমার অবচেতন মনে ওগুলোর ছাপ পড়েছে। এই থিয়োরিটা বেশ কাজে দিয়েছিল। আমার স্নায়ুতন্ত্রেও একটা স্থিতিশীলতা আসে। ১৯২২ সাল নাগাদ আমি বুঝতে পারলাম, আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারব। এবং নতুন যা যা কিছু শিখেছি, সেগুলো হাতেকলমে প্রয়োগের এটাই সেরা উপায়। এই সময় আমি তাই ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম। এদিকে অধ্যাপনার পাশাপাশি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের জন্য আমার মেজ ছেলে উইনগেটও এই সময় ইউনিভার্সিটিতে এল। আমাদের দু-জনের জুটিতে আরও অনেক দূর এগোতে পারব ভেবে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, আমি যে স্বপ্নগুলো দেখতাম, সেগুলো নরকযন্ত্রণার থেকে কিছু কম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার স্বপ্নের একটা ধারাবাহিক রেকর্ড রাখতে শুরু করি। বড়াই করব না, কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমার ওই রেকর্ড যে-কোনও মনোবিদ লুফে নিতেন অনায়াসে। খুব ধীরে ধীরে হলেও আমি আমার এই নরকযন্ত্রণা থেকে একটু হলেও বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। ১৯১৪ সালের পর থেকে আমার স্বপ্নের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এখন আমি স্বপ্নের মধ্যেই নানা জায়গায় অবাধে

ভেসে বেড়াতে পারতাম। বেড়াতে বেড়াতে কোথাও দেখতে পেতাম অদ্ভুত পাথুরে বাড়ি, যেগুলোর ভেতরের চোরাপথ দিয়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাতায়াত করা যেত। আবার কোথাও দেখতে পেতাম ওইরকমই গা-ছমছমে বন্ধ-হওয়া চোরা দরজা। এ ছাড়াও বিভিন্ন খোপ-খোপ আঁকা দরজা, নানারকম অদ্ভুত আকারের বাসনপত্র, জটিল কারিগরিতে ভরা বিভিন্ন গুহা (যেগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতাম না) দেখতে পেতাম।

কিন্তু সত্যিকারের ভয় কাকে বলে, সেটা টের পেলাম ১৯১৫ নাগাদ। এই সময় আমি আমার স্বপ্নে বিভিন্ন জ্যান্ত জিনিস দেখতে শুরু করলাম। শুধু দেখা বললে ভুল হবে, তাদের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আমার চিন্তায় গেঁথে গেল। হ্যাঁ, ঠিকই— আমি ইথদের কথাই বলছি। যদিও তখনও আমার মগজে ওইসব রাক্ষুসে বিল্ডিং আর রাস্তার স্মৃতি ভালোভাবেই ছিল। ওই পুরোনো পুঁথিগুলোতে ইথদের চেহারার বর্ণনা পড়ার পর যখন নিজের চোখের সামনে ওদের দেখলাম, আমার ভয় বহুগুণে বেড়ে গেল। ইথরা আমার চোখের সামনে যখন ভেসে উঠত, এক-একসময় মনে হত পুরো গায়েব, আবার ঠিক তার পরের মুহূর্তেই জেলির মতো থকথকে দশ ফুট লম্বা শরীর নিয়ে চলে যেত আর-এক জায়গায়। এদের শরীর থেকে তিন-চারখানা অংশ বেরিয়ে থাকত, যাদের মধ্যে দুটোকে দেখে আন্দাজ করতে পারতাম ওগুলো ওদের থাবা। তিন নম্বর অংশ থেকে আবার চারটে লাল শুঁড়ের মতো অংশ বেরিয়ে থাকত। চার নম্বর অংশের ব্যাস ছিল প্রায় দু-ফুট। আর এটা দেখতে অনেকটা হলদে গ্লোবের মতো। এটা থাকত ইথদের দেহের ঠিক মাঝখানে। সেখানে আবার তিনটে কালো কালো চোখ ছিল। তখন বুঝলাম ওই হলদে গ্লোবটা হল ওদের মাথা। মাথা থেকে আবার ছাইরঙা ফুলের মতো চারটে অংশ বেরিয়ে থাকত। এর দু-দিকেই আবার সবুজ রঙের অ্যান্টেনার মতো শুঁড় দেখা যেত।

এমনিতে দেখলে মনে হত এরা তেমন ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু এদের কাজকর্ম দেখে আমি সত্যিই ভয় পেতাম। ওই পাথুরে কুঠুরির তাকে যেসব বই থাকত, সেগুলো এরা শুঁড় দিয়ে টেনে বের করে নিয়ে আসত বেদির মতো টেবিলে। কখনও আবার ওই সবুজরঙা অ্যান্টেনার মতো শুঁড় দিয়ে খুব যত্ন নিয়ে কী সব লিখত। আর কথা বলত ওই শুঁড়গুলো দিয়ে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করে। ইথদের পিঠে একটা ঝোলার মতো অংশ থাকত। যেভাবে এরা ঝড়ের গতিতে নিজেদের লেখাপড়ার কাজ চালাত, তাতে এদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমি নিজেকে স্বপ্নে যে আতঙ্কপুরীতে

দেখতাম, তার সর্বত্র এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত। কখনও-বা মাটির নীচের ঘরে রাখা কিছু অতিকায় মেশিনে বিভিন্ন তথ্য জমা করত। এরা কী কী লিখত, সেগুলোও আস্তে আস্তে আমার চোখে ধরা পড়তে শুরু করে। অধিকাংশই ছিল ওই আঁকাবাঁকা হায়ারোগ্লিফিক লেখা, কখনও-বা একটু অন্যরকম সমাসবদ্ধ[200] কিছু। খুব সম্ভবত ওরা নিজেরা নিজেদের জন্যই কোনও বিশেষ বর্ণমালা তৈরি করেছিল। তবে হ্যাঁ, যারা লিখত, বাকি ইথদের থেকে তাদের গতি ছিল একটু হলেও কম।



চিত্র **১২.১ :** আর কথা বলত ওই শুঁড়গুলো দিয়ে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করে।

১৯১৫ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে এই ইথিয়ান কার্যকলাপ আমাকে রীতিমতো ভোগাতে শুরু করল। কারণ এত দিন আমি যা যা দেখেছি, সেগুলো ছিল কিছু স্বপ্ন, কিছু আমার কল্পনা। কিন্তু এখন আমি নিজেকে ইথিয়ান দুনিয়ারই অংশ হিসেবে অনুভব করতে লাগলাম। এর আগে হয়তো আমি আমার নীচের দিকে তাকিয়ে চলা বা আয়না থেকে

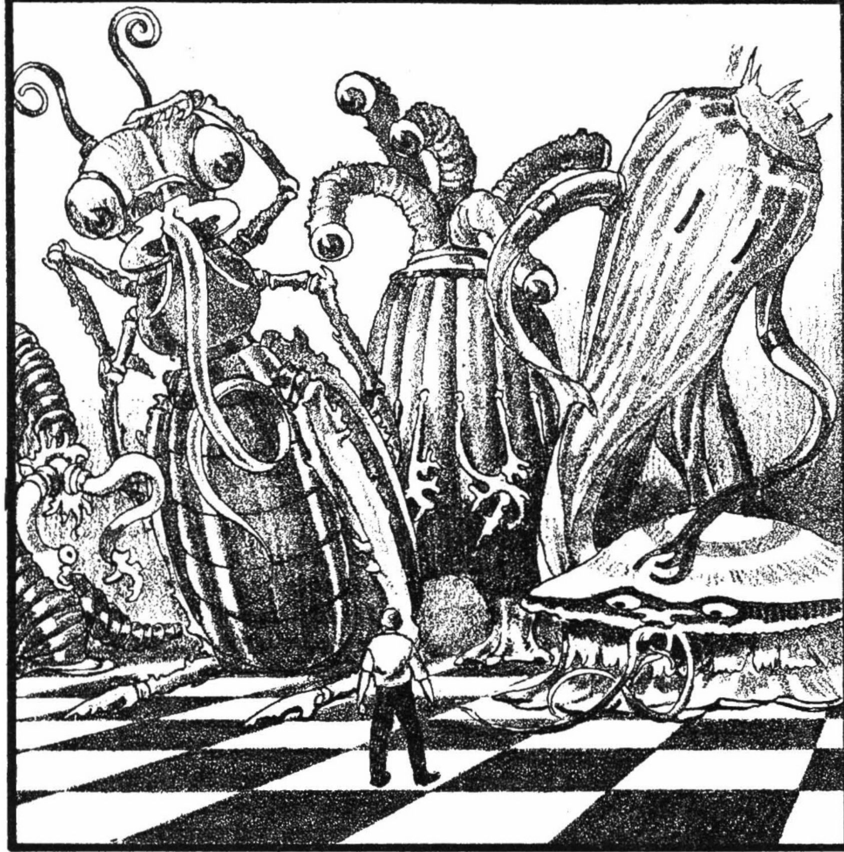
দূরে থাকার কথা উল্লেখ করেছি। এই ইথিয়ান দুনিয়াতেও নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ লাগত, কারণ এখানে কোনও আয়না ছিল না।

কিন্তু এরপর এল সেই কালরাত্রি, যখন আমি টের পেলাম, আমার মুন্ডুও একটা বিরাট থকথকে ঘাড়ের মতো অংশের সঙ্গে আটকানো। আর তার ঠিক নীচেই রয়েছে দশ ফুট লম্বা, কুঁজো হয়ে-যাওয়া শঙ্কুর মতো একটা ধড়। যেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে রংবেরঙের আঁশওয়ালা কিছু শুঁড়। সে দিন আমার চিৎকারে বোধহয় আর্কহ্যামের অর্ধেক লোক জেগে উঠেছিল।

এক সপ্তাহ পর থেকে এই দৃশ্যগুলো ঘন ঘন দেখতে শুরু করলাম আমার স্বপ্নে। এখন অবশ্য আমিও ওই রাক্ষুসে ইথদের মতোই আকারওয়ালা একজন। আমিও বাকি ইথদের মতোই সহজভাবে চলাফেরা করতাম। শুঁড় দিয়ে টেনে নিতাম বই, আবার বেদির মতো টেবিলে সবুজ শুঁড় দিয়ে অনেক কিছু লিখে চলতাম। ঠিক কী কী লিখতাম আর পড়তাম, প্রথম প্রথম আমার খেয়াল থাকত না, তবে বারবার একই জিনিস দেখার ফলে বুঝেছিলাম, ভয়ংকর নানা বিষয়ের সঙ্গেও গোটা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জীবজগতের বিষয়ই আমার লেখাপড়ার মূল বিষয় ছিল। তবে একটা ভয়ংকর বিষয় আমার আলাদাভাবে মনে আছে। সেটা হল মানব-প্রজাতির সম্পূর্ণ অবলুপ্তির লক্ষ লক্ষ বছর পর এক অদ্ভুত আকারের বুদ্ধিমান প্রাণীর গোটা দুনিয়া শাসনের বর্ণনা।

মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে আমি যা যা পড়লাম, এখনকার যে-কোনও তথাকথিত পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশির ভাগই হায়ারোগ্লিফিকে লেখা থাকলেও আমি সেগুলো বুঝতে পেরেছিলাম ড্রোনিং মেশিনের সাহায্যে। তবে অন্যান্য বেশ কিছু খণ্ড এমন বিটকেল ভাষায় লেখা ছিল, হাজার চেষ্টা করেও প্রথমে সেগুলো উদ্ধার করতে পারিনি। পরে এগুলো পড়তেও কাজে লাগাই ড্রোনিং মেশিন। তবে জেগে ওঠার পর খুব ঝাপসাভাবে এই স্মৃতিগুলো আমার মনে থাকত। এই উন্নত জাতি কীভাবে সময়কে জয় করেছে, সেটা ভেবে খুব অবাক লাগত। তার থেকেও বেশি অবাক হতাম এটা ভেবে, বর্তমান সময় থেকে আমার চেতনাকে সরিয়ে আনার পাশাপাশি ঠিক একই সময়ে কেউ ব্যবহার করে চলেছে আমার শরীর। শুধু তা-ই নয়, বৃহস্পতি[201], শুক্রর মতো গ্রহ থেকেও ইথরা চেতনা সংগ্রহ করেছিল। আমাদের এই পৃথিবীর চেতনাশক্তির মধ্যে ছিল অ্যান্টার্কটিকার ডানাওয়ালা তারার মতো মুন্ডুওয়ালা আধা উদ্ভিদ[202] প্যালিওজিয়ন প্রজাতি,

ভ্যালুসিয়ার সরীসৃপ প্রজাতি[203], এমনকী প্রাক-মানবসভ্যতার সাতগুয়ার রোমশ জাতির গোটা চারেক নমুনা[204], বিবর্তনের শেষ পর্যায়ের মাকড়সা প্রজাতি আর ভয়ানক চো চো প্রজাতির[205] নমুনাও ছিল।



চিত্র ১২.২ : এত বিচিত্র প্রাণীর নমুনা দেখেছিলাম যে খণ্ডের পর খণ্ড লিখে ফেলতে পারি!

এই সময় পাঁচ হাজার খ্রিস্টাব্দের এক দার্শনিক ইয়াং লি-র[206] চেতনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। দেখা হয়েছিল লেমুরের সম্রাটের সঙ্গেও[207], যিনি লক্ষ বছর আগে মেরুদেশে সাম্রাজ্য করতেন, হলুদ চামড়ার ইনুয়টদের আক্রমণের আগে। কথা বলেছিলাম ষোলো হাজার খ্রিস্টাব্দের এক জাদুকর নাগসোথের সঙ্গেও। এবং এদের সঙ্গে কথা বলে আমি অতীতের বহু সমাধান না-হওয়া রহস্যের আর ভবিষ্যতের বহু আসন্ন বিপর্যয় ও ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলাম।

এইসব স্বপ্নচারণের পর প্রত্যেকদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙত, দেখতাম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বপ্ন থেকে পাওয়া ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে এইসব নানারকম তথ্য নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করে দিতাম এবং আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য পেতাম। এখনকার বহু বিষয়, মানে যেগুলো নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, স্বপ্নের মাধ্যমে তা অনায়াসে সমাধান করে দিতাম। টের পেতাম, অতীতের এমন অনেক সত্য গোপন ছিল, যা প্রকাশ পেলে সমগ্র মানবজাতি এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। মানবসভ্যতার পরে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হবে কীট-সভ্যতার, যারা শাসন করবে গোটা দুনিয়া। এবং অবশ্যই ইথরা শাসন করবে গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে। চেতনা আদানপ্রদানের খেলা অবশ্য চলতেই থাকবে। ইথিয়ান লাইব্রেরির যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হত শক্ত সেলুলোজজাতীয় কাপড়ে। হাতে লেখা আর ছাপানো দু-রকমই থাকত বই আকারে বাঁধাই অবস্থায়। বলা বাহুল্য, এই স্বপ্নগুলো কখনওই আমাকে দৈনন্দিন জীবনের ছবি দেখায়নি। ইথিয়ান দুনিয়ায় আমি এতরকম প্রাণী আর প্রজাতি দেখেছিলাম, যে সবার কথা বলতে গেলে খণ্ডের পর খণ্ড লেখা হয়ে যাবে। খুব সম্ভবত আমি স্বপ্নে যে যুগের কার্যাবলি দেখতাম তা ছিল ১৫ কোটি বছরেরও আগেকার সময়ের— যখন পেলোজোয়িক যুগ শেষ হয়ে মেসোজোয়িক যুগ শুরু হতে যাচ্ছে।

এই সময় ইথরা প্রায় মানুষের মতোই দেখতে এক ধরনের প্রাণীর শরীর দখল করেছিল। এই প্রাণীগুলো ঠিক কী পর্যায়ের বলতে পারব না, কারণ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিতে এদের সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। ইথদের কোষের গঠন ছিল অদ্ভুত আর অভিনব। এবং এই কোষের গঠনের জন্যই তারা কখনও ক্লান্ত হত না। তাই ঘুমেরও দরকার হত না। যাবতীয় পৌষ্টিক কার্যাবলি চালাত ওই শুঁড়ের মতো উপাঙ্গ দিয়েই। আমাদের পরিচিত অনুভূতির মধ্যে মাত্র দুটি এদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল— দেখা আর শোনা। শোনার কাজ চালাত মাথার ওপরে থাকা ফুলের মতো ধূসর রঙের অংশ দিয়ে আর দেখার কাজ চালাত কুতকুতে তিনখানা চোখ দিয়ে। এদের রক্ত ছিল থকথকে সবুজ রঙের। ইথদের মধ্যে কোনওরকম যৌনক্রিয়া না থাকলেও প্রজননের কাজ তারা চালাত বীজ বা দেহের নীচের দিকে থাকা এককোষী যৌন জননাঙ্গ দিয়ে। অগভীর জলাশয়ে চলত সদ্যোজাতদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া। ইথরা ছিল যথেষ্ট দীর্ঘায়ু। কম করে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর ছিল

এদের আয়ু। যেহেতু ইথদের স্পর্শক্ষমতা বা যন্ত্রণাবোধ ছিল না, তাই সদ্যোজাতদের মধ্যে কারও কোনও খুঁত থাকলে তা ইথরা চোখে দেখলেই বুঝে যেত আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলা হত[208]। মৃত্যুর পর মৃতদের শরীর পুড়িয়ে ফেলা হত। ইথদের হাতে বন্দি-হওয়া কেউ কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার ফলেই কখনও কখনও আসন্ন মৃত্যুকে এড়াবার জন্য পালাতে সক্ষম হলেও এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটত না বললেই চলে। ইথরা মিলিত হয়ে যে সমাজ গড়ে তুলেছিল, তাতে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে যে উচ্চতায় তারা নিয়ে গিয়েছিল তা ধারণার বাইরে।



চিত্র ১২.৩ : দেখার কাজ চালাত কুতকুতে তিনখানা চোখ দিয়ে

স্বপ্নচারণ আর জেগে উঠে যেটুকু মাথায় থাকত, সেগুলো নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবা এইভাবেই চলছিল। আমার দুঃস্বপ্নের শেষ হত আমার চিৎকার দিয়ে। এগুলো আমার রোজনামচা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে একই রকম বিভিন্ন কেস নিয়ে অনুসন্ধান

চালাতাম। ১৯২২ সালে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেও ওই অপার্থিব আতঙ্ককে অতিক্রম করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। হয়তো এইভাবেই চলত, তারপর একদিন সমস্ত হিসেব গেল গুলিয়ে।

১৯৩৪ সালের ১০ জুলাই আমার হাতে এল সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পিলবারা থেকে পাঠানো একটা চিঠি আর তার সঙ্গে কিছু ফোটোগ্রাফ আর কাগজপত্র। আর এই চিঠিটাই আমার সামনে তুলে ধরল সেই নারকীয় রহস্য উন্মোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ। বেশি কিছু না বলে সরাসরি সেই চিঠির বয়ান হুবহু তুলে দিলাম:

অধ্যাপক ন্যাথানিয়েল উইনগেট পিসলি,
৪৯, ডাম্পিয়ের স্ট্রিট,
প্রযত্নে, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
পিলবারা[209], পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া,

৩০ই. ৪১ স্ট্রিট,
১৮ মে, ১৯৩৪
নিউ ইয়র্ক সিটি, ইউএসএ

মাননীয়েষু,

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, আপনার সঙ্গে আমার সরাসরি কোনও পরিচয় নেই। কিছু দিন আগে পার্‌থ নিবাসী ড. ই এম বয়েলের সঙ্গে আমার বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আপনার কথা অর্থাৎ আপনার ওই দ্বৈত সত্তা নিয়ে কাগজে বিভিন্ন লেখালেখির কথা আমাকে বলেন। তিনি আমাকে এ-ও জানান যে, আপনি আপনার স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্ন নিবন্ধ লিখেছেন। এই বিষয়ে আমি আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি আমাকে বলেন যে, ডাকযোগে তিনি আমাকে সেগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। ক-দিন আগে তিনি আপনার লেখা বিভিন্ন নিবন্ধ, কিছু কাগজ ও ছবি আমাকে ডাকযোগে পাঠান। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আর সরকারি খনি বিভাগের সঙ্গে জড়িত। আপনি হয়তো শুনলে অবাক ও আশ্বস্ত হবেন যে, আপনার স্বপ্নে

দেখা বিভিন্ন জ্যামিতিক আঁকিবুকি আর অদ্ভুত ওইসব বিরাট পাথরের চাঁইয়ের কিছু নমুনা আমিও দেখেছি।

কীভাবে দেখলাম, এবার সেই কথা বলি। বছর দুয়েক আগে সোনার খনির কাজে আমাকে যেতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে। কাজের জন্য সেখানকার আদিবাসীদের[210] *সাহায্য নিতেই হয়। এই আদিবাসীদের মুখেই প্রথম শুনি নানারকম অদ্ভুত প্রচলিত কিংবদন্তির কথা, যার মধ্যে একটা ছিল এক অজানা প্রাচীন শহরের কথা, যেখানে নাকি ওইরকম পেল্লায় পাথরের চাঁই দেখা যায়, যেগুলোর গায়ে থাকে অদ্ভুত নকশা আর আপনার বর্ণনার সেইসব হায়ারোগ্লিফ। স্থানীয় এইসব আদিবাসী যে কুসংস্কারগ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যেটা দেখলাম, এই কিংবদন্তি নিয়ে তাদের মধ্যে এক অজানা চাপা আতঙ্ক। তারা আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে এর সঙ্গে নিজেদের কিছু চালু উপকথাকেও মিলিয়ে নিয়েছে। যেমন বুদ্দাই*[211] *নামে এক বিশালাকার বৃদ্ধ, যে কিনা যুগ যুগ ধরে নিজের হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। যে দিন সে জেগে উঠবে, তার আগ্রাসী খিদে নিয়ে খেয়ে ফেলবে গোটা দুনিয়াকে। আর যেখানে সে ঘুমিয়ে আছে, তার আশপাশেই দেখা যায় ওইসব রাক্ষুসে পাথরের চাঁই।*

এই পাথরগুলো নাকি যেখানে আছে, তার নীচেই আছে এক ভয়ংকর দুনিয়া, যার বিস্তার কত দূর তা কেউ জানে না। এই দুনিয়া কতটা ভয়াবহ তা এই আদিবাসীদের কাছে অজানা হলেও এর প্রসঙ্গ উঠলেই তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। কারণ তারা নাকি শুনেছে, বহু যুগ আগে কিছু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এইরকমই এক সুড়ঙ্গের ভেতর, আর এরপর তারা কেউই আর ফিরে আসেনি। কিন্তু তাদের আশ্রয় নেবার পর থেকেই ওই জায়গা দিয়ে বইতে শুরু করে ভয়ানক ঝোড়ো বাতাস। আমি এদের এইসব আষাঢ়ে গপ্পে তেমন পাত্তা না দিলেও, আমার মনে গেঁথে আছে বছর দুয়েক আগের সেই স্মৃতি।

বছর দুয়েক আগে এই মরুভূমিরই ৫০০ মাইল পূর্বে আমি এরকমই কিছু রাক্ষুসে পাথরের চাঁই দেখেছিলাম। প্রায় ১২ ফুট লম্বা এই চাঁইগুলো মাটিতে পোঁতা ছিল। প্রথমে কিন্তু আমি এগুলোর গায়ে কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি, কিন্তু একটু কাছে গিয়ে ভালোভাবে দেখার পর এর গায়ে গভীরভাবে খোদাই-করা অদ্ভুত কিছু আঁকাবাঁকা রেখা দেখতে পাই, ঠিক যেমনটি ওই আদিবাসীরা তাদের আষাঢ়ে গপ্পে বলেছিল। কেন জানি না

আমার মনে হল, মাইলখানেকের মধ্যে এরকম আরও ৩০-৪০টা পাথরের চাঁই পোঁতা থাকলেও থাকতে পারে। আমার যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটু খোঁজার পর দেখলাম ঠিক তা-ই। খুঁজে পেলাম এরকম আরও কয়েকটা চাঁই, এবং সেগুলোর কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলাম। এবং আশ্বস্ত হবার পর দশ-বারোটা ছবিও তুললাম। ছবিগুলো এই চিঠির সঙ্গেই আপনাকে পাঠিয়েছি। এর আগে অবশ্য আমি এই চিঠি আর তথ্যগুলো পার্‌থের সরকারি বিভাগেও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এগুলোতে কোনও পাত্তাই দেয়নি। এরপর আমার সঙ্গে আলাপ হয় ড. বয়েলের। এই ড. বয়েল আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে আপনার নিবন্ধগুলো পড়েছিলেন। আমি তাঁকে এই পাথরের চাঁইগুলোর কথা বলতেই তিনি প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে পড়েন। আমি তাঁকে এ-ও জানাই যে, এই পাথর আর এর গায়ে আঁকা নকশাগুলোর সঙ্গে আপনার স্বপ্নে দেখা নকশাগুলোর যথেষ্ট মিল আছে। সঙ্গে আমি তাঁকে আমার তোলা ছবিগুলোও দেখাই। এরপরেই তিনি আমাকে বলেন অবিলম্বে আপনার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করার জন্য। আমার এই চিঠিটা পাঠাতে একটু দেরি হল, কারণ ইতিমধ্যে ড. বয়েল আমাকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার প্রায় সব প্রবন্ধ নিবন্ধ আমাকে পাঠান, আমি আরও একবার সমস্ত আঁকা আর বর্ণনাগুলো ভালোভাবে মিলিয়ে নিলাম এবং দেখলাম, ঠিক যেমনটি আপনি বলেছেন, আমার এই ছবিগুলোও সেইরকমই। এবং ওই পত্রপত্রিকার কপি আর যাবতীয় তথ্য ইত্যাদিও চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। বাকিটা না-হয় ড. বয়েলের থেকে সরাসরি সাক্ষাতেই শুনে নেবেন। সত্যি কথা বলতে কী, এগুলো দেখার পর আমি বুঝতে পারলাম, এগুলো আপনার কাছে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আগেই বলেছি, একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরুন ভূতত্ত্ব সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশোনা আমার আছে। সেই নিরিখেই বলতে পারি, এই পাথরের চাঁইগুলো এতটাই প্রাচীন যে, সাধারণ ভূতত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে এগুলোর আনুমানিক বয়স বলা অসম্ভব। তবে এটুকু বলতে পারি, পৃথিবীর গঠনের সময়ও এই পাথরগুলোর অস্তিত্ব ছিল। এই পাথরগুলোর উপাদান হিসেবে থাকা কংক্রিট আর সিমেন্টের উপাদান রীতিমতো বিস্ময়কর। এবং আরও বুঝতে পারি, বহু দিন, হয়তো সহস্র-লক্ষাধিক বছর কিংবা তারও বেশি দিন এগুলো জলের তলায় ডুবে ছিল। এবং বহু যুগের বিবর্তনের সাক্ষী এই পাথরের চাঁইগুলো। আর এগুলো বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক কত দিন, আমি বলতে পারব না। সত্যি বলতে কী, ভাবতেও চাই না। তবে একটা

ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, আমরা দু-জনেই মুখোমুখি হয়েছিলাম বহু প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের।

একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এগুলো হাতে পাবার পর আপনি অবশ্যই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমিতে অভিযান করতে চাইবেন। এ ব্যাপারে আমার আর ড. বয়েলের তরফ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আপনি পাবেন। আপনি চাইলে আপনার পরিচিত কোনও সংস্থার সঙ্গেও অভিযানের আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। আমি অভিযানের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালাবার জন্য কিছু মজুরের ব্যবস্থা করতে পারি। কারণ স্থানীয় ওইসব আদিবাসীকে দিয়ে এসব কাজ আর করানো যাবে না। ব্যাটারা ভয়েই কুঁকড়ে আছে। তবে এই অভিযানের ব্যাপারে আপনি, আমি ও ড. বয়েল ছাড়া আর কেউ জানবে না। আর একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, যদি কিছু আবিষ্কারও করতে পারি, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হবে আপনার।

এবার আসি জায়গাটার প্রসঙ্গে। পিলবারা থেকে মোটর ট্র্যাক্টরে করে ওখানে পৌঁছোতে দিন চারেক লাগবে। ওই মোটর ট্র্যাক্টরে আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতিও নিয়ে নেওয়া যাবে। ওয়ারবার্টন[212] *পার্‌থের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর জোয়ানা প্রপাতের ১০০ মাইল দক্ষিণে গিয়ে শেষ হবে ট্র্যাক্টর-যাত্রা। তারপর ডি গ্রে নদীপথেই*[213] *আমাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু হবে। ওই পাথরের চাঁইগুলোর সঠিক অবস্থান হল ২২ ডিগ্রি ৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড দক্ষিণ অক্ষাংশ আর ১২৫ ডিগ্রি ০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমা। ওখানকার আবহাওয়া কিন্তু খুবই গরম আর ক্রান্তীয় প্রকৃতির। তাই জুন থেকে আগস্টের মধ্যেই যাওয়া ভালো। যদি আপনারও কোনও পরিকল্পনা থাকে, সেটাও জানাবেন। সে যা-ই হোক, অত চিন্তা করার কিছু নেই। বাকি কথাবার্তা না-হয় সামনাসামনিই হবে। ড. বয়েলও আপনাকে পরে চিঠি লিখবেন। আর জরুরি কিছু বলার হলে না-হয় পার্‌থ থেকে তার করে দেওয়া যাবে।*

আপনার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

নমস্কারান্তে

রবার্ট বি এফ ম্যাকেঞ্জি

চিঠিটা পড়বার পর কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই চিঠিটা আরও বার দুয়েক পড়লাম। আনন্দে আর উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতর

ধুকপুকুনিটা যেন স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এরপর আর খুব বেশি দেরি করিনি। আমার জবাব ম্যাকেঞ্জি আর ড. বয়েলকে জানিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মিসকাটনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহচর্য আর পৃষ্ঠপোষকতা পেতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। ওদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ম্যাকেঞ্জি আর ড. বয়েলও যাবতীয় আয়োজন সেরে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমরা বিষয়টা যতটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেটা আর হল না। সর্বত্র কাগজওয়ালারা ফেউয়ের মতো লেগে গেল আমাদের পেছনে। শুরু হল আমাদের এই আসন্ন অভিযান নিয়ে নানারকম আষাঢ়ে গল্প আর টিটকিরির বন্যা। যদিও আমাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য তাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই গুজব আর টিটকিরিতেই এগুলো সীমিত থাকল।

এবার এই অভিযানে আমার সহযাত্রীদের নিয়ে বলা যাক। প্রথমেই বলব মিসকাটনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপকের কথা। এঁরা হলেন ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম ডায়ার[214] (যিনি ১৯৩০-৩১ নাগাদ অ্যান্টার্কটিকা অভিযান করেছিলেন), প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ফার্ডিনান্দ সি অ্যাশলে আর নৃতত্ত্ব বিভাগের টাইলার এম ফ্রিবরন। এবং এঁদের সঙ্গে অবশ্যই ছিল আমার মেজ ছেলে উইনগেট। ১৯৩৫ নাগাদ ম্যাকেঞ্জি আর্কহ্যামে আসে এবং আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে যারপরনাই সাহায্য করে। আমি এই পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই ভদ্রলোকের উৎসাহ আর অস্ট্রেলিয়ার হালহকিকত নিয়ে জ্ঞান যত দেখছিলাম, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

চিঠিতে যেমন বলা ছিল, ঠিক সেইভাবেই পিলবারাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মোটর ট্র্যাক্টর। আর এরপর আমরা ভাড়া করে নিই একটা টহলদারি স্টিমার। আমরা একেবারে আধুনিক আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাতে যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো যায়, তার জন্য সবরকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলাম। ১৯৩৫-এর ২৮ মার্চ আমরা বোস্টন থেকে এসে পৌঁছোলাম লেক্সিংটনে। সুয়েজ খাল বরাবর আটলান্টিক সাগর, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম লোহিত সাগরে এবং ভারত মহাসাগর পেরিয়ে আমরা চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। যাত্রাপথের ক্লান্তিকর আর দীর্ঘ বর্ণনায় আর গেলাম না। ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছেন ড. বয়েল। মনোবিজ্ঞানের ওপর তাঁর দখল

দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, এবং বাকি যাত্রাপথ আমি আর উইনগেট তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম।

যাত্রাপথের শেষে যখন আমাদের অভিযানের দল সেই বালি আর পাথরের দুনিয়ায় প্রবেশ করল, তখন ক্লান্তিতে আমাদের যা হাল হয়েছিল তা হয়তো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অবশেষে ৩১ মে এক শুক্রবার ডি গ্রে নদীর শাখা বেয়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই অজানা আর অদ্ভুত জগতে। যে অপার্থিব বস্তুগুলো এত দিন আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলোকে সামনে দেখলে ঠিক কী মনে হতে পারে, এ কথা ভাবতেই এক অজানা আর নারকীয় আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল।

৩ জুন, সোমবার আমরা এসে পৌঁছোলাম সেই জায়গায়, যেখানে ওই রাক্ষুসে পাথরের চাঁইগুলো রয়েছে। প্রথমে অর্ধেক পোঁতা পাথরটা দেখে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলাম। তারপর যখন সেটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, তখন যে আমার ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ওই পাথরের চাঁইটা ছিল আমার স্বপ্ন তথা দুঃস্বপ্নে দেখা দৈত্যাকার স্থাপত্যে তৈরি বাড়িগুলোর দেওয়ালের এক টুকরো ভগ্ন নিদর্শন। ওই পাথরের গায়ে খোদাইয়ের চিহ্ন ছিল। এবং যখন হাত দিয়ে একটা নকশাকে দেখে চিনতে পারলাম, উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে লাগল। কারণ বহু দিন ধরে নিয়মিতভাবে যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্ন আর গবেষণার ফলে ওই নকশাটা ছিল আমার কাছে ভীষণভাবে পরিচিত।

এক মাস ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চালাবার পর নানারকম আকৃতির প্রায় ১২৫০টা পাথরের চাঁই আমরা খুঁজে পেলাম। বেশির ভাগই ছিল ওপর-নীচে ঢেউ-খেলানো মান্ধাতার আমলের খোদাই-করা স্মৃতিস্তম্ভের মতো। কিছু ছিল আমার স্বপ্নে দেখা ওই পাষাণপুরীর মেঝে আর রাস্তার ধারের ফুটপাথের মতোই চৌকোনা বা আটকোনা চ্যাটালো ছোট পাথর। কয়েকটা আবার দানবীয় আকারের পাথরও ছিল। আমরা উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর যত খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে লাগলাম, ক্রমাগত এরকম পাথরের নমুনা আরও চোখে পড়তে লাগল। যদিও এযাবৎ আবিষ্কৃত সব ক-টা পাথরের মধ্যে কোনওরকম যোগসূত্র আছে কি না, সেটা আমরা বের করতে পারিনি। অধ্যাপক ডায়ার এই পাথরগুলোর প্রাচীনত্ব দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তবে অধ্যাপক ফ্রিবরন অবশ্য কিছু চিহ্নের সঙ্গে পাপুয়ান আর পলিনেশীয়

ভয়ানক কিছু প্রচলিত কিংবদন্তির মিল খুঁজে পেলেন। তবে পাথরগুলোর অবস্থা দেখে আমরা সকলেই একটা বিষয়ে একমত ছিলাম, এগুলো বহু যুগের বিবর্তনের সাক্ষী।

আমাদের সঙ্গে যে এরোপ্লেন ছিল, আমার মেজ ছেলে উইনগেট তাতে চেপে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন উচ্চতা থেকে জরিপ করে মরুভূমির বালি আর পাথরগুলোর মধ্যে নতুন কোনও চিহ্ন বা সূত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা চালাত। অবশ্য তার এই চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন সে সাফল্যের মুখ দেখল। ঝোড়ো হাওয়ার ফলে বেশ কিছু বালি এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। আর তার ফলেই তার চোখে পড়ল নতুন এক পাথরের ছাঁদ। আর এইগুলোর মধ্যে দু-একটা দেখার পরই আমি চিনতে পারলাম এই ছাঁদগুলোকে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, হুবহু কোথায় এগুলোকে আমি দেখেছিলাম। হতে পারে, আমার সেই নারকীয় দুঃস্বপ্ন অথবা দিনরাত পড়াশোনা আর গবেষণার ফলেই হয়তো অবচেতন মনে এর ছাপ রয়ে গেছে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আমি প্রথম সেই অজানা উত্তুরে ভয়ানক বাসিন্দাদের সম্পর্কে ভয় আর কৌতূহল মেশানো একটা অদ্ভুত গা-শিরশিরে অনুভূতি টের পেলাম। হয়তো এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল আমার আগের ভয়ানক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। আমি মাথা থেকে এইসব চিন্তা হটাবার জন্য নিজেকে নানারকম মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম। কিন্তু সবই বিফল হল। এই সময় গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো যোগ হল অনিদ্রা। তবে এটা আমার কাছে তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি, কারণ ঘুমোলেই তো আবার ওইসব স্বপ্ন দেখতে হবে! সে যা-ই হোক, এই সময় আমার একটা নতুন অভ্যাস তৈরি হল। সেটা হল গভীর রাতে উত্তর বা উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর মরুভূমিতে হাঁটা। কেন জানি না মনে হত, হয়তো আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বপ্ন নগরীর বা তার বাসিন্দাদের দেখা পেলেও পেতে পারি। নিজের ইচ্ছা থাক বা না-থাক, কেউ যেন জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে যেত ওই নৈশভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতেই কখনও কখনও হোঁচট খেতাম মাটি থেকে সামান্য উঁকি-মারা সেই আদ্যিকালের স্থাপত্যের কিছু পাথরের টুকরোয়। কিন্তু সেগুলো সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। যদিও আমার বিশ্বাস ছিল, মাটির নীচে এই স্থাপত্যের সিংহভাগই বহু যুগ ধরে লুকিয়ে রয়েছে। তার কারণও ছিল অবশ্য। আমাদের ক্যাম্পটা ছিল ওই পাথুরে টুকরোগুলোর থেকে উঁচু জায়গায়। বালির ঝড়ের দৌলতে একটা

সাময়িক টিলার সৃষ্টি হয়েছিল। আর টিলার জন্যই অপেক্ষাকৃত নতুন পাথরের টুকরোগুলো কিছুটা মাথা বের করেছিল।

এই গোটা এলাকার খোঁড়াখুঁড়ি চালালে ঠিক কী কী আবিষ্কার হতে পারে, তার জন্য আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলাম না। এই নৈশভ্রমণের ফলেই আমি একদিন আবিষ্কার করলাম এক ভয়ানক জিনিস। সেটা ছিল জুলাই মাসের ১১ তারিখ। জ্যোৎস্নায়[215] ঝলমলে হয়ে ছিল গোটা এলাকাটা। আমিও নিজের নৈশভ্রমণের এক্তিয়ার পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম আরও খানিকটা। এবং ঘুরতে ঘুরতেই আমার চোখে পড়েছিল একখানা রাক্ষুসে পাথরের চাঁই। পাথরটা প্রায় পুরোটাই বালিতে ঢেকে গিয়েছিল। আমি ভালোভাবে দেখার জন্য দু-হাত দিয়ে সব বালি পরিষ্কার করলাম। তারপর চাঁদের আলো আর আমার ইলেকট্রিক টর্চের যুগলবন্দিতে ভালোভাবে দেখতে লাগলাম পাথরটা। একেবারে নিখুঁত বর্গাকার এই পাথরটা ছিল আমাদের অভিযানে আগে দেখা সব ক-টা পাথরের থেকে এক্কেবারে আলাদা। ব্যাসাল্টজাতীয় শিলা দিয়ে তৈরি এই পাথরের চাঁইটায় কোনও উত্তল বা অবতল অংশ ছিল না। আর তখনই আমার মাথায় একটা ঝলক দিল! ঠিক এইরকম পাথরগুলোকেই আমি আমার স্বপ্নে দেখতাম। ইথদের দুনিয়ায় আমি যে জানলাহীন পেল্লায় পাথুরে বাড়িগুলো দেখতাম, এই পাথরটা সেই বাড়িগুলোরই একটা অংশ। এই বাড়ির মধ্যেই পাতাল-কুঠুরিতে চিরকালের জন্য দরজার মুখ বন্ধ করে রেখে দেওয়া হত কোনও অপার্থিব শক্তিকে। আর দেরি নয়, দৌড় লাগালাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। সে রাতে আর ঘুম এল না আমার। ভোরবেলা বুঝতে পারলাম, কী বোকামিটাই না করেছি! একটা মান্ধাতার আমলের উপকথা আর আমার দুঃস্বপ্নের ভিত্তিতে ওভাবে ভয় পাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। একটু বেলা হলে আমি সবাইকে আমার আবিষ্কারের কথা বললাম। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে রওনা দিলাম পাথরটাকে দেখার জন্য। কিন্তু আমার কপালটাই বোধহয় খারাপ ছিল। গত রাতে বালির ঝড়ে গোটা এলাকাটা ঢাকা পড়ে গেছে, ফলে আমি ঠিক কোন জায়গাটায় ওই পাথরটাকে দেখেছিলাম, খুঁজে বের করতে পারলাম না।

এইবার আমি আমার এই লেখার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে বলতে চলেছি। কারণ একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এগুলো কখনওই আমার কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, ভয়ংকর রকমের সত্যি। কারণ আমার মেজ ছেলের মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল,

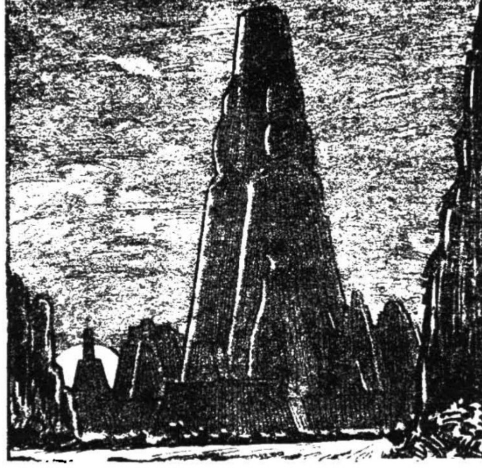
আর ও কখনওই এই বিষয়গুলোকে হালকাভাবে নেয়নি। আর আমার এই কেসের গোড়া থেকেই উইনগেট সাক্ষী ছিল। যা-ই হোক, এবার আসি আসল ঘটনায়। সেটা ছিল জুলাই মাসের ১৭-১৮ তারিখের একরাতের ঘটনা। বাইরে তুমুল ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। আমি ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেও ঘুম আসছিল না। তখন বোধহয় এগারোটা বেজেছিল, দেখলাম, আর শুয়ে কাজ নেই। যথারীতি সেই নৈশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাম্প থেকে যখন বেরোচ্ছি, ট্যাপার বলে একজন অস্ট্রেলিয়ান খনি মজুর আমাকে দেখে অভিবাদন জানাল। আকাশে তখন ঝলমলে চাঁদ তার নিজস্ব শোভা নিয়ে বিরাজমান। জ্যোৎস্নায় চারদিক উজ্জ্বল। আমি নিশ্চিত কারও কবিতা লেখার শখ থাকলে তিনি বেশ কয়েক ছত্র কবিতা লিখে ফেলতেন। কিন্তু আমি তো ঘরপোড়া গোরু, তাই কী একটা অশুভ আমাকে যেন ক্রমাগত ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল। খেয়াল করলাম, সেই ঝোড়ো বাতাসটা আর তেমন জোরে বইছে না। বুঝলাম, আগামী চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আর ঝোড়ো বাতাস বইবে না। আসলে ট্যাপারদের সঙ্গে কথা বলে এইসব ব্যাপারস্যাপার আমিও বেশ জেনে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ হেঁটেছিলাম খেয়াল নেই, তখন বোধহয় সাড়ে তিনটে মতো বেজেছিল। হঠাৎ সেই ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসের এমনই দাপট ছিল, যে আমাদের ক্যাম্পের সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে যেতে সবাই দেখল আমি গায়েব। কিন্তু যেহেতু আমি রোজই নৈশভ্রমণে বেরুতাম, কেউ গা করেনি। এদিকে তখনও বাইরে জ্যোৎস্না ঝলমল করছে, আকাশে ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। আমাদের ক্যাম্পের কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান মজুর আবার বেশ কুসংস্কারগ্রস্ত ছিল। তারা মনেপ্রাণে এইসব প্রচলিত উপকথায় বিশ্বাস করত। তাদের ধারণা ছিল, মেঘহীন ঝকঝকে আকাশ থাকা সত্ত্বেও যখন অনেকদিন বাদে এই ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করবে, সেটা নিশ্চিতভাবে অশুভ। এই বাতাসে কান পাতলে নাকি অনেক অপার্থিব ফিশফিশানি শুনতে পাওয়া যায়। আর এই বাতাসের ফলেই বালির ভেতর থেকে জেগে ওঠে বহু যুগ ধরে মাটির নীচে সুপ্ত থাকা সেইসব রাক্ষুসে আঁকিবুকি-কাটা পাথরের চাঁই। এই সময় তারা ভুলেও ওই এলাকা কখনও মাড়ায় না। তখন আন্দাজ চারটে বাজে, দুম করে ঝোড়ো বাতাস বওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বালি ফুঁড়ে তখন অনেক নতুন আকারের পাথর মাথা তুলেছে।

যখন পাঁচটা নাগাদ চাঁদ পশ্চিমদিকে বিদায় নিল, আমিও টলতে টলতে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। আমার মাথায় না-ছিল কোনও টুপি, আর ইলেকট্রিক টর্চটাও গিয়েছিল হারিয়ে। আর আমার চেহারা অবিকল লাশকাটা ঘরের কোনও কাটাছেঁড়া করা লাশের মতোই ফুটিফাটা, শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পের সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়লেও অধ্যাপক ডায়ার ক্যাম্পের সামনে বসে জুত করে পাইপ টানছিলেন। আমার চেহারার হাল দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ড. বয়েলকে ডেকে আনলেন। তারপর দু-জনে মিলে আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন আমার বিছানায়। এরপর ড. বয়েল, অধ্যাপক ডায়ার আর উইনগেট মিলে আমাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু আমার তখন যা মানসিক অবস্থা, ওসব ঘুম-টুম তখন বিশ বাঁও জল। হয়তো এযাবৎ আমার মানসিক অবস্থা যতবার বিগড়েছে, এবারেরটা ছিল সব থেকে ভয়াবহ। কিছুক্ষণ বাদে আমি এলোমেলোভাবে আমার হাল কী করে এরকম হল, বর্ণনা দিতে শুরু করলাম। আমি ওদের বললাম যে, আমি ক্লান্ত হয়ে বালির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যেসব ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এযাবৎকাল যত দুঃস্বপ্ন দেখেছি, সব ক-টাকে টেক্কা দিয়েছিল। অবশেষে যখন আমার স্নায়ু আর দুঃস্বপ্নের ভার বইতে পারেনি, তখন আমি জেগে উঠি। এবং প্রচণ্ড ভয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসার সময় ওই হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা পাথরগুলোয়ে ধাক্কা খেয়েই হয়তো আমার শরীর এভাবে কেটে-ছড়ে গেছে। হয়তো আমি একটু বেশিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তবে একটা কথা মানতেই হবে যে, ওই বীভৎসতার মুখোমুখি হয়েও আমি নিজেকে খুব ভালোভাবে সামলে নিয়েছিলাম। এরপর আমি জানাই, আমাদের অভিযানের কর্মসূচি একটু পালটে যাবতীয় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ উত্তর-পূর্বদিক বরাবর করলে ভালো হয়। যদিও আমার কথায় কোনও যুক্তি ছিল না। শুধু কিছু দুঃস্বপ্ন আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কেউই কর্মসূচি পালটাতে রাজি হয়নি। এদিকে আমাদের অভিযানের পুঁজিও ফুরিয়ে আসছে, আর আমার যা শরীর ও মনের অবস্থা, তাতে কোনও নতুন ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হয়নি, এমনকী উইনগেটও নয়।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্পের চারদিকে একটু টহল দিলেও ওদের খোঁড়াখুঁড়ির কোনও কাজে কোনও অংশ নিলাম না। দেখলাম, এদের সঙ্গে থাকলে আমার কাজ তেমন এগোবে না। কিন্তু আমাকে কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। তাই ঠিক করলাম, আমাকে দেশে ফিরতে হবে। আমার মেজ ছেলে উইনগেটকে বললাম আমার সঙ্গে বিমানে প্রায় হাজার

মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম পার্‌থে যাবার জন্য। সঙ্গে এ-ও বললাম, সেখানে পৌঁছোনোর পর যাবতীয় যা কাজ, সব আমি একাই করব। জুলাই মাসের ২০ তারিখ নাগাদ উইনগেট আমার সঙ্গে পার্‌থে রওনা দিল। ২৫ তারিখ লিভারপুল থেকে স্টিমার ছাড়া অবধি ও আমার সঙ্গে ছিল। এবং স্টিমারের কেবিনে বসে বসেই আমি এই লেখা লিখছি। কারণ আমার মনে হয়েছে, উইনগেটের গোটা ব্যাপারটাই জানা দরকার। বিশেষ করে সেই রাতের ঘটনাটা, যেটা আমি কাউকে বলিনি। আমার দুঃস্বপ্নের প্রতীক সেই নারকীয় হায়ারোগ্লিফিক লেখাওয়ালা সাইক্লোপিয়ান পাথরগুলো যখন পাতাল ফুঁড়ে আমার সামনে হাজির হয়েছিল, আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন আর তাদের কেন্দ্র করে আমার গবেষণা সব কিছু নিছকই শিশুসুলভ মনে হয়েছিল। হয়তো আকাশ থেকে জরিপ করার সময় উইনগেট এই পাথরগুলোই দেখেছিল, আর এদের মধ্যে মিল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হয়তো আমি যখন এগুলো তেমনভাবে খেয়াল করিনি, কোনও এক অজানা, অশুভশক্তি প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল এগুলো আমার দৃষ্টিগোচরে আনতে। আমি আগেই বলেছি, জুলাই মাসের ১৮ তারিখের সেই চাঁদনি রাতে ঝোড়ো বাতাস হঠাৎ করেই থেমে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমি আচমকাই সমুদ্রের মতো শান্ত আর স্থির হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আমার এই অভিযানে তেমন কোনও কাজ ছিল না, তাই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতাম। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কপালফেরে সেই দুঃস্বপ্নের নগরীর কোনও নিশান খুঁজে পাই! আমরা জানি, আমরা সব থেকে বেশি ভয় পাই অজানা-অচেনাকে। কিন্তু সেই অজানা-অচেনা জিনিস যদি আমাদের চোখের সামনে বারে বারে উঠে আসে, আমাদের ভয় অনেকটাই কমে যায়। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আদৌ তা হয়নি, বরং উলটোটাই হয়েছিল। স্বপ্নের জগতের সেইসব করাল বিভীষিকা যখন স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে আমার রোজকার জীবনে হানা দিয়েছিল, আমার জীবন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। আমার চোখের সামনে প্রাক-মানবসভ্যতার সেইসব ভয়াবহ পাথুরে আতঙ্কপুরীর বালি-আবৃত বারান্দা, খিলান, কুঠুরি— বারে বারে ফিরে ফিরে আসত। সঙ্গে অবশ্যই সেইসব হায়ারোগ্লিফিক নকশা। এখানেও কিন্তু আমি ঠিক ওই আতঙ্কপুরীর মতোই বিভিন্ন বালি দিয়ে ঢাকা পাথরের চাঁই দেখতাম। সে দিন ঠিক কতক্ষণ ধরে কোন দিক বরাবর আমি হেঁটেছিলাম, আমার কোনও খেয়ালই ছিল না। তাই যখন আমি হাঁটতে হাঁটতে ওই পাথরের চাঁইগুলোর কাছে সে দিন পৌঁছোলাম, আমার বুকের ভেতর দামামা বাজতে

লাগল। কারণ একসঙ্গে এতগুলো পাথরের চাঁই আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি। আকাশের চাঁদ আর মরুভূমিকে এখন আর সৌন্দর্যের প্রতীক মনে হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল অগণিত বছর ধরে কোনও অন্ধ অতীতের সাক্ষী এরা।



চিত্র ১২.৪ : প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে একটা টিলা দেখতে পেলাম

আমি এবার একটু কাছে এগিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর আমার ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেললাম। প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে একটা টিলা দেখতে পেলাম। আমার কেন জানি না মনে হল, এই পাথরের চাঁইগুলো কোনওভাবেই সাধারণ হতে পারে না। এযাবৎ আমরা যে ক-টা নমুনা দেখেছি, এগুলো তার থেকে অনেক গভীর অর্থপূর্ণ ছিল। এগুলোর ওপর যে আঁকাবাঁকা রেখাগুলো ছিল, সেগুলো আমি দেখেই চিনতে পারলাম। গবেষণা করে করে এই রেখাগুলো আমার খুবই পরিচিত। অনেক কসরত করে আমি একটু নিচু জায়গা দেখে নামলাম। তারপর এখানে-ওখানে যে বালি লেগেছিল, সেগুলো আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলাম। তারপর ক্রমাগত এগুলোর আকার, আকৃতিগত সামঞ্জস্য খুঁজতে লাগলাম। প্রথমে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঠিক তারপরেই টের পেলাম, এই ধ্বংসস্তূপকে কোথায় দেখেছি! এগুলো হল আমার দুঃস্বপ্নে দেখা সেই রাক্ষুসে তিরিশ ফুট লম্বা ইমারতেরই ভগ্নাংশ! কিন্তু এগুলো ঠিক কত দিন ধরে মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল, কোনও কূলকিনারা পেলাম না। আমি এই পেল্লায় ইমারতের লাইব্রেরি, বারান্দা, সেইসব

ঘর এবং সর্বোপরি সেই দানবীয় ইথদের অনেক আগেই দেখেছিলাম। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের ঠান্ডা স্রোত বইতে লাগল।

হঠাৎ টের পেলাম, সেই পাথরের গাদা থেকে আবার ঠান্ডা, দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক যেন গভীর পাতাল থেকে কোনও ঘূর্ণাবর্ত জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। বাইরের এই ধ্বংসস্তূপগুলো যার খোলস। আমার প্রথমেই মনে পড়ল স্থানীয় আদিবাসীদের সেইসব উপকথার কথা। কিন্তু তারপরেই আমার মনে পড়ে গেল আমার সেই দুঃস্বপ্নের কথাগুলো। টের পেলাম, আমার বহু আতঙ্কিত রাতের সেইসব দুঃস্বপ্ন এবার সত্যি হতে চলেছে। এই সময় হয়তো আমার পালিয়ে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু একটা কৌতূহল আর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা— যা-ই হোক-না কেন, আমাকে সাহায্য করল সেই ভয়কে জয় করতে। কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়াই আমি তরতরিয়ে এগোতে লাগলাম সেই ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ার উৎসের সন্ধানে। কোনও অলৌকিক বল যেন আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। কী করে জানি না, প্রথমেই আমি এক ঝটকায় একটা পেল্লায় পাথরের চাঁইকে সরিয়ে ফেললাম। আমার শরীরে তখন অমানুষিক শক্তি ভর করেছে। তারপর একের পর এক পাথরকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে লাগলাম। একটা জিনিস টের পেলাম, এই মরুভূমির দেশে থাকলেও পাথরগুলো কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই অলৌকিক বল আমাকে টেনে নিয়ে গেল অতল গহ্বরে। তলিয়ে যাবার সময় আমি আবার সেই বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেলাম। যখন হুঁশ ফিরল, দেখি, সেই গহ্বরের মধ্যে আমি পড়ে আছি। আমার আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেই ধ্বংসস্তূপের নানা নিদর্শন। পাশেই পড়ে আছে আমার ইলেকট্রিক টর্চ। আমি টর্চটা জ্বালালাম। কিন্তু সেই অন্ধকার ঘোচাবার পক্ষে ওই টর্চ নিছক খেলনা ছাড়া কিছুই নয়। এই মরুভূমির অতলে কত যুগ ধরে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রক্ষিত হয়েছে, কে জানে? খুব সম্ভবত পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকাল থেকেই। আমি ব্যাটারির আয়ু বাঁচাবার জন্য টর্চটা নেবালাম। আমার আগের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বুঝলাম, খুব ভয়ানক অশুভ কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যা-ই হোক, আমি হাত ও পা একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে এগোতে লাগলাম।

আমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল, সেই দানবীয় আঁকিবুকি-কাটা বিশাল দেওয়াল আর সীমাহীন অন্ধকার। আমি প্রথমটাই বেছে নিলাম। আমি ঠিক কোন পথে নীচে এলাম,

সেটা কোনওভাবেই আঁচ করতে পারলাম না। অতঃপর এলোমেলো কিছু স্মৃতির ওপর ভরসা করেই এগোতে লাগলাম। আমার শরীর তখন পুরোপুরি অসাড়। তার ওপর ভয়ও কাজ করছিল। এগোতে এগোতে এতক্ষণে একটা ঘরের মেঝেমতো পেলাম। মেঝের এদিক-ওদিক বিভিন্ন পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সঙ্গে ধুলো ও জঞ্জাল। ঘরের অন্যদিকে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু একটা দেওয়াল উঁচু হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। ওই দেওয়ালেও আঁকিবুকি থাকলেও সেগুলো ঠিক কীরকম এত দূর থেকে আমি ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু যে জিনিসটা দেখে আমি সব থেকে ঘাবড়ে গেলাম, সেটা হল এই ঘরের ধনুকের মতো বাঁকানো ছাদ। যদিও টর্চের আলোয় সবটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ওই ছাদের নীচের অংশটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম এগুলো আমার সেই দুঃস্বপ্নের পাতালপুরীর মতোই! এই অতল গহ্বর থেকে আমি কী করে ফিরব, কোনওভাবেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি এবার আমার বাঁদিকের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই দেওয়ালটা অন্যগুলোর থেকে কিছুটা কম এবড়োখেবড়ো ছিল। অনেক কষ্টে আমি এগোতে লাগলাম। এগোনোর সময় আমি কয়েকটা পাথরের টুকরোকে জঞ্জালের গাদায় ঠেলে দিতেই টের পেলাম এই ঘরের শান-বাঁধানো মেঝেও হুবহু আমার আতঙ্কপুরীর মতোই।

এবার আমি টর্চটা আবার জ্বেলে ভালোভাবে দেখলাম। বেলেপাথরের ওপর কোনও জলপ্রবাহের ক্রিয়ায় কিছু কিছু জায়গা আলগা আর নরম হয়ে ভেঙেচুরে গেছে। কিন্তু যেটা দেখে আমি সব থেকে বেশি অবাক হলাম, সেটা হচ্ছে পাথরের ওপর আঁকিবুকি নকশাগুলো দেখে। এগুলো হচ্ছে সেই নকশা, যা বহু যুগের আতঙ্ককে একসঙ্গে আমার অবচেতন মন দেখতে পেয়েছিল। রাতের পর রাত আমি দেখেছিলাম দুঃস্বপ্ন। যে দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এত দূর। এই ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেক টুকরোর সঙ্গে আমি পরিচিত, ঠিক আর্কহ্যামে আমার ক্রেন স্ট্রিটের বাড়ির মতোই। কিন্তু স্বপ্নে আমি যা দেখেছি, তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভয়াবহ বাস্তবে এই দুঃস্বপ্নের নগরীতে হাজির হওয়া। এই আতঙ্ককে হুবহু ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দুঃস্বপ্নে আমি যেসব জলজ্যান্ত বিভীষিকাকে দেখেছিলাম, যদি তাদের মুখোমুখি হই, তাহলে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করব এবং আদৌ পারব কি না, সেটা ভেবেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ করেই আমি যেন আমার চারপাশে সেইসব বিভীষিকার অস্তিত্ব টের

পেতে লাগলাম। অন্ধকারের কোথাও যেন তারা ঘাপটি মেরে আমাকে লক্ষ করছে। দুঃস্বপ্নের সেইসব দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এখনও কি সেই লাইব্রেরিতে ইথরা ঘুরে বেড়ায়? এখনও কি সেই আতঙ্কপুরীর বারান্দা আর বন্ধ কুঠুরিগুলোর অস্তিত্ব আছে? যদিও আমার স্বপ্নে দেখা আর ওইসব কিংবদন্তির অনেক কিছুই ভবিষ্যতের ইতিহাসের খোলনলচে পালটে দিয়েছিল। অবশ্যই এক ভয়ানক উন্মাদনা আমাকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু যে ভয়াবহতার সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে— তার কাছে সেগুলো কিছুই নয়। এই সময় আমার হঠাৎ করেই মনে পড়ল ইথদের সেই লাইব্রেরির কথা, যেখানে আমিও তাদের মতো একজন হয়ে গিয়ে ঝড়ের গতিতে লিখে চলতাম পাতার পর পাতা। যদি সত্যিই ওরকম কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে আমি নিমেষেই সেখানে পৌঁছোতে পারব।

আমার মাথার মধ্যে এবার যেন ঝড় বইতে লাগল। সমস্ত স্মৃতি থমকে থমকে ভিড় জমাল মগজে। আমার ইলেকট্রিক টর্চের কমজোরি আলো দেখে যেন ওই অনন্ত অন্ধকার বিদ্রুপের হাসি হাসতে লাগল। সত্যি বলতে কী, টর্চের ওই আলোয় জায়গাটা আরও ভূতুড়ে লাগছিল। এক জায়গায় দেখলাম, আলশেটা প্রায় পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, তাই ঠিক করলাম, ওইদিকেই যাওয়া যাক। আলশে থেকে পাথরের চাঁই পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গাদা হয়ে জমে আছে। অনেক কষ্টে সেগুলোর ওপর ওঠা গেল। এই দানবীয় গুহায় আমার আকৃতি ছাড়া সব কিছুই বেশ মিলে যাচ্ছিল আমার দুঃস্বপ্নের সঙ্গে। নিজেকে মনে হচ্ছিল দানবের দেশে গ্যালিভার। যা-ই হোক, টলতে টলতে, লাফ দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আমি কোনওমতে এগিয়ে চললাম আমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে। একবার তো কোনওমতে টাল সামলালাম, আর-একটু হলে আমার টর্চটাই ভেঙে যাচ্ছিল। তবে আমার এখন আর কোনও কিছু মনে হচ্ছিল না, কারণ এই পাতাল গহ্বরের প্রত্যেকটা ইঞ্চি এখন আমার কাছে পরিচিত মনে হল। মনে হচ্ছিল, এরা যেন আমাকে বলছে, “ক্ষণিকের অতিথি হয়ে কেন এলে আমাদের কাছে? আমরা যে যুগ যুগ ধরে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। এসো, আমাদের কাছে এসো।”

এখানকার বেশির ভাগ ঘরই হয় ভেঙেচুরে গেছে, নয়তো আবর্জনায় ভরতি। কয়েক জায়গায় দেখলাম, কিছু ধাতব পাত পড়ে আছে। কয়েকটা অক্ষত থাকলেও অধিকাংশই ভেঙেচুরে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম, এগুলো হচ্ছে আমার দুঃস্বপ্নে দেখা সেই

টেবিলের অংশ, যেগুলোর ওপর রেখে আমি পাতার পর পাতা লিখে চলতাম। এবার একটু নীচের দিকে নামলাম। দেখলাম নীচের দিকটা বেশ ঢালু। এগোতে এগোতে এবার থামলাম। দেখলাম, ফাটলের জন্য সামনে প্রায় ফুট চারেক ফাঁকের সৃষ্টি করেছে। ওই অন্ধকারের জন্য ফাঁকের ভেতরে কী আছে তা আন্দাজ করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আমি জানতাম, এই ইমারতের মাটির নীচে আরও দুটো তলা আছে। আর একদম শেষ তলায় আছে ধাতুর তৈরি সেই চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া দরজা। এদিকে এই ফাটল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমার পক্ষে এগোনো রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কেন জানি না, হয়তো নিজের পাগলামির ভরসাতেই আমি এগোতে থাকলাম বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে। এইভাবে পৌঁছোলাম একেবারে শেষের ধাপে। আমার ক্ষীণ স্মৃতি আমাকে বলল, এই পথে গেলেই আমি আমার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই মেশিন ঘরে পৌঁছোতে পারব। কালের প্রকোপে যেগুলো হয়তো আজ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে, কিংবা হয়নি! কোথায় কী ছিল, আমার একদম মুখস্থ। তাই বেশ মনের জোর নিয়েই আমি সেই ধ্বংসস্তূপের গাদা পেরিয়ে এগোতে লাগলাম। আমি জানতাম, একসময় এই ত্যারচা বারান্দা পেরিয়েই আমি পৌঁছোতাম সেই দুঃস্বপ্নের লাইব্রেরিতে। তাই আমার আশা ছিল, এবারেও সেখানে পৌঁছে যাব।

যত এগোতে লাগলাম, আমার মনে হল, বহু যুগ ধরে লুকিয়ে রাখা গোপন রহস্য এবার আমার সামনে উন্মোচিত হতে চলেছে। দেওয়াল, বারান্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে আমার দুঃস্বপ্নের সঙ্গে কিছু কিছু মিল খুঁজে পেলাম, কিছু আবার নতুন জিনিসও দেখলাম, যেগুলো আগে দেখিনি। আমি জানতাম, মাটির নীচের কোনও রাস্তা এই আতঙ্কপুরীকে মূল রাস্তার সঙ্গে যোগ করেছে। শুধু এই বাড়িই নয়, আশপাশের সেই রাক্ষুসে বাড়িগুলোকেও। তবে এখনও অবধি আমি আমার স্বপ্নের থেকে খুব বেশি কিছু ফারাক খুঁজে পাইনি। খুব আবছাভাবে হলেও, কিছু কিছু রাস্তা আমার এখনও মনে ছিল। তবুও আমি আরও ভাবতে লাগলাম। মাথায় বেশি জোর দেবার ফলে আমার অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ল। তবুও আমি মনে করতে পারলাম, মাটির নীচের সেই গোলাকার গম্বুজঅলা ঘর কম করে দু-শো ফুট জুড়ে ছিল। মেঝেটা এতই চকচকে ছিল যে, আমি নিজের ছায়াও দেখতে পেতাম। ইথদের দরকার না-থাকায় এখানে কোনও সিঁড়িও ছিল না। স্বপ্নের সেই দানবীয়

মিনারগুলো ইথরা কড়া পাহারায় রক্ষণাবেক্ষণ করত, কিন্তু এখন তো আর সেখানে কোনও পাহারা নেই! ভেবেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

এবার সেই বারান্দায় এক জায়গায় গিয়ে থামতে বাধ্য হলাম। এখানে পাথরের স্তূপ প্রায় পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে। আর দেখলাম একটা বিশাল বড় গহ্বর, যেটা দেখে বুঝলাম, আমার ইলেকট্রিক টর্চ এখন দেওয়াল বা গহ্বর কোনও কিছু দেখার জন্যই আর কাজে আসবে না। আমার কেন জানি না মনে হল, এটা মাটির নীচের সেই চোরাকুঠুরির কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি সীমারেখা। আমি বুঝতে পারলাম, ইথদের সেই তথ্যভাণ্ডারের খুব কাছাকাছি এসে গেছি। কিন্তু তিন নম্বর ধাপে উঠে যা দেখলাম, সেটা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। মনে হল, এতক্ষণ যা করলাম, সব পণ্ডশ্রম! এত কাঠখড় পুড়িয়ে আবার আমি এসে হাজির হয়েছি নতুন এক প্রকাণ্ড বারান্দায়। এখানে ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো প্রায় ছাদ ছুঁয়ে ফেলেছে। এরপর পুরোপুরি হয়তো আমার পাগলামির ওপর ভর করেই হ্যাঁচকা দিয়ে ওই পাথরের স্তূপগুলোকে সরাবার জন্য উদ্যোগী হলাম। স্বপ্ন নাকি সত্যি নাকি দুঃস্বপ্ন জানি না, কিন্তু অনেক কসরত করে একফালি এগোবার রাস্তা বানাতে সক্ষম হলাম। আমার ইলেকট্রিক টর্চ ক্রমাগত জ্বালাতে ও নেবাতে (অবশ্যই ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য) লাগলাম পাথর সরাবার কাজে। একবুক তেষ্টা নিয়ে কীভাবে এই অসাধ্য সাধন করলাম, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে হয়তো আরও একটি অধ্যায় লিখে ফেলতে হবে।

বারে বারে পিছলে যেতে যেতেও দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে ধরেছিলাম পাথরের চাঁইগুলোকে। যুদ্ধশেষে একটা মোটামুটি দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম। এবং অবশেষে টের পেলাম, আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু সেই লাইব্রেরির খুব কাছাকাছি এসে গেছি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি এসে পৌঁছেছি চারদিক বন্ধ খিলানওয়ালা একটা নিচু গোলাকার সমাধিগৃহে। এই সমাধিগৃহের অবস্থা কিন্তু অতটা তথৈবচ নয়। বরং দেখলে মনে হবে, দীর্ঘ দিন ধরে এর রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছে। এর দেওয়ালগুলো আমার টর্চের নাগালের মধ্যেই ছিল। তাই টর্চের আলোয় ভালো করে দেখলাম। এবং দেখে চমকে উঠলাম! আরে! এগুলোতে তো হায়ারোগ্লিফিক লেখা ও আঁকিবুকিতে ভরতি! কিছু কিছু আঁকিবুকি তো হুবহু আমার স্বপ্নের মতো। বুঝলাম, আমার নিয়তি আজ আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই আলো-আঁধারির দেশে।

আমার বাঁদিকের একটা ধনুক আকারের খিলানওয়ালা পথ গেছে দেখলাম, তাই সেদিকেই পা বাড়ালাম। এই পথে এগোতে এগোতে দেখলাম, ওপরে আর নীচে যে অংশগুলো এখনও টিকে আছে, এখান থেকে নাগাল পাওয়া যেতে পারে। একটা জিনিস ভেবে অবাক হয়ে গেলাম সমস্ত পৃথিবী থেকে সুরক্ষিত, সৌরজগতের যুগান্তরের নিখুঁত বর্ণনাসমৃদ্ধ এই তথ্যভাণ্ডার নির্মাণে কী অমানবিক দক্ষতা প্রয়োগ হয়েছে। এই গোটা স্থাপত্যটা নিজেই যেন এক স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম! নিখুঁত গাণিতিক পদ্ধতিতে সিমেন্টের সাহায্যে এই বিরাট পাথরগুলোকে বিস্ময়করভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই স্থাপত্য। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের মতোই মজবুত এর ভর। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, এই নতুন রাস্তা বানিয়ে নেওয়ার পর তুলনামূলকভাবে হাঁটতে আমার সুবিধে হচ্ছে, বরং একরকম দৌড়েই এগোতে লাগলাম। এই ব্যাপারটা আমাকে একটু হলেও অবাক করল আর ভাবিয়ে তুলল। এযাবৎ ওই দুঃস্বপ্নে আমি যা যা দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আমি আমার গতিপথের অস্বাভাবিক মিল দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার দু-দিকে হায়ারোগ্লিফিক নকশা-আঁকা ধাতুর দরজা থাকে থাকে তাদের স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান। কালচক্রে এই স্থাপত্যের অনেক কিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও, এগুলোতে তেমনভাবে সময় তার থাবা বসাতে পারেনি। ওই দরজার থাকের সারির মাঝে মাঝে ধুলোর পাহাড় তৈরি হয়েছে। বুঝতে পারলাম, ভূমিকম্পের ফলে এই ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে আবার বিভিন্ন লেখাওয়ালা গম্বুজ রয়েছে, যেগুলো দেখে বোঝা যায়, কোন তাকে কী কী খণ্ড রয়েছে, তার বিবরণ রয়েছে ওতে। হঠাৎ দেখি সমাধিঘরের মতো দেখতে একটা ঘরের দরজা খোলা! আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি, এখানে কয়েকটা ধাতব তাকওয়ালা আলমারি দিব্যি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, এবং এগুলোতে একটুও ধুলো জমেনি। আমারও এবার গোয়েন্দাগিরির শখ চাগিয়ে উঠল। কসরত করে ওই পেল্লায় আলমারি বেয়ে উঠতে লাগলাম। ওপরের তাকে কয়েকটা রোগাপাতলা নমুনা দেখতে পেলাম। ঠিক করলাম, ওগুলো মাটিতে নামিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ওগুলোতে ঠিক কী লেখা আছে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। মাটিতে নামালাম কয়েকটা পাতলা নমুনা।

এবার উলটে-পালটে দেখতে লাগলাম। ধাতব মলাটওয়ালা বইগুলো লম্বায় ছিল কুড়ি ইঞ্চি আর চওড়ায় পনেরো ইঞ্চি। আর বইগুলোর ঘনত্ব ছিল ইঞ্চি দুয়েক। এগুলোর

পাতায় পাতায় হায়ারোগ্লিফিক লেখায় ভরতি! এগুলোর কিছু কিছু আমার দুঃস্বপ্নে দেখা হায়ারোগ্লিফিকের মতো। এবার আমি আর-একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। এবার আমার মাথায় বিদ্যুতের ঝলকানি দিয়ে উঠল। এগুলোর লেখার পদ্ধতি আমার খুব ভালোভাবে পরিচিত। যখন আমি গবেষণা চালাতাম, এই ধরনের লেখা আমি অনেক দেখেছি! ডি এরলেটসের কাল্টস ডি গাউলস, লুডউইগ প্রিনের ডি ভারমিন মিস্ট্রিজ, ভন জানৎসের আনঅসপ্রেলিচেন কাল্টেন, আবদুল **আলহাজ্রেডের** 'নেক্রোনমিকন' আর সেগুলোর সূত্র ধরে যে যে জিনিস নিয়ে আমি গবেষণা চালিয়েছিলাম, সেটা থেকে এই বইয়ের হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তাতে এর বিষয়বস্তু পুরোপুরি না বুঝলেও এর সম্ভাব্য সারমর্ম কিছুটা হলেও আন্দাজ করলাম। সেলুলোজ দিয়ে তৈরি পাতায় অদ্ভুত রঙিন কালি দিয়ে হায়ারোগ্লিফিকে অনেক কিছু লেখা। কত কালচক্রের ইতিহাস যে লেখা রয়েছে, আন্দাজ করতে পারলাম। এই হায়ারোগ্লিফিক কোনও পরিচিত পার্থিব হায়ারোগ্লিফিক নয়, এ হল সম্পূর্ণ অশুভ অপার্থিব কোনও লিপিমালা। আমার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিল যে দূর মেঘলোক থেকে আসা কোনও প্রাণীর চিন্তন, এ হল তার ভাষায় লেখা বিবরণ! কোনও অজানা গ্রহের সৃষ্টির সময়ের বিবরণ হয়তো বন্দি আছে এখানে, তারপর সেটা জায়গা পেয়েছিল ইথদের সংগ্রহশালায়। তবে আমি নিশ্চিত, এ আমাদের পরিচিত সৌরজগতের কোনও গ্রহ[216] নয়। এদিকে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমার খেয়াল ছিল না যে, আমার টর্চের ব্যাটারির হাল খারাপ। যখন দেখলাম, ব্যাটারির দৌলতে টর্চ দপদপ করতে শুরু করেছে, চটজলদি ব্যাটারি পালটে নিলাম। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যাটারি সবসময়ই থাকে, তাই কোনও অসুবিধে হল না। আমার দুঃস্বপ্নের জন্য আমি এই গোলকধাঁধা আর অলিগলির অনেকটাই চিনতে পেরেছিলাম, তাই জানতাম বলেই সঙ্গে অতিরিক্ত সরঞ্জাম রেখেছিলাম। এদিকে আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে নিজেরই কেমন একটা অদ্ভুত লাগছিল। কতকাল এই পাণ্ডববর্জিত ধ্বংসাবশেষে কোনও জীবিত প্রাণীর পায়ের শব্দ শোনা যায়নি, কে জানে? বহু যুগ ধরে জমে-থাকা ধুলোর পরতের ওপর নিজের পায়ের ছাপ দেখে নিজেরই বুকটা কেঁপে উঠল। আমার অবচেতন মন ক্রমাগত জানান দিচ্ছিল, কোনও অশুভশক্তি হয়তো কোথাও ওঁত পেতে রয়েছে। এবার আমি আর-একটু গভীরে যাবার জন্য নীচের দিকে দৌড় লাগালাম। আমার সামনে শুধু টর্চের আলো। দৌড়োনোর সময় টর্চের আলোয় অনেক অদ্ভুত জিনিসের নিদর্শন

দেখতে পেলেও, একবারের জন্যও থামলাম না। দৌড়ের গতির সঙ্গে কেন জানি না, হয়তো আমার অবচেতন মনের নির্দেশেই বারে বারে ডান হাত ঝাঁকাতে লাগলাম! যেন আমি আধুনিক প্রযুক্তির কোনও বিশেষ কম্বিনেশনের তালা খুলতে চাইছিলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম, নাকি সত্যি জানি না, কিন্তু ওই তালাটার ব্যাপারে যেন আমার অবচেতন মন একশো ভাগ নিশ্চিত ছিল। স্বপ্ন না হলেও হয়তো সেই দুঃস্বপ্ন-ভ্রমণের সময় কোনও প্রাচীন অপার্থিব শক্তি নিখুঁতভাবে আমাকে ওই তালার গঠনপ্রণালী শিখিয়েছিল। এইসব ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে দুঃস্বপ্নের ক্রমাগত মিল খুঁজে পেয়ে আমার মন বারে বারে শিউরে উঠেছিল। এই গোটা ধ্বংসাবশেষ যেন কোনও অলীক অপার্থিব আতঙ্কের ভগ্নাংশমাত্র।



চিত্র ১২.৫ : দৌড়োনোর সময় টর্চের আলোয় অনেক অদ্ভুত জিনিসের নিদর্শন দেখতে পেলেও, একবারের জন্যও থামলাম না

ইতিমধ্যে আমি সব থেকে নীচের ধাপে চলে এসেছিলাম। কিন্তু কথায় বলে না, "যেখানে বাঘের ভয়..."! ওই অন্ধকারের নাগপাশের জন্যই হয়তো আমার দৌড়ের গতি কিছুটা কমে গিয়েছিল। আর যে জায়গায় এসে গতিটা কমল, আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। কারণ আমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, এই জায়গাটা পার করা সব থেকে কঠিন। কারণ এখানেই রয়েছে সব থেকে নিরাপত্তাযুক্ত ধাতুর গরাদওয়ালা দরজা। এবং এই দরজা অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য একটা ফাঁদও বটে। এই দরজার পাহারায় থাকত অনেক রক্ষী। যদিও এখন কোনও রক্ষী সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তাহলেও ভয়ে আমার হাত-পা কেঁপে উঠল। কারণ কোনওক্রমে এই ব্যাসাল্টের গুহা পার করলেও ঠিক একই রকম আরেকটা দরজার ফাঁদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ একটা ঠান্ডা কনকনে, ভ্যাপসা হাওয়া আমাকে ওই দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমার ইচ্ছে না থাকলেও ওই হাওয়ার প্রকোপে আমি ওইদিকে যেতে বাধ্য হলাম। যখন ওই হাওয়ার দমক থামল, আমি দেখলাম ওই ধাতুর গরাদগুলো হাঁ করে খোলা! কী করে ওটা খুলে গেল, আমার মাথায় এল না। ওই দমকা হাওয়ার জন্যই হবে হয়তো। যা-ই হোক, আমি আর-একটু এগোলাম। সামনে আবার সেই সারি সারি ধাতুর তাকওয়ালা আলমারি। এবার মেঝের দিকে তাকালাম। এক জায়গায় ধুলোর পাহাড় জমেছে, এবং গোটাকতক আলমারি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঠিক এই সময়েই এক অজানা আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল। কারণ যে আলমারিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সেগুলো আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। সেই বিগ ব্যাং-এর সময় থেকে পৃথিবী সৃষ্টির সমস্ত রহস্য লিপিবদ্ধ হয়ে জায়গা নিয়েছিল ওই তাকে। আর অগুনতি বছর ধরে যখন মাঝে মাঝে কিছু বিরতিতে পৃথিবীর বিবর্তন ঘটেছে, এই আলোহীন গোলকধাঁধাও বিধ্বস্ত হয়েছে বারেবারে। আর সেই জন্যই এইসব দানবীয় আলমারি যখন নিজেদের জায়গা ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে এই পাতালপুরী।

যখন আর-একটু কাছে এগোলাম, বুঝতে পারলাম, ঠিক কী কারণে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। না, ওই ধুলোর পাহাড় নয়। বরং ওই ধুলোর গাদার মধ্যে বিশেষ কিছু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি এবার টর্চের আলোয় ভালোভাবে জায়গাটা দেখলাম। এখানে ঠিক যতটা ধুলো জমে থাকার কথা, ততটা নেই। ঠিক যেন মাসখানেক আগে এখান থেকে কিছু সরানো হয়েছে, কারণ বাকি জায়গার ধুলোর আস্তরণ এর তুলনায় যথেষ্ট পুরু।

আরও ভালোভাবে টর্চের আলো ফেলে যা দেখলাম, সেটা আমার কাছে খুব একটা আনন্দদায়ক ছিল না। কারণ ধুলোর ওপর যে তিনটে ছাপ পড়েছিল, সেগুলো ছিল আমার খুব পরিচিত। মিসকাটনিক ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়ার সময় আমার চোখের সামনে যে বিদঘুটে অপরিচিত জ্যামিতিক আকার ভেসে উঠেছিল, এগুলো ছিল তারই একটা। ঠিক ওই সময়ই আমার ক্লাসরুমের আকারও গিয়েছিল পালটে। ধুলোর ওপর এই ছাপগুলো ছিল কোনও কিছুর বর্গাকার চারটে পায়ার। আর ছাপগুলো ছিল প্রায় গোলাকার আর পাঁচ ইঞ্চি মতো পুরু। চারটে পায়ার একটা বাকি তিনটের তুলনায় দেখলাম একটু বড়। ঠিক যেন এগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়েও কোনও কারণে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু কী কারণ? হয়তো যে কারণে এই দানবীয় ধাতব তাকওয়ালা আলমারি মুখ থুবড়ে পড়েছে বা ঠান্ডা, ভ্যাপসা হাওয়ার প্রকোপে ধাতুর গরাদওয়ালা এই দরজা খুলে গেছে এক নিমেষেই!

হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হল, ঠিক কীরকম তা ভাষায় ব্যাখ্যা হয়তো করতে পারব না, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এখন আমার আর আগের মতো ভয় করছিল না। আর ওই পায়ার ছাপগুলো দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার স্বপ্নের কিছু প্রভাব এখনও আমার অবচেতন মনে রয়ে গেছে। এদিকে আমার ডান হাত তখনও সেই বিশেষ কম্বিনেশন তালা খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমি ওই উলটে-পড়া আলমারি আর ধুলোর গাদা পেরিয়ে নিজের অজান্তেই ছুট লাগালাম একটা বিশেষ দিকে, যেন এই রাস্তা আমার কত দিনের পরিচিত! আমার নিজের এই আচরণের কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু আমার শরীরের কার্যকলাপের সঙ্গে তাল মেলাতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, কোন প্রাণীর চেতনা এখন আমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছে? কোনও মানুষ কি আদৌ সেই বিশেষ প্রযুক্তির তালার নাগাল পেতে পারে? যে প্রাণীর চিন্তন এখন আমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে কি আদৌ এর কম্বিনেশন জানে? আর জানলেও এত যুগ বাদে সেই তালা কি আদৌ টিকে আছে? মনের মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল। ওই তালাবন্ধ কুঠুরির ওপারে এমন কী রয়েছে, যার মুখোমুখি হবার আগে আমার মন এভাবে ভয়ে কেঁপে উঠছে? আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু এইটুকু মনে ছিল যে, আমার দৌড় সাময়িকভাবে থামিয়ে আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম একসারি হায়ারোগ্লিফিক লিপি-আঁকা বিরাট দরজাওয়ালা আলমারির দিকে। এগুলোর

বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম ছিল। এগুলো দেখলে মনে হচ্ছিল, এগুলোর কিন্তু যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটের দরজা আবার হাট করে খোলা। এগুলো দেখে আমার ঠিক কী মনে হচ্ছিল, ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না, শুধু এটুকু বলতে পারি, এগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, এরা বহু যুগ ধরে আমার পরিচিত। আমি তাকগুলোকে একবার মেপে নিলাম। নাঃ, সহজে এগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না। কোনও ফন্দি আঁটতে হবে। খানিকক্ষণ ভেবে একটা উপায় বের করলাম। একটা আলমারির নীচের দিকের খোলা দরজা আর অন্য বন্ধ দরজাগুলোর সাহায্য নিলে হাত-পায়ের সাহায্যে বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে। সেইভাবেই কোনওরকম শব্দ না করে টর্চটাকে কামড়ে ধরে উঠতে লাগলাম। আমার ডান হাত যেভাবে কাজ করছিল, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, ওই কম্বিনেশন তালা আমি খুলতে পারব। এখন তালাটা কাজ করলে হয়! এদিকে বন্ধ দরজাগুলোর খাঁজে পা লাগিয়ে আমার উঠতে তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ তাক বেয়ে উঠতে উঠতে ডানদিকে চোখ গেল, আর আমার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই তালাটাকে দেখতে পেলাম।

ওপরে চড়তে চড়তে আমার আঙুলগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই না আমি তালাটাকে দেখতে পেলাম, অমনি আমার আঙুলে সাড় ফিরে এল। কিন্তু চমকের তখনও শেষ হয়নি। আমাকে হতভম্ব করে ওই ধাতব দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল!! যেন আমার আসার জন্যই অপেক্ষায় ছিল। এগিয়ে গেলাম ওইদিকে। আমার ডান হাতের কাছেই একটা হায়ারোগ্লিফিক নকশাওয়ালা বইয়ের তাকে একটা বাক্স ছিল। সেটা দেখে আমার ডান হাত এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল যে, যন্ত্রণায় প্রায় কুঁকড়ে গেলাম। শুধু মনের জোরে আমি ওই ব্যথাটা ভুলে ছিলাম, নয়তো আর-একটু হলেই হাতটা ফসকে যেত আর কী! বাকি তাকগুলোর থেকে এটা একটু বেশিই বড় ছিল, আর এর বেধ ছিল ইঞ্চি তিনেক। আর এই বাক্সটাতে ছিল অনেকরকম গাণিতিক নকশা। আমি অনেক কসরত করে বাক্সটার নাগাল পেলাম। তারপর কোটের কলারের সঙ্গে আটকে সেটাকে নিয়ে নিলাম পিঠে। আর চিন্তা নেই, এখন আমার হাত খালি। এবার আমি তরতরিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। আমার মনে তখন তীব্র কৌতূহল, আমার এত যন্ত্রণা সহ্য করার পর পুরস্কার হিসেবে যে বাক্সটা পেলাম, কী আছে তার ভেতরে? নীচে নেমে ধুলোর ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর পিঠ থেকে বাক্সটাকে নিয়ে এলাম সামনে। আমার

হাত রীতিমতো কাঁপছিল। বাক্সটা খুলে আমি একটা বই বের করলাম। যেন আমার ভেতর থেকে অন্য কারও অদম্য ইচ্ছাশক্তি বইটাকে বের করে আনল। এই বইটার মলাটেও আমার পরিচিত হায়ারোগ্লিফিক নকশা আছে। এবার যেন আমি একটু হলেও আমি বুঝতে পারলাম, ঠিক কী জিনিস খোঁজার জন্য এত দিন আমি অপেক্ষা করেছি আর এত দূর ছুটে এসেছি। যদি আমি সত্যিই স্বপ্ন না দেখে থাকি, আর যেটা ভাবছি, সেটা হয়, তাহলে সমগ্র মানবসভ্যতা যে ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে চলেছে, তা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। সব থেকে ভয়ানক ব্যাপার হল যে, আমি চেষ্টা করেও এই ঘটনাগুলোকে স্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। এমনকী এটা লিখতে লিখতেই যতবার ঘটনাগুলো মনে পড়ছে, আমার হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যা-ই হোক, ঘটনায় ফিরে আসি। বইটার হায়ারোগ্লিফিক নকশাওয়ালা ধাতব মলাটের দিকে তাকিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। সত্যি বলতে কী, বইটার মলাট উলটে ভেতরে কী আছে, সেটা দেখার জন্য আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। আমার সেই দুঃস্বপ্নে ড্রোনিং মেশিনের সাহায্যে এটার সারমর্মের অনুবাদ করেছিলাম কি না, সেটাও মনে পড়ছিল না। যা হবে, দেখা যাবে ভেবে কপাল ঠুকে আমি মলাট উলটোলাম। ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য মুখ থেকে টর্চটা বের করে বন্ধ করলাম। অন্ধকারে বসে বসে খানিকক্ষণ সাহস সঞ্চয় করলাম। তারপর অবশেষে টর্চ জ্বালিয়ে সেই আলোয় তাকালাম খোলা পাতার দিকে।

যা ভেবেছিলাম তা-ই। পাতায় যা লেখা ছিল, সেটা দেখে আমার দাঁতে কাঁপুনি লেগে গেল। হয় আমি স্বপ্ন দেখছি, নয়তো সময় আর স্থান নিয়ে যা যা থিয়োরি আছে, সব ভাঁওতা। আমি ঠিক করলাম, যে করেই হোক, এই বইটা নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে উইনগেটকে এটা দেখাতে হবে। যদিও আশপাশের অন্ধকারে আমি অন্য কিছুর অস্তিত্ব টের পাইনি, কিন্তু অতীতের সেই ভয়াবহ স্মৃতির ঝলক আমার চারদিকে ভিড় জমাতে লাগল। আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল। আমি বইটা বন্ধ করে আবার কোটের কলারের সঙ্গে আটকে পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। সত্যিই যে, এই পাতালপুরীর অস্তিত্ব আছে তা সবার জানা দরকার। অবশ্য বাইরের জগতের এমনকী আমারও আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না, বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু নীচে নামার সময় আমার যে ভয়টা করেনি, সেটা এবার হতে লাগল। মনের জোরে তো এই অবধি আমি নেমে এসেছি। কিন্তু ওই

পরিমাণ প্রতিকূলতা কাটিয়ে আবার ফিরে যাবই বা কী করে? আর-একটা ভয় হল, ইথরাও ভয় পেয়েছিল যাদের, তারা হয়তো এখনও এই পাতালপুরীর অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। মনের মধ্যে আরও নানারকম ভয় ঘুরতে লাগল। স্থানীয় আদিবাসীদের ঝোড়ো হাওয়ার গল্প, ধ্বংসাবশেষ, শিসের মতো শব্দ, ধুলোর ওপর পায়ার ছাপ, দুঃস্বপ্নে ভেসে আসা জ্যামিতিক আকার— সব মিলেমিশে একেবারে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে গেল।

ঠিক কী ধরনের অজানা আতঙ্ক আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা যদিও আমার ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু তার কিছু কিছু নমুনা আমি আগে দেখেছিলাম। একটা দেখেছিলাম এখানে ঢোকার আগে একটা খাঁজকাটা দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটা চিহ্নে। আর-একটা দেখেছিলাম, প্রথম যে বইটা নামিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম, তার আগে ধনুকের মতো খিলানওয়ালা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গোলাকার গম্বুজওয়ালা হলে। ডানদিকের খিলানটার দিকে তাকালাম। নাঃ, এবার ফিরতে হবে। এটা বেয়ে নেমে এখানে এসে পৌঁছোলেও ফিরতে আমার যে কী অবস্থা হবে, ভেবেই আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। পিঠে এই ধাতব মলাটওয়ালা বইয়ের ভার নিয়ে এই ধ্বংসস্তূপ পেরোনো যে খুব সহজ হবে না তা বলাই বাহুল্য! এবং হলও ঠিক তা-ই। এই ধ্বংসস্তূপের এক-একটা টুকরো আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল পাহাড়প্রমাণ বাধা। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে করে আমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যে নির্দিষ্ট গন্তব্যে না-পৌঁছোনো অবধি আমি হাল ছাড়তাম না। এক্ষেত্রেও তা-ই হল। আমি দেখলাম, অবশেষে আমি এসে পৌঁছেছি সেই পাহাড়ের মতো ধ্বংসস্তূপের ঢিপির সামনে, যেটা পেরিয়ে আমি প্রথম একটু যাওয়ার রাস্তা বানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা ভয় কাজ করছিল। প্রথমবার এখানে ঢোকার সময় কিঞ্চিৎ শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা যেন আর না হয়। কারণ ধুলোর ওপর ওইসব ছাপ দেখে আর এই পাতালপুরীর ভেতর হাড় হিম করে দেওয়া নানারকম শব্দ শুনে আমার আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি আগের মতো ছিল না। আর ওই বাক্সবন্দি বইটা পিঠের ওপর হয়ে দাঁড়িয়েছিল গোদের ওপর বিষফোড়া। কিন্তু আমি ওসব তোয়াক্কা না করে এগোতে লাগলাম বেয়ে বেয়ে। টর্চটা কামড়ে ধরলাম মুখে আর বইয়ের বাক্সটাকে ওঠার পথে যা যা ফাঁকফোকর পাচ্ছিলাম, সাময়িক বোঝা লাঘব করার জন্য ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিলাম। কিন্তু

ওই সাময়িকই! তার পরের মুহূর্তেই পিঠের বোঝার জন্য বেয়ে উঠতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে এই কসরত করতে করতেই ঘটল আসল বিপত্তি! যেই না পরের ধাপে একটা পাথরের ফাঁকে বইয়ের বাক্সটাকে চালান করতে যাব, আমার হাত ফসকে বাক্সটা ঢাল বেয়ে গিয়ে পড়ল ধ্বংসস্তূপের গাদায়। আর শুধু যে পড়ল তা-ই নয়, পড়ে এমন একটা শব্দের সৃষ্টি করল, যে তার প্রতিধ্বনিতে এই পাণ্ডববর্জিত পাতালপুরীর প্রত্যেকটা দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল! আর আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত বেয়ে গেল। আমি ঠিক যে জিনিসটা মনেপ্রাণে চাইনি, সেটাই হল। আর এই সময়ই বহু দূর থেকে যেন একটা খনখনে, তীব্র শিসের মতো শব্দ ভেসে এল আমার কানে। শব্দটা যে ঠিক কীরকম, ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে, কোনও পার্থিব শব্দের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই, তাই কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে এটা বোঝাতে পারব না। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বোঝাতে লাগলাম, ওই শব্দ সম্পূর্ণ আমার কল্পনা। কিন্তু আমার সচেতন আর অবচেতন মন এর বিরোধিতা করতে লাগল। যদিও আমার আতঙ্কের শেষ এতেই ঘটেনি, কারণ এরপর যেটা ঘটল, সেটা এতটাই ভয়ানক ছিল যে, ভাবলেও এখন আমি শিউরে উঠছি। আমি বইয়ের বাক্সটাকে হস্তগত করার জন্য দৃঢ়ভাবে টর্চটা ধরে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলাম। আমি তো তখন বাইরের দুনিয়ায় চাঁদের আলো আর মরুভূমিতে পৌঁছোবার আনন্দে মশগুল! তাই আমার ধারণা ছিল না, বইটাকে হস্তগত করার পরও এই পৈশাচিক ঘটনাক্রমে কোনও ইতি ঘটবে না। জিনিসটা ঘটল ওই ধ্বংসস্তূপের পাহাড়ের ঢিপির ওপর ওঠার পর। হঠাৎ করেই আমার পা গেল পিছলে, আর আমি শুধু দেখলাম, কিছু গাঁথনি আর পাথরের টুকরোর ধসের সঙ্গে আমিও গড়িয়ে পড়ছি। আর সেই ধসের কী আওয়াজ! মনে হবে, একশোটা কামান যেন একসঙ্গে দাগা হয়েছে। এই বিপর্যয়ের ঠিক পরেই কী ঘটেছিল, আমার মনে ছিল না। যখন আমার হুঁশ এল, দেখলাম, চাতালের ওপর পড়ে আছি। আমার পাশেই পড়ে রয়েছে আমার টর্চটা আর সেই বইয়ের বাক্সটা। শুধু এইটুকু মনে করতে পারলাম, ওই সশব্দ ধ্বসের সঙ্গে প্রবল গতিতে আমিও নিমজ্জিত হতে চলেছি কোথাও। আর ওই ধসের শব্দে আমার চিৎকারও ঢেকে গিয়েছিল। এদিকে ওই ধসের বিকট শব্দের প্রতিধ্বনি তখনও যেন ফিরে ফিরে আসছে পাতালপুরীর দেওয়াল থেকে। আর ঠিক সময়ই আবার সেই অপার্থিব খনখনে

শিসের মতো শব্দটা ভেসে এল খুব স্পষ্টভাবে। নাঃ, এবার আর কোনও ভুল হবার কথা নয়। কারণ এবার শব্দটা আর আমার পিছনদিক থেকে নয়, আসছে সামনের দিক থেকে! সামনের সেই খোলা দরজার ওপারে থাকা সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে থেকে। আর শুধু শব্দই নয়, তার সঙ্গে বইছে এক ভয়ংকর দমকা হাওয়া। আর হাওয়াটা কোনও ঠান্ডা, সোঁদা বা ভ্যাপসা হাওয়া নয়। যেন ওই নরকের অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোনও অশুভ উদ্দেশ্য নিয়েই এর আগমন। আর এই হাওয়াটা আমাকে কেন্দ্র করেই যেন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বইতে লাগল। আর প্রত্যেক মুহূর্তে এই হাওয়ার দমক বেড়ে চলল। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল সেই খনখনে শিসের শব্দ। হাওয়ার ধরনটা দেখে মনে হল যেন এটা কোনও ফাঁস বা কাউবয়দের ল্যাসোর মতো আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। এবং এই হাওয়ার দমকের সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। শুধু খেয়াল ছিল, একটা ভয়ানক চক্রাবর্তের সঙ্গে আমিও ঘুরছি।

কতক্ষণ ঘুরেছিলাম খেয়াল নেই, কারণ এরপরেই আমি টর্চ আর বইয়ের বাক্স সহযোগে নিজেকে আবিষ্কার করলাম, কম করে দু-ধাপ নীচের একটা চাতালের ওপর পড়ে আছি, যেখানে ওই গুপ্ত দরজাগুলো হাঁ করে রয়েছে। আমার রীতিমতো কান্না পেল। কিন্তু দেখলাম, কান্নার বদলে আমি বিড়বিড় করছি নিজের মনে— হয়তো এটা গোটাটাই একটা স্বপ্ন, হয়তো আমার ঘুম ভাঙবে আর্কহ্যামের পাগলাগারদে কিংবা মরুভূমিতে আমাদের ক্যাম্পে। যদিও আমি জানতাম, ওই ফুট চারেক ফাঁকটা আরেকবার পেরোতে হবে। কিন্তু হয়তো এবার আমার জন্য নতুন কোনও অজানা আতঙ্ক অপেক্ষা করছে। আমি ভেবে দেখলাম, লাফ দিয়ে দিয়ে আমি এগিয়ে যেতে পারব, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সঙ্গী সেই অপার্থিব খনখনে শিসওয়ালা বিভীষিকা। এদিকে আমার টর্চের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আমার স্মৃতিশক্তির ওপর ভর করেই এগোতে হবে। আর ভেবে দেখলাম, এগিয়ে যেতে গেলে আমাকে এই ভয় কাটাতেই হবে। আর তার জন্য আমাকে এই নারকীয় আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হবে। এইসব বাধাবিপত্তির কথা ভাবলে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছি, সেটুকুও গায়েব হয়ে যাবে। তাই আমি আবার এগোতে লাগলাম। আর ওই ফাটলের কিনারা দেখতে পেলাম। সাহসে ভর করে যেই না এগোতে যাব, ওই ঝোড়ো দমকা হাওয়া, নারকীয় অন্ধকার, অপার্থিব শব্দ— সব কিছুর মিলিত একটা ঘূর্ণি আমাকে গ্রাস করল। শুধু ক্ষীণ স্মৃতি হিসেবে মনে আছে, আমি ওই

নারকীয় চক্রাবর্তে হারিয়ে যাচ্ছি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও ওই চক্রাবর্তের মিলিত শব্দের সামনে তা হারিয়ে গেল অচিরেই।

ব্যাস, এই ছিল আমার অভিজ্ঞতা। মানে আমার যতটুকু মনে ছিল, আমি লিপিবদ্ধ করলাম। এর বেশি কিছু বলতে গেলে হয়তো আমাকে আশ্রয় নিতে হবে আমার উন্মাদনা কিংবা অলৌকিক তত্ত্বের। স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, স্মৃতি, পাগলামি— সব কিছুর মিলিত যোগফলে হয়তো জন্ম হয়েছিল কোনও অপার্থিব বিভ্রমের, যার সঙ্গে এই পার্থিব জগতের কোনও কিছুরই মিল নেই। এর বেশি আর কী-ই বা বলতে পারি? যুগ যুগ ধরে এই মহাজাগতিক বিবর্তন, বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যা সংক্রান্ত বই নিয়ে পড়াশোনা, রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নের মোকাবিলার যোগফলই ঘটেছিল হয়তো-বা। তবে এরপরেও কিন্তু ওই ভয়ানক শহর আমার স্বপ্নে হানা দিয়েছিল। আমিও তখন ইথদের একজন হয়ে গিয়ে শঙ্কু-আকৃতির দেহ নিয়ে চলাফেরা করতাম। শুঁড়ের সাহায্যে তাক থেকে বই নামিয়ে নিতাম, আবার রেখেও দিতাম। তারপর এই পাতালপুরীর ভয়ানক স্মৃতি (সে সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক-না কেন) আর সবশেষে নারকীয় চক্রাবর্তে হারিয়ে-যাওয়া সব মিলিয়ে কোনটা কোনটা সত্যিই ঘটেছিল আর কোনটা নিছকই আমার কল্পনা, তা এই মুহূর্তে হয়তো আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কারণ এই সব কিছুই ঘটেছিল উলটোক্রমে। নিজেকে ইথরূপে দেখা, চক্রাবর্তে হারিয়ে যাওয়া, দমকা হাওয়া আর খনখনে শিসের শব্দ, ধ্বংসস্তূপ বেয়ে ওঠা, বইয়ের বাক্সটা খুঁজে পাওয়া, হায়ারোগ্লিফিক নকশাওয়ালা বইয়ের তাক, আঁকাবাঁকা খিলানওয়ালা পথ, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে মাথা ফুঁড়ে-ওঠা নকশাওয়ালা পাথরের চাঁই, চাঁদনই রাত— সব কিছু।

এই দৃশ্যায়নের উলটো ক্রমপর্যায় যখন শেষ হল, দেখলাম, অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমিতে বালি খামচে পড়ে আছি। আমার চারদিকে এক অদ্ভুত হাওয়া বইছে শনশন করে, এই হাওয়া কোনও পার্থিব হাওয়া নয়। আমার জামাকাপড়ের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়। পুরো ফর্দাফাঁই! দেখলে মনে হবে, কোনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছি। সারা শরীর কেটে ছড়ে গেছে। সচেতন অবস্থায় আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। স্বপ্ন, অভিযান— সব কিছুই ক্ষীণ স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেল! কোথা থেকে আমার স্বপ্ন শুরু হয়েছিল আর কোথায়ই বা অভিযানের শেষ হয়েছিল, আমার কিছুই মনে নেই। আমার আশপাশে কয়েকটা রাক্ষুসে পাথরের চাঁই যেন দুঃস্বপ্নের অভিযানের সাক্ষী হয়ে ব্যঙ্গের

হাসি হাসছে। যা-ই হোক, একটা দুঃস্বপ্নের অভিযান, একটা নারকীয় আতঙ্কের প্রহরের সমাপ্তি ঘটল অবশেষে। এর মধ্যে কতটা সত্যি আর কতটা আমার কল্পনা বা স্বপ্ন, সেটা অজানাই রয়ে গেল। আমার টর্চ, আমার সংগ্রহ-করা বইয়ের বাক্স— কিছুই আমার আশপাশে খুঁজে পেলাম না। ওগুলো থাকলে হয়তো সাক্ষী হিসেবে কাজ করত। ওই বইয়ের বাক্সটা দুটো দুনিয়ার মধ্যে মিসিং লিংকের কাজ করতে পারত। কিন্তু সত্যিই কি কোনও পাতালপুরী ছিল? বা ওই বইয়ের বাক্সটা, অথবা সেই প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ? নাকি সবই আমার কল্পনা? কিন্তু আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমার আশপাশে মরুভূমির রুক্ষ বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই অশুভ হাওয়াটা আর বইছিল না। রাঙাভাঙা চাঁদও পশ্চিমে ঢলে গিয়েছিল। আমিও কোনওরকমে আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর রওনা দিলাম ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল। যদি আমি জ্ঞান হারিয়ে গোটাটাই স্বপ্ন দেখে থাকি, তাহলে আমি এতক্ষণ বেঁচে রইলাম কী করে? আরও একবার সেই উপকথার গল্পগুলো আমার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। যদি ওই পাতালপুরীর অস্তিত্ব সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে ইথরাও সত্যি! আর বিশ্বব্যাপী কালচক্রের সেই চক্রাবর্তও একটা হৃদয়বিদারক সত্যি ছাড়া কিছু নয়। সত্যিই হয়তো আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম কয়েকশো কোটি বছর আগের প্রাক্-মানবসভ্যতার যুগে আমার সেই অন্ধকারের দিনগুলোয়। হয়তো সত্যিই প্যালিওজিয়ন যুগের কোনও ভিন গ্রহের ভয়ংকরের মনন আমার এই শরীরটাকে ব্যবহার করেছিল সময় অভিযানের বাহন হিসেবে। কিন্তু এর কিছু অংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে তো মানবসভ্যতার জন্য অপেক্ষা করছে সেই ভয়াবহ অকাল তমসা! পাশাপাশি এ কথাও ঠিক, এগুলোকে সত্যি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আমার কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না। যা-ও-বা ওই বইয়ের বাক্সটা ছিল, সেটাও হারালাম! অবশ্য সত্যি না হলে সেটা গোটা মানবসভ্যতার জন্যই আশীর্বাদ।

যা-ই হোক উইনগেটের জন্য সবই খুঁটিনাটি আমি লিখে রাখলাম। একজন মনস্তাত্ত্বিক আর আমার বিপর্যয়ের সাক্ষী হিসেবে ও-ই না-হয় এগুলোর বিচার করুক। আর শেষ করার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো, ওই পাতালপুরীর নরকে টর্চের আলোয় যখন আমি বাক্স থেকে বইটা বের করে দেখেছিলাম, তখন ঠিক কেন শিউরে উঠেছিলাম। ওই বইয়ের সেলুলোজের পাতায় কোনও প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা ছিল না। যা ছিল,

সেটা সত্যি হলে সময় আর স্থানের শিশুসুলভ সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা মানবসভ্যতা যে-কোনও দিন ডুবে যাবে সেই ভয়াবহ অকাল তমসায়। ইথরাও যাদের ভয় পেয়েছিল, তারা শাসন করবে এই গোটা মহাবিশ্ব! হ্যাঁ, ওই বইয়ের সেলুলোজ পাতায় হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালার বদলে আমি দেখেছিলাম নিজের হাতের লেখায় রোজকার খুঁটিনাটি বিবরণ! যে ভাষায় আমি কথা বলতাম মিসকাটনিক ইউনিভার্সিটিতে, সেই চালু ইংরেজিতে!



প্রথম প্রকাশ: **১৯৩৬** *সালে ‘অ্যাস্টাউন্ডিং স্টোরিজ’ পত্রিকার জুন সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।*
ভাষান্তর: *সৌমেন চ্যাটার্জী*

প রি শি ষ্ট

এইচ পি লাভক্র্যাফট
জীবন ও সাহিত্য

১৮৩৭:

জুলাই: হার্পার ব্রাদারস, নিউ ইয়র্ক প্রকাশ করল এডগার অ্যালান পো-র হাড়-হিম-করা উপন্যাস, 'দ্য ন্যারেটিভ অব আর্থার গর্ডন পিম'।

১৮৪৫:

২৯ জানুয়ারি: নিউ ইয়র্ক 'ইভনিং মিরর'-এ পো-র 'দ্য র‍্যাভেন'-এর প্রকাশ।
জুলাই: 'গ্রাহাম' ম্যাগাজিনে পো-র 'দি ইম্প অব দ্য পারভার্স'-এর প্রকাশ।

১৮৫২:

হেনরি ভিজেটেলি, লন্ডন থেকে পো-র কাব্যগ্রন্থ এবং গল্পসংকলন, 'টেলস অব মিস্ট্রি ইমাজিনেশন হিউমার অ্যান্ড পোয়েমস' প্রকাশ পেল।

১৮৯০:

২০ জুন: 'লিপিনকট' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ পেল অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে'।
২০ অগাস্ট: ১৯৪, এঞ্জেল স্ট্রিট প্রভিডেন্স, রোড আইল্যান্ডে জন্ম হল উইনফিল্ড স্কট লাভক্র্যাফট এবং সারাহ সুজান ফিলিপসের একমাত্র পুত্রসন্তান হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্র্যাফটের।

১৮৯৩:

লাভক্র্যাফটের বাবার মানসিক রোগ ধরা পড়ল এবং তাঁকে ভরতি করা হল বাটলার হাসপাতালে। এখানেই উনি ছিলেন আমৃত্যু। লাভক্র্যাফটের দাদু (মায়ের দিকের), এবং দুই মাসি এ বাড়ি চলে এলেন, ছোট্ট হাওয়ার্ডকে কোলেপিঠে বড় করার জন্য।

১৮৯৪:

আর্থার ম্যাকেনের 'দ্য গ্রেট গড প্যান' এবং 'দি ইনমোস্ট লাইট' জন লেন, লন্ডন থেকে প্রকাশিত হল।

১৮৯৫:

রবার্ট চেম্বার্সের 'দ্য কিং ইন ইয়েলো' এফ টেনিসন নিলি, নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হল।

জন লেন প্রকাশ করল আর্থার ম্যাকেনের লেখা 'দি ইম্পোস্টার', যা ব্রডলি হেডের কি-নোট সিরিজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৯৬:

দুর্বলতার কারণে ছোট্ট হাওয়ার্ড এলিমেন্টারি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার নিজগৃহ হয়ে ওঠে শিক্ষাস্থল।

১৮৯৮:

১ জুলাই: স্যান জুয়ান হিলে রক্তক্ষয়ী স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধে রাফ রাইডারদের নেতৃত্ব দিলেন থিয়োডর রুজভেল্ট।

১৮৯৯:

৬ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকান সেনেট স্প্যানিশদের সঙ্গে যুদ্ধসন্ধি করল।

১৯০০:

লাভক্র্যাফটের এখন দশ বছর বয়স। তিনি এর মধ্যেই পড়া শুরু করে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য। 'দ্য পোয়েম অব ইউলিসিস'-এর মতো কবিতা লিখছেন, সম্পাদনা করছেন নিজস্ব বিজ্ঞান পত্রিকা 'দ্য সায়েন্টিফিক গ্যাজেট'-এর।

ইধাও প্রদেশের স্নেক নদীর ওপর সৃষ্ট বাঁধ ধসে যায়। বাঁধটি ছিল লাভক্র্যাফটের দাদুর। তিনি নিজস্ব সব সম্পত্তি বিক্রি করে বাঁধটির পুনর্নির্মাণ করেন। এর ফলে তাঁর পরিবার প্রায় পথে বসে।

১৯০১:

৬ সেপ্টেম্বর: আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাকিনলে খুন হলেন। হত্যার সময়ে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরের বাফালোতে প্যান আমেরিকার একটি প্রদর্শনীতে ছিলেন।
১৪ সেপ্টেম্বর: ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে থিয়োডোর রুজভেল্টের শপথগ্রহণ

১৯০৩:

লাভক্র্যাফট আবার স্কুলে যোগ দিলেন— প্রভিডেন্সের হোপ হাই স্কুলে ভরতি হলেন তিনি।
১৭ ডিসেম্বর: কিটি হক, নিউ ক্যারোলিনাতে অরভিল রাইট প্রথম জ্বালানিচালিত, বাতাসের চেয়ে ভারী বিমান ওড়াতে সক্ষম হলেন।

১৯০৪:

২৮ মার্চ: মারা গেলেন লাভক্র্যাফটের দাদু, হুইপল ভ্যান বুরেন ফিলিপস।

১৯০৫:
অর্থকষ্টে লাভক্র্যাফটের মা এবং মাসিরা মিলে ৫৯৮ এঞ্জেল স্ট্রিটের একটা ছোট বাড়িতে উঠে এলেন।

১৯০৬:
আর্থার মাকেনের 'হাউস অব সোল' প্রকাশ করল গ্রান্ট রিচার্ডস, লন্ডন। বইটিতে কেবল তাঁর লেখা ফিকশনগুলোর সংকলনই ছিল না, তাতে ঠাঁই পেয়েছিল মাকেনের 'এ ফ্র্যাগমেন্ট অব লাইফ' এবং 'দ্য হোয়াইট পিপল' লেখাদুটিও।
১৬ এপ্রিল: সান ফ্রান্সিসকোতে ৭.৮ স্কেলের বিধ্বংসী ভূমিকম্প হল।

১৯০৭:
আর্থার মাকেনের 'হিল অব ড্রিমস' প্রকাশ করল গ্রান্ট রিচার্ডস, লন্ডন।

১৯০৮:
হাই স্কুল শেষ করলেও, লাভক্র্যাফট গ্র্যাজুয়েশন পাশ করতে পারলেন না। তাঁর গ্র্যাজুয়েট হওয়ার সাধ অপূর্ণই থেকে গেল।

১৯১১:
অ্যালজারনন ব্ল্যাকউডের 'দ্য সেনটিওর' প্রকাশ করল ম্যাকমিলান।

১৯১২:
১৫ এপ্রিল: নর্থ আটলান্টিকে আরএমএস টাইটানিকের সলিলসমাধি হল।
অক্টোবর: এডগার রাইজ বারোজের 'টারজান অব দি এপস' প্রকাশিত হল 'অল স্টোরি' ম্যাগাজিনে।

১৯১৩:
লাভক্র্যাফট 'দি আরগোসি' পত্রিকাতে ছাপলেন তাঁর পত্রগুচ্ছ।

১৯১৪:
ইউনাইটেড অ্যামেচার প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হলেন লাভক্র্যাফট।
২৮ জুলাই: অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরি সম্মিলিতভাবে সার্বিয়ার ওপর যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।
৪ আগস্ট: বেলজিয়াম আক্রমণের প্রতিবাদে ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আমেরিকা ঘোষণা করল নিজের নিরপেক্ষতা।

৬ নভেম্বর: আলজারনন ব্ল্যাকউডের ছোটগল্পসমগ্র প্রকাশ পেল ম্যাকমিলান–এ, নাম ছিল ‘ইনক্রেডিব্‌ল অ্যাডভেঞ্চারাস’।

১৯১৫:
৭ মে: আরএমএস লুসিতানিয়া— জার্মান ডুবোজাহাজ দ্বারা সলিলসমাধি প্রাপ্ত হল।

১৯১৬:
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দি অ্যালকেমিস্ট’ ‘দ্য ভাগরান্ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

১৯১৭:
১ মার্চ: মেক্সিকোর সহায়তায় আমেরিকা আক্রমণ করতে চেয়ে জার্মানির পাঠানো দ্য জিমারমান টেলিগ্রাম জনসমক্ষে আনা হল।
৬ এপ্রিল: আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।
সেপ্টেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘আ রেমিনিসেন্স অব ড. স্যামুয়েল জনশন’ দ্য ইউনাইটেড অ্যামেচারে প্রকাশিত হল।

১৯১৮:
জুন: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য বিস্ট ইন দ্য কেভ’ ‘দ্য ভাগরান্ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।
আগস্ট: আমেরিকায় দেশব্যাপী স্প্যানিশ ফ্লু মহামারি আকার ধারণ করল।
১১ নভেম্বর: যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল ও সমাপ্তি ঘটল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের।

১৯১৯:
লাভক্র্যাফটের মা-কে বাটলার হাসপাতালের স্বাস্থ্যনিবাসে ভরতি করা হল।
অক্টোবর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘বিয়ন্ড দ্য ওয়াল অব স্লিপ’ পাইন কন্সে প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘ডেগন’ ‘দ্য ভাগরান্ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য হোয়াইট শিপ’ প্রকাশিত হল ‘দি ইউনাইটেড অ্যামেচার’-এ।

১৯২০:
১৬ জানুয়ারি: আমেরিকায় অ্যালকোহলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল, যার পোশাকি নাম ছিল ‘প্রোহিবিশন’।
মে: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য স্টেটমেন্ট অব র‍্যাডল্‌ফ কার্টার’ ‘দ্য ভাগরান্ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

জুন: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য ডুম দ্যাট কেম টু সারনাথ' 'দ্য স্কট'-এ প্রকাশিত হল।
২৬ আগস্ট: উনিশতম সংশোধনী বিল পাশ হল এবং মহিলাদের ভোটাধিকার আইনসম্মত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য ক্যাটস অব উলথার' 'ট্রাইআউট'-এ প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'নায়ারলাথোটেপ' 'দি ইউনাইটেড অ্যামেচার'-এ প্রকাশিত হল।
ডিসেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'পোলারিস' 'দ্য ফিলোসফার'-এ প্রকাশিত হল।
ডিসেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য স্ট্রিট' 'উলভারিন'-এ প্রকাশিত হল।

১৯২১:
মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'এক্স অব্লিভিওন' 'দি ইউনাইটেড অ্যামেচার'-এ প্রকাশিত হল।
মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'ফ্যাক্টস কনসার্নিং দ্য লেট আর্থার জারমিন অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি' 'উলভারিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।
২৪ মে: লাভক্র্যাফটের মা বাটলার হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।
গ্রীষ্ম: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য পিকচার ইন দ্য হাউস' দ্য 'ন্যাশনাল অ্যামেচার'-এ প্রকাশিত হল।
জুলাই: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য টেরিবেল ওল্ড ম্যান' 'ট্রাইআউট'-এ প্রকাশিত হল।
৭ সেপ্টেম্বর: আটলান্টিক সিটি, নিউ জার্সিতে সর্বপ্রথম মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল।
অক্টোবর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য ট্রি' 'ট্রাইআউট'-এ প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য নেমলেস সিটি' 'উলভারিন'-এ প্রকাশিত হল।

১৯২২:
ফেব্রুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'হারবাট ওয়েস্ট-রিঅ্যানিমেটর' 'হোম ব্রিউ'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।
মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য টুম' 'দ্য ভাগরান্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হল।
মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য মিউজিক অব এরিক য্যান' 'দ্য ন্যাশনাল অ্যামেচার'-এ প্রকাশিত হল।
মে: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'সেলেফিয়াস' 'রেনবো'-তে প্রকাশিত হল।

১৯২৩:
জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য লার্কিং ফিয়ার' 'হোম ব্রিউ'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।
মে: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'মেমারি', 'হিপনস' এবং 'হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস' 'দ্য ন্যাশনাল অ্যামেচার'-এ প্রকাশিত হল।

১৬ অক্টোবর: রয় এবং ওয়াল্ট ডিজনি যৌথভাবে ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯২৪:

লর্ড ডানসানির ‘দ্য কিং অব এলফল্যান্ড’স ডটার’, নিউ ইয়র্ক, জি পি পুটনাম সনস-এ প্রকাশিত হল।

ফেব্রুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য হাউন্ড’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

৩ মার্চ: লাভক্র্যাফট ম্যানহটন, সেন্ট পলস চ্যাপেলে সোনিয়া হাফ্‌ট গ্রিনকে বিবাহ করলেন। নবদম্পতি ব্রুকলিনে সোনিয়ার বাড়িতে এসে উঠলেন।

মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য র‍্যাটস ইন দ্য ওয়ালস’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

মে: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘আন্ডার দ্য পিরামিডস’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১৯২৫:

লাভক্র্যাফট তাঁর সমকালীন লেখক ও বইবিক্রেতাদের সঙ্গে নতুন সংগঠিত কালেম ক্লাবে যোগ দিলেন।

জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য ফেস্টিভ্যাল’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১০ এপ্রিল: এফ স্কট ফিটজজেরাল্ড রচিত উপন্যাস ‘দ্য গ্রেট গ্যাটসবি’, চার্লস স্ক্রিবনারস সনস-এ প্রকাশিত হল।

জুলাই: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দি আননেম্‌ড’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

২১ জুলাই: ডেটন, টেনেসির জুরি জন টি স্কোপসকে ‘বিবর্তনবাদ’ পড়ানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন।

সেপ্টেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য টেম্পল’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘ইন দ্য ভল্ট’ ‘ট্রাইআউট’-এ প্রকাশিত হল।

লাভক্র্যাফট ‘উইয়ার্ড টেলস’-এর সম্পাদকের পদ প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁকে শিকাগোয় বাসা বদল করতে হত।

১৯২৬:

মার্চ: লর্ড ডানসানির ‘দ্য চারওম্যান শ্যাডো’ নিউ ইয়র্ক, জি পি পুটাম সনস-এ প্রকাশিত হল।

এপ্রিল: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দি আউটসাইডার’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

জুন: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য মুন বগ’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

সেপ্টেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘হি’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশ পেল।

এই মাসেই লাভক্র্যাফট ও তাঁর স্ত্রী-র বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের পর তিনি প্রভিডেন্সের ১০, বার্নেস স্ট্রিটে উঠে এলেন, যেখানে তিনি তাঁর জীবনের আগামী সাত বছর কাটাবেন।

১৯২৭:

জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য হরর এট রেড হুক' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।
২১ মে: চার্লস লিন্ডবার্গ সর্বপ্রথম আকাশপথে আটলান্টিক পার হলেন।
অক্টোবর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য কালার আউট অব স্পেস' 'অ্যামেজিং স্টোরিজ'-এ প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য পিকম্যান'স মডেল' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।

১৯২৮:

ফেব্রুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য কল অব কথুলু' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।
মার্চ: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'কুল এয়ার' 'টেলস অব ম্যাজিক অ্যান্ড মিসট্রি'-তে প্রকাশিত হল।

১৯২৯:

জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য সিলভার কি' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।
এপ্রিল: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য ডানউইচ হরর' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।
২৪ অক্টোবর: আমেরিকান স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করল।

১৯৩১:

আগস্ট: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য হুইসপার ইন ডার্কনেস' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।
অক্টোবর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প 'দ্য স্ট্রেঞ্জ হাই হাউস ইন দ্য মিস্ট' 'উইয়ার্ড টেলস'-এ প্রকাশিত হল।

১৯৩২:

৪ নভেম্বর: ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

১৯৩৩:

মে: অর্থাভাবে জর্জরিত লাভক্র্যাফট ৬৬ কলেজ স্ট্রিট, প্রভিডেন্সে বাসা বদল করলেন।

জুলাই: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য ড্রিমস ইন দ্য উইচ হাউস’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।
নভেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য আদার গডস’ ‘দ্য ফ্যান্টাসি ফ্যান’-এ প্রকাশিত হল।
৫ ডিসেম্বর: অ্যালকোহলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা ‘প্রোহিবিশন’ প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

১৯৩৪:

জুন: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘ফ্রম বিয়ন্ড’ ‘দ্য ফ্যান্টাসি ফ্যান’-এ প্রকাশিত হল।
জুলাই: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘থ্রু দ্য গেটস অব সিলভার কি’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১৯৩৫:

জুলাই: ছোটগল্প ‘দ্য কোয়েস্ট অব ইরানন’ গ্যালেওনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।

১৯৩৬:

ফেব্রুয়ারি: লাভক্র্যাফটের বড়গল্প ‘অ্যাট দ্য মাউন্টেনস অব ম্যাডনেস’ ‘অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।
এপ্রিল: লাভক্র্যাফটের বড়গল্প ‘দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ’ পেনসিলভ্যানিয়ার ভিসিনারি প্রেস এভেরেট থেকে প্রকাশিত হল।
জুন: লাভক্র্যাফটের বড়গল্প ‘দ্য শ্যাডো আউট অব টাইম’ ‘অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।
ডিসেম্বর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য হন্টার অব দ্য ডার্ক’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১৯৩৭:

জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য থিং অন দ্য ডোরস্টেপ’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।
২৫ মার্চ: প্রভিডেন্সে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্যানসারে ভুগে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন লাভক্র্যাফট।
অক্টোবর: লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য শানড হাউস’ ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১৯৩৮:

জানুয়ারি: লাভক্র্যাফটের নকল আত্মজীবনী ‘আইবিড’ ‘ও-ওয়াশ-টা-নং’ জার্নালে প্রকাশিত হল।
জুন: ‘দ্য ডেসেনড্যান্ড’, ‘দ্য বুক’ এবং ‘অ্যাজাথথ’— এই গল্পগুলি আলাদাভাবে ‘লিভস’-এর গ্রীষ্ম সংকলনে প্রকাশিত হল।

গ্রীষ্ম: উইসকনসিন, সকসিটির আর্কহ্যাম হাউস থেকে প্রকাশিত হল লাভক্র্যাফটের কল্পিত বইয়ের কল্পিত ইতিহাস ‘হিস্ট্রি অব দ্য নেক্রোনমিকন’।

১৯৩৯:
এপ্রিল: লাভক্র্যাফটের একটি চিঠির সংগ্রহ ‘দি ইভিল ক্লারগিম্যান’ নামে ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ প্রকাশিত হল।

১৯৪০:
গ্রীষ্ম: লাভক্র্যাফটের অন্য একটি চিঠির সংগ্রহ ‘দি ইভিল ভেরি ওল্ড ফোক’ নামে ‘সাইন্টি স্ন্যাপসে’-এ প্রকাশিত হল।

১৯৪১:
মে: লাভক্র্যাফটের বড়গল্প ‘দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড’, ‘উইয়ার্ড টেলস’-এ ধারিবাহিকভাবে প্রকাশিত হল।

১৯৪৩:
লাভক্র্যাফটের বড়গল্প ‘দ্য ড্রিম কোয়েস্ট অব আননোন কাডাথ’ সকসিটির আর্কহাম হাউস, উইসকনসিন থেকে প্রকাশিত হল।
লাভক্র্যাফটের মজার ছোটগল্প ‘সুইট এরমেনগার্দে’, সকসিটির আর্কহাম হাউস, উইসকনসিন থেকে ‘বিয়ন্ড দ্য ওয়াক অব স্লিপ’ সংগ্রহে আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৪৪:
লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘দ্য ট্রানজিশন অব জুয়ান রোমেরো’, সকসিটির আর্কহাম হাউস, উইসকনসিন থেকে ‘মার্জিনালিয়া’ সংগ্রহে প্রথম প্রকাশিত হল।

১৯৫৯:
লাভক্র্যাফটের ছোটগল্প ‘ওল্ড বাগস’, সকসিটির ‘আর্কহাম হাউস’, উইসকনসিন থেকে মুদ্রিত ‘দ্য শেল্টার্‌ড রুম’ এবং ‘আদার পিসেস’ সংগ্রহে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল।

চিত্রসূচি

শবঘর

পিকম্যানের মডেল

ইন্সমাউথের ইশারা

চিত্র ১০.৮: ভিসিওনারি পাবলিশিং কোং, ১৯৩৬, অলংকরণ: ফ্র্যাঙ্ক উতপ্যাটেল

চিত্র ১০.৯: উইয়ার্ড টেলস, জানুয়ারি ১৯৪২, অলংকরণ: হ্যানেস বক

কে?

চিত্র ১১.১: ম্যানুস্ক্রিপ্ট, কালেকশন: Brown University Library

চিত্র ১১.২: ক্রাউনিংশিল্ড বেন্টলে হাউস, সালেম, ম্যাসাচুসেটস, ১৭২৭ সালে তৈরি, ছবি: ২০১৩, ডোনোভান কে লকস

চিত্র ১১.৩: উইয়ার্ড টেলস, জানুয়ারি ১৯৩৭, অলংকরণ: ভারজিল ফিনলে

অকাল তমসা

চিত্র ১২.১: অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ, জুন ১৯৩৬, অলংকরণ: হাওয়ার্ড ভি ব্রাউন

চিত্র ১২.২: অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ, জুন ১৯৩৬, অলংকরণ: হাওয়ার্ড ভি ব্রাউন

চিত্র ১২.৩: অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ, জুন ১৯৩৬, অলংকরণ: হাওয়ার্ড ভি ব্রাউন

চিত্র ১২.৪: অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ, জুন ১৯৩৬, অলংকরণ: হাওয়ার্ড ভি ব্রাউন

চিত্র ১২.৫: অ্যাসটাউন্ডিং স্টোরিজ, জুন ১৯৩৬, অলংকরণ: হাওয়ার্ড ভি ব্রাউন

গ্রন্থসূচি

১) দি অ্যানোটেটেড এইচ পি লাভক্র্যাফট, সম্পাদনা: এস টি যোশি

২) দ্য নিউ অ্যানোটেটেড এইচ পি লাভক্র্যাফট, সম্পাদনা: লেসলি ক্লিঙ্গার

৩) দ্য নিউ অ্যানোটেটেড এইচ পি লাভক্র্যাফট: বিয়ন্ড আর্খাম, সম্পাদনা: লেসলি ক্লিঙ্গার

৪) দ্য কমপ্লিট ফিকশান অব এইচ পি লাভক্র্যাফট, নিকারবকার ক্লাসিক্স

৫) আই অ্যাম প্রভিডেন্স: দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইম অব এইচ পি লাভক্র্যাফট, এস টি যোশি

৬) উইকিপিডিয়া এবং অন্যান্য লাভক্র্যাফটের সম্বন্ধীয় ওয়েবসাইট।

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস এর অন্যান্য বই

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১: ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০: বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা: অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক: অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১: আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড: হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা: বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক: সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক: দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক: সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র: কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন

অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ: সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র: রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা: সুদীপ দেব

মনন শীল: তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক: পার্থ দে

ডেকাগন: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

স্বমহিমায় শঙ্কু: দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক: সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১: রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আগামীর সাত মুখ: স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ: সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা: অঙ্কিতা

মন্তাজ ইমপ্রিন্টের বই

হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন সমগ্র ১: বিখ্যাত হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটিকে নিয়ে তিনটি উপন্যাস ও পঞ্চাশটি গল্প, নাটক, কবিতা
লেখক: শিবরাম চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত, সম্পাদনা: সুদীপ দেব

প্রাপ্তিস্থান: অ্যামাজন, অরণ্যমন প্রকাশনী, দে বুক স্টোর (দীপু), বইচই, রিডবেঙ্গলীবুকস, বুকিকার্ট, বইঘর, দ্য বুকটক ইত্যাদি বুকস্টোরে।

টীকা

[১] ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের কথা বলেছেন কথক। ১৯১৪ সালের ১৮ জুন শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ, শেষ হয় ১৯১৯ সালের ভার্সেইয়ের চুক্তির মধ্যে দিয়ে।

[২] যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মান ডুবোজাহাজগুলি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চুক্তি অগ্রাহ্য করে বাণিজ্যিক ও যাত্রিবাহী জাহাজ আক্রমণ করা শুরু করে। এখানে সেই পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

[৩] ১৯১৪-১৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে কোনও অগ্নুৎপাতের কথা জানা যায় না। ১৯০৯ সালের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় বোগোস্লোফ আইল্যান্ডের আকস্মিক আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছিল।

[৪] প্যারাডাইস লস্ট: ১৬৬৭ সালে বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন মিল্টনের লেখা কাব্যগ্রন্থ। বাইবেলের কাহিনিতে আদম আর ইভের ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সুললিত বর্ণনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে ভগবানের বিরুদ্ধে শয়তানের লড়াই এর উপাখ্যান। গভীর পাতাল থেকে আগত শয়তানের প্রলোভনেই আদম এবং ইভের "ঈশ্বরত্ব" বিসর্জন এবং স্বর্গের নন্দনকানন থেকে বস্তুবাদী জগতে তাদের নির্বাসন— এসবই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিপিবদ্ধ করেছিলেন মিল্টন তাঁর এই গ্রন্থে।

[৫] ভাস্কর ডোরে: পল গুস্তাভ ডোরে (১৮৩২ – ১৮৮৩) ইনি একজন ফরাসি চিত্রকর এবং ভাস্কর। ১৮৭২ সালে তিনি 'লন্ডন: আ পিলগ্রিমেজ' নামে একগুচ্ছ ভাস্কর্য তৈরি করেন। লন্ডন শহরে অবস্থিত বস্তিগুলির ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে ডোরে-র ভাস্কর্যে।

[৬] বুলওয়ার— এডওয়ার্ড জর্জ আর্ল লিটন বা বুলওয়ার-লিটন (১৮০৩ – ১৮৭৩) ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিখ্যাত হরর/কল্পবিজ্ঞান লেখক। এডগার অ্যালান পো-র মতো এঁর লেখার বেশ খানিকটা প্রভাব লাভক্র্যাফটের রচনায় আমরা দেখতে পাই। বিশাল বিশাল বাক্যবন্ধ বা জটিল বাক্যে সাহিত্য রচনার ধারাটিকে ইংরাজিতে "পার্পল প্রোজ" বলে। বুলওয়ার এই ধরনের লেখনি ভঙ্গিমার দ্বারা ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

[৭] "র‍্যাটস ইন দি ওয়ালস" দ্রষ্টব্য।

[৮] নিয়েনডারথাল: ১৮২৯ সালে ফিলিপ চার্লস স্মার্লিং নিয়েনডারথালের কঙ্কাল খুঁজে পান। হোমো নিয়েনডারথ্যালেনসিস বা হোমো সেপিয়েনস নিয়েনডারথ্যালেনসিস— যাই বলা হোক না কেন, এই প্রজাতিকেই মানুষের মূল পূর্বপুরুষ হিসাবে এখনও অবধি খুঁজে পাওয়া গেছে। মোটামুটি এক লক্ষ তিরিশ হাজার বছর আগে এঁরা পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতেন।

[৯] পলিফেমাস: মহাকবি হোমারের রচিত "ওডিসি" তে পলিফেমাসের উল্লেখ রয়েছে। অডিসিয়াস গ্রীস থেকে ফেরার পথে, সাঙ্গপাঙ্গসমেত সাইক্লপসদের দ্বীপে আটকা পড়েন। সেখানে থাকতেন সমুদ্র দেবতা পসেইডন-এর পুত্র দানব পলিফেমাস। তাঁর ছিল কেবল একটিমাত্র চোখ। তবে, গবেষক এস টি যোশীর মতানুসারে, লাভক্র্যাফট বর্ণিত জন্তুটির সাদৃশ্য পলিফেমাসের দানবাকৃতির সঙ্গে, তার "একচক্ষু" বৈশিষ্টের সঙ্গে নয়।

[১০] ডেগন: ফিলিস্টিনিয় উপকথা অনুযায়ী, ডেগন মূলত অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক মাছের আকারের দেবতা। মিল্টনের "প্যারাডাইস লস্ট" এও ডেগনের উল্লেখ রয়েছে—
তবে সেখানে এঁর অর্ধাংশ হয়ে গেছে নর, নারী নয়।
ডেগন নাম তার, সমুদ্র-দানব— তাহার উর্ধাংশ নর।
নিম্নাংশ মৎস্য। দেখ, মন্দির ওই টিলার 'পর।
অ্যাজোটাসে জন্ম তাহার, সমুদ্রতীর ধরে—
প্যালেস্টাইন, গাথ আর অ্যাসকালনের উপকূল জুড়ে,
অ্যাকারন আর গাজার কূলে তার ভীতি আছড়ে পড়ে।

বাইবেলেও ডেগনের উল্লেখ রয়েছে। ডেগন শব্দের অর্থ হিব্রু ভাষায়, "ছোট মাছ"। প্রাচীন ফিলিস্টাইনে ডেগনের মন্দির ছিল অ্যাজোটাস-এ, যা অধুনা গাজাতে অবস্থিত। পরবর্তীকালে ফিলিস্টিনিয়রা, ডেগনকে কৃষির দেবতা হিসাবে— সাধারণভাবেই পূজা করত। তবে এনসাইক্লোপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ডেগনের মনুষ্য অংশের কল্পনাটি ভ্রান্ত। ডেগনের সারা শরীর আঁশে ঢাকা— মাছের মতোই। লাভক্র্যাফট, স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণাটিকেই গ্রহণ করেন।

[১১] বেনেভলেন্ট স্ট্রিট প্রভিডেন্সের একটি রাস্তা। "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড"-এ দেখা যায় চার্লস এই রাস্তায় পায়চারি করতে পছন্দ করত।

[১২] লাভক্র্যাফট বিশেষজ্ঞ এস টি যোশীর মতে এই অংশটি তিনি হিউ এলিয়টের "মডার্ন সায়েন্স অ্যান্ড মেটিরিয়ালিসম" বইটি পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন।

[১৩] মস্তিষ্কের মধ্যাংশে অবস্থিত একটি ছোট্ট এন্ডোক্রিনাল গ্ল্যান্ড। মস্তিষ্কের মধ্যে এর অবস্থানের জন্যে বহুকাল মনে করা হত এই গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী

হওয়া সম্ভব। এমনকী একসময় আত্মার বাসস্থান হিসেবেও এটিকে দেখা হত। বাস্তবে গ্ল্যান্ডটি শুধু ঘুমানোয় সাহায্য করে।

[১৪] গল্পের কিছু সংস্করণে একটি ডাকাতির ব্যাপারে সাবধানতার কথা বলা হয়েছে, যেটি মনে করা হয় লাভক্র্যাফটের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরে জুড়েছিলেন।

[১৫] দেবদূত ও অপদেবতারা যে অদৃশ্য অবস্থায় আমাদের ঘিরে আছে এই ধারণা অত্যন্ত প্রাচীন। লাভক্র্যাফট এই ধারণাকেই কল্পবিজ্ঞানের আলোয় নতুন করে তৈরি করেছিলেন।

[১৬] লাভক্র্যাফটের সৃষ্ট প্রাচীন অজ্ঞাত অতিমাত্রিক বা মহাজাগতিক অতিজীব মিথোসের সঙ্গে এই গল্পের বিষয়ের সরাসরি যোগসূত্র না থাকলেও এই গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব ও মেজাজ নিঃসন্দেহে সেই মিথোসকেই মনে করিয়া দেয়। মিথোসের মতো এই গল্পেও কসমিক হররের ছাপ সুস্পষ্ট। মহাজগৎ মানুষকে তার অজানা রহস্যের উন্মোচনের প্রলোভন দেখায়। কিন্তু যে মানুষ সেই দুঃসাহস করে, তার অনুসন্ধিৎসার শাস্তি হিসেবে তার সব প্রশ্নের এমন ভয়াল উত্তর প্রকাশ করে যে সেই মানুষ শেষ পর্যন্ত তার নিজের অনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধিৎসাকেই আজীবন অভিসম্পাত করে চলে।

[১৭] এস.এল: (১৮৮৭-১৯৭৬), স্যামুয়েল লাভম্যান— আমেরিকান কবি, সমালোচক ও নাট্যকার। তবে তিনি বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরিচিত এইচ পি লাভক্র্যাফট এবং আমেরিকান কবি হার্ট ক্রেনের বন্ধু হিসেবে।

[১৮] বোদলেয়ার: (১৮২১ – ১৮৬৭), শার্ল বোদলেয়ার— ফরাসি কবি ও অনুবাদক। ইনি এডগার অ্যালান পো-র সমস্ত লেখাকে ইংরাজি থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করেন। বলা হয় এটিই পো’ এর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ। কেবল তাই নয়, বোদলেয়র নিজেও ছিলেন একাধারে রহস্যময় ও সফল এক কবি। “লে ফ্লুর দু মাল” (শয়তানের ফুল) কবিতাগুচ্ছের জন্য তিনি বিখ্যাত। অবাধ যৌনতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, ভালোবাসা এবং আবেদনকে তিনি নিপুণভাবে মিশিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

[১৯] এক আয়ত চোখের মানুষ: এখানে লাভক্র্যাফট বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তি বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) কথা বলেছেন। লাভক্র্যাফটের রচনায় একাধিক বার এসেছে আইনস্টাইনের উল্লেখ। ‘দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড’ উপন্যাস কিংবা ‘দ্য হুইসপার ইন ডার্কনেস’ নভেলায় তিনি সরাসরি আইনস্টাইনের নাম উল্লেখ করলেও এখানে কেবল আয়ত চোখের মানুষ বলেই বর্ণনা করেছেন তাঁকে।

[২০] হোরি কেন্টের পুরোনো ম্যানর হাউস: ইংল্যান্ডের একটি পুরোনো জমিদার বাড়ি।

[২১] করোনা বোরিয়ালিস: এটি উত্তর আকাশে দৃশ্যমান একটি ছোট নক্ষত্রপুঞ্জ। লাতিনে এই শব্দের অর্থ 'উত্তরের মুকুট'। দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি এটি আবিষ্কার করেন।

[২২] হিপনোস: গ্রিক পুরাণে বর্ণিত হিপনোস যেন মূর্তিমান ঘুম। তাঁর মা নিক্স (নিক্স অর্থে রাত্রি) ও বাবা অন্ধকারের দেবতা এরেবাস। যমজ ভাই থানাতোসের সঙ্গে পাতালে থাকেন তিনি। থানাতোস হলেন মৃত্যুর মূর্তিমান প্রকাশ। হিপনোসের স্ত্রীর নাম প্যাসিথিয়া। তিনি বিভ্রমের দেবী। হিপনোস শব্দটি থেকেই পরবর্তী কালে হিপনোসিস কথাটা এসেছে, যার অর্থ সম্মোহন। হিপনোস যেহেতু ঘুমের দেবতা, তাই বলা হয় প্রত্যেক মানুষের অর্ধেক জীবনের মালিক তিনিই!

[২৩] অ্যাটিকা হরফ: অ্যাটিকা (বর্তমান নাম অ্যাটিক পেনিনসুলা) হল গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্সের এক অঞ্চল। সেখানকার প্রাচীন ভাষা।`

[২৪]এই লেখাটি লাভক্র্যাফটের লেখা একটি অন্যতম গদ্য কবিতা আকারে লেখা কাহিনি। আরও অনেক লেখার মতো "হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস" গল্পেও তার স্বপ্ন ও নিদ্রাজনিত অবস্থার প্রভাব লক্ষ করা যায়। লেখকের এরকম স্বপ্ন অনুপ্রাণিত আরও কিছু লেখার উদাহরণ হল "দ্য ডুম কেম টু সারনাথ", "দ্য ক্যাটস অব উলথার", "সেলেফাইস" এবং "দ্য আদার গডস"। আধুনিক মনস্তত্ত্বের জনক ড. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লাভক্র্যাফটের জীবদ্দশায় কিছুদিন লেখকের বাসস্থান প্রভিডেন্স শহরে কাটিয়েছিলেন। শোনা যায় সেই সময়ে লেখক প্রধানত কৌতূহলের বশেই তার ভয়াল স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে ফ্রয়েডের শরণাপন্ন হন।

[২৫] ক্লার্ক অ্যাস্টন স্মিথের লেখায় প্রথম এলড্রিচ জগতের কথা উঠে আসে। ১৯১২ সালে লেখা কবিতা দি এলড্রিচ ডার্ক দ্রষ্টব্য। ক্লার্ক লাভক্র্যাফটের সমসাময়িক ও দু-জনে একসঙ্গে বহু পত্রপত্রিকায় লিখেছেন।

[২৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একদল ফরাসি, বেলজিয়ান ও রাশিয়ান কবি, লেখক ও শিল্পীদের হাতে প্রতীকীবাদের আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। শার্ল বোদলেয়ারের ১৮৫৭ সালে রচিত লে ফ্লুয়ার ডু মাল-এর মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের শুরু বলে মনে করা হয়।

[২৭] প্রাক্-রাফেলীয়: রাফায়েল-কে ইউরোপের সেরা চিত্রকর মনে করা হত। এবং প্রায় চারশো বছর ধরে তাঁর আঁকা ছবি (ভ্যাটিক্যান সিটিতে প্রতি পদে যা শোভাবর্ধন করছে) অতুলনীয় শিল্প হিসাবে গণ্য হয়েছিল। আঠারোশো শতকের মাঝামাঝি কিছু নতুন শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা রাফায়েলের ধ্যানধারণার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁরা মনে করতেন, ছবির সঙ্গে মানব চরিত্র, মানব জীবনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের

আঁকায় ফুটে ওঠে বাস্তব জীবনের নানা খুঁটিনাটি এবং ছবিগুলিও হয় বেশ রংচঙে। কিন্তু এঁদের আঁকা সমালোচিত হওয়ায় এঁরা গুপ্তসমিতি খুলে সেখানে মেলামেশা এবং নিজেদের অধীত বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করেন এবং নিজেদের প্রাক্-রাফেলীয় বা প্রি-রাফেলাইট নামে পরিচিত করান।

[২৮] প্রতীকীবাদ (সিম্বলিসম) আন্দোলনের পরের ধাপে আসে ব্যাভিচারী (ডেকাডেন্ট) আন্দোলন। বলডেয়ার, হাইস্ম্যান, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা।

[২৯] বোদলেয়র: (১৮২১ – ১৮৬৭), শার্ল বোদলেয়র— ফরাসি কবি ও অনুবাদক। ইনি এডগার অ্যালান পো এর সমস্ত লেখাকে ইংরাজি থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করেন, এবং বলা হয় এটিই পো-এর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ। কেবল তাই নয়, বোদলেয়র নিজেও ছিলেন একাধারে রহস্যময় ও সফল এক কবি। “লে ফ্লুর দু মাল” (শয়তানের ফুল) কবিতাগুচ্ছের জন্য তিনি বিখ্যাত। অবাধ যৌনতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, ভালোবাসা এবং আবেদনকে তিনি নিপুণভাবে মিশিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

[৩০] হাইসমান্স: জরিস কার্ল হাইসমান্স (১৮৪৮-১৯০৭) একজন ফরাসি ঔপন্যাসিক ও জনপ্রিয় শিল্প সমালোচক। প্রথম জীবনে তাঁর লেখা এবং জীবনযাপনে বিখ্যাত সাহিত্যিক এমিল জোলা-র প্রভাব লক্ষ করা গেলেও, তাঁর নিজস্ব ছন্দে রচিত উপন্যাসগুলিও গুরুত্ব সহকারে পঠিত এবং প্রশংসিত। তাঁর লেখাগুলির মধ্যে “আগেনস্ট দ্য গ্রেন” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[৩১] “হার্বাট ওয়েস্ট: রিঅ্যানিমেটর” দ্রষ্টব্য

[৩২] ফ্র্যান্সিস জোস দ্য গয়া (১৭৪৬-১৮২৮) ছিলেন বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী। তাঁকে ক্লাসিকাল শিল্পের যুগ থেকে মডার্ন শিল্পের যুগের জনক বলা হয়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজের ঘরের দেওয়ালে যে অলৌকিক ঘটনাবলীযুক্ত ফ্রেস্কো এঁকেছিলেন, সেগুলিকে ব্ল্যাক পেইন্টিং বলা হয়। কথক হয়তো সেই ছবিগুলির খসড়ার কথাই বলেছেন।

[৩৩] বহু দেশের উপকথায় ভয়ংকর হাউন্ডের গল্প উপস্থিত। আর্থার কনান ডয়েলের বিখ্যাত গল্প “দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল” (১৯০২) দ্রষ্টব্য।

[৩৪] জেড পাথরে খোদাই করা কবচ চিনের প্রাচীন সংস্কারের অংশ।

[৩৫] মিশরের স্ফিংক্সের দেহ সিংহের ও মাথা ফারাওয়ের। যদিও গ্রিক স্ফিংক্সরা একটু ভিন্ন, তাদের মাথা এবং বুক মেয়েদের, শরীর সিংহের ও ডানা ইগলের।

[৩৬] এই প্রথম কোনও গল্পে নেক্রোনমিকনের উল্লেখ করলেন লাভক্র্যাফট। যদিও নেমলেস সিটি গল্পে এর আগে আবদুল আলহাজ্রেডের কথা বলা হয়েছে। লাভক্র্যাফটের মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা নেক্রোনমিকনের ইতিহাস প্রকাশ পায়। এক চিঠিতে লাভক্র্যাফট জানিয়েছেন নামটি তাঁর স্বপ্নে পাওয়া। তাঁর ধারণা ছিল শব্দটির অর্থ মৃতদের নিয়মের ছবি। যদিও পরে শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কিছু গল্পে নেক্রোনমিকনকে নিষিদ্ধ মন্ত্রের কিতাব হিসেবে বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে এই বইটিতে বিভিন্ন অলৌকিক শক্তিধারী ভয়ংকর প্রাণীদের বর্ণনা দেওয়া আছে।

[৩৭] লেং হল লাভক্র্যাফটের কল্পনাপ্রসূত একটি রাজ্য। "দ্য হুইস্পারার অব দ্য ডার্কনেস" ও "অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস" গল্পে এই জায়গাটির বিবরণ পাওয়া যায়।

[৩৮] লাভক্র্যাফটের প্রিয় লেখক অ্যামব্রোস বিয়ার্সের গল্প "দ্য ড্যামড থিং"-এর (১৮৯৩) প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ মনে করা হয় লাইনটিকে।

[৩৯] থেমস নদীর পাশে হাঁটার রাস্তা।

[৪০] এডগার অ্যালান পো-এর ১৮৪৫ সালের গল্প "মাস্ক অব দ্য রেড ডেথ" অবলম্বনে এই লাইনটি লেখা।

[৪১] বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক লং-কে একটি চিঠিতে লাভক্র্যাফট জানান গল্পটি এতটাই ভয়ানক যে কোমলমতি পাঠক এটি সহ্য করতে পারবে না। তাও তিনি গল্পটি উইয়ার্ড টেল পত্রিকায় প্রকাশ করতে সমর্থ হন।

[৪২] এক্সাম প্রায়োরি নামে ইংল্যান্ডে কোনও জায়গার কথা জানা যায় না। যদিও উত্তর ইংল্যান্ডের হেক্সাম শহরে হেক্সাম প্রায়োরি হাই স্কুল আর অ্যাবি আছে।

[৪৩] ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের রাজা।

[৪৪] এক্সাম উপাধির কোনও ব্যারনকে সেই সময়ের ইংল্যান্ডে খুঁজে পাওয়া যায় না।

[৪৫] ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় কোনও ডেলাপোর খোঁজ পাওয়া যায় না। মনে করা হয় লাভক্র্যাফট নামটি তাঁর গুরু এডগ্যার অ্যালান পো এবং সারা হেলেন হুইটম্যানকে সম্মান জানানোর জন্যে বানিয়েছিলেন। হেলেনের বাবার উপাধি ছিল লাপোর।

[৪৬] লাভক্র্যাফটের ব্যবহার করা বানানের নরিস উপাধির কাউকে উত্তর ইংল্যান্ডে সেই সময় খুঁজে পাওয়া যায়নি।

[৪৭] গথিক ঘরানার বাড়ি ইংল্যান্ডে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

[৪৮] রোমানিস্ক ঘরানার স্থাপত্যের চল ছিল একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ইংল্যান্ডে।

[৪৯] কেলটরা ছিল ইংল্যান্ডের প্রথম আদিবাসী। পশ্চিম ইউরোপ থেকে রোমানদেরও আগে তারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়েছিল। কেলটদের পুরোহিতদের বলা হত ড্রুইড।

[৫০] অ্যানচেস্টার নামে কোনও গ্রামের সন্ধান হেক্সামের কাছে পাওয়া যায়নি।

[৫১] ভার্জিনিয়া রাজ্যের মধ্যে ৩৫০ মাইল লম্বা নদী জেমস। কিন্তু ভার্জিনিয়ার মধ্যে কারফ্যাক্সের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

[৫২] যুদ্ধের অবস্থান ও বর্ণনা থেকে বোঝা যায় গল্পের মূল চরিত্র পারিবারিকভাবে দাস প্রথার সমর্থক ছিলেন।

[৫৩] স্টোনহেঞ্জ: ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার প্রদেশে প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো কেল্টিক স্থাপত্য। এটির আকৃতি এবং কৃতকৌশল আজও মানুষকে অভিভূত করে। দুটি বিশালাকায় সমান্তরাল পাথরের উপর আরও একটি পাথর চাপিয়ে আকৃতিটিকে ঘোড়ার নালের মতো দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা আজ মোটামুটি সহমত যে এটি একটি সুপ্রাচীন কবরস্থান। বিজ্ঞানীরা আজও অবাক হন, যে মানুষ চাকা আবিষ্কারের পূর্বে কীভাবে এই বিশাল পাথরগুলিকে এতদূরে (প্রায় দু-শো মাইল!) বয়ে নিয়ে এসে এই বিপুলাকার স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছিল।

[৫৪] সিবেলে একজন ফ্রিজিয়ান দেবী। মনে করা হয়, মানব সভ্যতার নিও-লিথিক পর্ব থেকেই এঁর উৎপত্তি। সেদিক থেকে দেখতে হলে, ইনি ভীষণভাবেই প্রাচীনা। আর সেই জন্যই এঁকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে মিথের পর মিথ। গ্রিকরা ফ্রিজিয়া আক্রমণ করলে, এই দেবীর ব্যাপারে জানতে পারে এবং ক্রমে তাঁর আরাধনা চালু হয়। খ্রিস্টপূর্ব দু-শো শতকে রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবী হয়ে ওঠেন সিবেলে, তাঁর নামকরণ হয় "মা ভবতারিণী" (দ্য গ্রেট মাদার) বা ম্যাগনা ম্যাটার। রোমানদের আরাধনায় ধীরে ধীরে মেশে তান্ত্রিক উপাচার এবং সিবেলে কিছু অংশের কাছে হয়ে ওঠেন এক রহস্যময়ী দেবী। কথিত আছে, সিবেলের উপাসনায় বলির প্রথা ছিল। বলির সময় একজন পুরোহিত উৎসর্গ বেদীর ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। মোষের শিরচ্ছেদের পর নির্গত শোণিত জলের ধারার মতো নেমে আসত। তিনি অবগাহন করতেন সেই রুধির ধারায়, এবং সঙ্গে চলত আরাধনা। দেবী সিবেলের পুরোহিত হিসাবেই অ্যাটিয়াসের আবির্ভাব। দেবীর চেয়ে কম বয়েসি একজন পূজারী— যিনি দেবীর আরাধনায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে

অ্যাটিয়াসকে কল্পনা করা হয়েছে মেষপালক হিসাবে, যাঁর হাতে ধরা থাকত বাঁশুরি। অ্যাটিয়াস চরিত্রটি পরবর্তীকালে দেবী সিবেলের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

[৫৫] দিভ শব্দটি রোমানে ডিউ হতে পারে যার অর্থ চিরকালীন। ওপাস ঐশ্বর্যের রোমান দেবী, স্যাটার্নের স্ত্রী ও সিবিলের সঙ্গিনী। পুরো বাক্যটি ছিল ইটারন্যাল ওপাস ম্যাগনা ম্যাটার।

[৫৬] তৃতীয় নয়, দ্বিতীয় শাখাটি ওয়েলসে যুদ্ধ করেছিল।

[৫৭] ফ্রিজিয়ানরা ৭০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে আনাতোলিয়ায় রাজত্ব করত।

[৫৮] রোমানদের পরে স্যাক্সনরা পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে জার্মানি থেকে ইংল্যান্ডে ঢোকে।

[৫৯] অ্যাংলো স্যাক্সন ইংল্যান্ডের সাতটি রাজ্য নিয়ে এই সপ্তসাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। সেগুলি হল— নর্থামব্রিয়া, মারসিয়া, পূর্ব অ্যাংলিয়া, ওয়েসেক্স, কেন্ট, এসেক্স ও সাসেক্স।

[৬০] অষ্টম ও নবম শতকের অ্যাংলো স্যাক্সন ক্রনিকালের কথা হয়তো বলেছেন চরিত্রটি। পরিমার্জিত উইনচেস্টার ক্রনিকালের কথাও বলা হতে পারে।

[৬১] ডেনিশ ও নরয়েজিয়ানরা ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড আক্রমণ করে।

[৬২] তৃতীয় হেনরি ছিলেন রাজা জন ও রানি ইসাবেলের পুত্র। ১২১৬ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন ইংল্যান্ডে।

[৬৩] গিলস দ্য রেটজ (১৪০৫-১৪৪০) নিজের দুর্গে ছোট ছেলেমেয়েদের হত্যার জন্যে কুখ্যাত।

[৬৪] মার্কুইস দ্য সাদ (১৭৪০-১৮১৪) ইরোটিসমধর্মী গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের লিখতেন। সমাজের রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে মুক্ত ও বিতর্কিত জীবনযাপনের জন্যে তিনি কুখ্যাত ছিলেন।

[৬৫] মেক্সিকান আমেরিকান যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৪৬-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের পরে মেক্সিকোকে আমেরিকার অন্তর্গত করে নেওয়া হয়।

[৬৬] ভুডু পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি দেশের অদিবাসীদের ধর্ম। আফ্রিকান দাসদের মাধ্যমে এই প্রথা হাইতি, পুর্টোরিকো, কিউবা, ব্রাজিল আর ক্যারাবিয়ানে ছড়িয়ে যায়।

[৬৭] স্যার জন ক্লেভারিং (১৬৭২-১৭১৪) ছিলেন নর্থাম্বারল্যান্ডের তৃতীয় ব্যারন অব ক্লেভারিং অব অ্যাক্সোয়েল। হেক্সাম প্রায়োরিও এই একই কাউন্টিতে পড়ে বলে মনে করা যায় যে লাভক্র্যাফট এই ভদ্রলোকের কথাই লিখেছিলেন।

[৬৮] সাবিন ব্যারিং গোল্ডের কিউরিয়াস মিথস অব মিডল এজেস (১৮৬৮) বইটিতে জার্মান বিশপ হ্যাটোর কথা আছে। হ্যাটো কিছু গরীব মজুরকে নিজের দুর্গে এনে পুড়িয়ে মেরেছিল দুর্ভিক্ষ আটকাতে। কিছুদিনের মধ্যেই একদল ইঁদুর হ্যাটোর দুর্গ আক্রমণ করে এবং তাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলে। এস টি যোশী জানান, লাভক্র্যাফটের লাইব্রেরিতে এই বইটি ছিল।

[৬৯] মূল গল্পে কালো-মানিক বিড়ালটির নাম ছিল 'নিগার-ম্যান' যা বর্তমান আমেরিকায় অত্যন্ত বর্ণবিদ্বেষী শব্দ এবং এর ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। লাভক্র্যাফটের ছোটবেলার পোষা বিড়ালটিরও এই নাম ছিল। এর থেকে বোঝা যায় সাদা চামড়ার অ্যাংলো স্যাক্সন মানুষদের ছাড়া অন্যদের প্রতি লাভক্র্যাফট যথেষ্ট বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন। অনেক সমালোচক বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বেশির ভাগ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই ছিল বলে লাভক্র্যাফটকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লাভক্র্যাফটের ১৯১২ সালে লেখা কুখ্যাত কবিতা "অন দ্য ক্রিয়েশান অব নিগারস" পড়লে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত গোঁড়া এবং কালো মানুষদের বিরোধী ছিলেন।

[৭০] "হার্বার্ট ওয়েস্ট: রিঅ্যানিমেটর" গল্প দ্রষ্টব্য।

[৭১] "ফ্যাক্টস কনসার্নিং দ্য লেট আর্থার জারমিন" গল্পে একই রকম ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে।

[৭২] গ্যেটিরা ছিল থ্রেসিয়ার আদিবাসী, পরে তারা পশ্চিম গথদের সঙ্গে মিশে দানিয়ুব ও দানিস্টার নদীর পাড়ে থাকতে শুরু করে। সম্পূর্ণ বাক্যটিকে বুঝতে পারা এই অংশগুলি থেকে সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন এগুলি বিভিন্ন ঘরের নাম। যেমন *Liber Praeceptiones*-এর অর্থ নির্দেশিকা পুস্তকের স্থান। *Templum* (মন্দির), *Pontificates* (পুরোহিতের গৃহ), *Dona* (যেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত কিছু রাখা হয়) ইত্যাদি।

[৭৩] কবি ক্যাথুলুস: গায়াস ভ্যালেরিয়াস ক্যাথুলুস (৮৪ থেকে ৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) একজন রোমান কবি ও সাহিত্যিক।

[৭৪] সূর্যের বিচ্ছুরিত রশ্মি ছিল ম্যাসিডনিয়ার প্রতীক (ষষ্ঠ থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। ১৯৯৩ সালে এই ছবিটি গ্রিসের জাতীয় প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত হয়।



[৭৫] মানুষ বা কোনও পশুর বলির রক্তের দাগের কথা বলেছেন লাভক্র্যাফট।

[৭৬] অ্যানাটোলিয়া, টার্কির উত্তর-পশ্চিমে বিগা পেনিনসুলার উপর গ্রিক গ্রামগুলির খননকার্যের অভিযানের কথা বলা হয়েছে।

[৭৭] প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হার্ডিং ১৯২৩ সালে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। যদিও মনে করা হয় যে তাকে খুন করা হয়েছিল।

[৭৮] রোমান লেখক গেয়াস পেট্রোনিয়াস আরবাইটার তাঁর বই "দ্য স্যাটায়ারিকন"-এ রোমান সম্রাট নেরোর আদলে মজা করে ট্রিমালকিয়ো নামে একটি চরিত্র তৈরি করেন। সদ্য বড়লোক হওয়া ট্রিমালকিয়ো প্রচুর আড়ম্বর সহকারে ভোজসভা দিতে ভালোবাসত।

[৭৯] আয়োডিনের অভাবে হওয়া রোগ ক্রিটিনিসম।

[৮০] কবরের উপরের মাটি বা পাথরের অদ্ভুত স্তূপকে টুমুলি বলা হয়।

[৮১] "ডেগন" গল্প দ্রষ্টব্য। পিল্টডাইন ম্যান: ১৯১২ সালে চার্লস ডসন নামের এক প্রত্নতাত্ত্বিক ইংল্যান্ডের সাসেক্স প্রদেশে পিল্টডাউন বলে একটা জায়গায় কিছু করোটি, চোয়াল ও দাঁতের টুকরো খুঁজে পান। সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে তিনি দাবি করেন, তিনি এমন একটা প্রজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন, যা কিনা বাঁদর থেকে মানুষে রূপান্তরের মিসিং লিঙ্ক। ব্যাপারটি নিয়ে সেই সময়ে ব্যাপক হইচই হয় এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রির তৎকালীন কর্তৃপক্ষ আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ড ও ব্যাপারটি সমর্থন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধারণা করেন, যে করোটি এবং চোয়ালের অংশটি নাকি কম করেও পাঁচ লাখ বছর পুরোনো। মানব ইতিহাসে এক রহস্যময় অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

১৯৪৯ সালে কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে জানা যায় স্যাম্পেলগুলি খুব বেশি হলেও পঞ্চাশ হাজার বছর পুরোনো এবং আরও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে খুলির নিদর্শনগুলো ওরাংওটাং-এর। কেউ জালিয়াতি করে চোয়ালের টুকরোগুলোতে মানুষের দাঁত বসিয়ে দিয়ে একটা বকচ্ছপ ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের ওপর শতাব্দীর অন্যতম বড় জালিয়াতির পর্দা এভাবেই ফাঁস হয়ে পড়ে।

[৮২] লাভক্র্যাফট সৃষ্ট প্রাচীন ও মহাজাগতিক দানব-দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন এই নায়ারলাথোটেপ। কথুলু-এর মতো ইনি ঘুমন্ত নন, বা ইয়গ সোথথ-এর মতো নির্বাসিতও নন। ইনি রীতিমতো কর্মক্ষম এবং অ্যাজাথথের আদেশ পালনকারী। পৃথিবীর বুকে একজন রোগা, লম্বা এবং চনমনে মুখের মানুষ হিসাবে ইনি ঘুরে বেড়ান। যে কোনও প্রাণীর রূপ ধারণ করতে ইনি সিদ্ধহস্ত— আর কোনও শিকারকে সরাসরি না হত্যা করে তাকে উন্মাদ বানিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণাময় মৃত্যু দেখে ইনি পরমানন্দ লাভ করেন। নামকরণের মধ্যে লাভক্র্যাফট একটা ইজিপ্টিয় ছোঁয়া রেখেছেন— "হোটেপ" অর্থ, শান্তি। "ড্রিম কোয়েস্ট অব আননোন কাদাথ" দ্রষ্টব্য।

[৮৩] এর থেকে বোঝা যায় ডেলাপোর পূর্বপুরুষরা ম্যাগনা ম্যাতেরের উপাসকদের পুরোহিত ছিলেন।

[৮৪] লাইনটি প্রথম পাওয়া যায় ফিয়োনা ম্যাক্লিওডের দ্য সিন ইটার গল্পে (১৮৯৫)।

[৮৫] ডেলাপো প্রথমে কথা বলা শুরু করে প্রাচীন ইংরাজিতে, তারপর যথাক্রমে অর্ধ ইংরাজি, ল্যাটিন, গলিয়, এবং শেষ পর্যন্ত অর্থহীন চীৎকার।

[৮৬] হ্যানওয়েল কাউন্টির পাগলা গারদ প্রথম তৈরি হয় ১৮৩১ সালে। বর্তমানে এটি ইয়েলিং হাসপাতালের অংশ।

[৮৭] আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালান পো কবি সারা হেলেন হুইটম্যানের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন হুইটম্যানের প্রভিডেন্সের বাড়িতে ১৮৪৮ সালে। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে পো সারাকে বিবাহ করতে চান। প্রাথমিকভাবে রাজি হয়েও সারা দু-দিন পরে পো-কে না করে দেন। পো ভগ্নহৃদয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যান এবং আর কখনও সারার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

[৮৮] ১৫৯ বেনিফিট স্ট্রিটের বাড়িটি বহু দিন হল ভেঙে ফেলা হয়েছে।

[৮৯] সেইন্ট জনস চার্চের সামনে কোনও পুরোনো সমাধিক্ষেত্রে আর নেই। মনে করা হয় ১৮১০ সালে চার্চটি সারানোর সময় সমাধিক্ষেত্রটি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়।

[৯০] প্রভিডেন্সের এই বিরাট সমাধিক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড" গল্পে।

[৯১] লাভক্র্যাফট বর্ণিত ব্যাবিট হাউসটির ঠিকানা ১৩৫ বেনিফিট স্ট্রিট। বর্তমানে এটি জন মাউনি হাউস নামে পরিচিত। পাশের ছবিটি বাড়িটির বর্তমান সময়ের ছবি।



[৯২] *Monotropa uniflora* কে ঘোস্ট প্ল্যান্ট বা কর্পস প্ল্যান্ট বলা হয়। কোনও সূর্যরশ্মি ও ক্লোরোফিল ছাড়াই অন্ধকারে এরা বংশবৃদ্ধি করে।

[৯৩] হুইপল ছিল লাভক্র্যাফটের তস্য তস্য পিতামহের পদবী। লাভক্র্যাফটের পিতামহ এবং ভাই এর নামের মধ্যেও হুইপল ব্যবহার করা হয়েছিল।

[৯৪] উইলিয়াম হ্যারিস ছিলেন প্রভিডেন্সের প্রথম বসবাসকারীদের মধ্যে একজন (১৬৩৬)।

[৯৫] সার্লট গিলম্যানের "দ্য ইয়েলো ওয়ালপেপার" (১৮৯২) গল্পটি থেকে লাভক্র্যাফট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মনে করা হয়।

[৯৬] নুসনেক নদীর পাশে নুসনেক হিল কৃষিক্ষেত্র ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বর্ধিষ্ণু জনপদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়।

[৯৭] নাথানিয়েল গ্রিন (১৭৪২-১৭৮৬) মেজর জেনারেল হিসেবে বোস্টনের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

[৯৮] নিউ জার্সির প্রথম রাজধানী শহর ছিল এলিজাবেথ টাউন। এখন শহরটি শুধুই এলিজাবেথ নামে পরিচিত।

[৯৯] আসল নাম ওয়েবোসট ব্রিজ। প্রভিডেন্সের মার্কেট স্কোয়ার আর ওয়েস্টমিনিস্টার স্ট্রিটের মাঝখানে স্থাপিত।

[১০০] ক্যাপ্টেন কাহুন ভিজিল্যান্ট নামের ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের রণতরীর ক্যাপ্টেন ছিলেন।

[১০১] ১৮১২ সালে আমেরিকার রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮১৪ সালে এই যুদ্ধ ঘেন্টের চুক্তি অনুসারে শেষ হয়।

[১০২] ১৮১৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রভিডেন্স এবং নিউ ইংল্যান্ডে একটি হ্যারিকেন ঝড়ের তাণ্ডব চলে। লাভক্র্যাফট সেই ঝড়ের কথাই বলেছেন।

[১০৩] ১৮৬২ সালে ফ্রেডরিক্সবার্গের যুদ্ধে অন্তত দুই লক্ষ মানুষ যোগদান করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের এর লড়াইয়ে দক্ষিণী কনফেডারেট সৈন্যরা ইউনিয়ানের সৈন্যদের হারাতে সক্ষম হয়।

[১০৪] ১৭৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

[১০৫] "দ্য ডেইলি ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যান্ড ক্রনিক্যাল" প্রথম ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।

[১০৬] রোড আইল্যান্ডে এই আদিবাসীরা কলোনিস্টদের থেকে অন্তত ত্রিশ হাজার বছর আগে থেকে বসবাস করছিল।

[১০৭] জন থ্রকমর্টন ছিল রজার উইলিয়ামসের সহযোগী ও প্রভিডেন্সের প্রথম বাসিন্দাদের একজন।

[১০৮] "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড" দ্রষ্টব্য।

[১০৯] "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড" দ্রষ্টব্য।

[১১০] প্রভিডেন্সের আঠারো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইস্ট গ্রিনউইচ অবস্থিত।

[১১১] ফ্রান্সে কড নামে কোনও গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও কডকোস্টে আর গড নামে দুটি গ্রাম সেই সময়ে ছিল।

[১১২] ব্যারিং গোল্ডের "দ্য বুক অব ওয়ারউলফ"-এ এই ঘটনাটির বর্ণনা আছে আ টেরিবল সুপারস্টিশান নামে (১৮৬৫)। মনে করা হয় রুলেট আসলে মানসিক রোগী ছিল যে নিজেকে ওয়ারউলফ বলে ভাবত ও সেইরকম আচরণ করত।

[১১৩] স্কিনারের লেখা "মিথস অ্যান্ড লেজেন্ডস অব আওয়ার ওন ল্যান্ড"-এ এইরকম একটি ঘটনার বর্ণনা ছিল।

[১১৪] ১৭৬৪ সালে প্রভিডেন্স আর রোড আইল্যান্ডের বাসিন্দাদের জন্যে ব্রাউন ইনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[১১৫] ১৯০৭ সালে রোড আইল্যান্ডের ন্যাশনাল গার্ডদের জন্যে এই অস্ত্রাগার বানানো হয়।

[১১৬] এখানে লাভক্র্যাফট বিজ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

[১১৭] ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস ১৮৭০ সালে ক্রুকস টিউব বানান। এই টিউব দিয়ে এক্সরে নির্গত হয়। চরিত্ররা ভেবেছিল হয়তো অশরীরী শক্তির বিরুদ্ধে এই এক্সরে কোনওভাবে কাজে দেবে।

[১১৮] ফ্লেমথ্রোয়ার ধরনের অস্ত্রের প্রথম ব্যবহার জানা যায় গ্রিকদের হাতে প্রথম শতাব্দীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এর ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়।

[১১৯] "রেভ্যু দে দু মঁদ" একটি ফরাসি জার্নাল যেখানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের খবর থাকে। জার্নালটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৮২৯ সালে।

[১২০] এই এলাকাটি কেন্দ্র করে "কল অব কথুলু" গল্পটি লেখা হয়েছে।

[১২১] "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড"-এ উল্লেখিত।

[১২২] ১৯২৫-এর অগাস্ট মাসে লাভক্র্যাফটকে লেখা "টাই-আউট" পত্রিকার সম্পাদক চার্লস ডব্লিউ স্মিথ এর এক চিঠিতে বর্ণিত এক গ্রাম্য কবরখানায় আটকে পড়া এক সৎকার কর্মীর বর্ণনা থেকেই এই গল্পের বীজ লেখক পেয়েছিলেন। গল্পটি লেখক স্মিথকেই উৎসর্গ করেছিলেন। গল্পে ব্যবহৃত বীভৎস বর্ণনার কারণে প্রথমে তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা উইয়ার্ড টেলস এই গল্পটি ছাপতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য ১৯৩২ সালে গল্পটি 'উইয়ার্ড টেলস'-এ পুনঃপ্রকাশিত হয়। লাভক্র্যাফটের সৃষ্ট মিথোসের কোনও যোগসূত্র এই গল্পে একেবারেই অনুপস্থিত। সেই কারণে অনেক সমালোচক এই গল্পটিকে লাভক্র্যাফটের একটি ব্যতিক্রমী ও কিছুটা নিম্নমানের গল্প হিসেবে মূল্যাঙ্কন করেছেন। কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের পটভূমিকায় অতিপ্রাকৃত হররের উদাহরণ লাভক্র্যাফটের লেখায় প্রচুর। সেই নিরিখে এই গল্পটিও লাভক্র্যাফটিয়ান হররের একটি রসোত্তীর্ণ উদাহরণ।

[১২৩] পেক ভ্যালি: ভ্যালি কাউন্টিতে ফোর্ট পেক নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। লাভক্র্যাফট হয়তো এটির কথাই লিখেছেন।

[১২৪] ১৮৮০ সালে আমেরিকায় টাইফয়েড আর ইয়েলো ফিভারের প্রাদুর্ভাবে প্রচুর মানুষ মারা যেত।

[১২৫] বাইবেল অনুসারে বলা হয় মহাপ্লাবনের পরে পৃথিবীর বাকি মানুষেরা একসঙ্গে একটি শহর তৈরি করেছিল। তখন মানুষেরা সবাই এক ভাষায় কথা বলত এবং তাদের সবার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ছিল। সেই শহরের মাঝখানে ছিল ব্যাবেলের টাওয়ার। ভগবান যখন দেখলেন টাওয়ারটি উঁচু হতে হতে প্রায় স্বর্গে পৌঁছে যাচ্ছে তখন তিনি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন করে দিলেন। তার ফলে কেউ আর অপরের কথা বুঝতে পারল না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

[১২৬] উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন গোত্রের গাছ ও বড় ঝোপকে সাধারণভাবে সাইপ্রাস গাছ বলা হয়।

[১২৭] অ্যাকিলিস টেন্ডন হল পায়ের পিছনের শক্ত পেশিগুচ্ছ।

[১২৮] পিকম্যানস মডেল: সমালোচকরা বলেন লাভক্র্যাফট এই গল্পটি আর "মিউজিক অব এরিক জ্যান"-এর গল্পে প্রায় একই থিম ব্যবহার করেছেন। এরিক জ্যানের গল্পে শিল্পীর মাধ্যম যেখানে সুর পিকম্যানের গল্পে সেখানে রং-তুলি।

[১২৯] গল্পটি থার্বার নামে পিকম্যানের এক বন্ধু এলিয়টকে শোনাচ্ছেন।

[১৩০] বোস্টন আর্ট ক্লাব প্রথম তৈরি হয় ১৮৫৪ সালে। ১৮৮২ সালে ক্লাব হাউসের একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়। বাড়িটি ১৯৫০ সালে বিক্রি করে দেওয়া হলেও ক্লাবটি এখনও আছে।

[১৩১] "অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস" গল্পে নাথানিয়েল ডার্বি পিকম্যানের উল্লেখ আছে মিসকাটোনিক ইউনিভার্সিটির আন্টার্কটিকা অভিযানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। তবে সেই নাথানিয়েলের সঙ্গে রিচার্ড পিকম্যানের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। পিকম্যান নামটি এসেছে পিকার শব্দটি থেকে যার অর্থ লোভী পেটুক। আরব ভাষায় গুল এক ধরনের প্রেতাত্মা যারা কবর খুঁড়ে মৃতদেহ খেয়ে থাকে। আবার পিকম্যানের অন্য অর্থ যে ছিনিয়ে নেয়। গুল শব্দটিও যে আরবি শব্দ গালা থেকে এসেছে তার মানেও ছিনিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ লাভক্র্যাফট যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেই পিকম্যান নামটি বেছেছিলেন।

[১৩২] বোস্টনের সবথেকে পুরোনো পাড়া। ১৯২০ সালে অঞ্চলটি ইতালিয় অভিবাসীদের বস্তিতে পরিণত হয়েছিল।

[১৩৩] "ড্রিম কোয়েস্ট অব আননোন কাদাথ" গল্পের সময় পিকম্যান নিজেই একটি নারকীয় গুলে পরিণত হয়েছিল।

[১৩৪] লাভক্র্যাফট 'উইয়ার্ড টেলস' পত্রিকার অনেক শিল্পীর কাজ পছন্দ করতেন না। তাদের মধ্যে মার্গারেট ব্রান্ডেজ, হ্যানেস বোক, ভার্জিল ফিনলে ইত্যাদি নামী শিল্পীরাও ছিলেন।

[১৩৫] "কালার আউট অব স্পেস" দ্রষ্টব্য। হেনরি ফুজেলি (১৭৪১-১৮২৫) একজন স্যুইডিশ শিল্পী। এঁর আঁকা "দ্য নাইটমেয়ার" ছবিটি বিশ্বে অন্যতম গথিক হরর পেন্টিং হিসাবে বিখ্যাত। ১৭৮১ সালের এক আর্ট এক্সিবিশনে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। একজন মহিলা সাদা পোশাকে আলুথালুভাবে ঘুমিয়ে রয়েছেন আর তার বুকের ওপর বসে রয়েছে ভয়ানক দেখতে এক বামনাকৃতি জীব— এই ছিল ছবিটির মূল উপজীব্য। সেই জীবটির অবয়ব এমনি বিবমিষা উদ্রেককারী যে ছবিটি দেখামাত্র দর্শকরা ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শিল্পচাতুর্য্যে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক কারণেই ছবিটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু ফুজেলি ছবিটির ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না করায়, ছবিটির উৎস বা অনুপ্রেরণা ব্যাপারটি রহস্যঘন হয়ে পড়ে। গথিক হরর প্রেমিদের কাছে, ছবিটি আজও কালজয়ী।

[১৩৬] "ডেগন" দ্রষ্টব্য।

[১৩৭] "কল অব কথুলু" দ্রষ্টব্য। যে যে লেখকের থেকে লাভক্র্যাফট তাঁর হরর গল্প লেখার প্রেরণা পান, তাঁদের মধ্যে লর্ড ডানসিনি অন্যতম। গথিক হরর রচনায় লাভক্র্যাফট পূর্ববর্তী যুগে ইনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর গল্পে ছবি আঁকতেন সিডনি সাইম। তাই এঁর ছবির সঙ্গে লাভক্র্যাফটের পরিচিতি স্বাভাবিক এবং সাইমের আঁকা ছবি উনি পছন্দও করতেন।

[১৩৮] "কল অব কথুলু" দ্রষ্টব্য। শিকাগোর আঙ্গারোলা: অ্যান্টনি অ্যাঙ্গারোলা (১৮৯৩-১৯২৯) আমেরিকা বংশোদ্ভূত একজন শিল্পী। অ্যাঙ্গারোলা প্রোটো রেনেসাঁ টাইপের আঁকায় বেশি পারদর্শী হলেও, তাঁর আঁকায় হরর সেরকমভাবে পাওয়া যায় না। তবে "কিংডম অব ইভিল" নামে একটি আঁকায় তিনি শয়তানের একটা অবয়ব তুলে আনেন। মনে করা হয়, ছবিটি দেখেই লাভক্র্যাফটের তাঁর কাজ ভালো লেগে যায়।

[১৩৯] পিকম্যান সত্যিই মানুষ ছিল না, সে ছিল মানুষের চেহারায় একটি গুল।

[১৪০] "দ্য হাউন্ড" দ্রষ্টব্য। ফ্র্যান্সিসিসকো গোয়্যা (১৭৪৬-১৮২৮) বিখ্যাত স্প্যানিশ পোর্ট্রেট শিল্পী। ১৮১৯ থেকে ১৮২৩ সাল নাগাদ তাঁর ভূতুড়ে ছবিগুলিকে একত্র করে একটা সিরিজ বের করা হয়— যার নাম ছিল ব্ল্যাক পেন্টিং সিরিজ। এই সিরিজের মধ্যে তাঁর আঁকা একটি ছবি বিখ্যাত, যার নাম, "স্যাটার্ন ডিভাউরিং হিস সন" অর্থাৎ এক পিতার তার পুত্রকে জীবন্ত খেয়ে নেওয়ার একটি বীভৎস রসের ছবি। ছবিটি প্রথমে গোয়্যার বাড়ির দেওয়ালে আঁকা হয়েছিল, পরে সেটিকে ক্যানভাসে রূপদান করা হয়।

সন্দেহাতীতভাবেই আতঙ্ক সম্রাট লাভক্র্যাফট এই সিরিজের ছবিগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

[১৪১] বোস্টন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৭৬ সালে।

[১৪২] "দ্য ফেস্টিভাল" আর "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড"— এই গল্প দুটিতে সালেমের এই ডাইনি হত্যার কথা বিস্তারিত বলা আছে।

[১৪৩] ডেনভার অ্যাসাইলামের কথা "দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ" গল্পটিতে বলা আছে।

[১৪৪] বোস্টনের ব্যাক বে-এর কাছের একটি জনপ্রিয় ফ্যাসানের রাস্তা।

[১৪৫] নর্থ এন্ডের কপ হিল কবরখানা বোস্টনের সব থেকে পুরোনো কবর। আন্দাজ করা হয় ১৬৩৯ সালে প্রথম এই জায়গাটিতে কবর দেওয়া শুরু হয়।

[১৪৬] "পিকচার ইন দ্য হাউস" গল্প দ্রষ্টব্য।

[১৪৭] ওয়ান্ডার্স অব দ্য ইনভিসিব্‌ল ওয়ার্ল্ডস: কটন ম্যাথের এর লেখা এই বইটি ১৬৯২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। কটন মাথের ছোটবেলায় একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি পাদ্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। নিউ ইংল্যান্ড এবং সালেম — এসব জায়গাকে তিনি মনে করতেন শয়তানের আখড়া। ডাইনি-শিকারী হিসাবে তিনি গ্রামের মধ্যে পরিচিত হন। নিজের এই ডাইনি হত্যার সমর্থনে তিনি এই বইটি লেখেন। নিউ ইংলন্ডে জন্ম এবং বড় হওয়ার সুবাদে লাভক্র্যাফট কটন মাথেরের কিংবদন্তি শুনে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁর বই-এর খবর যে লাভক্র্যাফটের রচনায় স্থান করে নেবে, তা বলাই বাহুল্য।

[১৪৮] সপ্তাদশ শতাব্দীতে তৈরি বোস্টনের বাড়ির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য।

[১৪৯] অ্যান্ড্রোস ও ফিপ্স: স্যার এডমন্ড অ্যান্ড্রোস: (১৬৩৭ -১৭১৪) নিউ ইংল্যান্ড প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তাঁকে লোকে তেমন ভক্তি করত না। তাঁর কড়া ব্যবহার, ইংরাজদের আদবকায়দায় চলাফেরা এবং সাধারণ মানুষদেরও তা করতে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণে তাঁকে নিউ ইংল্যান্ডের লোকজন দু-চক্ষে দেখতে পারত না। দ্য শানড হাউস গল্প দ্রষ্টব্য। উইলিয়াম ফিপ্স: (১৬৫১-১৬৯৫) পরাধীন ম্যাসাচুসেটস-এর স্বয়ং রাজার দ্বারা নির্বাচিত গভর্নর। তিনি নিজেও বেশ ডাকাবুকো ছিলেন। ১৬৯২ এর কুখ্যাত সালেম উইচ ট্রায়াল কোর্টের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি এবং পাঁচমাস পর বিরক্তিতে এবং কোর্টের কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে সেটি ভেঙেও দেন তিনি।

[১৫০] ক্লার্ক অ্যাস্টন স্মিথ এবং ট্রান্স সাটার্নিয়ান ল্যান্ডস্কেপ ও লুনার ফাঙ্গি: এইচ পি লাভক্র্যাফটের সমসাময়িক লেখক ও চিত্রকর হলেন ক্লার্ক অ্যাস্টন স্মিথ। ভদ্রলোক নিজেও মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়েছিলেন। নিজের গল্পে অদ্ভুত সব রহস্যের উপস্থাপনা করেছেন উনি— তাঁর চিত্রশিল্পেও ছড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টিছাড়া সব ফিগার। স্যাটার্ন বা শনি তাঁর বহু গল্পে উঠে এসেছে। লাভক্র্যাফট হয়তো স্মিথের আঁকা ছবিগুলিকে উল্লেখ করেছেন।

[১৫১] অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস, জেমস রাসেল লয়েল আর হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো— এই তিনজনেরই সমাধি কেম্ব্রিজের মাউন্ট আবার্ন সমাধিস্থলে পাওয়া যায়।

[১৫২] ১৯১৯ সালে আমেরিকায় মদ্য বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলে সংবিধানে আঠেরো নম্বর ধারায় মদ্য সংক্রান্ত নতুন বিধি প্রণীত হয়।

[১৫৩] ম্যাসাচুসেটে সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি ছোট শহর। বোস্টন থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর পূর্বে।

[১৫৪] সালেমেরই আরেক নাম যদি আর্কহ্যাম হয়, তবে শহরটি নিউবারিপোর্ট থেকে কুড়ি মাইল দূরত্বে ছিল। "দ্য ডানউইচ হরর" দ্রষ্টব্য। অনেকে মনে করেন ম্যানচেস্টার শহরটি আসলে ইন্সমাউথ।

[১৫৫] একটি কাল্পনিক নদী।

[১৫৬] অ্যাডিসন কাউন্টির ছোট একটি জনপদ।

[১৫৭] ম্যাসাচুসেটে ১৮৪৬ সালে এমন কোনও মড়কের কথা জানা যায় না।

[১৫৮] গিলম্যান নামের হোটেলটি হয়তো ইন্সমাউথের বাসিন্দাদের বর্ণনার প্রতি লাভক্র্যাফটের ঠাট্টা। (বাসিন্দাদের মাছের সঙ্গে প্রচুর আকারগত মিল ছিল)।

[১৫৯] ডেনভার স্টেট হসপিটাল ১৮৭৪ সালে তৈরি হয়েছিল। সেখানে মানসিক রোগীদেরও চিকিৎসা হত।

[১৬০] নিউবারিপোর্ট হিস্টোরিকাল সোসাইটি ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[১৬১] হেলেন টিলটন নিউবারিপোর্ট লাইব্রেরিতে ১৯০৫ সালে চাকরি করতেন। হয়তো আনা টিলটন তাঁরই কোনও আত্মীয়।

[১৬২] "দ্য স্ট্রেঞ্জ হাই হাউস ইন দ্য মিস্ট" গল্পে লাভক্র্যাফট এই বাড়ির গল্প আবার শুনিয়েছেন (১৯২৬)।

[১৬৩] 'ওয়াল্পারজিস্নাট' আর 'অল হলোস ইভ' এই দুই পরবের কথা "দ্য কেস অব চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডে" আছে।

[১৬৪] লাভক্র্যাফট ইন্সমাউথের একটি ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। এই বইতে সেটি অন্তর্গত করা হয়েছে।

[১৬৫] বিভিন্ন আকারের জাহাজ।

[১৬৬] আশতরেথ বা ইশ্তহার ছিলেন যৌনতা ও উর্বরতার দেবী। অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দেবী পূজিত হন।

[১৬৭] বেলিয়াল— একটি হিব্রু শব্দ যার অর্থ অদ্ভুত বা মূল্যহীন। পরে ইহুদি ও ক্রিশ্চান সাহিত্যে এই শব্দটির মানে পরিবর্তিত হয়ে শয়তান হয়েছে।

[১৬৮] বিইলজেবাব ছিল ফিলিস্তিনের উপদেবতা। পরে আব্রাহামিক ধর্মে তাকে দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে।

[১৬৯] নাইট টেম্পলারদের প্রশাসনিক দপ্তর। টেম্পলাররা ১১১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ও পোপ দ্বারা অনুমদিত ক্যাথলিক সৈন্যবাহিনী। ক্রুসেডের যুদ্ধে এরা এবং সমকালীন খ্রিস্টীয় সমাজে এদের প্রতিপত্তি ছিল অসীম।

[১৭০] ফ্রিমেসন বা মেসন একটি প্রাচীন সংঘ যাদের উৎপত্তি চতুর্দশ শতাব্দীর স্টোনমেসনদের থেকে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ১৮২৬ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ফ্রিমেসনদের নিয়ে আমেরিকার রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

[১৭১] প্রাচীন গ্রিক উপকথায় হাইড্রা নামে অনেক মাথাওয়ালা এক বিশাল জলচর জন্তুর কথা জানা যায়। বীর হারকিউলিস হাইড্রাকে বধ করেছিলেন।

[১৭২] "দ্য কালার আউট অব স্পেস"-এর অজানা রং দ্রষ্টব্য।

[১৭৩] মাউমি টলেডো শহরের কাছের এক ছোট্ট জনপদ। কথক হয়তো টলেডোর স্টেট হসপিটালে ভরতি ছিলেন।

[১৭৪] "সামথিং অ্যাবাউট ক্যাটস অ্যান্ড আদার পিসেস" বইয়ে লাভক্র্যাফট কথকের বংশতালিকা দিয়েছিলেন।

- ওবেদ— তস্য তস্য মাতামহ, ১৭৯৮ - ১৮৭৮, ইন্সমাউথ।
- ফ্যা'থ্যালি— অর্ধ মৎস। তস্য তস্য মাতামহী, খ্রিষ্টপূর্ব আটাত্তর হাজার বছর, ওবেদের মৃত্যুর পরে জলের নিচে ফিরে যায়।
- অ্যালিস মার্শ— তস্য মাতামহী, ১৮৪৭ - ১৮৬৭, ইন্সমাউথের বুড়ো মার্শের বোন।
- এলিজা ওর্নে— মাতামহী, প্রথম পুত্র আত্মহত্যা করে। খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- মেরি উইলিয়ামসন— মা, ১৮৮৫ - ১৯২২, আর্কনের হেনরি ওলমস্টেডকে বিবাহ করেন।
- ডগলাস ওর্নে উইলিয়ামসন— বড় মামা, ১৮৮৭ - ১৯১৩
- ওয়াল্টার উইলিয়ামসন— ছোট মামা, ১৮৯০
- রবার্ট ওলমস্টেড— কথক, ১৯০৬

[১৭৫] 'অ্যান্ড আই উইল ডুয়েল ইন দ্য হাউস অব লর্ড ফরেভার'— বাইবেলের এই লাইনটিকে ব্যঙ্গ করেই যেন লাভক্র্যাফট গল্পটি শেষ করেছেন।

[১৭৬] অ্যাসেনাথ: ওল্ড টেস্টামেন্ট এর জেনেসিস ৪১-৪৫ এ লিখিত আছে, ইজিপ্টের "ওন" প্রদেশের রাজপুরোহিত পতিফেরার মেয়ের নাম হল অ্যাসেনাথ। অ্যাসেনাথের অন্যতম সন্তানের নাম এপ্রাহিম— যদিও গল্পে লাভক্র্যাফট বিন্যাস বদলে দিয়েছেন। এপ্রাইমের মেয়ে হিসাবে দেখিয়েছেন অ্যাসেনাথকে।

[১৭৭] জাস্টিন জিওফ্রে: কল্পিত কবি জাস্টিন জিওফ্রের জন্ম লাভক্র্যাফটের হাতে নয়। রবার্ট হাওয়ার্ডের ১৯৩১ সালের গল্প "দ্য ব্ল্যাক স্টোন"-এ এই কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পটা শুরুই হচ্ছে জিওফ্রের কবিতা দিয়ে এভাবে:
পুরাতন অভিশাপ আর অন্ধকার—
ফিরে ফিরে আসে বার বার।
পৃথিবীর কোন অন্ধকার কোণে সে আছে অপেক্ষায়।
কিছু মৃত্যুশীতল রাতে, ঠান্ডা লৌহদ্বার হাঁ করে থাকে—
নরকে আবদ্ধ জীব মরে কুম্ভীপাকে।

[১৭৮] মিসকাটনিক বিশ্ববিদ্যালয়: ম্যাসাচুসেটস এসেক্স প্রদেশে আর্কহ্যাম একটি কাল্পনিক শহর। মিসকাটনিক সেখানকারই এক কল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়। এর লাইব্রেরিতেই রয়েছে ভয়ংকরের আরাধনার সমস্ত বইয়ের সারি।

[১৭৯] বুক অব ইবন: ক্লার্ক অ্যাস্টন স্মিথের সৃষ্টি-করা একটি কাল্পনিক বই। বলা হয়, ইবন বলে এক ভয়ানক শয়তান জাদুকরের লেখা বই এটি। সেই জাদুকর বিশ্ব ছাড়িয়ে অন্য গ্রহেও পাড়ি দেয় এবং বিভিন্ন মহাজাগতিক দেবদেবীর সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। বইটির পুরো অংশ পৃথিবীর কোনও এক স্থানে নেই। বরং এর তিনটি টুকরো পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে।

[১৮০] ভন জুন্থ (অভিশপ্ত গুহ্যবিদ্যা): ভন জুন্থ নামটি কাল্পনিক এবং মনে হয় স্বয়ং লাভক্র্যাফটেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। রবার্ট হাওয়ার্ডের ১৯৩১ সালে লেখা গল্প "দ্য চিলড্রেন অব দ্য নাইট"-এ বইটির উল্লেখ রয়েছে। এতে নাকি 'বাকপথাতীত' কিছু কাল্ট বা আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই বইটিও কাল্পনিক।

[১৮১] নেক্রোনমিকন: লাভক্র্যাফটের নিজের সৃষ্টি-করা অভিশপ্ত কাল্পনিক বই এই নেক্রোনমিকন। বইটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'দ্য নেমলেস সিটি' গল্পে। সেখানে এক উন্মাদ আরব আবদুল আলহাজ্রেডের লেখা এই বইটি কেবল যে মহা শয়তানি আরাধনায় ঠাসা তা-ই নয়, শয়তানকে জাগানো, মড়াকে জাগিয়ে তোলা— ইত্যাদি নানা সৃষ্টিছাড়া এবং রক্ত-জল-করা পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে এতে

[১৮২] ওয়াইট: ইন্সমাউথে ("দ্য শ্যাডো ওভার ইন্সমাউথ" দ্রষ্টব্য) যে কয়টি সযত্নে লালিত পরিবার ছিল, তাদের মধ্যে ওয়াইট-রা অন্যতম। বাকিরা হল, গিলম্যানস, এলিয়ট এবং মার্স।

[১৮৩] এপ্রাহিম: এপ্রাহিম আর অ্যাসেনাথের প্ল্যান খুব একটা পরিষ্কার নয় গল্পে। "দ্য শ্যাডো ওভার ইনসমাউথ"-এ পড়েছি যে পাতালরাজ্যের অধিদেবতার বদান্যতায় অমরত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সেক্ষেত্রে অ্যাসেনাথের শরীর তো এমনিতেই অমর, তাহলে অন্য এক মরনশীল দেহলাভের জন্য অ্যাসেনাথের আকাঙ্ক্ষার কারণ পরিষ্কার নয়। যদিও এডোয়ার্ড ডার্বির শরীর বেশ শক্তপোক্ত এবং বলশালী ছিল। তবে অবশ্য কারণ একটাই হতে পারে, তা লেখক নিজেও ইঙ্গিতে বলেছেন যে এপ্রাহিম চাইত নারী শরীরের চাইতে একটি পুরুষ শরীর তার কাজের পক্ষে অনেক বেশি যথোপযুক্ত হবে।

[১৮৪] ক্রাউনিংশিল্ড: আমেরিকার ঐতিহাসিক স্থানের জাতীয় তালিকায় "ক্রাউনিংশিল্ড-বেন্টলে" নামের একটি প্রাসাদোপম বাড়ির উল্লেখে রয়েছে, ম্যাসাচুসেটস এর স্যালেমে। বাড়িটির মালিক ফ্র্যাংক ক্রাউনিংশিল্ড "ভ্যানিটি ফেয়ার" পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ঊনবিংশ শতকের গড়ার দিকে। এই পরিবারটিও বিশেষ বিত্তশালী এবং সরকারী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অবাধ প্রতিপত্তি তাদেরকে লাভক্র্যাফটের আকর্ষণের বিষয় করে তুলেছিল। উচ্চপদাধিকারী বা সমাজের উচ্চস্তরে থাকা মানুষদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করা

লাভক্র্যাফটের বেশ পছন্দ ছিল। তা ছাড়া এই সাদা চামড়া প্রতি উন্মাদনা তাঁকে করে তুলেছিল কট্টর বর্ণবিদ্বেষী।

[১৮৫] মেইন-এর ঘন জঙ্গলে কিছু পুরোনো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তারই কিছু ভগ্ন কাঠামোর নীচে রয়েছে গভীর সুড়ঙ্গ। হাজার সিঁড়ি পেরিয়ে সেই গভীরতায় পৌঁছানো যায় — কেউই এই গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান জানে না। কিন্তু এডোয়ার্ড জানতে পেরেছে। সে এ-ও জানতে পেরেছে যে সেখানে এমন কিছু আছে, যা ঠিক প্রকাশ করা যায় না— অন্য দেশ-কাল থেকে, অন্য মাত্রা থেকে আগত কিছু ভয়ংকরের ব্যাপারে জানতে পেরেছে সে। — "দ্য ড্রিমস ইন দ্য উইচ হাউস" দ্রষ্টব্য।

[১৮৬] আর্কহ্যামের বসবাসরত এক প্রাক্তন তান্ত্রিক: ১৯৩২ সালে অলৌকিক জাদুকর অ্যালিস্টার ক্রাউলির বিতাড়িত সেক্রেটারি ইস্রায়েল রেগার্ডি-কে কেন্দ্র করে একটি জাদুসংঘ করে ওঠে। রেগার্ডি নিজে অলৌকিক জাদুবিদ্যার ওপর বইও লেখেন। ক্রাউলি ১৯২৯ সালে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হন। তারপর অবশ্য উনি আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

[১৮৭] চেসুনকুক লেক পিস্কাটাকিস প্রদেশ, মেইনের অন্তর্গত। ওসব জায়গায় মনুষ্যবসতি আজও নেই বললেই চলে। উত্তর-পূর্বের ছোট্ট গ্রামের সারা বছরের জনসংখ্যার গড় মাত্র দশ জন।

[১৮৮] নেমলেস সিটি গল্পে হয়তো এই অভিযানের কথাই বলা হয়েছে।

[১৮৯] উত্তর গ্রীনল্যান্ডের ছয়শো মাইল পূর্বে এই দ্বীপটি খুঁজে পাওয়া যায়।

[১৯০] আন্দাজ করা হয় এটি ভার্জিনিয়া প্রদেশের এন্ডলেস কেভের কথা বলা হয়েছে। ১৯২০ সাল থেকে এই ছয় মাইল লম্বা গুহাটি দর্শকদের জন্যে জনপ্রিয় গন্তব্য।

[১৯১] ডি এরলেটসের কাল্টস: বইটি কাল্পনিক। "ডি এরলেট" নামটি লাভক্র্যাফটের বন্ধু এবং ভাবশিষ্য অগস্ট ডেররেথের ডাকনাম। হন্টার অব দ্য ডার্ক গল্পে আবার এই কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[১৯২] ডি গাউলস লুডউইগ প্রিনের ডি ভারমিজ মিস্ট্রিজ: রবার্ট বক্লের লেখা "দ্য শ্যাম্বলারস ফ্রম দ্য স্টারস" (১৯৩৫) এ উল্লিখিত এক কাল্পনিক বই। সেখানে বলা আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে লুডভিগ প্রিন নামে একজন অপরসায়নবিদ "কীট-রহস্য" নামে এই বইটি লেখেন। প্রিন নাকি প্রায় পাঁচশো বছর বেঁচেছিলেন। তিনি কেবল যে গুপ্তবিদ্যা অভ্যাস করতেন তা নয়— তাঁর নাকি কয়েকটি শয়তান অনুচরও ছিল। পাঁচশো বছর পর,

তাঁকে ডাইনি-সন্ধানীরা গ্রেপ্তার করে এবং হত্যা করে। এই "কীট-রহস্য" নেক্রোনমিকনের মতোই এক মহা অভিশপ্ত পুস্তক।

[১৯৩] কথুলু মিথোসের অন্তর্গত একটি অভিশপ্ত গুপ্তবিদ্যার বই। রবার্ট ই হাওয়ার্ডের গল্প চিলড্রেন অব দ্য নাইট ও দ্য ব্ল্যাক স্টোনে প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে লাভক্র্যাফট তাঁর গল্পে এই বইটির কথা বলেন।

[১৯৪] নেক্রোনমিকন বা দ্য বুক অব ডেড হয়তো লাভক্র্যাফটের দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী ও রহস্যময় জাদু কিতাব (কিতাব আল-আজিফ)। ১৯২২ সালে দ্য হাউন্ড গল্পে লাভক্র্যাফট প্রথম এই বইটির কথা লেখেন। উন্মাদ আরব জাদুকর আবদুল আলহাজ্রেডের লেখা এই অভিশপ্ত গ্রন্থটিতে প্রাচীন দুনিয়ার মহাশক্তিধর জীবদের কথা ও তাদের আহ্বান জানানোর পদ্ধতির উল্লেখ আছে।

[১৯৫] ১২০ কসওয়ে স্ট্রিট, বোস্টনে অবস্থিত। বোস্টন ও মেইন রেইলওয়েকে জুড়ে আছে এই স্টেশনটি।

[১৯৬] উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভনস (১৮৩৫-১৮৮২) প্রথম অর্থনীতিকে অঙ্ক ও বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেমিস্ট্রি ও বটানি নিয়ে ইউনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডন থেকে পড়াশুনার পরে তিনি ফিলোজফি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে অধ্যয়ন করেন। উল্লিখিত অংশটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "সৌরকলঙ্ক ও ভুট্টার দামের ওঠাপড়া" (১৮৭৫) থেকে নেওয়া হয়েছে।

[১৯৭] অধুনালুপ্ত হর্স্টেইল গাছ। প্রায় একশো ফুট পর্যন্ত লম্বা হত।

[১৯৮] পনেরো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আকাশে সূর্যকে এরকমই লাগবে, এই বিশ্বাস ছিল গল্পটির সময়কালে।

[১৯৯] নাকোটিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাভক্র্যাফটের গল্পে ব্যবহৃত একটি প্রাচীন গুপ্তবিদ্যার কিতাব যার উল্লেখ তিনি প্রথম করেন পোলারিস (১৯১৮) গল্পে।

[২০০] অ্যাগ্লুটিনেটিভ স্পিচ— যে সমস্ত ভাষায় যৌগিক শব্দ তৈরি করা যায় যেগুলির ব্যবহার ছোট বাক্যের মতো। সংস্কৃত, বাংলা, টার্কিশ ও অন্যান্য অনেক ভাষায় এইরকম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

[২০১] "বিয়ন্ড দ্য ওয়াল অব স্লিপ" গল্পে হয়তো এদের কথাই বলা হয়েছে।

[২০২] "অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস" গল্পের মহাপ্রাচীন জীবদের বর্ণনা।

[২০৩] “অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস” গল্পে বর্ণিত।

[২০৪] ক্লার্ক অ্যাস্টন স্মিথের “দ্য টেল অব সাতামপ্রা জেইরোজ” (১৯৩১) -এ এদের বর্ণনা আছে।

[২০৫] অগাস্ট ডেরলেথ ও মার্ক শোরারের দ্য লেয়ার অব স্টার স্পনে (১৯৩২) চো চো-দের বর্ণনা আছে।

[২০৬] “বিয়ন্ড দ্য ওয়াল অব স্লিপ” গল্পটি উল্লেখ্য।

[২০৭] ১৯১৮ সালে রচিত “পোলারিস” গল্পে এই লড়াইয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে।

[২০৮] “অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস” দ্রষ্টব্য।

[২০৯] অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে পিলবারা অঞ্চল খনিজ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের জন্যে বিখ্যাত। পৃথিবীর সুপ্রাচীন কিছু রক ফর্মেশন এখানে দেখা যায়।

[২১০] অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ব্ল্যাকফেলো বলা হয়।

[২১১] অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ভগবানের নাম বুদ্দাই। প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী বুদ্দাই বালির নিচে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভাঙলে তিনি সমস্ত জগতকে গ্রাস করবেন।

[২১২] পিটার ওয়ারবার্টন (১৮১৩-১৮৮৯) প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ও বিশাল মরুভূমিতে অভিযান চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একটি পথ তৈরি করা ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

[২১৩] গল্পের অভিযানের ক্যাম্পের কাছের এই নদীটি পার্সিভাল লেকের সঙ্গে সংযুক্ত।

[২১৪] “অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অব ম্যাডনেস” দ্রষ্টব্য।

[২১৫] জুলাই ১৬, ১৯৩৫ সাল ছিল পূর্ণিমা, যা পিসলির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।

[২১৬] লাভক্র্যাফটের বর্ণনায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের অসংখ্যা গ্রহাণুর অবস্থান একটি অজানা গ্রহের প্রমাণ দেয়। কোনও কারণে এই অজানা গ্রহটি ধ্বংস হয়ে এই গ্রহাণুগুলির সৃষ্টি হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা এই ধারণা ভুল বলে ব্যাখ্যা করেছে।